বনফুলের
গল্প সমগ্র

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫৮

সম্পাদক ঃ
নিরঞ্জন চক্রবর্তী
প্রকাশক ঃ
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা-৭৩
মুদ্রাকর ঃ
দুলাল চন্দ্র ভূঞ্যা
সুদীপ প্রিন্টার্স
৪/১এ সনাতন শীল লেন
কলকাতা-১২
প্রচ্ছদ ঃ
এস. স্কোয়ার

সূচীপত্র

বাড়তি মাশুল ৩ চোখ গেল ৩ অমলা ৪ খেঁদি ৫
পারুল প্রসঙ্গ ৬ আত্মপর ৭ এক ফোঁটা জল ৮
সার্থকতা ৮ অজান্তে ৯ বেচারামবাবু ১০ সমাধান
১১ ভৈরবী ও পূরবী ১২ অদ্বিতীয়া ১৫
কার্তিকেয় কাহিনী ১৭ খেঁকি ২২ অনির্বচনীয় ২৫
রামায়ণের এক অধ্যায় ২৬ স্থুলের স্মৃতি ২৬
বিধাতা ২৯ তর্ক ও স্বপ্ন ৩০ বর্ষা-ব্যাকুল ৩৫
পূজার গল্প ৩৬ বলহরি, হরিবোল ৩৮ ট্রেনে ৪১
সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ ৪৩ মাত্র দশটি টাকা ৪৮
শেষ রক্ষা ৫২ যুগল স্বপ্ন ৫৪ ভিতর ও বাহির ৫৬
সুলেখার ক্রন্দন ৬৯ বুধ্‌নী ৬২ মানুষের মন ৬৪
রূপকথা ৬৭ টাইফয়েড ৮০ রূপকথা ১১৩ ঐরাবত
১১৪ উৎসবের ইতিহাস ১২০ অলকনন্দা ১২৩
যুগান্তর ১৩৩ বাস্তব ও স্বপ্ন ১৩৮ খড়মের দৌরাত্ম্য
১৪৪ পাশাপাশি ১৪৬ বিদ্যাসাগর ১৪৯ পাঠকের
মৃত্যু ১৫১ দত্ত মহাশয় ১৫৩ মিস্টার মুখার্জি ১৫৮
খুড়ো ১৬০ অক্ষমের আত্মকথা ১৬২ ক্যান্‌ভাসার
১৬৪ বৈষ্ণব-শাক্ত ১৬৬ অন্তর্যামীর কাণ্ড ১৬৭
স্ত্রী-চরিত্র ১৬৯ 'থিওরি অব্‌ রিলেটিভিটি' ১৭১
মুহূর্তের মহিমা ১৭৬ শ্রীপতি সামন্ত ১৭৯ শরশয্যা
১৮২ ভ্রষ্ট-লগ্ন ১৮৫ ঘটনাচক্র ১৮৯ কালো ১৯৪ বংশ
গৌরব ১৯৭ ভূত ১৯৯ জগমোহন ২০২ চৌধুরী
২০৬ ভোম্বলদা ২০৮ মানুষ ২১১ নরোত্তম ২১৩
আমাদের শক্তি-সম্পদ ২১৬ আধুনিক গল্প-সাহিত্য
২১৭ পরচর্চা ২২২ বাজে খরচ ২২৫ খোশামোদ ২২৯
স্থূল-সূক্ষ্ম ২৩৫ চিন্তার কথা ২৩৮ প্রাণকান্ত ২৪১
শিশু ২৪৫ দামোদর ২৪৮ শরীর, মন ও মানুষ ২৫৪
বঙ্কিম শতবার্ষিকী ২৫৭ বিবেক ২৬৩ বিবর্তন ২৬৭
দুই বন্ধু ২৭০ আত্মদর্শন ২৭৪ চিরন্তনী ২৮০
নিবিড় পরিচয় ২৮৪ অবচেতনা ২৮৭ অতি-
আধুনিকতা ২৯০ কবচ ২৯৪ পাকা রুই ২৯৮
নাথুনির মা ৩০০ গদ্য-কবিতা ৩০১ কাকের কাণ্ড
৩০৪ খেলা ৩০৭ কোন্‌টা গল্প ৩০৯ সংক্ষেপে
উপন্যাস ৩১৩ অতি-আধুনিক ৩১৫ ক খ গ ৩১৯
তপন ৩২১ করুণা-ভাজন ৩২২ লাল বনাত ৩২৪
ছোটলোক ৩২৫ ইতিহাস ৩২৬ গণেশ ৩২৭ দোলের

দিনে ৩৩৩ নাম ৩৩৬ তিলোত্তমা ৩৩৯ চান্দ্রায়ণ ৩৪৪ চিত্রচতুষ্টয় ৩৪৯ বাঘা ৩৫১ জৈবিক নিয়ম ৩৫৪ জ্যোৎস্না ৩৫৭ আকাশ-পাতাল ৩৬০ চিঠি পাওয়ার পর ৩৬৪ দিবা দ্বিপ্রহরে ৩৬৮ পরিবর্তন ৩৭০ হাসির গল্প ৩৭৫ ব্যতিক্রম ৩৭৭ প্রভু-ভৃত্য ৩৮৫ প্রস্তর সমস্যা ৩৮৭ যূথিকা ৩৮৯ বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট ৩৯১ শ্রীধরের উত্তরাধিকারী ৩৯৩ জাগ্রত দেবতা ৩৯৮ ত্রিবেণী ৪০০ মাধব মুকুজ্যো ৪০৭ নির্ভর ৪০৯ দর্জি ৪১১ ছেলেমেয়ে ৪১৩ ঘোষাল মহাশয় ৪১৭ আইন ৪১৯ সামান্য ঘটনা ৪২২ নিপুনিকা ৪২৪ বর্ণে বর্ণে ৪২৮ কাত্যায়ণী ৪৩০ স্মৃতি ৪৩৩ মকরধ্বজ মহিমা ৪৩৭ অনুবীক্ষণ ৪৪১ ঝুলনপূর্ণিমা ৪৪৩ নমুনা ৪৫০ গণেশ-জননী ৪৫৫ অশ্ব ৪৫৮ নিস্তারিণী ৪৬৪ অভিজ্ঞতা ৪৬৬ ভক্তি-ভাজন ৪৬৯ কশাই ৪৭৩ অশ্রুর উৎস ৪৭৫ হার ৪৭৯ গোবর্ধন-চরিত ৪৮২ অর্জুন মণ্ডল ৪৮৫ অদৃশ্যালোকে ৫০০ রাত দুপুরে ৫০১ অবর্তমান ৫০১ শেষ কিস্তি ৫০৭ মালাবদল ৫০৯ দুই ভিক্ষুক ৫১০ প্রমাণ ৫১১ অধরা ৫১৪ প্রজাপতি ৫১৫ একই ব্যক্তি ৫১৬ তাজমহল ৫১৯ হিসাব ৫২২ নিমগাছ ৫২৩ এপার ওপার ৫২৪ কেন ৫২৬ সহধর্মিনী ৫২৭ ছাত্র ৫২৯ রূপকথা ৫৩০ স্বপ্ন ৫৪১ নন্দীক্ষ্যাপা ৫৪২

বনফুল : গল্প সমগ্র

আমার গল্প যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কাছে আমার লেখা সম্বন্ধে ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ভালবাসেন না তাঁহাদের কাছে আরও নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা আমার লেখার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা গল্পগুলি পড়িলেই আমার স্বরূপ জানিতে পারিবেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও আমার বিশেষ কোন নিবেদন নাই।

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। আমার পরম বন্ধু 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহার উৎসাহ এবং আগ্রহ না থাকিলে হয়ত আমি অধিকাংশ গল্পই লিখিতাম না।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় আমার গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ইঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভাগলপুর

"বনফুল"

বাড়তি মাশুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আপিসে কলম পিষে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেণের একখানি থার্ড ক্লাসে বসে হাঁপাচ্ছি—এমন সময় দেখি সামনের প্লাটফর্ম থেকে বোম্বে মেল ছাড়ছে আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে পড়ে গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে উঠল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যায়—আর ফেরেনি। অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয়নি। ভগবানের ইচ্ছা বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি—হাঁা ঠিক সেই মুখটিই বম্বে মেলের একটা কামরায় দেখতে পেলাম।

আর কি থাকতে পারি?

তাড়াতাড়ি গিয়ে বম্বে মেলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেলও ছেড়ে দিলে। ট্রেণে উঠে আবার ভাল করে দেখলাম—হাঁা ঠিক সেই—পাশে একটি বৃদ্ধও বসে আছেন।

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম, "এতদিন কোথায় ছিলি—আমাকে চিনতে পারিস?"

হা ঈশ্বর—সে উত্তর দিলে হিন্দীতে। "হামরা নাম পুঁছতে হেঁ? কেউ? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।" সমস্ত মনটা যেন ভেঙ্গে গেল—মনে হল যেন দ্বিতীয়বার আমি পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বললেন—"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙ্‌তে হেঁ!"

রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"কিছু না!"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত করে দু-ফোটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

বর্দ্ধমানে নামলাম।

আবার Excess fare বাড়তি মাশুল দিতে হল।

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়ত সে সুশ্রী ছিল না।

আমিও তাহাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে—কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও দেখি নাই। দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা মিনি আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল! তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম—"ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে রাখি।"

"কেন?"

"ওই দুটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি সব চেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।"

এত ভালবাসিতাম—কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাত অপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

মিনি যখন বাপের বাড়ী আসিল, দেখি, তাহার দুটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ শোনা গেল যে চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আড়ালে একদিন দেখা হইয়াছিল।

বলিলাম—"অসাবধানতার জন্যে অমন দুটি চোখ গেল!"

সে উত্তর দিল—"কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে না জানাই ভাল!"

অমলা

অমলাকে আজ দেখতে আস্‌বে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁক্‌লে। সুন্দর, সুশ্রী, যুবা—বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবী—সুন্দর সুপুরুষ।

অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এল। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাব্‌লে—'আমার ঠাকুর-পো!'

মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। একথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সে রাত্রে স্বপ্নই দেখলে!

বিয়ে কিন্তু হল না—দরে বন্‌ল না!

॥ দুই ॥

আবার কিছুদিন পরে অমলাকে দেখতে এল। এবার পাত্র স্বয়ং। নাম হেমচন্দ্র। এবারও অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলে বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা—ধপ্‌ধপে রঙ্—কোঁকড়া চুল—সোনার চশমা—দিব্যি দেখতে।

আবার অমলার মন ধীরে ধীরে এই নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

ভাবলে—কত কি ভাবলে!

এবার দরে বন্‌ল—কিন্তু মেয়ে পছন্দ হল না!

॥ তিন ॥

অবশেষে মেয়েও পছন্দ হল—দরেও বন্‌ল—বিয়েও হল। পাত্র বিশ্বেশ্বরবাবু। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—বি. এ. পাশ—সদাগরি আপিসে চাকুরি করেন।

অমলার সঙ্গে যখন তাঁর শুভদৃষ্টি হল—তখন কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার সারা বুক ভরে গেল। এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হ'ল।

অমলা সুখেই আছে।

খেঁদি

তখন সবে সন্ধ্যা।—মালতী ঘরে এসে প্রদীপটা জ্বালতেই তার স্বামী বলে উঠল—"লতি...আমি একটা নাম ঠিক করেছি।"

"কি?"

"ওই যে তুমি বল্লে—'কি'।"

"তার মানে?"

"ইংরিজি key মানে চাবি আর বাঙলা 'কি'—একটা প্রশ্ন। মেয়ে মানুষের পক্ষে বেশ মানানসই নাম হবে।"

"এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই—এখন থেকেই নামকরণ! আর আমার মেয়েই হবে তুমি জান্‌লে কি করে? ও জ্যোতিষীর কথায় আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"না—না ঠিক মেয়ে হবে—দেখো তুমি। আমাদের শ্যামবাবু জাগ্রত জ্যোতিষী!"

"ধর যদি মেয়েই হয়—তা বলে ওই নাম রাখতে হবে? কত সব ভাল নাম আছে—"

"যথা—শরৎশশী, নিভাননী, ইন্দুবালা, প্রভা, প্রতিভা, সুধা, আশালতা—এই সব ত ? সব বাজে—পুরানো, সেকেলে, এক ঘেয়ে ! আমার মেয়ের নাম হবে একেবারে নতুন।"

. . . .

মালতীর প্রসব হবার দুমাস পূর্বে তার স্বামী কলেরায় মারা গেল। প্রসব হতে গিয়ে মালতীও মারা গেল। জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল—মালতীর মেয়েই হয়েছিল। সে এখন তার মামার বাড়ী সোনারপুরে মানুষ হচ্ছে। তাঁরা তার নাম রেখেছেন "খেঁদি !"

পারুল প্রসঙ্গ

"ও কি তোমাদের মত উপায় ক'রে খাবে নাকি ?"

"উপায় ক'রে না খাক—তা ব'লে মাছ দুধ চুরি ক'রে খাওয়াটা—"

"আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব !"

"সে ত খাওয়াচ্ছই—তাছাড়াও যে চুরি করে। এরকম রোজ রোজ—"

"বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায় ?"

"যাই হোক—আমি বেড়ালকে মাছ দুধ গেলাতে পারব না। পয়সা আমার এত সস্তা নয়।"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্তিনী মেনি মার্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর এ-ভাবে থাকিবে ? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুলবালা ভূমি-শয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল—"কি করছ ছেলেমানুষি ! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেড়াল তাড়িয়ে দিচ্ছি !"

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—"চল চল—তোমার বেড়ালকে মাছ দুধই খাওয়ান যাক্।"

পারুল—"হ্যাঁ, সে তোমার মাছ দুধ খাওয়ার জন্যে ব'সে আছে কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?"

"আচ্ছা আমি খুঁজে আনছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?" বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল।

এদিক ওদিক রাস্তা ঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিক খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা

পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছে!—"কই দেখ্‌তে পেলাম না ত বাইরে। সে আসবে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।"

"চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।"

"Hunger strike করবে না কি!"

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিল—তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—কড়ায় একটুও দুধ নাই—ভাজা মাছগুলি অন্তর্হিত—ডালের বাটিটা উল্টান।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল ত অপ্রস্তুত!

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন।

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে মেনি কুণ্ডলী পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায়

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুর বেলায় দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে—অমনি মুখের উপর থপ্‌ ক'রে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা। লোম নেই—ডানা নেই—কিম্ভূতকিমাকার! রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল—টপ্‌ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখীদের আর্তরব শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

তারপর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে!

আমাদের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার—কবরেজ—ওঝা—বদ্যি কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না। শচীন জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

বাড়ীতে কান্নার তুমুল হাহাকার।

ভিতরে আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিত অজ্ঞান। তাকে নিয়ে একজন লোক শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি দড়ির খাটিয়ার ওপর শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

তখন বহুদিন পরে—কেন জানিনা—সেই পাখীর ছানাটার কথা মনে পড়ে গেল।

সেই চার পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখীর ছানাটি, আর তার চারদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত্ত হাহাকার।

হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।

একফোঁটা জল

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালী লোক তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা ভাবিনি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম—শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না! আমি হলাম এদিককার ডাক্তার।

যাই হোক নেমন্তন্ন যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম। গিয়ে দেখি শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বল্লেন, "আসুন ডাক্তারবাবু—আসতে আজ্ঞা হোক্!" দু'চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার মায়ের হয়েছিল কি?"

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"ও, আপনি শোনেননি বুঝি! আমার মা ত আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন—তাঁকে আমার মনেও নেই—ইনি আমার আর এক মা—সত্যিকারের মা ছিলেন।"

ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম—"কি রকম? কে তিনি?"

তিনি বললেন—"আমার মঙ্গলা গাই—আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই—সেই থেকে ওই গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড় করেছে। ওরি দুধে আমার দেহ মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু!"

এই বলে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেল্লেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সার্থকতা

আমার অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি—আর আমার দুঃখ হয়! সে যেন একটা সুখ-স্বপ্ন ছিল! সেই আমার অতীত জীবনের স্মৃতি ··আজ সত্য সত্যই স্মৃতি-মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সে জীবন গেল কোথায়? সেই শোভন, সুন্দর, মোহন জীবন।

…একদিন আমার রূপ ছিল—সৌরভ ছিল—মধু ছিল। আমার সেই সুষমার দিনে কত মধুলুব্ধ ভ্রমরই না আমার কানে কানে বন্দনার স্তুতিগান তুলিয়াছে! …. তাহারা আজ কোথায়?

…এই আকাশ বাতাস আলো একদিন কতই না ভালো লাগিয়াছে! একদিন ইহাদের লইয়া সত্যই আমি পাগল হইয়া থাকিতাম…আজ কোথায় গেল আমার সেই পাগলামি…সেই সহজ উন্মাদনা—ছন্দময়ী ভাললাগার নেশা! আজ কই তারা সব?

…আজ আমি পরিপক্ক—অভিজ্ঞ। আমার সেই অতীতের তরল অনুভূতি জমিয়া যেন কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আমার আজ কেবলই মনে হইতেছে…আমার অতীত আর ফিরিবে না জানি—কিন্তু ভবিষ্যৎ? সে কেমন—কি জানি! আমার আনন্দময় অতীতকে হারাইয়া আজ এই যে পরিপক্ক অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি—ইহার পরিণতি কি?—ইহার সার্থকতা কোথায়?

* * * * * *

গাছের একটি পাকা ফল এই সব ভাবিতেছিল। হঠাৎ বাতাসের দোলায় মাটিতে পড়িয়া গেল। ..একটি পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ফলটি লইয়া একটি ডালে বসিল এবং পরম আনন্দে ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিল!

অজ্ঞাতে

সেদিন আপিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ী ফেরবার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্যে একটা 'বডিস্' কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়েছি—বৃষ্টিও আরম্ভ হল। কি করি—দাঁড়াতে হল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে—জামাটি বগলে ক'রে—ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম—তার পরই গলি, তা-ও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও পড়ে গেল, আমিও পড়ে গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি—লোকটা তখনও ওঠেনি—ওঠ্‌বার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল—মারলাম এক লাথি!

“রাস্তা দেখে চলতে পারো না শুয়ার!”

মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল—কিন্তু কোন জবাব করলে না! তাতে আমার আরও রাগ হল—আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ীর এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি মশাই ?"

"দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না—ঘাড়ে এসে পড়ল—"

"কে—ও ? ওঃ—থাক্ মশাই মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না ! ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী—এই গলিতেই থাকে—"

তার দিকে চেয়ে দেখি—মারের চোটে সে বেচারা কাঁপচে—গা'ময় কাদা। আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছে।

বেচারামবাবু

হরিশ মুদী সন্ধ্যাবেলা হিসাব বুঝাইয়া গেল যে গত মাসের পাওনা ২৭৭০ পঃ হইয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে মিটাইয়া দেওয়া দরকার। সদ্য-অফিস-প্রত্যাগত বেচারামবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মাইনেটা পেলেই— !" অতঃপর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বেচারাম বাহিরের রোয়াকটিতে বসিয়া হাঁক দিলেন—"ওরে চা আন্—।" চা আসিল। চা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার হরিবাবু, নবীন রায়, বিধু ক্লার্ক প্রভৃতি চার পাঁচজন ভদ্রলোকও সমাগত হইলেন এবং সমবেতভাবে গল্প-গুজব সহযোগে চা-পান চলিতে লাগিল।

গল্প চলিতেছে। এমন সময় বেচারামবাবুর ছোট মেয়ে পুঁটি আসিয়া উপস্থিত—"বাবা, দুখানা চিঠি এসেছে আজ ডাকে। আনব ?"

পুঁটির ছোট বোন টুনিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কহিল—"আমি আনব বাবা !" বেচারামবাবু মীমাংসা করিয়া দিলেন—"আচ্ছা দু'জনে দুটো আনো !"

শ্রীযুক্ত বেচারাম বক্‌সির পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র।

পুঁটি ও টুনি দুজনে দু'খানি পত্র বহন করিয়া আনিল। প্রথম পত্রখানি বেচারামবাবুর প্রবাসী পুত্র বহরমপুর হইতে লিখিতেছে—তাহার কলেজ ফি, হষ্টেল চার্জ প্রভৃতি লইয়া এ মাসে ৫৫ টাকা চাই। দ্বিতীয় পত্রটি তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাড়ী হইতে লিখিয়াছে যে গত বৎসর ভাল করিয়া পূজার তত্ত্ব করা হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনেক খোঁটা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এবার যেন পূজার তত্ত্বে কার্পণ্য করা না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্বশুরবাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইবে।

বেচারামবাবু চিন্তিত মুখে পত্র দুটি পকেটস্থ করিলেন।

…আবার গল্প চলিল। নবীন রায় একটা পান মুখে পুরিয়া কহিলেন—"তোমার মেজ মেয়ের বিয়ের কচ্ছ কি ? বিয়ে না দিলে আর ভাল দেখাচ্ছে না !"

বেচারাম কহিলেন—"পাত্র একটা দেখ না !"

নবীন তদুত্তরে বলিলেন—"পাত্র একটি আছে, খাঁইও খুব বেশী নয়। ৫০১ টাকা নগদ—তেত্রিশ ভরি সোনা আর বরাভরণ। এমন কিছু বেশী নয় আজকালকার দিনে।"

থামিয়া বেচারাম উত্তর দিলেন—"তা বটে।"

ক্রমে সভা ভঙ্গ হইল। বেচারামবাবু অন্দরে গেলেন। ভিতরে গিয়া আহারে বসিতেই গৃহিণী হরিমতি কাছে আসিয়া বসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন—

"বিনোদের মুখে মাসীমা খবর পাঠিয়েছেন যে, কাল তিনি আসবেন। কিছু আলোচাল আর একসের দুধের কথা বলে দিও তাহলে কাল থেকে। তিনি আফিং খান জান তো?"

শুইতে গিয়া দেখিলেন ছেলেমেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে। বলিলেন—"কি হল এদের?"

স্ত্রী বলিলেন—"হবে না? শীত পড়ে গেছে—কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করান হয়েছিল ছিঁড়বে না আর। তোমাকে ত বলে বলে হার মেনেছি। কি আর করব বল!"

বেচারাম এবার আর কিছু বলিলেন না! শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকড়াগ্রাম-বাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি! নামকরণটীতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ীর এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল—"এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে—তার নাম পুষ্পমঞ্জরি দিবি নাকি? তোর যত সব অনাছিষ্টি—"

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ্‌ ত কালোই—একটা চোখ ছোট আর একটা বড়—তাছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরনের—মুখে সর্বদাই লালা ঝরে। পুষ্পমঞ্জরি নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক।

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছেন। সেদিন রবিবার কাহারো কাজকর্ম নাই—চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল!

নৃপেন বলিল—"এই দেখ না নীহারের অদেষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে—তাও আবার এমন কদাকার—"

শ্যাম বোস বলিলেন—"তা আবার বলতে। বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।"

হারু খুড়ো তামাকটাতে দু'টান দিয়া কহিলেন—"আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না। লোকে টাকাও চায়—রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরও মুস্কিল কিনা—কি যে হবে—"

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল—"কার চিঠি হে?"

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম—"বউ লিখেছে। বুঁচি মারা গেছে কাল।"

ভৈরবী ও পূরবী

কাননে একটি ফুল ফুটিল—যেন বন-লক্ষ্মীর রচিত একটি কবিতা। গন্ধে বর্ণে ছন্দে অপরূপ। ফুল চাহিয়া দেখিল তার চারিদিকে আনন্দের উৎসব লাগিয়াছে। আকাশে বাতাসে আলোতে যেন কিসের আকুলতা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে পলক পড়ে না।

আকাশের নীলে ভরিল নয়ন
আলোর সোহাগে আকুল তনু,
রূপসী উষার সোনার পরশে
সরস করিল প্রতিটি অণু।
কে যেন কহিছে "বনলক্ষ্মীর
স্বপ্ন যে তুমি ধরেছ কায়া
তাই বন-ভার বাজে আশাবরী
আলোতে লেগেছে রঙীন মায়া।"

গুঞ্জন তুলিয়া কে যেন তাহার কানে কানে কহিল—

অঙ্গ ভরিয়া এনেছ বর্ণ
এঁকেছ নয়নে মোহন ছবি—
আঁখি তুলে চাও আজি এ প্রভাতে
এসেছি যে আমি তোমারি কবি।"

চকিত হইয়া ফুল কহিল—"কে তুমি?"

"আমি ভ্রমর।"

"কি চাও?"

ভ্রমর কহিল—

কি যে চাই সখি জানিনা ত তাই
তবে মনে হয় আজিকে প্রাতে
এতটুকু মধু দিতে যদি তুমি
তোমার রঙীন সোহাগ সাথে !
মুখ তুলে' সখি আঁখি মেলি চাও
বিফল কোরো না এমন আলো,
গুণ্ঠন খোলো মনে হয় যেন
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

এই শুনিয়া ফুলের হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল—সে মাথা নত করিল। বৃন্তের উপর সে তার সরম-শঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়। অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল—

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ কোরোনা এমন আলো।
গুণ্ঠন খোলো গুণ্ঠন খোলো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

ফুল কিন্তু কিছুতেই গুণ্ঠন খুলিতে পারিল না। অপরিসীম লজ্জায় যেন তাহার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট অবশ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের দ্বারে কে যেন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—"না, না, না—না—না"

অবশেষে ভ্রমর কহিল—তবে যাই।

এমন আলো এমন বাতাস হয়ত আবার উঠ্‌বে না।
যদিই ওঠে হয়ত তখন বন্ধু এমন জুটবে না।
এই যে প্রাতে ওই রবিতে
গান ধরেছে ভৈরবীতে
হয়ত তাতে আর কোন দিন এই মাধুরী ফুট্‌বে না।

ভ্রমরের গুঞ্জন দূর হইতে সুদূরে মিলাইয়া গেল।

* * *

ভ্রমর যখন চলিয়া গেল তখন, কি আশ্চর্য, ফুলটির যেন ঘুম ভাঙিল। তাহার মর্মের মাঝখানে যেন গুঞ্জন গানে বাজিতে লাগিল—

গুণ্ঠন খোলো মনে হয় যেন
তোমারেই আমি বেসেছি ভাল।

তাহার রঙীন পাপড়ি ভরিয়া গন্ধ জাগিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রার্থনা জানাইতে চায়—"আহা সে যদি আর একবার আসে।"—কিন্তু সে আসিল না।

কুসুমের প্রাণের কামনায় প্রভাত সমীরণ মদির হইয়া গেল। সমস্ত প্রভাত বহিয়া গেল, দ্বিপ্রহরও উত্তীর্ণ হইল—সন্ধ্যা হয়-হয় কিন্তু কোথা সে, যার ধ্যানে—

অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি'
ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধ-ভার
যার গানে মুখরিত গগন-পবন
মুখরিত আলো অন্ধকার!

কই সে? সে ত আর আসিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল।

ছোট ফুলটির আঁধারে আলো জ্বালাইয়া জোনাকী আসিল।

ম্লান কণ্ঠে ফুল তাহাকে শুধায়—"কে ভাই তুমি?"

"আমি জোনাকী।"

আগ্রহ ভরে ফুল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তাকে চেন কি?"

"কা'কে?"

"যে আমায় আজ সকালে গানে গানে বলেছিল, 'গুণ্ঠন খোলো—' তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি। সে ত আর এল না। তুমি তাকে চেন কি?"

জোনাকী বলে—"মনে ত হয় না।"

মিনতি করিয়া ফুল তাহাকে কহিল—"তার সাথে যদি দেখা হয় তাকে বোলো সে যেন আর একবার আসে।"

"দেখা পাই ত বল্‌ব"—এই বলিয়া জোনাকী উড়িয়া গেল। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফুলটির সর্বাঙ্গ যেন গান গাহিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া গেল।

* * * *

তার পরদিন সন্ধ্যায় জোনাকী আসিয়া কহিল—"খুঁজে পেলাম না তা'কে।"

ফুল কহিল—"কা'কে?"

"তুমি কাল যার কথা বলেছিলে?"

"আমি ত কাল ছিলাম না—আজ ফুটেছি।"

"কাল্‌কের ফুল কোথা?"

"সে ঝরে' গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ।"

জোনাকী চুপ করিয়া রহিল।

তখন নূতন ফুলটি বলিল—"আচ্ছা, তুমি একজনকে চেন কি?"

"কা'কে?"

"যে আজ সকালে কেবল গুঞ্জন গানে আমাকে ব'লে গেল,

'গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ কোরো না এমন আলো'

॥ দুই ॥

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত' ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।··· এখানে একটি বেশ ডাগর ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত' মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তাছাড়া দেখ আমরা "মা ফলেষু কদাচন" দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টাই করা যাক্! ··দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে ত? ··"

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে যে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই! এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম! একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিড্‌নি' কেমন—কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে?···মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?···এ মেয়েটি বেশ বড়সড়

দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া! আচ্ছা প্রভার আত্মার যদি—গৃহ্নামি। গৃহ্নামি!

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসরঘরেও শুনিলাম ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তাছাড়া এ দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ কে আর আমোদ করিতে চায়? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়ীতে মানুষ। সেজদির বাড়ীতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা! সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

* * * *

জমিল ফুলশয্যার রাতে!

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিৎ হল!"

"মানে?"

"মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মরে গেলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বল্লে—'হাতী হবে। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে।' আমি বল্লাম—'কক্‌খনো নয়।' তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদে মিলে এই ষড়যন্ত্র! আমিও শান্তিপুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিৎ। পাড়ার মাণ্‌কে ছোঁড়াকে কনে' সাজিয়ে সেজদি বাজী জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন! ছি ছি—কি তোমরা! অমনি গোঁফটা কি বলে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়!

* * * *

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি!

কার্তিকেয়-কাহিনী

একদিন দেবরাজ ইন্দ্র মানসশৈলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। মন মোটে ভালো নাই। দৈত্যদের নিকট বারবার হারিয়া গিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থাটা 'মোহন-বাগান'-এর ক্যাপ্টেনের মনের অবস্থার মত হইয়াছে। কি করিয়া এই দানবদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়! নানাবিধ চিন্তায় যখন তিনি আকুল তখন সহসা তাঁহার কর্ণে এক রমণীয় আর্তনাদ প্রবেশ করিল—

"কোনো পুরুষ আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন। তিনি আমাকে পতিপ্রদান করুন বা স্বয়ং পতি হউন!"

ইন্দ্র ছুটিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন যে গদাপাণি কিরীটধারী কেশীদানব নারীধর্ষণে উদ্যত! ইন্দ্র বাধা দিতেই দুইজনে মারামারি বাধিয়া গেল। ইন্দ্র ছুঁড়িলেন বজ্র—কেশী ছুঁড়িলেন পর্বত। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ইন্দ্রই জয়ী হইলেন—কেশী পলাইল।

তখন ইন্দ্র মেয়েটিকে বলিলেন—"কার মেয়ে বাপু তুমি? আজকাল দিনসময় খারাপ। এমন সময় এখানে আসিলে কেন? ভাল কাজ কর নাই।"

মেয়েটিও সাধুভাষায় উত্তর দিল—"হে দেবরাজ, আমার নাম দেবসেনা। প্রজাপতির কন্যা আমি। আমার এক বোন ছিল, দৈত্যসেনা। দৈত্যেরা আগেই তাহাকে হরণ করিয়াছে। আমরা দুই বোনই পিতার সম্মতিক্রমে এই মানসশৈলে হাওয়া খাইতে আসিতাম। এই দানবটা প্রায়ই আমাদের পিছু লইত। দৈত্যসেনা হতভাগী প্রেমে পড়িয়া ইহার সহিত আগেই উধাও হইয়াছে। আমি কিন্তু উহাকে অবজ্ঞা করি। তাই ধরিতে আসিলে চীৎকার করিয়াছি।"

ইন্দ্র বলিলেন—"ও তুমি তো আমার মাসতুতো বোন দেখিতেছি। এখন কি করিতে চাও বল।"

দেবসেনা বলিলেন—"হে মহাবোহো, আমি অবলা কিন্তু পিতৃবর প্রভাবে অসামান্য বলবীর্যসম্পন্ন সুরাসুরনমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন। সেই আশায় আছি। আপনি তাঁহাকে খুঁজিয়া দিন।"

ইন্দ্র কহিলেন—"তোমার সখ ত প্রচণ্ড দেখিতেছি। কিন্তু ভদ্রে, আজকাল বড বেগতিক! সুরাসুরের যুদ্ধে এত ব্যস্ত আছি যে তোমার পাত্র খোঁজার সময় নাই। যাই হোক পিতামহের কাছে চল।"

ইন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—ইনি যে ধরনের পতি-কামিনী তাহাতে মনে হয় যে সর্বগুণসম্পন্ন অগ্নি যাঁহাকে উৎপন্ন করিবেন তিনিই ইঁহার পতি হইবেন।

ব্রহ্মারও দেখা গেল সেই মত।

॥ দুই ॥

এদিকে বশিষ্ঠ প্রমুখ দেবর্ষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন। ইন্দ্র সেখানে গেলেন। সোমরসের লোভে আরও অনেক দেবতা সেখানে জুটিয়াছিলেন। ভগবান হুতাশনও ঋষিগণ কর্তৃক আহূত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি হব্যগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল—'বাঃ ঋষিপত্নীগুলি খাসা ত!' দাঁড়াইয়া গেলেন। ঋষিপত্নীরা কেহ কল্পবেদীর ন্যায়, কেহ চন্দ্রলেখার ন্যায়—কেহ…। বাস্‌…কন্দর্পশরে জর্জরিত! আর কথা আছে? কিন্তু জর্জরিত হইলে কি হইবে? এ বড়

কঠিন ঠাঁই! ঋষিপত্নী, ইয়ার্কি নয়। এদিকে ওদিকে ঘুরঘুর করিয়া নিরুপায় অগ্নি শেষে গার্হপত্যে প্রবেশ করিলেন। আহ্লাদও হইল! তাঁহার শিখাসমুদায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শিখাদ্বারা তিনি মহর্ষিভার্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ 'আলগোছে' প্রেম করায় তাঁহার তৃপ্তি হইল না এবং যখন তিনি স্থির নিশ্চয় হইলেন যে এখানে 'কলকে' পাওয়া সত্যই শক্ত তখন নিতান্ত সন্তপ্তচিত্তে মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরিতে পারিলেন না।

॥ তিন ॥

দক্ষদুহিতা স্বাহা বহুদিন যাবৎ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিনী ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বাগাইতে পারেন নাই। এইবার তিনি সুযোগ পাইয়া গেলেন। তিনি ঋষিপত্নীগণের রূপ ধারণ করিয়া অগ্নির নিকট গেলেন ও নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এইরূপ ছয় ছয় বার। অরুন্ধতী (বশিষ্ঠের পত্নী) অত্যন্ত বেশী পতিব্রতা ছিলেন। স্বাহা তাঁহার রূপটা আর ধারণ করিতে পারেন নাই। তা না-ই পারুন—ছয় বারই যথেষ্ট। ছয় বারই হুতাশন সহর্ষে প্রীতি প্রফুল্ল মূর্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং স্বাহা দেবীও পরম প্রীতি সহকারে পাণিকমলে (?) আগ্নেয় তেজ গ্রহণ করিলেন। পাছে ধরা পড়িয়া একটা কেলেঙ্কারি হয় এই ভয়ে স্বাহা ছয় বারই গরুড়ীমূর্তি ধারণ করিয়া কাটিয়া পড়িলেন। সাপও মরিল, লাঠিও ভাঙিল না!

॥ চার ॥

গরুড়ী-রূপিনী স্বাহা উড়িয়া গেলেন শ্বেত ভূধরে। ভীষণ স্থান সে। সর্প, রাক্ষস, পিশাচ—সব সেখানে আছে। সেই শ্বেত ভূধরে এক কাঞ্চনকুণ্ড ছিল। গরুড়ী সেই কাঞ্চনকুণ্ডে অগ্নিরেতঃ নিক্ষেপ করিল। ছয় ছয় বারই! অদ্ভুত এই আচরণ।

ফলও হইল অদ্ভুত! প্রথম ফল ভোগ করিলেন ঋষিপত্নীগণ—যাঁহাদের মূর্তি ধারণ করিয়া স্বাহা দেবী মজা লুটিয়াছিলেন।

স্বাহা-হুতাশন-ঘটিত কাণ্ড অতি সঙ্গোপনে বনের মধ্যে ঘটিয়াছিল ত? কেলেঙ্কারি বাঁচাইবার জন্য স্বাহা চেষ্টারও কিছু ত্রুটি করে নাই। বেচারী গরুড়ী পর্যন্ত হইয়াছিল! কিন্তু হইলে কি হয়? লোকেরা ঠিক টের পাইয়া গেল! ক্রমশঃ ঋষিগণেরও কর্ণগোচর হইল। ঋষিগণ ত শুনিয়া প্রথমে 'থ' ও পরে 'টং' হইয়া গেলেন। তাঁহাদের পত্নীগণ এই! ম্লেচ্ছভাষায় যাহাকে বলে—sinking sinking water drinking! বশিষ্ঠ চটিলেন না—কারণ তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীর মূর্তি স্বাহা ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং অঙ্গিরা তাঁহাদের পত্নীগণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ

করিলেন—সেকালেও Divorce ছিল! বিশ্বামিত্র—হাজার হোক্‌ মিত্তির! সমস্ত ব্যাপারটা গোড়া হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলেন—তিনি বলিলেন যে মুনিপত্নীগণ সম্পূর্ণ নির্দোষ—আসল ব্যাপার এই—

কিন্তু উক্ত মুনিগণ সকলেই প্রাজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা আর এবম্বিধ গোলমালের মধ্যে থাকিতে রাজী হইলেন না। মুনিপত্নীগণ পরিত্যক্তা হইয়া কৃত্তিকাগণ (১) হইলেন। লোকমাতা বলিয়াও ইঁহারা কীর্তিতা।

ইহার দ্বিতীয় ফল যাহা হইল তাহা এই। কাঞ্চনকুণ্ডে ছয়বার নিক্ষিপ্ত তেজোময় রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। যেহেতু এই রেতঃ একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্কন্দন অর্থাৎ গমন করিয়াছিল সেই হেতু এই পুত্রের নাম হইল স্কন্দ।

ইহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। লোহিত মেঘমালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্যের ন্যায় এই সুকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

এই মহাবাহু ও মহাপরাক্রান্ত স্কন্দ তাঁহার বলপ্রভাবে ত্রিভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন। তিনি হাতী আছড়াইলেন, পাহাড় ফাড়িলেন এবং ভুজদ্বয় দ্বারা আকাশ আঁচড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতাপে স্ত্রী-পুরুষের বৈর-ভাব, শীত-গ্রীষ্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ঘটিল। দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহসকল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী ভীষণভাবে শব্দায়মান হইতে লাগিল।

সকলের চক্ষু স্থির! স্বর্গে দেবতারা একে দৈত্যদের জ্বালায় অস্থির। ক্রমাগত মহাদেব, ব্রহ্মা প্রভৃতির খোসামোদ করিয়া কোন রকমে এই দানবদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় আছেন—এমন সময় এ আবার কোথা হইতে এক 'উট্‌কো' উৎপাত আসিয়া জুটিল! ইহার যে রকম বিক্রম—এ ত দেব দানব ব্রহ্মা সকলকেই ঠেঙাইয়া ছাতু করিয়া দিবে! ভীতচিত্তে দেবগণ ইন্দ্রকে বলিলেন—"একটা উপায় কর হে, অন্ততঃ তোমার সেই মামুলি বজ্রটা একবার ছাড়!"

ইন্দ্র বলিলেন, "পাগল হইয়াছ! বজ্র ত উহার কাছে নস্য! আমি উহাকে ঘাঁটাইতে চাই না। সাফ্‌ কথা!" এই সাফ কথা শুনিয়া দেবতারা তখন অন্য উপায় চিন্তা করিলেন। সেই পরিত্যক্তা ঋষিপত্নীগণ (যাঁহারা লোকমাতা নামে পরিচিতা ছিলেন) স্কন্দের উদ্ভবকেই নিজেদের দুর্দশার কারণ মনে করিয়া স্কন্দের উপর চটিয়াছিলেন। তাঁহারা খুব শক্তিশালিনীও ছিলেন। দেবতারা এই লোকমাতাদের লেলাইয়া দিলেন। লোকমাতৃগণ প্রথমটা খুব চটিয়া স্কন্দের কাছে গেলেন। কিন্তু সেই অতুলবল বালককে দেখিয়া তাঁহাদের রাগ জল হইয়া গেল। তাঁহাকে মারা দূরে থাকুক তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ রক্ষা করিতে লাগিলেন! অগ্নিও আসিয়া হাজির হইলেন এবং স্কন্দের রক্ষাকার্য

---

(১) ঋষিগণ ইঁহাদের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইঁহাদের নাম কৃত্তিকা হইয়াছে। কারণ কৃত্তিকা শব্দটি কৃত্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। কৃত মানে ছেদন করা।

করিতে লাগিলেন। লোকমাতৃগণ ক্রোধপ্রভাবে এক নারী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি শুদ্ধ স্কন্দের 'বডি গার্ড' হইলেন!

বেগতিক দেখিয়া দেবতারা আবার ইন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন—"বজ্রটা ছাড় ঠাকুর। দেখই না কি হয়।" অগত্যা ইন্দ্রকে বজ্র ছাড়িতেই হইল। সেই বজ্রাঘাতে স্কন্দের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল ও সেই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ দিব্য স্বর্ণ কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবাপুরুষ নির্গত হইয়া ইন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চরম ঘাবড়াইয়া ইন্দ্র তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"হে মহাবাহো, তুমি আজ ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদের সুখ সৌভাগ্য বিধান কর।" ইন্দ্রের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' গোছ ভাব দেখিয়া স্কন্দ হাসিয়া কহিলেন, "অনাকুলিত চিত্তে তুমি ত্রৈলোক্য শাসন কর; আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্রত্ব পদ আমার অভীপ্সিত নহে।"

সুতরাং স্কন্দ দেব-সেনাপতি হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া ইন্দ্র তখন সেই জিয়ান পাত্রীটিকে আনিয়া হাজির করিলেন। কহিলেন—"ইনি প্রজাপতিদুহিতা দেবসেনা। ভগবান ব্রহ্মা বহুপূর্ব হইতেই ইহাকে তোমার পত্নীরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব—"

স্কন্দ রাজী হইয়া গেলেন।

ইহার পর অনেক কাণ্ড হইল। লোকমাতাগণ কৃত্তিকা নক্ষত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কৃত্তিকাগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া স্কন্দের নাম কার্তিকেয় হইল। স্বাহা আসিয়া তখন কার্তিকেয়কে বলিলেন—"সকলেরই ত একটা একটা ব্যবস্থা করিলে। আমার যাহাতে অনল-সহবাস ঘটে তাহার একটা ব্যবস্থা কর বাবা। তোমাকে এত করিয়া সৃষ্টি করিলাম!"

স্কন্দ কহিলেন—"দেবি! অদ্যাবধি সৎপথাশ্রিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হব্য কব্য প্রভৃতি দ্রব্যজাত 'স্বাহা' বলিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন, তাহা হইলেই আপনার সর্বদাই অনল-সহবাস হইবে।" মিটিয়া গেল।

শেষে ভগবান প্রজাপতি সব ফাঁস করিয়া দিলেন। তিনি স্কন্দকে বলিলেন—"কীর্তি মহাদেবের। মহাদেবই অগ্নিতে ও উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া লোক-হিতার্থ তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন। সুতরাং মহাদেব তোমার পিতা এবং উমা তোমার মাতা!"

সব দিক রক্ষা হইল!

* * *

উপরোক্ত গল্পটি মহাভারত হইতে টুকিয়াছি। কালীপ্রসন্ন সিংহের ভাষাও স্থানে স্থানে বজায় আছে। আজকাল দেখিতেছি অশ্লীল ও 'থ্রিল'-পূর্ণ গল্প অনেকে ভালোবাসেন এবং তাঁহাদেরই প্রীত্যর্থে বাংলা সাহিত্যে একদল লেখক-লেখিকাও উদ্ভূত হইয়াছেন। এই সব পাঠক-পাঠিকাদের মহাভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অবৈধ প্রণয়-মূলক গল্পও পড়া চলিবে অথচ ধর্মও বজায় থাকিবে যদি মহাভারতটা একবার খুলিয়া বসেন। মহাভারতের কথা অমৃত সমান—সার্থক এই উক্তি। তরুণ গল্প-লেখক-লেখিকাগণও এই

মহাভারতে নানারূপ প্লট খুঁজিয়া পাইবেন। তাঁহারা আর একটা জিনিসও লক্ষ্য করিবেন। এই গল্পে শুধু অশ্লীলতাই নাই—বিরাট কল্পনাও আছে, অপরূপ কবিত্ব আছে, চিন্তার সার্বজনীনতা আছে।

আর একদল পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচক আছেন তাঁহাদের মত মাইকেলের পরবর্তী সাহিত্য মাত্রই অশ্লীল ও বাজে। অনেকেই পড়েন নাই কিন্তু তাঁহাদের মনটা সততই রামায়ণ মহাভারতমুখী। উপরোক্ত গল্পে তাঁহারা মহাভারতের নমুনা (অবশ্য সামান্যই) পাইবেন।

খেঁকি

॥ এক ॥

যদিও বাঙালী নহি—কিন্তু তবুও আমার জীবকাহিনী করুণ। যদিও আমি সামান্য কুকুর মাত্র, তথাপি হে বাঙালী ভাই, খোঁজ করিলে তোমারই মত আমার শোণিতেও আভিজাত্যের আমেজ পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি আমার অতি বৃদ্ধ পিতামহীর কোনো প্রণয়ী বুলডগ-বংশাবতংস ছিলেন এবং সেই বুলডগ শোণিতধারার কিয়দংশও আমার ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি। লোকে কিন্তু আমাকে বলে—খেঁকি কুকুর! সত্য বটে আমার গায়ে লোম নাই—সর্বাঙ্গে ঘা—চোখে ভাল দেখিতে পাই না—স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙা লইয়া অন্যান্য কুকুরদের সহিত মারামারি করিয়া আমার দিনপাত হয়—সবই সত্য; কিন্তু তথাপি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না আমার পূর্বপুরুষ বুলডগ ছিলেন। ইহাই আমার সান্ত্বনা—ইহারই প্রভাবে আমার মনে হয় আমার এ দুর্দিন থাকিবে না। ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

॥ দুই ॥

সেদিন সকালে স্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। আমি ঠোঙা চাটিবার প্রত্যাশায় —গাড়ীর প্রতি বাতায়ন-পথে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছি। এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে কে আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস গলাইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। চাহিয়া দেখি স্টেশনের পরিচিত কুলী—মিঠ্ঠু! মিঠ্ঠুর হাতে অনেকবার মারও খাইয়াছি, ভাতও খাইয়াছি। স্টেশনের ধারে তার বাড়ী—সে আমাকে মারধোর করিলেও—ডাকিয়া প্রায়ই ভাত-রুটি দিত। হঠাৎ সেই মিঠ্ঠু আমাকে একেবারে

বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল কেন—কিছুই বুঝিলাম না। এতদিনে কি তাহার হুঁস হইয়াছে যে আমার মতন এমন একটা বুলডগ্‌ বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়ানটা অশোভন? তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিজাতবংশীয় কুকুরদের মত বাঁধিয়া খাওয়াইবে?

সে কিন্তু সোজা আমাকে স্টেশন-মাস্টারের কামরায় লইয়া গেল।

॥ তিন ॥

স্টেশন মাস্টার বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আরে এ কোত্থেকে একটা খেঁকি কুত্তা নিয়ে এলি!"

তাঁহার সহকারী বলিলেন—"ওইতেই হবে—A Dog ত বটে—ওর বেশী ত আর কিছু লেখা নেই।"

মালবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি মশাই! এ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন?"

স্টেশন মাস্টার তখন বিবৃত করিয়া বলিলেন—"আর বলেন কেন মশাই! চাকরি বুঝি আর থাকে না। কোন এক সায়েব মহাপ্রভু—এই গাড়ীতে যাচ্ছেন—তার নাকি এক কুকুর Dog Box-এ ছিল। আমরা ত দেখছি খালি—আমাদের আগের স্টেশন বলছে যে তারা Dog Box-এ কুকুর দেখেছে। অথচ এখানে দেখছি—Dog Box খোলা। বেটা কুকুর হয়ত কোথাও পড়ে ফড়ে গেছে—আমাদের রামসুন্দরবাবু বলছেন 'দিন যে কোন একটা কুকুর পূরে—তারপর দেখা যাবে। রেল কোম্পানি ত A Dog বলে বুক করেছে—A Dog হলেই হল। তারপর ব্যাটার কুকুর যদি পছন্দ না হয় ত কোর্টে গিয়ে বোঝাপড়া করুক গে!' যত সব আপদ জোটে আমারি ঘাড়ে। কি বলেন? দোব এ কুকুরটাকে ঢুকিয়ে? একেবারে মোটে রোঁয়া নেই!" মিঠ্‌ঠু বলিল—এত তাড়াতাড়ি অন্য কুকুর পাওয়া সম্ভব নহে।

মালবাবু বলিলেন—"দিন ত দুর্গা বলে চড়িয়ে।"

মিঠ্‌ঠু আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া Dog Box-এ তুলিয়া দিল। ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

চলিয়াছি! নববধূ যেমন তার আজন্ম পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া অজানা অচেনার উদ্দেশ্যে আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল-হৃদয়ে যাত্রা করে আমিও তেমনি চলিয়াছি। জানিনা আমার এই অজানা সাহেব মনিব কেমন লোক! যেমনই লোক হোক, সাহেবেরা শুনিয়াছি ভাল কুকুরের আদর জানে! তাছাড়া সত্যই ভাল কুকুরকে চেনে—যত্নও করে। তাই আমার আশা আছে যে বুলডগ্‌-পূর্বপুরুষের আভিজাত্য সে আমার জীর্ণ অঙ্গেও খুঁজিয়া পাইবে। শুনিয়াছি সাহেবরা কুকুরকে মাংস খাইতে দেয়। মাংস কেমন কখনো

অনির্বচনীয়

ক্ষণিকা খাস্তগীরের মস্তকে বজ্রপাত হইয়াছে। এখনও কিন্তু সে মরে নাই বরং এ অবস্থায় মরা উচিত কিনা এবং উচিত হইলেও সহজ অথচ মর্মান্তিক মৃত্যুর উপায় কি—তাহাই ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে ছাদে পায়চারি করিতেছে। কেরোসিন তেল, গলায় দড়ি, পুকুরে ডোবা, এমন কি **cyanide** পর্যন্ত নিতান্ত মামুলি হইয়া পড়িয়াছে! যক্ষ্মার জীবাণু শুঁকিলে হয় না?

হঠাৎ পিছনে রমেশ বাবুর চটির শব্দ। "খন্তু, এখানে আছিস?—এই যে! আচ্ছা, কি ছেলেমানুষ বল ত তুই!"

ক্ষণিকা কোন কথা কহিল না।

রমেশবাবু বলিলেন—"কথা বলছিস না যে! আমি কি এক্ষুণি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব? কথাটা ভেবে দেখতে দোষ কি?"

ক্ষণিকা বলিল—"তুমি যে বাবা শেষকালে আমাকে একটা দোজবরের হাতে দেবে একথা ভাবতেও পারি না!" রমেশবাবু বলিলেন—"বেশত তাকে না-ই করলি বিয়ে! আমার ছেলেটিকে ভালো লাগল—তাই বলছিলাম। বিদ্বান, বড় চাকরি করে, চমৎকার স্বাস্থ্য। ছেলেপিলে কিছু নেই। হলই বা দ্বিতীয় পক্ষ। বেশত বাপু তোর পছন্দ না হয়, করিস না বিয়ে। এখন শুবি চল! তোরা লেখাপড়া শিখে শুধু টন্‌সিল দুটোই বড় করেছিস—বুদ্ধি কিছু বাড়েনি!" মাতৃভাবাপন্ন রমেশবাবু তাঁহার মাতৃহীন কন্যাকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি—প্রথমেই বলা উচিত ছিল—ক্ষণিকা খাস্তগীর ইংরেজীতে 'অনার্স' লইয়া বি-এ পাশ কবিয়াছেন। প্রধান মাসিক-পত্রগুলিতে তাঁহার ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকা পরদিন বান্ধবী সুজাতাকে বলিল—"যাক্ খুব ফাঁড়াটা কেটে গেল। লোকটার আক্কেলকে বলিহারি যাই। মরতে না মরতে অমনি বিয়ের তাড়া পড়েছে! পুরুষগুলো আমাদের দেখছি সিগারেটের সামিল করে তুলেছে। একটা ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা ধরান চাই। এ ভদ্রলোক যেন আরো ব্যস্তবাগীশ! যেন আগের স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই দ্বিতীয় বিবাহের হোমের কাঠগুলো ধরিয়ে নিতে চান!"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি? ভদ্রলোক কে?"

ক্ষণিকা উত্তর দিল—"ভদ্রলোকের নাম—অজয়কুমার বোস্! সরকারী চাকরি করেন—কবিতাও লেখেন। কাব্যরস একটু বেশীমাত্রায়!"

সুজাতা কেবল কহিল—"তাই নাকি?"

ক্ষণিকার উত্তেজনা তখনও কমে নাই। সে বলিয়া চলিল—

"আমার ত মনে হয় আইন করে এসব বিয়ে বন্ধ করা উচিত!" সুজাতা কিছু বলিল না।

সুজাতা তখন কিছু বলিল না বটে—কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার আইনজ্ঞান সে হাতে-কলমে দেখাইয়া দিল। মাসখানেক পরে সুজাতা দেবীর সহিত অজয় বোসের শুভ-বিবাহের নিমন্ত্রণ-লিপি পরিচিত মহলে বিতরিত হইতে লাগিল।

* * *

বন্ধুর স্বামী। আলাপ হইলই। একদিন কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে ক্ষণিকা অজয়বাবুকে কহিল, "ছেলেবেলায় আপনি 'ট্রাই ট্রাই এগেন' কবিতাটি ভাল করেই পড়েছিলেন দেখ্‌ছি!"

অজয়বাবু বলিলেন—"সেত পড়েইছি! তাছাড়া কি জানেন, প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর—বড় বড় লোক এসে দিনরাত অনুরোধ করতে সুরু করলেন—কি করি বলুন! নিজের তাগিদ ত ছিলই—"

ক্ষণিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"বড় বড় লোক মানে?"

"এই ধরুন না কেন যুগ্মপত্নীর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য থেকে সুরু করে—শেলি, বায়রন, মোপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ সবারই সনির্বন্ধ অনুরোধ—এমন কি আমাদের সত্যেন দত্ত পর্য্যন্ত বল্লেন—

কে গেছে কে যায় আর
অত শত ভাবনার
ফুরসুৎ নেই আজ—নেই বন্ধু!

ওই যে ওমর খৈয়াম আপনি বিয়েতে উপহার দিয়েছেন সে ভদ্রলোক ত নাছোড়! এখন ভেবে দেখুন ভদ্রভাবে ওঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হলে আমাদের মত গরীব লোকের বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি!"

আরক্তিম-কর্ণমূল লইয়া ক্ষণিকা বলিল—"থামুন,—থামুন, আপনাদের বোঝা গেছে!"

কিন্তু অজয়ের সপ্রতিভ সরস উত্তরটা সে মনে মনে উপভোগ না করিয়া পারিল না। লোকটি রসিক—সুজাতা সুখী হইবে।

* * *

কিন্তু কিছুদিন পরে শোনা গেল সুজাতা আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহারও কিছুদিন পরে শোনা গেল অজয়বাবু নাকি আবার বিবাহ করিতেছেন এবং এবার নাকি ক্ষণিকা গাম্ভীরকে।—'লভ্ ম্যারেজ'।

রামায়ণের এক অধ্যায়

॥ অভিনয় কাণ্ড ॥

সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায়। কেবলই তাহার মনে হইতেছে—ঘোরতর অবিচার করিয়াছি।

কুলগুরু বশিষ্ঠকে বলিতেছেন—"গুরুদেব, অবিচার! এ ঘোর অবিচার; সীতার কোন অপরাধ নাই—তিনি নিরপরাধিনী, দেবী। আমার কোন অধিকার নাই তাঁহাকে শাস্তি দিবার! আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি—"

তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন—"বৎস, সত্যরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তুমি সত্যাশ্রয়ী। সত্যধর্ম পালন করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কার্য করিয়াছ।"

রাম বলিলেন—"এ ত সত্য নয়—এ যে মিথ্যা। এ যে অবিচার গুরুদেব—এ যে মিথ্যাচার—গুরুদেব—"

গুরুদেব বলিলেন—"অধীর হইও না বৎস, রাজধর্ম বড়ই কঠিন।"

রামচন্দ্র শুনিলেন না। অধীর হইয়া উঠিলেন।—"রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য চাই না—প্রজাপুঞ্জের মতামত গ্রাহ্য করি না—সীতাকে চাই! আমার দেবীকে চাই!—রাজ্য যাক্—মান যাক্…" রাম পাগল হইয়া গেলেন।

॥ দুই ॥

অভিনেতা নকুড় মাইতি রামের অভিনয় শেষ করিয়া যখন শেষরাত্রে বাড়ী ফিরিলেন তখন তাহার পা টলিতেছে—মদের নেশায় চুরচুর।

ঠেলাঠেলির পর স্ত্রী হরিমতি দ্বার খুলিয়া দিলে নকুড়বাবু বলিলেন—"হারামজাদি, আধঘণ্টা ধরে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই?"

হরিমতি বলিলেন—"ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

নকুড় মাইতি কহিলেন—"ফের কথার ওপর কথা!"

বলিয়াই এক লাথি এবং বাম লাথি।

স্কুলের স্মৃতি

গত বর্ষায় বেশ একটু কাবু করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে বাস করি, সুতরাং বর্ষার আগমন আমার পক্ষে মনোরম না হইবারই কথা। কিন্তু একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লাভ নাই। সংক্ষেপে এইটুকু

জানিয়া রাখুন সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত ব্যাপারটির আনুপূর্বিক আলোচনা করিয়া বুঝিলাম কাব্যরসে কুলাইবে না—কিছু চোলাই রসের প্রয়োজন। দোকান আমার বসত বাটি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে! উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলিয়া কাদায় ছপ্‌ছপ্‌ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

* * *

গঙ্গার তীর দুকূলপ্লাবিত, বর্ষার গঙ্গা। শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। মেঘে আর জ্যোৎস্নায় নির্জন নদীতীরে . যাক্‌ বর্ণনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না। সে আর আমি মুখোমুখি বসিয়াছিলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জন সাক্ষাৎ। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নাই—একটু দূরেই স্থানীয় শ্মশান। আকাশে—মেঘ ও জ্যোৎস্না। সম্মুখে বেগবতী বর্ষার নদী। আমার ট্যাঁকে কিঞ্চিৎ ধন ও উদরে প্রচুর 'ধেনো'। বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"আর একটু কাছে এসে বস না।"

রমণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না।"

আমি আবেগভরে কহিলাম—"কেন? বল, কেন?"

রমণী এবার কিছু না বলিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমিও আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম—

"কেন? বল, কেন? ভয় করছে? কিসের ভয় তোমার! সরে এসো লক্ষ্মীটি!"

"না—" বলিয়া সে আর একটু সরিয়া বসিল। আমি আবার একটু কাছে গিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—

"তুমি বিয়াত্রিচের গল্প শুনেছ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন? শোননি? জোহান বোয়ারের 'লাইফ' পড়েছ? যাতে সেই স্কুলমাস্টার? তাও শোননি? বেশ কেষ্টরাধার কথা ত জান? একবার ভেবে দেখ দিকি সেই যমুনার কূলে—"

এবার রমণী বলিল—"আমরা হলাম কৈবর্তের মেয়ে—!"

উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম—"হোক্‌—তাতে ক্ষতি নেই! দোহাই তোমার একটু কাছে সরে এসো।" বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।

মাথার উপর এক পশলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম, "দেখ, জীবন খুব ছোট—এই ক্ষুদ্র জীবনে আজ যে শুভ মুহূর্তটি এসেছে—নষ্ট কোরো না তাকে। শুনছ? যত টাকা লাগে—! শুনছ?"

রমণী কিছু বলিল না। হাত ধরিতেই কিন্তু আবার সরিয়া বসিল। আমিও সরিয়া গেলাম।

শ্রাবণের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। রমণী কিন্তু ভিজিল না। তখন মনে হইল গান গাহিয়া দেখি যদি কিছু হয়। গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া গান ধরিলাম—

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌ নে আজি দোল
বা—গিচায় !"

হঠাৎ দেখি সে কাৎ হইতেছে !

"ওকি অমন করছ কেন ?"

ঝপাং করিয়া ধ্বস্‌ ভাঙিল।

* * * *

হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছি—কিন্তু স্থূলের স্মৃতিটি আজিও মর্মে হুলের মত বিঁধিয়া আছে।

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু বাছুর, শেষে মানুষ পর্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল—কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

"ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।"

বিধাতা কহিলেন—আচ্ছা।

কিছু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল—"আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

বিধাতা কহিলেন—আচ্ছা।

পাশের বাড়ীর ক্ষেন্তি পিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন—"বিধাতা তুমি সত্য। মাগীর বড় দেমাক। নিত্যি নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধরে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও ত !"

বিধাতা কহিলেন—আচ্ছা।

দার্শনিক কহিলেন—"হে বিধাতা—তোমাকে বুঝিতে চাই।"

বিধাতা কহিলেন—আচ্ছা।

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল—"জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।"

বিধাতা কহিলেন—আচ্ছা।

বাঙলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল—"কোনো সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।"

বিধাতা কহিলেন—আচ্ছা।

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাসায় খাঁটি সর্ষের তেল আছে?"

ব্রহ্মা কহিলেন—"আছে। কেন বলুন ত!"

বিধাতা। "আমার একটু দরকার। দেবেন কি?"

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) "অবশ্য, অবশ্য।"

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন, "মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ করে নিলে সুস্বাদু হয়।"

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিতে চান—"মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হলে পরে—ঝোলটা মেরে ভাজা-ভাজা করে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না!"

"আমি জানি না! মাংস ত ভাঁজা উচিতই, মশলাও ভাজা উচিত।"

"পাক-প্রণালীতে ওকথা লেখে না!"

"পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড় বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি মাংসটা আগে সিদ্ধ—"

"পাক-প্রণালী"র কথা তুমি মানতে চাও না?"

"না।"

"কেন শুনতে পাই কি?"

"কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা—অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে—তাদের কথাই প্রামাণ্য।"

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

"সব বাবুর্চিও ত সব সময়ে একমত নয়।"

"যে সব বাবুর্চিরা মাংস আগে ভাজ্‌তে চায়, তারা বাবুর্চি নয়—বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে?"

প্রথম তার্কিক ধৈর্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"জাপান টাপান বুঝি না! তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে? অভদ্র কোথাকার!"

"তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! নিজে দুনিয়ার কোন খবর রাখবে না—আবার ফদর ফদর করে তর্ক করতে আসে! বেকুব।"

"ফের বেকুব বলছ?"

"ক্রমাগত বল্‌ব!—"

"তবে রে—"

"তবে রে—"

তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্ক-প্রগতি উপভোগ করিতেছিল; উভয়কে সমরোন্মুখ দেখিয়া হাস্যভরে কহিল—"পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা ত উভয়েই নিরামিষ-ভোজী। আমিষ-বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমালের সৃষ্টি করিও না। তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুস্কিল।"

তাহারা তখন পরস্পর শিঙে শিঙ্‌ লাগাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতেছে। শৃগালের উপদেশ বাণী তাহাদের কর্ণগোচর হইল না।

আচমকা ঘুম ভাঙিয়া গোশকট-চালকটি দেখিল এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলীবর্দযুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় শকট-চালকের অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল—"খা শালারা খা—বেশী ডেঁপোমি করিস্‌ না!"

খাইতে দিল বিচালি।

* * * *

চট্‌ করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্মানী-সংবাদ, হিটলার-মুসোলিনি প্রভৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন, ট্রেন থামিয়াছে, নাথনগরে।

সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

একটি তরুণী বসিয়া সেলাই করিতেছে। কোলে দুগ্ধফেননিভ একটি মার্জার। সেলাই ভাল লাগিল না। পিয়ানো বাজাইয়া গান ধরিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অবশেষে টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে বসিল।...আবার গুনগুন করিয়া গান। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কিন্তু বৃথা। আমার মনের কথা কখনও কি তাহার কাছে পৌঁছিবে?

জানিতে পারিলাম তাহার অগণিত প্রণয়ীর মধ্যে দুইজনকে লইয়া সে সম্প্রতি বিব্রত। একজন ধনীর দুলাল, নাদুসনুদুস-ভদ্রলোক। রোজ নানাবিধ উপহার লইয়া বিকশিতদশনে তাহার দ্বারে ধর্ণা দেয়। মোটরে বেড়াইতে লইয়া যায়। তরুণীর পিতা ইহাতে আপত্তির কিছু দেখেন না। কারণ তিনি চান এই নাদুসনুদুস লোকটি তাঁহার

জামাই হোক্। তাঁহার স্বর্গীয় পত্নীরও এই ইচ্ছাই ছিল এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অনুরোধেই এই তন্বী রূপসী ওই নাতুসনুতুসকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জননীর শেষ ইচ্ছা পালন করিতে কে না চায়?

'কিন্তু'—!

নাতুসনুতুস লোক ভাল, টাকা কড়ি আছে, কুরূপও নয়, স্বাস্থ্য ভালই—কিন্তু! তরুণীটি নানাদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখে। 'কিন্তু'কে ঠেকান যায় না! অর্থাৎ সেদিন বড় রাস্তার মধ্যে দুরন্ত ছুটন্ত পাগলা ঘোড়ার সম্মুখ হইতে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে সুশ্রী যুবকটি তাহাকে বাঁচাইয়াছিল নাতুসনুতুস্ মোটেই তাহার মত নয়।

সেই নামগোত্রহীন দুঃসাহসী যুবাকে সমস্ত নারীহৃদয় দিয়া সে চায়।

নাতুসনুতুস কিন্তু না-ছোড়!

তরুণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতেও পারে না। জননীর শেষ-ইচ্ছা! জননীর মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন শীর্ণ মুখখানি মনে পড়ে! নাতুসনুতুসকে কিছু বলিতে পারে না।

অথচ সেই যুবক!—হ্যাঁ যুবকটির পরিচয় সে পাইয়াছে। সে এক জমিদার বাড়ীর সহিস। হোক সহিস—সে সুশিক্ষিত। সেক্‌সপিয়র হইতে গলস্‌ওয়ার্দি এমন কি আরলেনের পর্যন্ত খবর রাখে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দেশের মুকুটমণি হইতে পারিত—শুধু কপালের দোষে সে আজ সহিস মাত্র।

সর্বোপরি সুন্দর এবং পুরুষ। বলিষ্ঠ সতেজ—বিদ্রোহী! যদিও সামান্য সহিস—কিন্তু মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে—চোখে অহীন-দীপ্তি!

আমি দমিয়া গেলাম।

সত্যই ত, একদিকে নাতুসনুতুস আর একদিকে ওই সর্বগুণান্বিত সহিস ছোকরা—ইহার মধ্যে আমার মত নগণ্য লোকের স্থান কোথায়? একমাত্র সম্বল ছাঁটা গোঁফ-জোড়াটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইতিপূর্বে দু-একবার দেখিয়াছি, তরুণীটি ও সহিস-যুবকটি সহরের বাহিরে যে পুলটা আছে তাহারই উপর গোপন সন্ধ্যায় দেখাশোনা করিয়াছে। একদিন চুম্বন-বিনিময়ও হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরদিন যাহা ঘটিল তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর!

গভীর রাত্রি। সহিস ছোকরাটি এক প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির। ব্রাউন রঙের বিশাল ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া গতিবেগ যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

তরুণীটির বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সহিস 'হুইস্‌ল' দিল। তরুণী পথে বাহির হইল। একবার ক্ষণিকের জন্য তাহার মায়ের শেষ মুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই।—সহিস চট্ করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়াই উধাও।

টগবগ টগবগ টগবগ।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্তও যেন ফুটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরেই নাদুসনুদুসও টের পাইল। যখন সে সত্যই বুঝিল যে তাহার প্রেয়সী তাহার প্রণয়-শৃঙ্খল কাটিয়া পলাইয়াছে তখন তাহার মুখভাব একটা দেখিবার মত জিনিস! প্রতারিত নাদুস্‌নুদুস্‌, বিরহী নাদুস্‌নুদুস্‌, উন্মাদ নাদুস্‌নুদুস্‌! সে কি চেহারা!

একজন বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়া দিল কোনপথে তাহারা গিয়াছে। প্রকাণ্ড 'রোলস্ রয়েস্' সেইপথে ছুটিল। উদভ্রান্ত নাদুসনুদুস 'ষ্টিয়ারিং' ধরিয়া বসিয়া আছে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ। গাড়ীর বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফরফর করিয়া নাদুসনুদুসের চুল উড়িতেছে।

সে কি প্রাণান্তকর অনুধাবন! নক্ষত্রবেগে ঘোড়া মাঠ, বন, অরণ্য, পর্বত পার হইয়া যাইতেছে—বিদ্যুৎবেগে নাদুসনুদুস অনুসরণ করিতেছে। প্রায় ধরে ধরে—এমন সময় সম্মুখে এক নদী। এক লম্ফে অশ্ব নদী পার হইয়া গেল। নাদুসনুদুসের রোলস্ রয়েস্ পারিল না। ষ্টিয়ারিং ছাড়িয়া নাদুসনুদুস আক্রোশে দুই হাতে চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল।

—ঝপাং।

নাদুসনুদুস জলে লাফাইয়াছে। কিন্তু সাঁতার জানে না। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। স্রোত ভীষণ। তবু চেষ্টা করিতেছে—নাদুসনুদুস তবু চেষ্টা করিতেছে। সে সহজে ছাড়িবে না। নাকে মুখে চোখে জল ঢুকিয়া, সেই প্রবল স্রোতে উল্টাইয়া নাকানি চোবানির চরম! কিন্তু নাদুসনুদুসের সে কি অমানুষিক আপ্রাণ চেষ্টা! এমন না হইলে প্রেম! সমস্ত আত্মা দিয়া, সমস্ত সত্তা দিয়া নাদুসনুদুস ওপারে যাইতে চায়।

তাহার প্রিয়তমা যে ওপারে আততায়ীর হস্তে! কিন্তু শক্তির একটা সীমা আছেই।

নাদুসনুদুস আর পারে না। বোধশক্তি হারাইয়া যাইতেছে—হস্ত পদ ক্লান্ত অবসন্ন! সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল যে! নাদুসনুদুস বুঝি তলাইয়া গেল!

… … …

সেই সময়ে ঠিক ওপারে একটি গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সেই সহিস ছোকরাটি ও তরুণীটি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে।

হঠাৎ সহিসের নজরে পড়িল নীচে নদীতে কে যেন ডুবিতেছে। সঙ্গিনীকে কহিল, "দেখ, কে যেন ডুবছে—ওকে তুলি।"

তরুণী সভয়ে কহিল—"ও কিন্তু নাদুসনুদুস।" সহিস কিন্তু সামান্য লোক নয়। মহামানব সে। সে হাসিয়া কহিল—"তা আমি জানি; হোক্ নাদুসনুদুস কিন্তু মানুষ ত! সে ডুববে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব! হতে পারে না।" বলিয়াই সে তীর-বেগে ঘোড়ায় চড়িয়া তরতর করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল নাদুসনুদুসের দেহ স্কন্ধে বহিয়া সহিস হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতেছে। এই সংজ্ঞাহীন, বিশালকায় ভিজা নাদুসনুদুসকে লইয়া অশ্বারোহণে পাহাড়ে

চড়া অসম্ভব। হাঁটিয়া উঠিতে হইতেছে। সে কি কষ্ট! সহিসের মুখে দেবতার দীপ্তি—দেহে দৈত্যের বল!

তাহার ঘোড়াটি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পিছু পিছু আসিতেছে।

তাহার পর সেই তরুণী ও সহিস মিলিয়া নাতুসনুতুসের কি সেবাটাই করিল! নাতুসনুতুস বাঁচিয়া উঠিল। তখন সহিস-যুবকটি তাহার একমাত্র কম্বলটি দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

তরুণী তখন তাহাকে কহিল—"প্রিয়তম তুমি সহিস নও—তুমি দেবতা।" কম্বলের ভিতর হইতে নাতুসনুতুস বলিল—"ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু এখন ঘুমাও।"

ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণী স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহার মা যেন বলিতেছেন—"বৎসে, তুমি তাহাকেই বিবাহ কর—ইহাই আমার পুনশ্চ ইচ্ছা।"

ঘুম ভাঙিয়া দেখিল—সম্মুখের বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত-কপোতী চঞ্চু চুম্বন করিতেছে। পাশ ফিরিয়া দেখিল—নাতুসনুতুস জাগিয়া বসিয়া আছে। নাতুসনুতুস আবেগভরে কহিল, "দেখ, তুমি এই সহিসেরই উপযুক্ত। আমাকে এখন কেবল নদীটা পার করিয়া দাও। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"

তরুণী কহিল—"ধন্যবাদ। আপনাকে উনি নিশ্চয়ই নদী পার করিয়া দিবেন! ওঁকে জাগান।"

নাতুসনুতুস দেখিল অদূরেই সহিস অঘোর ঘুমাইতেছে। ডাকিল, সাড়া নাই। ঠেলিল, সাড়া নাই।

দূরে সহিসের Brown ঘোড়াটি চরিয়া বেড়াইতেছে—কিন্তু কাছেই একটি আস্ত White Horse একেবারে খালি পড়িয়া আছে।

নাতুসনুতুস বুঝিল—বেলা বারটার আগে সহিস উঠিবে না।

তখন সে অগত্যা একাই পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। সর্বাঙ্গের কাপড় তখনও ভিজা—সর্বাঙ্গে কাদা—মুখে নিরাশা।

হতাশ প্রণয়ী নাতুসনুতুসের সে কি করুণ অবরোহণ।

সিনেমা শেষ হইয়া গেল। পথ চলিতে চলিতে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল! কি আর করি! অগত্যা পোড়া বিঁড়িটা কান হইতে নামাইয়া ধরাইয়া ফেলিলাম।

বর্ষা-ব্যাকুল

ঘন-ঘোর করিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া নিবিড় কালো মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের আলো। পূরবী বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিতেছে।

মনটা বিকল হইয়া গেল। বাতায়ন পথে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। বিছানায় উপুড় হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অবশ্যম্ভাবী বর্ষা-সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এ কি ঘন ঘটা···। খবরের কাগজটা খুলিয়া দেখিলাম। অস্বস্তি বাড়িয়া গেল। কালিদাসটা কোথা ?

গুরু গুরু গুরু গুরু—আকাশ ডাকিল।

“কেষ্টা—অ কেষ্টা !”

কেষ্টা চাকর আসিল। তাহাকে কহিলাম—“ওরে বৃষ্টি আসছে। কড়া এক কাপ চা নিয়ে আয় ত। আর দেখ এক বাণ্ডিল বিড়িও আনিস্।”

বাতায়ন পথে দেখিলাম ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। কালিদাসকে চাই। কালিদাস না হইলে জমিবে না। আসিলেন কিন্তু ভজহরিবাবু। তাঁহার সম্মুখের দন্ত কয়েকটি সর্বদাই প্রকাশিত। তিনি আমাদের ম্যানেজার।

“এই যে সহায়রামবাবু, আপনার একখানা চিঠি !”

চিঠি দিয়া ভজহরিবাবু চলিয়া গেলেন।

প্রিয়ার পত্র। বহুকাল পরে। বুকটা কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ নিবিড় হইয়া আসিল। চিঠিখানা খুলিয়া আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আর একবার পড়িলাম। আর একবার !

সমস্ত মনটা উদাস হইয়া গেল। কেষ্ট চা আনিল, একটু একটু চা পান করিতে করিতে প্রিয়ার পত্রখানি চতুর্থবার পাঠ করিলাম। আকুলতা বাড়িল বই কমিল না।

আকাশের ঘনায়মান আয়োজন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকার। টপ্ টপ্ টিপ টাপ—বর্ষণ সুরু হইল।

হাত ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—পৌনে দশটা। সমস্ত মনপ্রাণ বিচলিত ! এখন যদি···নাঃ ! পাশের বাড়ির গ্রামোফোন হইতে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন।

“রতন পালংপর বৈঠল দুঁহু জন···” সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল।

কড়—কড়—কড়—কড়াৎ

আর পারি না। অন্তরের সমস্ত আবেগ ভাষায় রূপান্তরিত করিলাম—“কালিদাস রাস্কেলটা গেল কোথায় ?”

সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস আপাদমস্তক ভিজিয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"উঃ, কি বৃষ্টি মাইরি!"

"কি বৃষ্টি মাইরি! সেই থেকে তোর জন্য বসে আছি। আমাদের জাতটা এই জন্য উচ্ছন্ন গেল। সময়ের একটা জ্ঞান নেই। ক্যাড্ কোথাকার! এখন কি করে যাই বল ত? না আছে একটা ছাতা, না আছে ওয়াটারপ্রুফ।"

কালিদাস অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"হঠাৎ বৃষ্টিটা নামতেই আট্‌কে পড়লুম ভাই!"

"আজই কি শেষ?"

"হ্যাঁ আজই শেষ।"

"ছি ছি মাইরি গ্রেটা গার্বোর অমন ছবিটা দেখা হল না। দশটা বেজে গেছে!"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন মানসে কালিদাস কহিল—"তোর হাতে ওটা কি?"

"বৌ চিঠি দিয়েছেন। তাঁর জ্বর, বড় মেজ সেজ ছোট্ট ন—সব ছেলেগুলির জ্বর। মেয়ে দুটোর আমাশা হয়েছে! গ্রেটা গার্বোর লভ্ সিনটা মাইরি মাটি হ'ল।"

নিষ্ফল আক্রোশে মুষলধারার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে গান চলিতে লাগিল—

"রসভরে দুঁহু তনু—থর থর কাঁপই—"

পূজার গল্প

গল্প শুনিতে চান ত? শুনুন তবে।

সেবার পূজার দুইএকদিন আগে সিমলা হইতে ফিরিতেছিলাম। আমি ইন্‌শিওরেন্সের দালাল। কার্য্য-ব্যপদেশে নানাস্থানে গতিবিধি। যে 'লাইফ'টির জন্য গিয়াছিলাম—তাহা লইতে পারি নাই। অন্য আর একজন সেটি বাগাইয়া লইয়াছে। সুতরাং মন খারাপ।

যে কামরায় উঠিলাম তাহাতে দেখি অপরূপ সুন্দরী—একজন নয়—তিন তিনটি মহিলা বসিয়া। এরূপ সুন্দরী কখনও দেখি নাই। চোখ ঝলসাইয়া গেল। সঙ্গে একটি যুবক আছেন। তিনি কন্দর্পকান্তি! আমার এই মেদবহুল কৃষ্ণবপু লইয়া ইহাদের নিকট বসিতে লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু বসিলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর যুবকটিকে সম্বোধন করিয়া সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কতদূর যাবেন?" তিনি দেখিলাম একটি সিনেমা-সাপ্তাহিকে নিবদ্ধদৃষ্টি—একটি অভিনেত্রীর অর্ধনগ্ন চিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

"কতদূর যাবেন?"

চকিত হইয়া যুবকটি বলিল—"কি বলছেন?"

"বিশেষ কিছু নয়। কতদূর যাবেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"বঙ্গদেশে !"

বলিলাম—"আমিও ত সেখানেই যাচ্ছি। একসঙ্গে যাওয়া যাবে বেশ"—যুবকটি দেখিলাম—আবার সাপ্তাহিকে মন দিয়াছেন !

সাপ্তাহিকটিতে আমাদের কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে দেখিলাম। যুবকটির চিত্ত সেইদিকে আকর্ষণ করিবার আশায় কহিলাম—"এই বিজ্ঞাপনটা আমাদের কোম্পানির—দেখুন, বোনাস্ আর—"

অর্ধনগ্ন অভিনেত্রীর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যুবকটি বলিলেন—"ওসব বুঝি না।"

"তার মানে ? আপনি ইন্‌শিওর্ড ত ?"

"বললাম ত বুঝি না। যা বুঝি তা দেখছি।" বলিয়াই আবার সেই চিত্রের দিকে চাহিলেন। আমি বিষ্ণুচরণ বর্মা—ছাড়িবার পাত্র নহি। বলিলাম, "আপনার মত রসিক লোক জীবনবীমা বোঝেন না এটা বিশ্বাস করা শক্ত। মাসে সামান্য কিছু অর্থব্যয় করে যদি জীবনটাকে"—

বাধা দিয়া যুবক কহিলেন—"অনর্থক অর্থের কথা পেড়ে আমাকে বিব্রত করবেন না। বৈষয়িক যদি কিছু আলোচনা ক'র্‌তে চান—মায়ের সঙ্গে করুন।"

সহাস্য নমস্কারে তাঁহার জননীর সম্বর্ধনা করিলাম। বলিলাম—"আপনার ছেলে তো এ বিষয়ে আলোচনা কর্‌তেই চান না। আপনিও নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত যে জীবন বীমা জিনিসটা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য।"

মহিলাটি সমস্ত মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া বলিলেন—"আমিও কিন্তু ও বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানি না ; আপনার অসুবিধা না হয় ত একটু বিশদ করে বলুন।"

"নিশ্চয়ই"—বলিয়া সুরু করিলাম এবং অনর্গল আমাদের সম্মোহন-মন্ত্রগুলি সগর্বে আওড়াইয়া গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য—মহিলাটির মনে রেখাপাত পর্যন্ত করিল না। অন্য দুইটি মহিলাও আমার বক্তৃতা মন দিয়াই শুনিলেন—কিন্তু তাঁহাদেরও কোন উৎসাহ দেখিলাম না।

একটু থামিয়া বলিলাম—"আশা করি আমার সব কথা আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারছি।"

প্রথমা মহিলাটি বলিলেন—"আদ্যোপান্ত সব বুঝেছি। কিন্তু আমার দরকার হবে না জীবন-বীমার।"

"আপনার না হয় না হতে পারে—কিন্তু আপনার পুত্রের, আপনার স্বামীর ?"

"আমার স্বামী মৃত্যুঞ্জয় ! সুতরাং তাঁর জীবন-বীমার প্রয়োজন কই ?"

এমন সময় বাঙ্কের উপর হইতে স-শুণ্ড মুণ্ড বাহির করিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে গণেশ কহিলেন—"তোমরা বড় গোলমাল কর্চ্ছ মা ! এ চারদিন কি আর নিদ্রা হবে ? একটু ঘুমিয়ে নাও।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম—এ কি ! ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। জগজ্জননী দুর্গা

বঙ্গদেশে চলিয়াছেন—সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদধূলি লইলাম। বলিলাম—"অবোধ আমি—ক্ষমা চাই।" শঙ্করী হাসিয়া বলিলেন—"কোন দোষ ত কর নাই বৎস্য। ফর্ম বাহির কর—বঙ্গদেশে পূজাটা ইন্‌শিওর করিয়া রাখি। তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছি।"

বল হরি, হরি বোল

"বল হরি, হরি বোল—"

নৈশ গগন মুখরিত করিয়া আমরা কয়জন প্রাণী চলিয়াছি। হঠাৎ রমেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর!"

আমি বলিলাম—"না—কিছুমাত্র না!"

রমেশবাবু বলিতে লাগিলেন—"না হওয়াটাই আশ্চর্য। আজ বিকেলে আপনি আমার বাড়ীতে অতিথি হলেন। রাত্রে আপনাকে মড়া বইতে নিয়ে যাওয়াটা ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু লোক জুটল না—কি করি বলুন।"

আমি বলিলাম—"আহা, ওর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কলেজে পড়ার সময় মড়া পোড়ানটাও আমাদের কোর্সের মধ্যেই ছিল প্রায়। প্রায়ই এ কার্য করতে হত।"

হরেন্দ্রবাবু তখন বলিয়া উঠিলেন—"ওসব বাজে ভদ্রতা ছেড়ে এখন কেউ একটা মিঠে গোছের প্রেমের গল্প বলুন দেখি—সময়টা যাতে কাটে। এখনও বেশ কিছু দূরে হেঁটে যেতে হবে। শ্যামবাবু, আপনি বলুন।"

শ্যামবাবু আমাদের মধ্যে একটু বয়স্ক লোক। তিনি বলিলেন—"আরে বাপু—দু-একটা প্রেম যা জীবনে করেছি তা কি আর এখন মনে আছে? আমাকে এখন অ্যালজাব্রার ফর্মুলা জিজ্ঞেস করাও যা, প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই। এককালে করেছি সব। কিন্তু কিছুই ভাল মনে নেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা, তোমাদের পাল্লায় পড়ে এলাম ত—বাতটা না বাড়ে।"

"বল হরি, হরি বোল—"

হরেন্দ্র তখন শ্যামবাবুকে ছাড়িয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন। "আপনি ত চন্দ্র-দা এককালে খুব উড়েছিলেন। বলুন না দু একটা গল্প—সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরি বোল—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"উড়েছিলাম বটে। কিন্তু ঠিক যে প্রেম করেছিলাম তাতো বলতে পারি না। কারণ each time, I had to pay for my love either in coin or in kinds! সুতরাং তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিত্ব নেই মনের মধ্যে। রাণী, হাবি, বিনোদিনী, নয়নতারা সব একাকার হয়ে গেছে! Distinguish করা শক্ত।"

"বল হরি, হরি বোল—"

হরেন্দ্রবাবু রমেশবাবুকে তখন বলিলেন—"আপনার স্টকে কিছু আছে নাকি রমেশ-দা ? বলুন না।"

রমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন—"আমি ভাই ইস্কুলে পড়ামুখস্থ করে একজামিন পাস করাটাই পরমার্থ মনে করতাম। সুতরাং ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করা ছাড়া আর কিছু করি নি। বিয়ে করে স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। ফলে চারটি মেয়ে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ।"

"বল হরি, হরি বোল—"

একটু থামিয়া রমেশবাবু আবার বলিলেন—"এইবার একটা প্রেম করব মনে করছি। কিন্তু ফুর্সৎ কই ? সকাল থেকে উঠে আপিস যাওয়ার তাড়া। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এসে মনে হয় চাট্টি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি। তোমার নিজের কিছু থাকে ত বল না ভায়া। অপরকে জ্বালাতন কর কেন ?"

"বল হরি, হরি বোল—"

হরেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"ডাক্তারেরা যেদিন থেকে আশঙ্কা করলেন যে আমার বুকের দোষ আছে—সেদিন থেকে নিজের জীবনকে আর কারুর সঙ্গে জড়াতে সাহস পাই না। তা ছাড়া আমার মত মুখে বসন্তের দাগ—একচোখ কাণা লোককে কোন মেয়ে ভালবাসবে বলুন ! কিন্তু প্রেমের গল্প শুনতে আমার ভারি ইচ্ছে। বলুন না আপনারা কেউ একটা।"

"বল হরি, হরি বোল—"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"কিছু মনে করবেন না মশাই। আপনি অপরিচিত লোক। জীবনে যদি ঘটে থাকে কিছু, বলুন না। এ সময়ে বেশ লাগবে।"

"বল হরি, হরি বোল—"

আমার জীবনে-যে রমণীর আবির্ভাব ঘটে নাই তাহা নয়। কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা করে। সুতরাং কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম, "এখন কি ওসব ভাল লাগবে ? তার চেয়ে বরং ভূতের গল্প বলুন কেউ।"

বয়স্থ শ্যামবাবু বলিলেন—"প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প ও আমার কাছে দুইই সমান। আপনি প্রেমের গল্পই বলুন।"

"বল হরি, হরি বোল—"

বলিতে লাগিলাম।

"তখন সবে আমি এম. এ. পাস করেছি। এই বছরখানেক আগেকার কথা। মামার বাড়ী বেড়াতে গেলাম। হঠাৎ সেখানে এক অশিক্ষিতা চাকরাণীকে ভাল লেগে গেল। বয়স কম। কিন্তু ভারি সুন্দর। খোঁজ করে শুনলাম মেয়েটি বিধবা। কিন্তু অমন নিষ্পাপ মূর্তি আমি কখনো দেখিনি।"

"বল হরি, হরি বোল—"

"তারপর ক্রমশঃ যেমন হয়। একদিন আড়ালে পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম। মেয়েটি শুধু বললে—'তা কি হয়?'

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম "খুব হয়"। বলে একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিতে গেলাম। সে কিছুতে নিলে না।"

"বল হরি, হরি বোল—"

"এমনি করে কিছুদিন যায়। যতদিন মামার বাড়ীতে ছিলাম তার আশেপাশে ঘুরেছি! কিন্তু কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারি নি। মামা, মামী, বাড়ীসুদ্ধ লোকজন। একদিন লুকিয়ে তার বাড়ী গেলাম। সেখানেও দেখি এক খাণ্ডার মাসী রয়েছে।—কি করি ভাবছি। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। মুকুজ্জেদের বাড়ী মামা-মামী বাড়ীসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হল! ফাঁকা বাড়ী। কুসুমকে সেদিন একা পেলাম।"

হরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বল হরি, হরি বোল—"

"সেই দিনই বুঝলাম, কুসুমও আমাকে ভালবাসে। সেইদিনই তার সেই চকিত চাহনি আর ঠোঁটের কাঁপন দেখে আমি বুঝেছিলাম যে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সেদিন তাকে আমি যা-ইচ্ছা তাই করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না, কিছু করতে পারলাম না। শুধু একটি চুমু খেলাম।"

"বল হরি, হরি বোল—"

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না।

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তারপর?"

"তারপর? তারপর আর কিছু নেই। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। কুসুমের আর দেখা পাইনি, শুনেছিলাম আমি চলে আসার পর সে মামার বাড়ীর চাকুরি ছেড়ে দিয়েছে।"

"বল হরি, হরি বোল—"

শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শব নামান হইল। চিতা সাজান হইল। শবের দেহাবরণ খুলিয়া তাহাকে চিতায় তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম—

"থামুন—থামুন—থামুন—এ আপনার বাসায় কি করে এলো রমেশবাবু?"

রমেশবাবু বলিলেন—"অসুস্থ হয়ে এই মেয়েটি দুদিন আগে আমাদের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল কাকে খুঁজতে সে বেরিয়েছে। তাছাড়া অত প্রশ্ন করার অবসর ছিল কোথা? বেচারী মারাই গেল। কেন বলুন ত?"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ট্রেনে

ট্রেনে এক বৃদ্ধ চলিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও লোকটি যে এককালে সৌখীন ছিলেন তাহা বেশ বোঝা যায়। মাথার চুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের মোজাটা পর্যন্ত তাঁহার বিগত-যৌবনের রুচির পরিচয় দিতেছে। হাতে একটি মোটা বর্মা চুরুট। খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি।

তিনি কামরাটিতে এতক্ষণ একাই ছিলেন। কিউল স্টেশনে ট্রেন থামিতে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবকটির ঘাড়ের চুল চাঁচা—চোখে সস্তা দামের খেলো নীল চশমা—গোঁফ ছাঁটা—বুক-খোলা জামার নীচে একটা অর্ধছিন্ন মাফ্‌লার—মাফ্‌লারের ছিদ্র দিয়া একটি ময়লা গেঞ্জি উঁকি দিতেছে। যুবকটির মুখে বিড়ি; বগলে একটি মাসিক পত্র। আসিয়াই বেঞ্চি বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—"কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাজাও বনে—"। তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বিড়িটা ধরাইতে ধরাইতে একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার কতদূর যাওয়া হবে স্যর—"

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংযতকণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন—"দানাপুর যাব। আপনি?"

"তবে ত বেশ ভালই হল—আমিও দানাপুরেই যাব। তাহলে আমার স্যর এই পুঁটুলি আর বইটা রইল। আমি চট্ করে এক কাপ চা খেয়ে আসি। আর বিড়িও এক বাণ্ডিল আনি।"

অল্পক্ষণ পরেই যুবক ফিরিয়া আসিল। মুখে বিড়ি। কিছুক্ষণ কোন কথাবার্তা নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাতের খবরের কাগজটা নামাইতেই যুবকটি হাত বাড়াইল—"কাগজটা একবার পেতে পারি স্যর—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিন্ না!"

একটু পরেই যুবকটি বলিয়া উঠিল—"ইস্—একটি ছোক্‌রা আত্মহত্যা করেছে দেখছি আজ—"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সশব্দে ঝাল ঝাড়িয়া দিলেন—"আজকালকার এই গোঁফ-ছাঁটা ছোঁড়াগুলোকে দেখলে রাগ ধরে।"

যুবকটি কিছুমাত্র না চটিয়া পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয় হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আপনাদের ছোক্‌রা কালে কি আপনারা প্রেম করেন নি? সব যুধিষ্ঠির ছিলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির হয়ত ছিলাম না। কিন্তু বেয়াদপ ছিলাম না। বুড়ো লোকের সম্মান রেখে কথা কইতাম।"

ছোকরা দমিবার নহে। আবার হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনারাও প্রেম করতেন তাহলে—"

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ? দেখি একবার—"

"হাঁ হাঁ স্যর দেখুন। ওতে বেশ একটা ভাল গল্প আছে, পড়ে দেখুন। 'মগডালে' পড়ে দেখুন—!"

বৃদ্ধ মাসিকটির আদ্যোপান্ত উল্টাইয়া "মগডালে" পড়িতে সুরু করিলেন। লেখকের নাম নাই। বৃদ্ধ পড়িতে পড়িতে বর্মাতে দুটো টান-দিয়া বুঝিলেন—ধরাইতে হইবে। দেশলাইটা কোথা গেল? এ পকেট সে পকেট খুঁজিতেছেন এমন সময় যুবকটি চট করিয়া নিজের দেশলাইটা হইতে ফস্ করিয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া বলিল—

"এই যে আসুন স্যর—"

"Thanks"

"কেমন লাগছে স্যর গল্পটা—?"

"একেবারে ট্রাশ মনে হচ্ছে যেন; শেষ হলে বাঁচি।"

"শেষের দিকটা দেখবেন—রস আছে।"

"দেখা যাক্—"

"বাগানের দৃশ্যটা কেমন লাগল?"

"বেশ অদ্ভুত। তবে কোন জিনিসই শেষ পর্যন্ত না পড়ে কিছু বলা যায় না—"

যুবক কিছু না বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

ফুল বাগানে ঝুলবি যদি আয়
এই ভরা জ্যোছনায়—

বৃদ্ধ পড়িয়া চলিয়াছেন—। বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে।

গল্প শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—"একেবারে বাজে—" যুবক বলিয়া উঠিল—"কেন শেষ কালটায়—যেখানে মণিমালা কদম গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। আর নায়ক ভুলে মনে করছে যে সে তালপুকুরে ডুবে গেছে—আর সেই ভেবে ক্রমাগত ডুব-সাঁতার দিয়ে খুঁজছে। সেখানটা ভাল লাগল না আপনার?"

"রাবিশ—! আজকাল ছেলেরা বোধ হয় সত্যিকার মেয়েমানুষের সন্ধান পায় না—"

"তার মানে?"

"তা না হলে ওই রকম গল্প লেখে কেউ! এই সত্যি কথাটা কেউ বুঝছে যে যাকে স্বর্গের দেবী বলে বলে সবাই অস্থির হচ্ছে—she can be easily bought!"

"সেটা কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব—"

"প্রায় ক্ষেত্রেই—অন্ততঃ আমার ত তাই ধারণা।"

"কি রকম বলুন না—"

"এই ধর একটা concrete example। আমারই ছেলেবেলায় প্রায় বছর কুড়ি আগে সৈরভি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল—তার গর্ভে একটা ছেলেও হল! ছেলেটা যখন মাস দুয়েকের, তখন ব্যাস্, সৈরভি একদিন উধাও। শুনলাম রামেশ্বরপুরের এক জমিদার তার প্রেমে পড়েছেন! আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মাথাই ঘামালাম না। I had another—Girls were so cheap in those days" যুবক মুখ হইতে বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাহার পর যুবক বিনীত স্বরে বলিল—"আমায় মাপ করবেন। না জেনে হয়ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি।"

"তার মানে—"

"তার মানে সৈরভি আমারই মা—তিনি এখনও রামেশ্বরপুর জমিদার বাড়ীতে চাকরাণী আছেন। আপনি, আমার বাবা—"

এই বলিয়া সে প্রণত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

তাহার পর হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা আপনার নাম কি হারাধন বসাক?"

"আমার নাম রমেশ সেন—"

"ও, যাক্। তবে আপনি নন্। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বসাক। তাহলে আপনার একটা চুরুট দিন স্যর। আমার বিড়ি গেছে ফুরিয়ে—বাঁচালেন আপনি।"

বলিয়া ছোকরা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ

॥ এক ॥

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া, কবিতা লিখাইয়া, সর্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ অনায়াসে তাহাদের উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের বর্তমানে এ-সব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুস-ফুস্ গুজ-গুজ করিতেছে মাত্র। কারণ আর কিছুই নহে—শ্যামা নাম্নী ধোপানিটিও সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।

যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার-মহাশয় সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা, যদিও প্রবীণ হালদার-মহাশয় প্রবলভাবে উহা প্রচার করিতেছেন। এই হালদার মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী-মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল তখন হালদার-মহাশয় নিম্নস্বরে বলিলেন, "ছি-ছি, শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে। রাম রাম!"

এতৎপ্রসঙ্গে ভাদুড়ী-মহাশয় য-ফলা আকার ব্যবহার করিয়া ঘৃণা-প্রকাশের ধরণটা অধিকতর মর্মান্তিক করিয়া বলিলেন, "আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—!"

পরমুহূর্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন ধোপানিটা বল ত হে।"

দেখা গেল, হালদার-মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন! তিনি উক্ত রজকীনির আবাস-স্থান, চেহারা, বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, "শৈলেশ যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি জড়িয়ে পড়েছে কে জানত? অত বড় ছেলে, অত বড় মেয়ে—"

ভাদুড়ী-মহাশয় শুধু বলিলেন, "ছ্যা-ছ্যা! লোক হাসালে!"

খোঁড়া মল্লিক-মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে শ্যামা ধোপানি পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু-ধোপার নিকট মার খাইয়াছিল। মল্লিক-মহাশয় শৈলেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু-ধোপাকে বলিলেন, "কথাটা আর কারো কাছে প্রকাশ করিস নি, বুঝলি?"

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কথাটা?" মল্লিক-মহাশয় থতমত খাইয়া কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজেদের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন!—কেন সে পিরু-ধোপার নিকট গিয়াছিল? এ কি আহাম্মকি!

সুতরাং মল্লিক-মহাশয়ের এই কাঁচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি মুকুজ্যেমহাশয়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিরুর বাড়ীতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল, "মল্লিকের কথায় কিছু মনে করিসনি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে।"

এবারও বিস্মিত পিরু কহিল, "মানে? কি বলেছেন?" মুকুজ্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, "মানে? ও কিছু নয়! বুঝলি?" বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন, "পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে। মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে!"

তখন সকলে চটিয়া মল্লিকের উপর খড়্গহস্ত! বেচারি মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিরুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল, তখনই ভাবিল এবং হাসিল—মল্লিকমহাশয় আজকাল সিদ্ধি খাইতেছেন!

যাই হোক শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার, মুকুজ্যে প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ

একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা-গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে-ভিতরে অবশ্য ভাদুড়ী হইলেন কৌতূহলী, মুকুজ্যে উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ!

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাৎ ছোট নয়। অনেকগুলি বনিয়াদি ভদ্রগৃহস্থের সেখানে বসবাস। গোটা-দুই চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বরবাবুর বিপক্ষদলও একটি ছিল এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী, কর্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন, সেই হেতু তাঁহার বিপক্ষ দলটি বেশ ভারিও ছিল। তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-রজকিনী-প্রসঙ্গটা তাঁহারা বেশ-একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল, "হালদার-মশাই বলে বেড়াচ্ছেন যে শৈলেশ্বরবাবু নাকি খুলনা গেছেন!"

হুঁকাতে দুইটি টান মারিয়া রায়-মহাশয় বলিলেন, "হালদারকে বলে দিও হে—সূর্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি! যত সব—"

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন, "আহা চট কেন! একথা হালদার বলবে না ত কে বলবে বল। ওই দলটার সব কটা পাজী। বুড়ো মিত্তির সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি আবার মাস্টারি করেন!"

"ভাদুড়ীই বা কি কম! রোজ ওঁর ময়নাদীঘির ধারে বেড়াতে যাওয়াটার অর্থ কি?"

বৃদ্ধ গোস্বামী-মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই।

তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন, "সব ঘুঘু।"

"পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!" এই বলিয়া রায়-মহাশয় হুঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

॥ দুই ॥

ফলে অচিরকাল মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ী-মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায় মহাশয়, রায়-মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুকুজ্যে-মহাশয়, মুকুজ্যে-মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙ্গুলি-মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শৈলেশ্বরবাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতাসম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি জনমত ক্রমশঃ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও যান নাই—কারণ স্টেশনের কর্মচারীরা কেহ তাহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি পদব্রজেই কোথাও গিয়া স-রজকিনী আত্মগোপন করিতেছেন! একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর-গলায় বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানিটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠামাটি দৌড়ুচ্ছেন!"

॥ তিন ॥

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বরবাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে ভীত-চকিত শৈলেশ্বরগৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন! আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকুল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার সমবয়স্কা গৃহিণীগণ বেশ রসান দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল। কেহ কহিল, "ওমা কি ঘেন্নার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না—!" বলিয়া গালে হাত দিল এবং ঘাড় কাৎ করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন, "পুরুষমানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই! —একবার চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্!" হালদারগৃহিণী একটু সহানুভূতির সুর দিয়া বলিলেন, "উনি ত বলছিলেন শৈলেশবাবু খুলনা গেছেন—"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "থাম লো থাম্। আমার কর্তাটিও ওই দলে! সব চোরে-চোরে মাস্তুতো ভাই! বলে দিয়েছি এবার পষ্ট করে যে ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবে-দাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ করে বসে থাকবে। বুড়ো মিনষের অত আড্ডা দেওয়া কেন?"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর ফাঁদি-নথ ঘন-ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল; মরীয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "কোনদিন কিন্তু ওঁকে শ্যামা ধোপানির সংস্রবে দেখিনি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিরু ধোপা। শ্যামা ত কোনদিন আসেও নি আমাদের বাড়ী!—"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "এই বুদ্ধি না হলে তোমার স্বামী যাবে কেন, বোন! তারা যা করবে তা কি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে না কি? শৈলেশবাবু হলেন একটা ঘাগি মোক্তার। তার সঙ্গে চালাকি! পুরুষমানুষদের বশে রাখবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—নজরবন্দী করে রাখা। চোখে-চোখে রাখা। যা বল্লেন আমাদের গাঙ্গুলিদিদি; চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"

॥ চার ॥

শৈলেশ্বরবাবুর দুই পুত্র মাধব ও যাদব। মাধব বি. এ. পাস্ করিয়াছে। যাদব আই. এ. পড়িতেছে! তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া গেল। কি করিবে! তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতেছিল যে শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটি ঝুনা-ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও অবশ্য কয়েকজন ছোকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল। এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধদের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল! হালদার-মহাশয়ের উপর ধনী রায়মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার নামে ডাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ

ঢুকিয়া দিয়াছেন। ভাতুড়ী-মহাশয় মাণিক পোদ্দারের নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন ; গাঙ্গুলি-মহাশয়ের উস্‌কানিতে পোদ্দারের পো ভাতুড়ী-মহাশয়কে চাপ দিতে সুরু করিয়াছে। মল্লিক-মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষদলের কাহারো বাড়ী আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামীমহাশয় কলিকাতা হইতে "সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা" নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারি খানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি কি করিয়া বিপক্ষদলের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া স্বদলের কয়েকজন পাণ্ডা, স্থানীয় পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোস্টমাস্টার বেচারা এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"Everything is fair in love and fight। শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব—তবে ছাড়ব!"

॥ পাঁচ ॥

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

—হঠাৎ শ্যামা ধোপানি কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ি গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোন কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করিতে লাগিল—যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীণের দল প্রথমটা হতভম্ব হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অবশ্য তাহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন, "ভূতের কাছে মামদোবাজী। মামার বাড়ী! পিরু-ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে ত!"

শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ, তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়—কূপে পড়িয়া। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কূয়া ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক-মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

মাত্র দশটি টাকা

॥ এক ॥

অপ্রস্তুত হইয়া বিধুবাবু বলিলেন, "আচ্ছা থাক থাক, তাতে কি হয়েছে। হাতে যখন থাকবে তখন দেবেন। ব্যস্ত কি?"

ততোধিক অপ্রস্তুত হইয়া নিখিলবাবু বলিলেন, "না, ব্যস্ত হবার কথা বৈ কি! এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ঘোরালাম। আজ একেবারে আপনাকে ঠিক দিতাম, কাল রাত্রে টাকাটা এনেও রেখেছিলাম। কিন্তু সকালে বোস্‌জা-মশাই এসে একেবারে নাছোড় হয়ে পড়লেন। বেনারসে তাঁর ছেলের অসুখ করেছে—তার এসেছে—কিছু টাকা না হলে—"

বিধুবাবু বলিলেন, "তা বেশ করেছেন দিয়েছেন! তার জন্য আর কি হয়েছে! তিনি ফেরৎ দিলে আমাকে দেবেন এখন। আজ দেখি যদি বিপিন কিছু ধার দেয়। আমারও আজ টাকা কিছু—" বলিয়া বিধুবাবু উঠিলেন। বিধুবাবু বাহির হইয়া যাইতেই নিখিলবাবুর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়া গেল এবং মনে মনে তিনি বলিলেন, "চামার কোথাকার! কটা টাকার জন্যে আর ঘুম হচ্ছে না।"

বাহিরে গিয়া বিধুবাবুর মুখভাব বদলাইল এবং তিনিও অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বেটাচ্ছেলে ভোগাবে দেখছি।"

॥ দুই ॥

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দিন কাটিতে থাকে। একটি সপ্তাহ কাটিল। বিধুবাবু আবার একদা প্রাতে নিখিলবাবুর বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রায় মাস তিনেক পূর্বে বিধুবাবু নগদ দশটি টাকা নিখিলবাবুকে ধার দিয়াছিলেন এবং "কালই সকালে দিয়ে দেব" এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে আপিসের গণ্যমান্য বড়বাবু নিখিলনাথ মিত্রকে অদ্যাপি অধমর্ণই থাকিতে হইয়াছে—তাহাও সামান্য দশটি টাকার জন্য এবং বিধুচরণ বসুর মত একটা লোফারের নিকট! "হায়রে নিয়তি—তোমাকে গড় করি। নলরাজার মত বিচক্ষণ রাজাকেও তুমি নাকাল করিয়াছিলে, আমি তো সামান্য কেরানি মাত্র—" ইহাই ছিল নিখিলনাথের সান্ত্বনা। বাল্যকালে নিখিলনাথ মহাভারতের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বিধুচরণ আসিতেই নিখিলনাথ মুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন তিনি বিধুচরণের পথ চাহিয়াই উৎকণ্ঠিত ভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। বিধুচরণ আসাতে তাঁহার সে দারুণ উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল।

"বাঁচা গেল! আসুন বিধুবাবু, আপনার কথা রোজই ভাবি। আজ আমাদের পাড়ায় গণেশ-অপেরা যাত্রা হবে। আসবেন শুনতে? একজন মনোমত সঙ্গী না পেলে এসব জিনিস শুনে সুখ নেই! আসুন না।"

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, বিধুচরণের মুখমণ্ডলে এইরূপ একটি আনন্দজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তিনি উদ্ভাসিতচক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ ত! কটার সময়—"

"আটটা। সন্ধ্যে আটটা—"

"আসব শুনতে।"

এমন সময় নিখিলবাবুর ছয়বৎসরের কন্যা মিণ্টু আসিয়া বলিল, "বাবা, মা বললে চিনি ফুরিয়ে গেছে!" বিধুবাবু মিণ্টুকে ধরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এত আলাপ তিনি নিজের মেয়ের সহিতও করেন না।

"বাঃ খুকী তোমার ফ্রকটি তো বেশ সুন্দর! মাথার ফিতেও চমৎকার দেখছি তো!"—ইত্যাকার নানারূপ আলোচনায় আরও মিনিট দশেক কাটিল।

বিধুচরণবাবুর এখানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দশটি টাকা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাগাদা করিতে পারিলেন না। নানা ছুতানাতায় কালহরণ করিতে লাগিলেন, যদি নিখিলনাথবাবু কথাটা নিজেই পাড়েন। বিধুচরণবাবুর চক্ষুলজ্জা প্রবল।

নিখিলনাথবাবুর মহাভারতীয় মন। তিনি ও-দিক দিয়াই গেলেন না। এ বৎসর ফতেপুর সিক্রিতে কি ভীষণ শীত পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য গরীব লোকদের কি দারুণ কষ্ট হইতেছে, এই সম্পর্কে তিনি নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। নিখিলনাথবাবু বলিলেন, "এইবার আপিস যাওয়ার জোগাড় করা যাক।"

বিধুচরণবাবু এইবার মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "বোসজা মশায়ের কাছে টাকাটা ফেরৎ পেয়েছেন না কি?" নিখিলনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "ঠিক ঠিক ভুলেই গেছি তো। টাকা আপনার জন্যে রেখেছি আমি।" বলিয়া তিনি পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন।

"আরে গেল যা! চাবিটা ফেললাম কোথা!" সমস্ত পকেটগুলি খুঁজিলেন। টেবিলের নীচে, আলমারির মাথায় সর্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য, চাবি পাওয়া গেল না। বিধুচরণও খুঁজিলেন এবং শেষটা বলিলেন, "আচ্ছা থাক—ব্যস্ত কি?"

॥ তিন ॥

সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে আসিয়া বিধুবাবু দেখিলেন, নিখিলনাথ অনুপস্থিত। খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, কোন প্রয়োজনীয় কার্যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন, কখন ফিরিবেন

স্থিরতা নাই। বিধুচরণ একাই বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। উত্তরার অভিনয় তাঁহার বেশ ভাল লাগিল। শরীরের সহিত মনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রমাণও মিলিল। উত্তরার দুঃখে তিনি খুব বেশী অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলেন হৃদয়ের বেদনা গলদেশ আশ্রয় করিয়াছে। ঢোঁক গিলিতে কষ্ট হইতেছে এবং টন্‌সিল দুইটি ফুলিয়াছে। এমন কি টেম্পারেচার লইয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বরও হইয়াছে। সামান্য জ্বর ক্রমশঃ অসামান্য হইয়া উঠিল এবং তখন শয্যাগত বিধুচরণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে নিখিলনাথের সহিত দেখা না হইলে তিনি কদাপি যাত্রা শুনিতে যাইতেন না, এবং ইহাও সত্যকথা যে মূলে দশটি টাকা না থাকিলে কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না। এইরূপ বিশ্লেষণ করিবার পরে বিধুচরণ বলিতে বাধ্য হইলেন, "ব্যাটা আমাকে ধনে-প্রাণে মারবে দেখছি।

বিধুচরণ একসপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিলেন এবং চিকিৎসা বাবদ তাঁহার ১৭·৮৭ পয়সা খরচ হইল।

॥ চার ॥

উক্ত ঘটনার পর একটি মাস কাটিয়াছে। কারণ পৃথিবী বাঙালী নহে, নিয়মিতভাবে সে নিজকক্ষে ঘুরিয়া চলিয়াছে, নিয়মিতভাবে দিবারাত্রি আসিতেছে এবং যাইতেছে।

সেদিন মাসের ছয় তারিখ। নিখিলনাথ নীচের ঘরটাতে বসিয়া মানসাঙ্ক কষিতেছিলেন। আগামী কল্য তিনি মাহিনা পাইবেন। কাটিয়া কুটিয়া ৫৫·৪৭ পয়সা। ইহার মধ্যে বাড়ীভাড়া দিতে হইবে ১৫ টাকা, মুদীকে দিতে হইবে ২০ টাকা। বাকী ২০·৪৭ পয়সা। ৪৭ পয়সা ছাড়িয়া দিলে—থাকে কুড়ি টাকা। ইহার ভিতর সমস্ত মাসের তরকারি খরচ, ছেলেমেয়ের স্কুলের মাহিনা, দুধ, কেরোসিন তেল, কাপড়-চোপড়ের বিল। নাঃ, বিধুচরণবাবুকে দশটা টাকা দেওয়া অসম্ভব!

গৃহিণীর হাতে অবশ্য গোটাকয়েক টাকা আছে। বাজার-খরচ প্রভৃতি হইতে এক-আধ পয়সা বাঁচাইয়া নিখিল-গৃহিণী গোটা কয়েক টাকা জমাইয়াছেন ঠিকই, কিন্তু ঠিক কয়টা টাকা তাহা নিখিলের সঠিক জানা নাই; তাহা ছাড়া এই কয়টি টাকা হইতে শোভাকে বঞ্চিত করিতে নিখিলনাথের মায়া হয়। কি বলিয়া চাহিবে!

বিধুর কাছে সে টাকাটা লইয়াছিল, রেস্‌ খেলিবার জন্য। বলা বাহুল্য, হারিয়াছে। একথা অকপটে স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলিবার মত নহে। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, কোনরূপে ম্যানেজ করিয়া টাকাটা সে বিধুকে দিয়া দিবে। কিন্তু প্রতিমাসেই সে একবার করিয়া মানসাঙ্ক কষিয়া দেখিতেছে, ম্যানেজ করা অসম্ভব। অথচ মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া বিধুকে আর ঠেকাইয়া রাখাও অসম্ভব। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা

আছে। নিখিলনাথ কি করিবে ভাবিতেছিল এমন সময় গলির মোড় হইতে হঠাৎ বিধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "এই একবার নিখিলবাবুর কাছে যাচ্ছি।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিখিলনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাশেই একটা চোরকুঠুরি ছিল তাহাতে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

"নিখিলবাবু!"

মিণ্টু আসিয়া কহিল, "বাবা তো এক্ষুণি এখানে বসেছিলেন! বাইরে গেছেন তাহলে।"

"আচ্ছা। এলে বোলো যে আমি এসেছিলাম।"

"আচ্ছা।"

বিধুবাবু চলিয়া গেলেন। বিধুবাবু চলিয়া যাইতে না যাইতে "বাপরে বাপ—উঃ উঃ।" করিতে করিতে সবেগে নিখিলনাথ চোরকুঠুরি হইতে বাহির হইলেন। চোর-কুঠুরির কোণে একটা বোলতার চাক ছিল। কামড়ের চোটে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া নিখিলবাবু গাড়ু হইতে খানিকটা জল লইয়া চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঁ চোখটা ফুলিয়া ঢাকিয়া গেল এবং ডান দিকের গালটার স্ফীতি মিণ্টুর হাস্যোদ্রেক করিল। নিখিলনাথ উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক এমনি সময় দুইজন লোক ধরাধরি করিয়া বিধুবাবুকে লইয়া হাজির! কি করিয়া নিখিলনাথের কাছে টাকাটা আদায় করা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমন অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিলেন, যে কলার খোসায় পিছলাইয়া একেবারে সাংঘাতিক রকম পড়িয়া গিয়াছেন। মাথা কাটিয়াছে, হাতও ভাঙিয়াছে। দুইজন পথিকের সহায়তায় অতিকষ্টে তিনি নিখিলনাথের বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী অনেক দূর।

নিখিলনাথ উপরে গিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন। ডাকাডাকিতে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুটি দিয়া দেখিলেন বিধুচরণ আবার ফিরিয়াছে।

উভয়ে উভয়কে দেখিয়া যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাঁচান আমাকে।"

* * *

আরও তিনমাস কাটিয়াছে।

নিখিলনাথ এখনও টাকা দেন নাই।

বিধুচরণ এখনও ঘোরাফেরা করিতেছেন।

শেষ রক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক অম্বুজাক্ষ ভৌমিক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। বর্তমান বাজারে লেখক মাত্রেই একটু বিপন্ন। ভাল লেখার সমঝ্‌দার নাই, ভাল লেখার বাজারদর কম এবং ভাল লেখাকে ক্ষত-বিক্ষত করিবার জন্য একদল সমালোচক সর্বদাই সশস্ত্র হইয়া আছেন। ভৌমিক মহাশয়ের বর্তমান চিন্তার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি গত পরশ্ব হইতে একটি গল্প সুরু করিয়াছেন—খুব মনোরমভাবেই সুরু করিয়াছেন—(লিখিতে লিখিতে নিজেরই তাঁহার বার কয়েক রোমাঞ্চ হইয়াছে)—কিন্তু কি করিয়া এই বিস্ময়কর উপাখ্যানটি তিনি শেষ করিবেন তাহা তাঁহার মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। গল্পের শেষ রক্ষা করা সত্যই একটি দুরূহ সমস্যা—গল্পলেখক মাত্রেরই তাহ জানা আছে। শেষ বরাবর আসিয়া ভৌমিক মহাশয় লেখনী সম্বরণ করিয়া বসিয়া আছেন। সকাল হইতে চার পেয়ালা কড়া চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট শেষ হইয়া গিয়াছে—গল্প কিন্তু শেষ হইতে চাহে না।

ভৌমিক মহাশয় বসিয়া আছেন—নির্জন ত্রিতলের ঘরটিতে। ঘরের কপাটটি খোলা ছিল এবং সেই মুক্ত দ্বারপথ দিয়া কিঞ্চিৎ বাতাস, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, ছেলেমেয়েদের হুড়োমুড়ির শব্দ এবং দুইটি বায়সের চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না—কিন্তু উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যেন গল্পের প্লটটিকে গলাধাক্কা দিয়া মস্তিস্ক হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে—ভৌমিক মহাশয়ের এইরূপ মনে হইল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্বার-দেশ অর্গলবদ্ধ করিলেন এবং একটি ভীমকান্তি সিগার ধরাইয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। জানুযুগল পরিশ্রান্ত হইল—কিন্তু গল্পের কোন সুরাহা হইল না। ভৌমিক মহাশয় তখন ক্লান্ত হাঁটুকে আর না ঘাঁটাইয়া দক্ষিণ কর্ণটি লইয়া পড়িলেন। একটি দিয়াশলাই কাঠি সন্তর্পণে তিনি দক্ষিণ কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ও গণ্ডদেশ কুঞ্চিত করিলেন। গল্পের শেষটা আজ লিখিয়া দিতেই হইবে—কারণ গল্প দেওয়ার আজই শেষ দিন। আজ গল্পটি দিতে না পারিলে "চমৎকারিণী" নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থান এ মাসে অন্ততঃ হইবে না। এ মাসে না হইলে পঁচিশটি টাকা তো মার যাইবেই—উপরন্ত তিনি গৃহিণী এবং সম্পাদক উভয়েরই নিকট খেলো হইয়া যাইবেন।

সম্পাদককে কথা দিয়াছেন যে একটি বৃহৎ চমকপ্রদ গল্প তিনি পঁচিশ টাকা পাইলে লিখিয়া দিবেন এবং তৎপূর্বে তিনি গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আগামী মাসে তিনি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা দিয়া একখানি মুগার শাড়ী খরিদ করিয়া দিবেনই দিবেন। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বৈ কি।

গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই তিনি "চমৎকারিণী" পত্রিকায় আদৌ লিখিতে রাজি হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি ওরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কাগজে উত্তেজক

গল্প লিখিতে রাজি হইতেন কি ? অম্বুজাক্ষ ভৌমিক একজন নামজাদা রক্ষণশীল লেখক। চিরকাল তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি গল্পে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাইয়া আসিয়াছেন এবং এই ধরনের গল্প ভৌমিক মহাশয়ের হাতে খোলেও ভাল। তাঁহার লিখিত "হিন্দু বৈজয়ন্তী" গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপদেশ। গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশ করিতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার 'বঙ্গ বিষাণ' নামক গ্রন্থটি প্রত্যেক যুবক-যুবতী, শুধু যুবক-যুবতী কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। এ হেন ভৌমিক মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কেবল গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থেই এক ছাবলা কাগজের সম্পাদকের ফরমায়েস অনুযায়ী এই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। নীতিমূলক তাঁহার একটি সুন্দর গল্প ছিল। কেমন করিয়া বিলাসপুরের ধর্মাত্মা জমিদার একটি অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত সর্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন—কেমন করিয়া দুরাত্মা ধনী মাধবলাল বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেমন করিয়া আবার সেই সর্বস্বান্ত জমিদার কেবলমাত্র পুণ্যফলে এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় হস্তচ্যুত জমিদারী পুনর্বার প্রাপ্ত হইলেন—এই সমস্তই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি "সতীর আশীর্বাদ" নামক গল্পটিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু "চমৎকারিণী"র সম্পাদক মহাশয় মাইনাস্ থ্রী চশমা পরিধান করিয়া সম্ভবতঃ কন্টিনেণ্টাল ভাব রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ান—তিনি উক্ত গল্পটি পছন্দ করেন নাই এবং কি ধরনের গল্প হইলে তাঁহার পছন্দ হইতে পারে তাহার আভাস দিয়াছেন। তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে "যা থাকে কপালে" বলিয়া পরশু দিন হইতে ভৌমিক মহাশয় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বদ্ধপরিকর হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শেষ পর্যন্ত কানে দিয়াশলাই কাঠিও ঢুকাইতে হইয়াছে।

॥ দুই ॥

"উঃ" বলিয়া কাঠিটা ভৌমিক মহাশয় কান হইতে বাহির করিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন খোলার বাড়ীর চালে বসিয়া একটি বীর হনুমান দাঁত খিঁচাইতেছে এবং একটি বৃদ্ধা তদ্দর্শনে নিজের বড়িগুলি সামলাইতেছেন। ভৌমিক মহাশয় যে গল্প ফাঁদিয়াছেন এই সব অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য তাহাতে কাজে লাগিবে না ভাবিয়া তিনি চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইলেন। অন্যদিকে মানে ঘরের দেওয়ালের দিকে। কিন্তু ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়াটে গৃহের দেওয়ালেও এমন কোন কিছু ছিল না যাহা তাঁহার "প্রেমের জন্য" নামক গল্পের শেষরক্ষা করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া ভৌমিক চক্ষু মুদিয়া চুরুটে একটি টান দিলেন। টান দিয়াই বুঝিলেন চক্ষু খুলিতে হইবে। চুরুট নিবিয়াছে, ধরান দরকার। নিপুণভাবে চুরুটটি তিনি ধরাইলেন। ধরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত। নায়ক নায়িকার বাড়ির পাঁচিল ডিঙাইয়াছেন। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর

রাত্রি। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নায়ক গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া একটি পেয়ারা গাছের তলায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সম্মুখে একটি গরু থাকাতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস তাঁহার হইতেছে না।

ভৌমিক মহাশয় এই পর্যন্ত অবলীলাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর আর কি লিখিলে আর্ট বজায় থাকিবে, নায়ক আর কোন্ কোন্ দুরূহ প্রক্রিয়া করিলে তাহা সম্পাদকের মনোহরণ করিতে পারিবে তাহা ভৌমিক মহাশয়ের মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। তিনি চিরকাল পুণ্যের জয় ও পাপের পতন চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন—এই অশ্লীলমনা নায়ককে লইয়া এখন কি করা কর্তব্য তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে 'বেল্লিককে চাবকাইয়া উহার পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলি!' কিন্তু আর্ট ক্ষুন্ন হইবে এবং আর্ট ক্ষুন্ন হইলেই পাঁচিশটি টাকা!

উঃ ভগবান, এ কি সমস্যা! তখন তিনি প্রাণপণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর এ উভয়-সঙ্কট হইতে আমাকে বাঁচাও! পাপের চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না—অথচ গৃহিণীকেও চটাইতে পারিব না। দয়াময়, দয়া কর!"

ভগবান যেন স্বকর্ণে শুনিলেন।

দুই মিনিটে সব ঠিক হইয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া যাইবার পর সূক্ষ্মকলেবর ভৌমিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে তাঁহার গৃহিণীর আর মুগার শাড়ীর দরকার হইবে না।

কারণ তিনি বিধবা হইয়াছেন!

যুগল স্বপ্ন

॥ এক ॥

সুধীর আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা ফুল-সুদ্ধ রজনীগন্ধার ডাঁটা। চোখে মুখে হাসি ভরা! তাহার সমস্ত মন যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে।

সুধীর আসিয়াই বলিল—"হাসি আজ একটা ভারি সুখবর আছে। কি দেবে বল—তা না হলে বলব না।"

হাসি বলিল—"বলুন না কি!"

"কি দেবে বল আমাকে—"

"কি আর দিতে পারি আমি?—আচ্ছা, আপনার রুমালে একটা বেশ সুন্দর এমব্রয়ডারী করে দেব। চমৎকার প্যাটার্ণ পেয়েছি একটা।"

"না, ওতে আমি রাজি নই।"

"তবে কি চাই আপনার ? চকোলেট আছে দিতে পারি।"

"আমি কি কচি খোকা নাকি ? চকোলেটে তুষ্ট হব !"

হাসি হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"তাহলে শুনতে চাই না যান। এম্ব্রয়ডারী করে দেব বললাম, চকোলেট দিতে চাইলাম—তাতে যখন আপনার—"

সুধীর বলিল—"চললাম তাহলে।"

হাসি আবার ডাকিল—"বলবেন না কিছুতে ?"

"একটি জিনিস পেলে বলতে পারি। সেই যে সেদিন যা চেয়েছিলাম—" বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসির পানে চাহিয়া হাসিল।

হাসি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সামলাইয়া লইল।

বলিল—"আপনাকে ত বলেছি—তা হয় না।"

কিন্তু সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল। সে শুনিল সুধীর বলিতেছে—"মনে করেছিলাম খবরটা খুব লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু পারলাম না। মাপ কোরো আমায়। শুনে এলাম তোমার বিয়ে সাঁতরাগাছিতে সেই পাত্রটির সঙ্গে ঠিক হোয়ে গেছে।"

বলিয়া সুধীর চলিয়া গেল।

হাসি ডাকিল—"সুধীর দা—শুনে যান।"

সুধীর ফিরিয়া আসে।

॥ দুই ॥

অলকা আসিয়াছে।

সেই অলকা যাহাকে একবার দেখিবার জন্য অজয় সমস্ত দিন অপেক্ষা করিত—কখন সন্ধ্যাবেলায় সে আসিবে।

অলকা আসিয়া বলিতেছে—"আচ্ছা, অজয়দা—ইংরিজিতে পেট বলে কোন কথা আছে নাকি ?"

অজয় বলিল—"হ্যাঁ আছে, 'পেট' মানে মাথা।"

"সত্যি ?"

"অভিধান খুলে দেখ। পেট মানে মাথা!"

"আমাদের বরুণাদি' তাহ'লে ঠিক বলেছেন ত ?"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, মুণ্ডুর ইংরিজি কি বল ত ?"

অলকা মিটি মিটি তাকাইয়া বলিল—"হেড !"

"হেড মানে ত মাথা"—

"মুণ্ডুর মানেও ত মাথা—"

অজয় হাসিয়া বলিল—"এই বুঝি তোমার বাংলা ভাষার জ্ঞান ! মাথা আর মুণ্ডু বুঝি একই বস্তু !"

অলকা হাসিয়া বলিল—"তফাৎ কি ?"

অজয় গম্ভীর ভাবে বলিল—"তোমার সঙ্গে আর ওই পাঁচি ধোপানিটার কোন তফাৎ নেই—তাহলে বল ! দুজনেই ত মেয়ে মানুষ !"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল—"পাঁচি ধোপানীটি কে ?"

"ওই যে তোমাদের গলিটার মোড়ে একজন ধোপার মেয়ে আছে। কম বয়স—তোমার বয়সী হবে !"

অলকা বক্র হাসি হাসিয়া কহিল—"আজকাল অজয়দা দেখছি সমস্ত জিনিসই বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখতে আরম্ভ করেছেন ! ধোপানী পর্যন্ত বাদ পড়ে না।"

অজয় বলিল—"নিশ্চয়। নিজের জিনিসটি যে ভাল সেটা যাচাই করে দেখে নিতে হবে না ?"

"কে আপনার নিজের জিনিস।"

"আছে একজন—"

অলকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পাশের টেবিলটা গুছাইতে লাগিল।

অজয় জানালা দিয়া অকারণে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * * *

দুইটি স্বপ্ন দুইজনে দেখিতেছে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দুইজন পাশাপাশি শুইয়া আছে।

হাসির হাতখানা অজয়ের বুকের উপর।

হাসি ও অজয়—স্বামী স্ত্রী।

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোরবাবু উকীল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরীব প্রজার

সর্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন বিধবার সম্পত্তিঘটিত একটা মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু যেন উদ্বিগ্ন আছেন, অন্যমনস্ক ত বটেই।

এমন সময় আর একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি কোন বিষয়ে পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, "আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি তা জানেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কত দিতে হবে আপনাকে?"

"বত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা, বেশ—।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান ত?"

"হ্যাঁ, ছেলের কোন রোগ নেই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান" বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জান্‌তে আসা যে যদি বংশ লোপই পায়, তাহ'লে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?"

নস্যের টিপ্‌টা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন, "ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা ত নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাক্‌লেও সবসময় কি সব জিনিস করা সম্ভব?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেন্টিমেন্ট অনুসারে চল্‌লে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই! ওই সব বাজে সেন্টিমেন্ট নিয়েই ত আমরা ডুব্‌তে বসেছি।"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেন্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, “ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তাহ'লে সম্পত্তি কারা পাবে?”

আইন-অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না—“ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার ত শ্মশান। আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বল্‌লাম—আপনার সেন্টিমেন্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।”

আগন্তুক বলিলেন, “না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই ত আপনার কাছে আসা।”

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ী আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়ীতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা —“সরোজিনী দেবী।”

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া তরুণীটির ব্যবহারেও সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু কোথায়?”

“কাছারীতে।”

“কখন আসবেন?”

“জানি না।”

তাহার পর তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

* * * *

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, “এ কি, সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে।”

“ও বাড়ীতে থাকা আর পোষাবে না।”

“কেন? ব্যাপার কি?”

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

“পোষাবে না, মানে?”

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমিও ত মত দিয়েছ!"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে?—"

"ওরা একজন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। অন্ততঃ তাই ত শুনলাম। তুমি নাকি বলেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল—"

রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

হতবাক্ রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়-ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি বলেছ, বাবা?"

সুলেখার ক্রন্দন

সুলেখা কাঁদিতেছে।

গভীর রাত্রি—বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা!—ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুর অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন?

প্রেম? হইতে পারে বই কি! এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়ন-পল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ প্রেম হইতে পারে। সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল ত! তখনও তাহারও বিবাহ হয় নাই। অরুণ-দা নামক যুবকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে মনে। এই শ্রদ্ধাই হয়ত স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমে পরিণত হইতে পারিত—কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাতে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বরমাল্য অর্পণ করিল!

হয়ত এই গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আবেশে সেই অরুণ-দা'কেই, তাহার বার-বার মনে পড়িতেছে। নির্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়ত এই অশ্রু-তর্পণ। তবে ইহাও ঠিক যে তাহার গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্তাটি সে অরুণ-দা'কে কখনও জানায় নাই এবং মনে মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয় কিন্তু বিপিন,—বিপিন!—একেবারে খাঁটি বিপিন! এবং আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালও

বাসিয়াছিল। ভালবাসিয়া সুখীও হইয়াছিল। সহসা আজ নিশীথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দা'কে মনে পড়িয়া আঁখি পল্লব সজল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীত-প্রবণ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। সে সম্বন্ধে চট করিয়া কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুতঃ স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে কোন-কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয় বয়স বোধহয় উনিশ-কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়!

সুতরাং নাবী-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে বেকুবের মত ফস্ করিয়া কিছু একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্ততঃ করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যত দূর জানি তাহাতে তাহাদের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আপনারা আশ্বস্ত হউন।

অরুণ-দা'র কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। কিছুই আশ্চর্য নয়! শিশুটির মৃত্যুব পব সুলেখার দুই দিন 'ফিট্' হয়—ইহা ত আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমল-হৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে!

কিন্তু হাঁা,—আর একটা কারণও ত হইতে পারে। পুত্রশোক-প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন—কিন্তু সুলেখার ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না! বিগত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা হাউসে দেখান হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নর-নারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ

সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভাল লাগে প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য লোক এই বিপিন! কিছুক্ষণ আগেই সিনেমার "লাস্ট শো" হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। হয়ত তাহাতেই সুলেখার সিনেমাশোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়! সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য "সীট্ বুক" করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে! তরুণী পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক্ না বিপিন লোমশ—সে মানুষ ত! তাহা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকরা—অনেক কথাই বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমা-ঘটিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে! এমন কি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড়-পছন্দ করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণতঃ যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চীৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণতঃ যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন সুলেখা সম্ভবতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছে--অর্থাৎ কাঁদিতেছে।

কারণ যাহাই হউক ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ! রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ—অর্থাৎ করুণতর! কোন সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলে আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং জ্যোৎস্না যতই আকাশ-প্লাবিনী হউক না কেন এ-বিষয়ে খুব সম্ভবতঃ আমরা একমত যে এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ী কাঁদিলে আমরা এতটা আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়ত বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে এবং একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না-নির্ণয় করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। এমন কি অরুণ-দা'কে জড়াইয়া একটা সস্তা-গোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, "কেন নয়? এমন চাঁদনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে না কি? ওই ত দূরে 'চোখ গেল'-পাখী অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে! সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্ন-বিহ্বল—চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার পাথার! এমন দুর্লভ ক্ষণে অরুণ-দা'র কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব, না অপরাধ?" মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ব্যস্ত-

সমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবতঃ। কিন্তু এ কি!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?"

"না! বড্ড কন্‌কন্‌ করছে।"

"এই পুরিয়াটা খাও তাহ'লে। ডাক্তারবাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কি হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষ্মীটি!—"

জ্যোৎস্নার টুক্‌রাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে!

দেখিলেন ত? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব!

বুধ্‌নী

॥ এক ॥

জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—এ-কথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পুরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু সে শিখা নিবিবে। একটি সরল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে। কাল তাহার ফাঁসি!

সে দোষী কি নির্দোষ সে আলোচনা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হয়ত তাহাকে লইয়া মাথাই ঘামাইতাম না, যদি সেদিন জেলখানায় বেড়াইতে গিয়া তাহার আর্ত-করুণ চীৎকার না শুনিতাম!

"বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী বুধ্‌নী।" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।

॥ দুই ॥

হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। এই পার্বত্য পল্লীতেই একদা ধনুকধারী বিল্‌টু শিকার-সন্ধান করিতে করিতে বুধ্‌নীর দেখা পায় এক মহুয়া গাছের তলায়। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নী। সভ্য কোন যুবক আলো-ছায়া খচিত মহুয়া তরুতলে কোন কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্য-ভরে চলিয়া যাইত, বিল্‌টু তাহা করে নাই। বন্য পশুর মত সে তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্‌নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে কিন্তু বিল্‌টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।

॥ তিন ॥

তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে প্রভাতে বিস্তীর্ণ মাঠে ইহাদের সভা বসিত। সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত। একটা পাত্রে খানিকটা সিঁদূর গোলা থাকিত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদূর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদূর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়! সেই কুমারীর আত্মীয়-স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ, সড়্কি, বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে এবং যুবা যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে—মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্তদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল বাঁশী বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিল্টু বুধ্নীকে জয় করিয়াছিল। এই ত সেদিনের কথা! এখনও দুই বৎসর পুরা হয় নাই।

॥ চার ॥

অসভ্য বিল্টু জংলী বুধ্নীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্য লোক, বর্বর বন্য-দম্পতীর আদবকায়দা আমার জানা নাই। যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দূলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ্ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।

শুধু এইটুকু জানি বিবাহের পর বিল্টু বুধনীকে এক দণ্ড ছাড়ে নাই! এক দণ্ডও নয়। বনে জঙ্গলে পর্বতে গুহায় এই বর্বর-দম্পতী অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল—বিল্টুর হাতে বাঁশের বাঁশী। এই সম্বল!

॥ পাঁচ ॥

সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

বুধ্নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু! বুধ্নীর সে কি আনন্দ! বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর

কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিল্‌টু দেখিল—একি! বুধ্‌নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা! বুধ্‌নী ত তাহার আর একার নাই! অসহ্য!

॥ ছয় ॥

বিল্‌টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চীৎকার করিয়া গেল—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী। ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।

নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক-বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনা এইরূপ—শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ, দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুণী সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, এবং তাহার মাথায় কোঁকড়ান কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা গোছের—এবং নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠী। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া ধার্মিক! অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কম্বাইন্‌ড হ্যাণ্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাট্‌লেট' বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ্‌ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়ীতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন। মোটেই তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধহয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। উভয়েই এম-এ পাশ—নরেশ কেমিষ্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রোফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়ীতে ইহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়ীটি বেশ বড়। অর্থাৎ এত বড়

যে ইহাতে দুই তিনটি পরিবার পুত্র পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই পরিবারহীন। নরেশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই পত্নী ইহলোক ত্যাগ করাতে তাঁহার এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন—'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন—নির্মলা সত্যই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এই মাত্র!

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়ীতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়েই ভালবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রাম-আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই—"আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।" পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন—"বাকী অর্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক্।" তাহাই হইল! পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কি?

পল্টু, নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণি-রূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিংবা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন-ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোল বয়স। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ্—আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালবাসিতেন এবং এ-বিষয়ে উভয়ের মিলও ছিল অসাধারণ।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ, তিনি স্বভাবতঃই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন

নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; নরেশকে বলিলেন—“আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হত ?”

“বেশ, দেখাও ।”

কবিরাজ আসিলেন—সাত দিন চিকিৎসা করিলেন । জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল । পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল । অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, “আচ্ছা, একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্ঠিটা দেখালে কেমন হয় ? কি বল ?”

“বেশ ত ! তবে যাই কর, এ-জ্বর একুশ দিনের আগে কম্‌বে না । ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড !”

“তাই না কি ?”

পল্টুর কুষ্ঠি লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটিলেন । জ্যোতিষী কহিলেন —“মঙ্গল মারকেশ । তিনি রুষ্ট হইয়াছেন ।” কি করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহারও একটা ফর্দ দিলেন । পরেশ একটা প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন ।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে । নরেশ একদিন বলিলেন—“কবিরাজি ওষুধে ত বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব না কি ?”

“তাই ডাক না হয়—”

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন । পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন । পল্টু প্রলাপ বকিতেছে—“মা আমাকে নিয়ে যাও । বাবা কোথায় !”

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল । হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ওষুধ পাওয়া যায় । ঠিক !

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—“আমি একবার তারকেশ্বর চল্‌লাম, ফিরতে দু-এক দিন দেরী হবে ।”

“হঠাৎ তারকেশ্বর কেন ?”

“বাবার কাছে ধর্না দেব—”

নরেশ আর কিছু বলিলেন না । ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন । ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—“বড় খারাপ টার্ণ নিয়েছে ।”

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল ।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন । হস্তে একটি মাটির ভাঁড় । উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—“বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম । তিনি বললেন যে রোগীকে যেন ইনজেকশন দেওয়া না হয় । আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলে সেরে যাবে ।”

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুল বেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ান চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইনজেকশন দিতে লাগিলেন এবং ইঁহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

এইরূপ কয়েকদিন চলিল। রোগের উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন! "ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে।"

"অ্যাঁ, বল কি?"

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার আর ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পল্টু খাও—খাও ত বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। চরণামৃত কস বাহিয়া পড়িয়া গেল।

রূপকথা

॥ এক ॥

শিল্পীর স্বপ্ন ভাঙিয়াছে।

জীবনের প্রতি মুহূর্তের সাধনা—এই মর্মর মূর্তি।—কত দিবসের, কত নিশীথের আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত স্বপ্ন - সহসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। হতবাক্ শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে—যে মর্মর-প্রতিমাটি এত যত্নে সে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সহসা পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছে! প্রতিমা অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহা পড়িয়া আছে—তাহা পাষাণ! হঠাৎ ভাঙিয়া গেল!

কেন এমন হইল? কে বলিবে? শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর স্বপ্ন কখন কোন মন্ত্রবলে নিঃশেষ হইয়া যায় কে তাহার সন্ধান দিবে?

দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যেই তামার স্বপ্ন মূর্তি-পরিগ্রহ করিল, কঠিন পাষাণ যে মুহূর্তে তাহার মানসীতে রূপান্তরিত হইল—যে মুহূর্তে সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"যাক্, এতদিনে পরিশ্রম সার্থক হইল"—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ! মানসীর মৃত্যু। ইহাকে কি সে আর ফিরিয়া পাইবে?

প্রতিমা ফাটিয়া গেল—যাহা রহিল তাহা বিদীর্ণ শিলাখণ্ড। মুহ্যমান শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

* * * *

অনুজা ও অভিজিৎ আসিয়া দেখে, শিল্পী তেমনিভাবেই বসিয়া আছে। অনুজা শিল্পীর বিধবা দিদি। এই পাগলা ভাইটিকে সে জননী-স্নেহে লালন করিয়াছে। সে খাইতে দিলে শিল্পীর খাওয়া হয়—তাহারই অনুরোধে যেন সে বাঁচিয়া আছে।

অভিজিৎ শিল্পীর প্রতিবেশী ও অনুজার প্রণয়ী। তাহাদের দেখিয়া অসহায়ের মত শিল্পী বলিয়া উঠিল—

"দেখ দিদি—দেখ অভিজিৎ—এ কি হয়েছে।"

অনুজা কিছু বলিল না।

অভিজিৎ বলিল—"তোমার মুক্তি হয়েছে। রাজ-শিল্পী তুমি, রাজসভায় যাও।"

…শিল্পী ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

তাহার মানসীর স্মৃতি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল—রাজসভায় নয়, শ্মশানে!

॥ দুই ॥

মহাশ্মশান…

কাছে, দূরে চিতা জ্বলিতেছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়—চিতা—কেবল চিতা! নর-নারীর, দেশের, জাতির, হৃদয়ের। কাহারও অনলশিখা গগনস্পর্শী—কেহ নির্বাপিতপ্রায়—কেহ নিবিয়া গিয়াছে। চিতাভস্ম লইয়া বাতাস উন্মাদ!

…অন্ধকারে মৃদু কলকলধ্বনি!…বৈতরণীর। সেই প্রায়ান্ধকার শ্মশানে শিল্পী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মহাশ্মশানে তাহার মানসীর সন্ধান মিলিবে কি? মানসী কি মরিয়াছে? ‥ তাহাই বা কে বলিয়া দিবে! মানসী কি মরে? মরিলেও কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? অন্ধকার উত্তর দেয় না। শ্মশানের চিতা জ্বলে ও নেবে। সহসা শ্মশানভূমি অট্টহাস্যে শিহরিয়া উঠিল। সচকিত শিল্পী চিতার আলোকে দেখিল, হাসিতে হাসিতে একটি মূর্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মুখাবয়ব জটা-শ্মশ্রু-মণ্ডিত—চক্ষু-দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের ন্যায়—মুখে বিকট হাস্য। কণ্ঠে পুষ্পমাল্য—পুষ্পমাল্যকে বেষ্টন করিয়া এক বিষধর সর্প পিচ্ছিল সঞ্চরণে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিতেছে। তাহার এক হস্তে খর্পর—অন্য হস্তে বাঁশরী। সম্পূর্ণ উলঙ্গ।

শিল্পীর নিকটে আসিবামাত্র সে অট্টহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া উন্মাদ-নৃত্য জুড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গান—

দুটো গরুর চারটে পা রে
তিনটে পা তার খোঁড়া,
টিয়া পাখীর ডিমের মাঝে
ছিল টাট্টু ঘোড়া !
আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে
হাতে দিলাম সেদিন,
নামিয়ে দেখি শুয়োরমুখো
গিরগিটি দু জোড়া !
শুঁয়ো পোকার সঙ্গে যেদিন
বিয়ে হল রাণীর,
তাই না দেখে মাকড়শাটার
পৃষ্ঠে হল ফোড়া—
হা-হা-হা-হা—

শিল্পী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে ?"

"আমি ? দেখ দিকি ভাল করে ?—চিনতে পারছ না ?"

"না।"

"হা—হা—হা—হা"—উন্মাদের হাসি।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শিল্পী শুনিল—সে বলিতেছে—

"আমি যে তুমি। তোমারই আর একটা রূপ আমি !"

"বুঝতে পারলাম না।"

"হা—হা—হা—হা"—আবার সেই অট্টহাস্য !

হাসি থামাইয়া হঠাৎ সে আবার বলিল—"তিনের পিঠে একটা কিছু দিলে একটা সংখ্যা হয় আর ঘোড়ার পিঠে একটা কিছু দিলে জিন্ হয় ! কেমন মজা ! তোমার নাম কি বন্ধু ?—যদিও আমি জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে ইচ্ছে করছে—"

"আমার নাম চিত্রকারু ! আমি শিল্পী—"

"আর বলতে হবে না। তুমি শিল্পী ? আমি যদি বলি, তুমি স্বল্প !—মিছে কথা হয় তাহলে ?—হা হা হা হা"—শিল্পী অভিভুত হইয়া দেখিতে লাগিল, আবার সে নৃত্য জুড়িয়াছে। বাঁশরীর আঘাতে হাতের খর্পরটা যেন হাসিতেছে। তাহার কণ্ঠের বিষধর সর্পের চক্ষে কুসুমের কোমলতা ফুটিয়া উঠিল—পুষ্পমাল্যের এক একটি ফুল যেন স্ফুলিঙ্গ !

হঠাৎ সে আবার নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিল।

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ফুট্‌বল খেলেছিস্‌ কখনো? আকাশে গিয়ে? সূর্য চন্দ্রকে ফুটবল করে? আচ্ছা আর একটু বড় হ—তারপর খেল্‌বি।"

অপরিসীম করুণায় সে শিল্পীর গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। জ্বলন্ত অংগারের মত চক্ষু দুইটি হইতে স্নেহ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে? আপনার নাম কি?"

"আমার নাম 'যা-ইচ্ছে'—"

"যা-ইচ্ছে?"

"হ্যাঁ—সকলের সংগেই ত আমার আলাপ! তোর কাছেও ত জন্মাবধি আছি। তোর মানসীর চোখের মাঝখানে এতদিন বসেছিলাম, তুই ত বাটালির ঘায়ে আমাকে অস্থির করে দিয়েছিস রোজ—এই দেখ—হা-হা-হা।" শিল্পীর ভাষা হারাইয়া গিয়াছে! শিল্পী দেখিল, সত্যই ত ইহার সর্বাংগে ক্ষতচিহ্ন! কে এ?

"আমার মানসীর চোখের ভিতর আপনি ছিলেন?"

আবার পাগল নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংগে সংগে গান—

ভাবের যখন হয় রে অভাব
　　ভাষা তখন আসর জমায়
নফর যখন হয় রে নবাব
　　উজীরের সে মাইনে কমায়।
কান এবং নাকে মিলে
কান্নাকে যে জন্ম দিলে
চম্‌কে গেল হায়রে পিলে
　　চোখের জ্যোতি বাড়ল অমায়!
　　উজীরের সে মাইনে কমায়—

সে থামিলে শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কথা শুনুন। আপনি কি আমার মানসীকে চেনেন?"

পাগল হাসিয়া বলিল—"আমি তোমাকে চিনি। তুমি এখানে এসেছ কেন বল ত! যদিও আমি জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে বেশ লাগে—হা-হা-হা—"

"আমার মানসীর স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে এনেছে।"

"হা-হা-হা—মানসীর স্মৃতি। শ্যামা-নাপতিনির নাতনি মারা গেছে—রামময়ের ভাই মরে গেল—চিতা নেবেনি এখনও। তাদের স্মৃতি বুঝি তোমায় আকুল করছে না? কেবল মানসীর স্মৃতি নিয়ে তুমি ব্যস্ত! কেন বাছাধন?"

"তাকে যে আমি ভালবাসতাম—"

"আর এদের বাসতে না কেন? আম, আঙুর, আচার এবং মাংস এবং আরো অনেক

কিছু ত তুমি ভালবাস একসঙ্গে। মানসীকে ভালবাসবে আর রামময়ের ভাইকে বাসবে না কেন ?"

বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার গান ধরিয়া দিল—

জলের মাঝে পড়লে চিনি
গলেই জেনো যাবে দাদা,
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হবে কাদা !
ডাগর চোখে সাগর আছে,
চাউনিতে তার ডাইনি নাচে,
ভূত থাকে রে সেওড়া গাছে
পরনে তার কাপড় সাদা—
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হয় যে কাদা !

হঠাৎ সে থামিয়া গেল। বলিল—"এইবার আমাকে সরে পড়তে হবে। আমার গানের মানে ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে !"

শিল্পী কহিল—"না, না, আপনি বলে যান—আমার মানসী কোথায় ? আপনি ত চেনেন তাকে ? সে কোথায় ?"

পাগল বলিল—"তাকে তুমিই ত মেরে ফেল্লে। দিনরাত উঠে পড়ে লেগে শেষ করে দিলে। অমনি সে মরে গেল।"

"আর পাব না তাকে ?"

"আবার পাবে বৈ কি ! আনন্দের দেশে যাও।"

"কোথায় সে দেশ ?"

"খুঁজে বার কর।" তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা এই মালাটা গলায় পর। আনন্দের দেশের আভাস একটা পাবে। এ মালা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না—একটু পরে পাখী হয়ে যাবে। তার পরে হাওয়া—"

মালাটি শিল্পীর গলায় পরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে সেই অদ্ভুত মূর্তি শ্মশানের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

* * * *

শ্মশান-দেবতার বরমাল্য গলায় পরিয়া শিল্পী আনন্দের দেশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া গেল। কি অদ্ভুত দেশ।

"ওই দেশে যেতে হলে জ্ঞানরাজ্যে যাও আগে—"

চমকিয়া শিল্পী দেখিল গলার মালা পাখী হইয়া গিয়াছে। উড়িয়া উড়িয়া বলিতেছে—"এস আমার সঙ্গে—"

॥ তিন ॥

অনুজা চলিয়াছে।

চলিয়াছে তাহার ভায়ের সন্ধানে। পাগলের মত কোথায় চলিয়া গেল সে? তাহার সেই অসহায় ভাই! না খাইতে দিলে সময় মত খায় না, বিছানা করিয়া না দিলে যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে! পরিষ্কার পরিচ্ছদ জোর করিয়া হাতে তুলিয়া না দিলে সে বেশ-বাস বদলায় না! এখনও শিশু। সন্তানহারা জননীর আকুলতায় অনুজা পথের শ্রান্তি ভুলিয়াছে।

……সহযাত্রী অভিজিৎ। অভিজিৎ খুঁজিতেছে শিল্পীকে নয়, অনুজাকে। অনুজা তাহার পথ-চলার সঙ্গিনী। পাশাপাশি চলিয়াছে—অথচ আজও সে অনুজার সন্ধান পায় নাই।

* * * *

দিন যায়—রাত্রি আসে। কত ফুল ফুটিল, ঝরিল। কত চন্দ্র-সূর্য উঠিল, ডুবিল। পথের শেষ নাই—দুই জনে পাশাপাশি চলিয়াছে।

জ্ঞান-রাজ্য বহুদূর।

॥ চার ॥

শিল্পী জ্ঞান-রাজ্যে আসিয়াছে।

অসীম এই দেশ। যতদূর দেখা যায় সীমা-রেখা চোখে পড়ে না। এই দেশে কোথাও অভ্রভেদী পর্বতমালা—আকাশের সংগে মিতালি করিতেছে। কোথাও মরীচিকাময় মরুভূমি—কোথাও ঊর্মিসমাকীর্ণ মহাসমুদ্র—কোথাও আবার মনোহর পুষ্করিণী, পদ্মফুলে ভরা। এই দেশের কোথাও কণ্টকময়, কোথাও পুষ্পাকীর্ণ, কোথাও ঊষর, কোথাও শ্যামল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, ভিড় নাই। একটি বৃক্ষতলে শিল্পী একরাশি জটিল সূতার বাণ্ডিল লইয়া তাহার জট্ ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না—তাহার হস্তপদ সেই সূতার জালে যেন জড়ীভূত হইয়া যাইতেছে—বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিল্পীর চেষ্টার বিরাম নাই। চতুর্দিক প্রখর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু এই সূর্যালোক শিল্পীকে মুগ্ধ করিতেছে না। শিল্পী সূত্র-সমস্যায় মগ্ন। ··দূরে সিদ্ধান্তশেখর প্রবেশ করলেন। ইনি একজন মহাজ্ঞানী। আপনার মনে সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে আসিতেছেন—তাঁহার গাত্রে, হস্তে, মস্তকে নানা বর্ণের সূতার জাল। তিনি সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে শিল্পীর

সমীপবর্তী হইলেন। শিল্পী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিদ্ধান্তশেখর স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কে? কতদিন এ দেশে এসেছেন? ইতিপূর্বে আপনাকে দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না!—"

শিল্পী বলিলেন—"আমি আনন্দের দেশের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। শুনেছি আনন্দের দেশের সন্ধান জ্ঞান-রাজ্যে পাওয়া যায়। এখানে এসে আমি আচার্য উদ্দীপনের উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমায় বললেন, এই যে রাশি রাশি জটিল সূত্র—এদের সমস্যা—এদের জটিলতা যে সমাধান করতে পারবে সে-ই আনন্দের দেশে যেতে পারবে। আমি তাই তাঁর উপদেশ অনুসারে এই জট্ ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কত দিন লাগবে বলতে পারেন?"

সিদ্ধান্তশেখরের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"তার কি ঠিক আছে? সে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আমার ত বহু বৎসর অতীত হয়ে গেছে—এখনও ত সব বাকী, অধীর হয়ো না। ওই সাদা সূতার জট্ খুলতেই তুমি অধীর হয়ে পড়েছ—এরপর লাল, কালো, নীল, সবুজ, হলুদ—বহুবর্ণের জটিল সমস্যা আছে। একে একে সব রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে, তবে না আনন্দের দেশের সন্ধান পাবে!"

এই বলিয়া সিদ্ধান্তশেখর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নিকটে দূরে সিদ্ধান্তশেখরের মত আরও দুই একজনকে দেখা গেল। সকলেই সূত্র-সমস্যায় আকুল!

* * * *

আর ভাল লাগে না।

শিল্পীর ধৈর্য সীমা ছাড়াইয়াছে—হস্ত-পদ ক্লান্ত, অবসন্ন। চোখে ঘুম ঘিরিয়া আসিতেছে। সাদা সূতার জট্ এখনও জটিল হইয়াই আছে। আপন মনেই শিল্পী বলিয়া উঠিল, 'আর ত পারি না। এর-যে কোন আদি-অন্তই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক কষ্টে যদি খেই খুঁজে পেলাম, একটু পরেই আবার তা হারিয়ে যাচ্ছে। যার জট্ ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, খানিকক্ষণ পরে দেখি আবার তাতে নূতন করে জট্ পড়েছে। কি করা যায়? আনন্দের দেশের কোন খবরই ত পাচ্ছি না। সন্দেহের পর সন্দেহ মনে জাগছে! এই জটিলতার মধ্যে কি—" সহসা শিল্পীর চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। হঠাৎ একটি গান কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল, অপূর্ব কণ্ঠস্বর!

উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়।...

একটি সুশ্রী কিশোরী, পিছনে লীলায়িত সবুজ ওড়না, মাথায় বেণী দুলিতেছে, সর্বাঙ্গে চাঞ্চল্য। হাততালি দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেই দিকে আসিল।

শিল্পী তাড়াতাড়ি সুতার বাণ্ডিল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল —“আপনি কে ?”

কিশোরী তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। কথার উত্তর দিল না, হাততালি দিতে দিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গাহিয়া চলিল—

হঠাৎ এই সোনার আলো
নয়নে লাগ্‌লো ভালো
ভরেছে পরাণ আমার
ভরেছে রে কানায় কানায়।
উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়—!

গান শেষ করিয়া কিশোরী শিল্পীর দিকে ফিরিয়া কহিল—“যখন কেউ গান করে তখন তাকে কথা কওয়াতে নেই! এ বুঝি আপনি জানেন না! আচার্য উদ্দীপন তা বুঝি আপনাকে শেখাননি!”

শিল্পী বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একটা ঘুরপাক খাইয়া কিশোরী বলিল—“আমার নাম খেয়াল।”

শিল্পী আবার প্রশ্ন করিল—“ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনি যে এই গান গাইলেন, এর অর্থ কি ?”

“এর অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। তা-ছাড়া কোন জিনিসের অর্থ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনো! গানের অর্থ যাই হোক্—আপনার এখানে বসে থাকার অর্থ কি ?”

“আমি আনন্দের দেশের পথ খুঁজছি—এই জটিলতার সমাধান করতে পারলেই—”

কিশোরী হঠাৎ হাসিয়া কবিতায় উত্তর দিয়া উঠিলেন—

জটিলকে আরো জটিল করিছ
সরল তাহারে করিতে গিয়া,
প্রেম-সমস্যা সমাধান লাগি
নিত্য যেমন করিছ বিয়া।

শিল্পীর মুখে কথা যোগাইল না।

কিশোরী আবার বলিল—“এই সব বাজে সুতার বাণ্ডিলে আপনি আনন্দের দেশের সন্ধান পাবেন—কে বলল আপনাকে ?”

“আচার্য উদ্দীপন।”

“আচার্য উদ্দীপন যে একটি বাতুল, তা আপনি শোনেন নি বুঝি ? এই দেশটাই ত পাগলাদের দেশ। পাগল দেখতে বেশ লাগে, তাই মাঝে মাঝে এখানে আসি। আপনি দেখছি এখনও একটু প্রকৃতিস্থ আছেন - এই বেলা পালান।”

"কোথা যাব ?"

"যেদিকে দু'চক্ষু যায়—"

বলিয়া কিশোরী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শিল্পী বলিল, "একটু দাঁড়ান। আপনি থাকেন কোথায় ?"

হাস্যকলরবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া কিশোরী কহিল—"চিনতে পাচ্ছেন না আমাকে ? আপনার মনের ভেতরেই ত আমার বাসা।"

"কৈ এর আগে কখনও ত দেখিনি আপনাকে—"

"বাঃ—সে দিন যে শ্মশানে দেখা হল রাত্রে ! বা-রে বেশ !"

কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

শিল্পী নির্বাক।

শিল্পী অবশেষে বলিলেন—"আপনি আজ বলছেন এখান থেকে পালাতে। সেদিন ত আপনারই দেওয়া গলার মালা পাখী হয়ে আমাকে এ দেশে নিয়ে এল—"

"আমি আর আমার মালা—কি এক জিনিস ?"

এই বলিয়া কিশোরী সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

* * * *

শিল্পীও চলিয়াছে। সূত্রের বোঝা পিছনে ফেলিয়া তাহার মন উধাও হইয়াছে—কোথায় কে জানে !

কিন্তু এ রাজ্যে আর সে থাকিবে না।

কিন্তু বড় পিপাসার্ত সে !

জল কোথায় ?

জল !···ওই যে !

মরু-প্রান্তরের মরীচিকার পিছনে সে ছুটিল।

॥ পাঁচ ॥

অনুজা ও অভিজিৎ।

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ পথ অতিবাহন করিয়াছে। এই ত জ্ঞানরাজ্য। কই ? এখানেও ত কেহ নাই ! অনুজা আজিও তাহার ভাইকে পাইল না—অভিজিৎ অনুজার সন্ধান আজও করিতেছে। পথচলার শেষ নাই...কতদূর—!

সহসা অভিজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল।

অনুজা বলিতেছে—সে তৃষিতা, একটু জল চাই।

জল ?

ওই ত নিকটেই একটা কূপ রহিয়াছে। চতুর্দিক ফুল-গাছ দিয়া ঘেরা। জল তুলিবার কোন উপকরণ কিন্তু নাই। অভিজিৎ সেই সন্ধানে অনুজাকে সেই কূপের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—"বালতি কিম্বা ঘড়া যাহোক একটা যোগাড় করে আনছি আমি। তুমি বোস।"

অনুজা বসিল—অভিজিৎ চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আর আসে না। কোথায় গেল সে?

অনুজার তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।

সহসা অনুজা বলিয়া উঠিল—"উঃ বড় পিপাসা—আর ত পারি না। আমাকে একটু জল দেয় এমন কেউ নেই এখানে!"

অনুজার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কূপের ভিতর হইতে চন্দনচর্চিত পুষ্পমাল্য-বিভূষিত একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। অনুজাকে বলিল—"সুন্দর নির্মল জল যদি চান আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"এই কূপের ভিতর—কোন ভয় নেই—আসুন।"

"আমার সঙ্গী যে এখনও ফেরেননি!"

"তাহলে অপেক্ষা করুন! আমি যাই—"

"একটু জল এনে দিতে পারেন না দয়া করে—"

"না সে জল আনা যায় না।"

' চলুন যাই তবে —"

অনুজা চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আসিয়া দেখে অনুজা নাই। একটু দূরে সিদ্ধান্তশেখর সূতার জট ছাড়াইতেছেন! অভিজিৎ তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একজন রমণী এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? দেখেছেন আপনি?"

সিদ্ধান্তশেখর বলিলেন—"দেখেছি। তাঁকে সহজে এখন পাবেন না। তিনি ধর্মকূপে প্রবেশ করেছেন।"

"ধর্মকূপ? সে আবার কি?"

' ওই যে আপনার সম্মুখেই রয়েছে। ওখানে কোন সরল অসহায় বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণ যদি গিয়ে তৃষ্ণার জল চায় তাহলে ধর্মকূপের অভ্যন্তরবাসী কেউ এসে নির্মল জলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওর ভিতরে নিয়ে যায়। একটি স্ত্রীলোককে এক্ষুণি নিয়ে গেছে আমি দেখেছি।"

অভি। আপনি দেখলেন অথচ বারণ করলেন না?

সিদ্ধান্তশেখর। বারণ করে কোন ফল হয় না। বরং উল্টো ফল হয়। আমি আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ওই ধর্মকূপে পতিত হতে দেখেছি। এই জ্ঞানরাজ্যের

মধ্যে কয়েকটি ওই রকম ধর্মকূপ আছে। একবার যদি ওর প্রতি কোন মোহ জন্মায় তাহলে আর নিস্তার নাই। জ্ঞান-রাজ্যে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।

অভি। আপনি এতে পড়েন না কেন ?

সি। আমি যে নাস্তিক।

অভি। আমি কি প্রবেশ করতে পারব ?

সি। তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করুন। আপনাকে যদি যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন—ওঁরা নিজেরাই এসে সমাদরে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

অভি। আমি যদি লাফিয়ে পড়ি।

সি। (হাসিয়া) তা হয় না। ওর কিছুদূর গিয়েই একটা রুদ্ধদ্বার আছে। অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে তা চির-রুদ্ধ।

এই বলিয়া সিদ্ধান্তশেখর চলিয়া গেলেন।

* * * *

অভিজিৎ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

তারস্বরে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলেন—কেহ আসিল না।

ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন—কিন্তু উঠিয়া আসিতে হইল।

সর্ব-প্রকার চেষ্টা তিনি করিলেন—কিন্তু ধর্মকূপ তাঁহার নিকট রুদ্ধই রহিয়া গেল।

অনুজা আর ফিরিবে না—?

সে কি !

॥ ছয় ॥

শিল্পী—উদ্‌ভ্রান্ত শিল্পী—চলিয়াছে।

চতুর্দিকে হতাশার মরুভূমি—মৃগতৃষ্ণিকার মায়াসরোবর রচনা করিতেছে। তৃষ্ণার্ত শিল্পী তাহাদেরই উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃষ্ণা ত মিটিল না—কিন্তু শক্তির যে শেষ হইয়া আসিল।

তপ্ত বালুকণার জ্বলন্ত অনুভূতি—ঘূর্ণীবাতাসের উন্মত্ত নর্তন—মরীচিকার ছলনা !

শিল্পীর বিস্রস্ত কেশ, বিক্ষত চরণ। নয়নে তীব্র জ্বালা, বক্ষে নিদারুণ পিপাসা। বিশুষ্ক রসনায় অব্যক্ত হাহাকার—কোথায়—কোথায়—কোথায় !

ওই যে আর একটু দূরে—ওই ত শ্যাম অরণ্যানীর স্নিগ্ধকান্তি।—জলধারার আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন !

মরীচিকার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সহসা শিল্পী আর পারিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তপ্ত বালুকায় লুটাইয়া পড়িল।

কাছে—দূরে মরীচিকার স্বপ্ন রচনা করিতেছে। এখনও!

* * *

ধীরে ধীরে একটি মরীচিকা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

··একটি মানবী মূর্তি।

সুন্দরী—যুবতী—তন্বী!

ধীরে ধীরে সে শিল্পীর নিকট আসিল।

ধীরে ধীরে কহিল—"ওঠ, আমি এসেছি—"

॥ সাত ॥

ধর্মকূপের অভ্যন্তর।···চতুর্দিক বন্ধ। আলোক-প্রবেশের পথ নাই। ধূপধূনার ধূমে সমাচ্ছন্ন। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। রাশি রাশি মৃত কিম্বা মৃতপ্রায় পুষ্পের শবদেহ। এখানে মহাধার্মিক সকলেই অন্ধ। এক একজন হাত ধরিয়া তাহাদের লইয়া বেড়াইতেছে। বিবিধ মূর্তি। কাহারও শিখা—কাহারও শ্মশ্রু—কাহারও জটা—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক—কেহ পট্টবস্ত্র পরিহিত—কেহ উলঙ্গ—কেহ রক্তাম্বরধারী।

···সিংহবাহিনী-মূর্তির পদতলে অনুজা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সরলতার প্রতিমূর্তি একটি নারী বসিয়া গান গাহিতেছে। তাহার নাম বিশ্বাস। এই গানের সুরই ধর্মরাজ্যের প্রাণ-মন্ত্র!

ডাকো শুধু ডাকো—
তাঁহারি চরণে মরম-খানিরে
উজাড় করিয়া রাখো।
বেদনার বোঝা চরণের তলে
ভিজাইয়া রাখ নয়নের জলে
সকল বেদনা ঘুচিবে মুছিবে
যেও না, দাঁড়ায়ে থাকো!
বেদনার কথা লুকায়ে রেখোনা
সরমের কথা বৃথাই ঢেকোনা
কেবল তাঁহার মোহন মুরতি
ব্যথিত মরমে আঁকো!

এই একই মন্ত্রের বিবিধ ভাষা! অন্ধকারে অন্ধের প্রার্থনা। অনুজা অন্ধ হইয়াছে। প্রার্থনা করিতেছে, 'ভাইকে ফিরাইয়া দাও'—পিপাসা কিন্তু মেটে নাই। অভিজিৎ কখন জল আনিবে—মনে মনে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

॥ আট ॥

অভিজিৎ মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অনুজার মত বিশ্বাস তাহার নাই···ধর্মজগতে সে স্থান পাইল না। শিল্পীর মত স্বপ্ন নাই, কোন মরীচিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিল না। সংসারের সাধারণ মানুষ সে। শিল্পী তাহার বন্ধু ছিল—তাহার পাগলামির জন্যই তাহাকে ভালবাসিত। অনুজাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিতে চাহিয়াছিল। পাইল না। কাহাকেও পাইল না।

হতাশার মরুভূমি ধু ধু করিতেছে। অভিজিৎ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়—জীবনের সমস্তটা যখন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার সহিত এক ফেরিওয়ালার দেখা হইল। নাম তার ব্যসন। অভিজিৎ তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

"তুমি কে ভাই ?"

"আমি একজন ফেরিওয়ালা !"

অভি। ফেরিওয়ালা ? এই মরুভূমির মাঝখানে ফেরিওয়ালা !

ব্যসন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই আমার সমঝদার বেশী।

অভি। কি আছে—তোমার কাছে ?

ব্যসন। নানারকম জিনিস আছে। কি চান বলুন ?

অভি। দু'একটা নাম কর দেখি—

ব্যসন। তাস, পাশা, গান, সাহিত্য, সংগীত, মদ।

অভি। মদ আছে ?

ব্যসন। আছে।

অভি। দাম ত আমার কাছে এখন নেই।

ব্যসন। আমার কাছে আসতে হলে অগ্রিম দাম দিয়ে তবে আসতে হয়। তা আমি পেয়ে গেছি। জিনিসটার দাম যথা-সময়ে ও যথা-স্থানে আপনার কাছে আদায় করে নেওয়া হবে।

অভি। (সাগ্রহে) দিন তবে।

* * * *

বহুকাল পরে অনুজা ও অভিজিতের দেখা হয়।

অনুজা অন্ধ—অভিজিৎ মত্ত।

কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

॥ নয় ॥

আনন্দের দেশ। চতুর্দিক উজ্জ্বল। অজস্র ফুল…অজস্র হাসি—অনবদ্য সংগীত—অফুরন্ত আনন্দ। তরুণ-তরুণীর হাট। বিশ্বের যৌবন এখানে অক্ষয় হইয়া আছে।

একটি নির্জন চাঁপা-গাছ-তলায় বসিয়া শিল্পী মরীচিকা-সুন্দরীর কর্ণমূলে স্তুতিগান করিতেছে—"তুমি কত সুন্দর!"

* * * *

শিল্পীর সেই মর্মর-প্রতিমা?

তাহা এখনও ভগ্ন—বিদীর্ণ!

শ্যাম শৈবালদল আসিয়া তাহার বিদীর্ণ স্থানটুকু ঢাকিয়া দিতেছে!

টাইফয়েড

॥ এক ॥

রাত্রি কত হইয়াছে আন্দাজ করা শক্ত।

একটি থার্ড ক্লাস কামরার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আনন্দ ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছিল ট্রেনটা হঠাৎ থামিয়া গেল কেন। সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর অন্য কিছু শোনা যাইতেছে না।—কিছুদূরে আকাশের গায়ে লাল আলো। আনন্দ বিশেষ কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ঘুমটা ভাঙিয়া যাওয়াতে বিরক্তও হইল।

শুইবামাত্র 'হুইস্‌ল' দিয়া ট্রেনটা ছাড়িল এবং ছাড়িবার সময় 'ঘচাং' করিয়া সমস্ত গাড়ীটাকে এমন একটা নাড়া দিল যে সামনের বেঞ্চ হইতে একটি ভদ্রমহিলা পড়িয়া যাইতে যাইতে সামলাইয়া লইলেন।

মহিলাটির সঙ্গে যিনি অভিভাবক ছিলেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া বাঙ্ক হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাগল না কি?"

মহিলাটি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন—মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন যে লাগে নাই।

মহিলাটির অভিভাবক-ভদ্রলোক কোনরূপে বাঙ্কের উপর একটু জায়গা করিয়া লইয়া তাহার মধ্যেই নাক ডাকাইতেছিলেন। মহিলাটির শুইবার স্থান ছিল না। তিনি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলেন।

আনন্দের ঘুম আসিতেছিল না। সে সন্ধ্যা হইতে একটানা বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়াছে। সে শুইয়া শুইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল যে ভদ্রমহিলাটি ক্রমাগত ঢুলিতেছেন।

হঠাৎ আনন্দের মনে হইল কাজটা অভদ্র হইতেছে।

সে উঠিয়া বসিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, "আমি আর ঘুমোব না। আপনি এসে না হয় আমার এই বেঞ্চটাতে শুয়ে পড়ুন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঙ্কের উপর হইতে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল ?"

আনন্দ বলিল, "আমার ঘুম হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে উনি আমার বেঞ্চটায় শুতে পারেন। বসে ঢুলছেন কিনা!"

মহিলাটি একটু লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিলেন।

"ধন্যবাদ!—বেশ তো,—অনু শুয়ে পড় তুই। কতক্ষণ আর বসে থাকবি!"

আনন্দ স্থান করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অনু অর্থাৎ অনুপমা সসঙ্কোচে শয়ন করিলেন।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে আনন্দ দেখিল, যাহাকে সে 'মহিলা' বলিয়া মনে করিতেছিল আসলে সে একটি ছিপছিপে রোগা-গোছের মেয়ে—বয়স বড়জোর উনিশ কি কুড়ি!

ধীর মন্থর গতিতে ট্রেন স্টেশনে প্রবেশ করিল।

কিউল।

চায়ের সন্ধানে গলা বাড়াইতেই বাঙ্ক হইতে অভিভাবক-ভদ্রলোকটি—অবিনাশবাবু —আনন্দকে বলিলেন, "আমার জন্যেও এককাপ নিন তো!" বলিয়া তিনি বাঙ্ক হইতে নামিয়া বসিলেন।

চা পান করিতে করিতে বাঁ হাতের আঙুল দিয়া মাথার রগ টিপিতে টিপিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, "মাথাটা ভারি ধরেছে!"

সর্বাঙ্গে বালাপোষ মুড়ি দিয়া এক বৃদ্ধ কোণে বসিয়া ছিলেন। তিনি অযাচিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাথা ধরেছে তো? পায়ের দুটো বুড়ো আঙুলে বেশ করে কসকসিয়ে দড়ি বেঁধে রাখুন তো—এক্ষুণি ছেড়ে যাবে।"

* * *

"কতদূর যাবেন আপনারা ?"

অবিনাশবাবু উত্তর করিলেন, "সাহেবগঞ্জ।"

আনন্দ যেন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উঠিল—"সাহেবগঞ্জ! আমার বাড়ী যে সেখানে। আমি তো সেখানেই যাচ্ছি। সাহেবগঞ্জে কোন জায়গাটায় যাবেন আপনি ?"

"হরেরামবাবুর বাড়ী। চেনেন আপনি ?"

"চিনি মানে? ঠিক সামনাসামনি বাড়ী আমাদের—একই গলিতে। কিন্তু তাঁরা তো ওখানে কেউ নেই আজকাল—তাঁরা—"

"গিরিডিতে। বাড়ীটা খালি আছে বলেই না যাচ্ছি। ছুটি পেলাম। একটু বেড়িয়ে যাওয়া যাক। হরেরাম আমার সম্বন্ধী।"

অকারণে আনন্দ বলিয়া ফেলিল, "বেশ করেছেন।" কিছুক্ষণ চুপচাপ। আনন্দ বইটা মনোযোগ দিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন ?"

"আজ এক চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। কাল আমার ছেলে এসে পেঁছুবে। কলেজের ছুটি হবে কাল তার। অনু আমার মেয়ে। বছর দুই হল স্ত্রী মারা গেছেন। তাই ছেলে-মেয়েদের ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ি কোথাও না কোথাও।"

আনন্দ কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া সে দেখিতে লাগিল পাহাড়ের ওপারের আকাশটায় কে-যেন মুঠামুঠা আবির ছড়াইতেছে।

অরুণ-রঞ্জিত মেঘমালা, আলোক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

* * *

বেলা প্রায় আটটা বাজে। সাহেবগঞ্জ আসিল বলিয়া!

অবিনাশবাবু বাঙ্ক হইতে নামিয়া বসিয়াছেন।

আনন্দের সহিত নানা বিষয়ে গল্প চলিতেছে।

অনুপমা গল্পে যোগদান করে নাই। সে জাগিয়া অবধি জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া দেখিয়া চলিয়াছে।

কি যে এত দেখিতেছে—সে-ই জানে!

সাহেবগঞ্জ! ট্রেন থামিলেই অবিনাশবাবু বলিলেন, "আমার তিনটে কুলী লাগবে। অনুপমা—দেখো কুঁজোটা না ভাঙে! আনন্দবাবু দেখুন"—

হঠাৎ আনন্দ বলিল, "দেখুন, আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমাকে 'আপনি' বলে আর লজ্জা দেবেন না। আপনার ছেলে আমার সহপাঠী—না হয় ভিন্ন কলেজেই পড়ি আমরা।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—তা সে—মানে" অবিনাশবাবু কি বলিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "আচ্ছা, চারটে কুলীই ডাকো তাহলে।"

স্টেশনে নামিতেই দীর্ঘ ঋজুদেহ বলিষ্ঠ এবং সুদর্শন একটি যুবক আসিয়া আনন্দকে সম্ভাষণ করিল, "কোথায় গিয়েছিলি তুই আনন্দ! আমি রোজ তোর খোঁজ করছি!"

আনন্দ বলিল, "কাশী বেড়িয়ে এলাম।"

মৃণাল গলার স্বর একটু খাটো করিয়া বলিল, "আজ ছটার সময় পাহাড়তলীতে আমরা meet কর্ব!"

আনন্দ বলিল, "কেন?"

"ভুলে গেলে? বেশ ছেলে!"

"ও,—সেই ব্যাপার! আচ্ছা—"

আনন্দের মুখে ক্ষণিকের জন্য চিন্তার ছায়া পড়িল। সে আবার বলিল, "তুই যা এখন। যাব আমি।"

"মনে থাকে যেন"—মৃণাল চলিয়া গেল।

* * *

পথে আসিতে আসিতে অবিনাশবাবু বলিলেন, "বাঃ—চমৎকার পাহাড় তো!—এখান থেকে কতদূর!"

আনন্দ উত্তর দিল, "বেশী দূর নয়! এই রেললাইনগুলো পেরিয়ে একটা মাঠ—আমাদের ফুটবল খেলা হয় সেখানে—সেই মাঠটা পেরিয়ে একটু গেলেই পাহাড়—ওই

যে এই বড় পাহাড়টার ওপর একটা গাছ দেখছেন, ওটা একটা তেঁতুল গাছ—আমরা সব নিজেদের নাম খোদাই করে এসেছি ওর গায়ে।”

অনুপমার চক্ষু দুইটি কৌতূহলে ভাষাময় হইয়া উঠিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন, “এখানকার রাস্তাঘাটগুলিও বেশ ঝরঝরে!—এই রাস্তাটা সোজা বুঝি গঙ্গার ধারে গেছে ?” বলিয়া তিনি একটি লাল কাঁকরের পরিচ্ছন্ন রাস্তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। চমৎকার রাস্তাটি। দুধারে গাছের সারি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশ দেখা যাইতেছে। লাল রাস্তার উপর আলো-ছায়ার ছবি আঁকা। রাস্তার দুইপাশে প্রায় একই ধরনের পরিষ্কার পাকাবাড়ী। প্রায় প্রত্যেকটিরই সম্মুখে ছোট বাগান।

আনন্দ বলিল, “হ্যাঁ এই রাস্তাটা সোজা গঙ্গার ধারের দিকে গেছে—চার্চ হয়ে!”

তাহার পর আনন্দ দেখাইতে দেখাইতে চলিল, “এটা ইস্কুল, ওই ডাক্তারখানা, এইটে মিউনিসিপ্যাল অফিস, এইটে গার্ড-বাংলা—ওগুলো রেলওয়ে কোয়ার্টার”—

বেশ পরিচ্ছন্ন ছোট শহর।

অনুপমা বলিল, “আজ আমরা একটু পরে বেড়াতে বেরোব কি বল বাবা ?”

“আজ থাক। শরীরটার তেমন যুৎ নেই!”

॥ দুই ॥

ভালো ছেলে বলিতে যাহা বুঝায়, শ্রীমান আনন্দমোহন রায় তাহাই। এ অঞ্চলে নাম-করা ছেলে। স্কুলের সে ভাল ছেলে ছিল—কলেজেও ভাল লেখাপড়া করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় যদিও সে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নাই—কিন্তু কীর্তিমান যে-কোন ছাত্র অপেক্ষা তাহার জ্ঞানের পরিধি ছোট নয়। চরিত্রবান সুস্থ অমায়িক যুবক। পরোপকারী। এই সাহেবগঞ্জেই যে-কোন বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ করিলে আনন্দই ছিল সকলের ভরসা-স্থল। তাহার একদল ভক্ত ছিল—সেই ভক্তেরা অধিকাংশই স্কুলের ছাত্র। তাহারা আনন্দের জন্য সমস্ত করিতে প্রস্তুত।

আহারাদির পর আনন্দ নিজের ঘরে শুইয়া খবরের কাগজে মনোযোগ দিয়াছে এমন সময় বৌদিদি দর্শন দিলেন—

“কি ঠাকুরপো, কেমন দেখে এলে কাশী ?”

“বেশ ভালই।”

“কোথায় উঠেছিলে ?”

“আমার এক বন্ধুর বাসায়!”

“ভাগ্যে ঠিকানা দিয়ে যাওনি। তাহলে বিপদে পড়ে যেতে।”

“কেন ?”

“টেলিগ্রাম যেত।”

“কেন ?”—আনন্দ উঠিয়া বসিল।

"কেন দেখ তাহলে !" বলিয়া হাস্যমুখী বৌদিদি উঠিয়া গেলেন এবং ক্ষণপরে একটি 'ফোটো' হস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

"কেন, এই দেখ !"

আনন্দ দেখিল। বলিল, "কাশীতে থাকে বুঝি ?"

"কুষ্ঠি প্রভৃতির সব মিল—এখন মেয়ে পছন্দ হলেই হয়।"

আনন্দ বলিল, "আচ্ছা, কেন তোমরা সবাই মিলে এমন করে উঠে-পড়ে লেগেছ বল দেখি !"

"তবে কি বলতে চাও, বিয়ে করবে না ! পঁচিশ বছর বয়স হতে চল্‌ল। আর কেন ?"

"এখন তো তোমার উৎসাহের অন্ত নেই—কিন্তু বিয়ের পর তখন তুমিই নানারকম খুঁৎ বার করে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি করবে। বেশ তো আছি। তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন ?"

"হিংসে করে !" বলিয়া বৌদিদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

"আমি বিয়ে করে তোমাদের মত ন্যাতা-জোবড়া হয়ে থাকতে চাই না !"

"তোমার এত পঞ্চাশ-গণ্ডা হাংগামা পোয়াবে কে বলতো ? ঘন ঘন চা চাই। খাওয়া নাওয়ার ঠিক নেই। সেবক-সমিতির পাণ্ডাগিরি করে রাত্রে বারোটার সময় আর দিনে দুটোর সময় বাড়ী ফিরবে—কে তোমার জন্যে রোজ রোজ বসে থাকবে।"

"কেন, তুমি ! অনর্থক বাড়ীতে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন হেতু দেখতে পাচ্ছি না। তুমি তো একাই স্বচ্ছন্দে বেশ ম্যানেজ করছ !"

"পারবো না আমি।"

"আচ্ছা যখন অপারগ হবে তখন দাদার আর একটা না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে। তোমাকে তখন পেন্‌শন্ দিয়ে কাশী পাঠিয়ে দিলেই হবে !"

"ইস্—তা বৈ কি ! দাদা তোমার কক্‌খোনো বিয়ে কর্বে না ! আমি মরে গেলেও না !"

আনন্দ খানিকক্ষণ বৌদিদির দিকে চাহিয়া রহিল। নিজের দাদাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত। বৌদিদির ভুলটা আর ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। সরল বেচারী !

বলিল, "ওঃ ভারি অহঙ্কার তো তোমার ! আচ্ছা, যতদিন পার ততদিন তো ম্যানেজ কর ! তারপর দেখা যাবে।"

ফোটোখানি তুলিয়া বৌদিদি বলিলেন, "কেন মেয়েটি তো দিব্যি দেখতে। সুন্দর চোখদুটি !"

"আমি তো বলিনি দেখতে খারাপ !"

নীচে গলি হইতে ডাক আসিল, "আনন্দদা—"

জানালার নিকট আনন্দ উঠিয়া গেল—"কে, কিশোর ? কিরে—কি খবর ?"

"আজ আমাদের 'বি' টিম আর 'সি' টিম হকি ম্যাচ হবে, আপনাকে রেফারি হতে হবে।"

"কাল সারা রাত ট্রেনে এসেছি। বংশীদাকে বল না !—"

"তিনি ভারি পার্শিয়ালিটি করেন ! সেবার আমাদের মিছিমিছি একটা পেনালটি দিয়ে দিলেন !"

"যাঃ—তোরা ফাউল করেছিলি। আমি ছিলাম তো!"

"না, আনন্দদা, আপনিই হোন—"

কিশোরের কিশোর মুখে আব্দারের আভাস দেখিয়া আনন্দ হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা। কটার সময়?"

'সাড়ে চারটে—"

"কটা বেজেছে এখন?"

"আড়াইটে বোধ হয়—"

"আমার হুইস্‌ল নেই কিন্তু, একটা নিয়ে যাস্‌।"

"আচ্ছা।" কিশোর চলিয়া যাইতেই সামনের বাড়ীর জানালার দিকে আনন্দের নজর পড়িল। দেখিল, অনুপমা দাঁড়াইয়াছিল—তাহার দৃষ্টি পড়িতেই সরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগছে? সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিয়েছেন তো? কোন কিছু দরকার হলে বলবেন আমাকে!"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, গোছান প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তবে শরীরটা তেমন ভাল নেই। কেমন যেন মাথাটা ধরে' আছে। অনু, চা হল মা?"

আনন্দ বলিল, "চা না হয় আজ আমরাই পাঠিয়ে দিই। ওবেলা আমাদের এখানেই না হয় খাবেন!"

অবিনাশবাবু বলিলেন, "না, না—সে সব ঠিক আছে। অনু আমার কলেজে-পড়া মেয়ে হলে কি হয়—সব জানে! তা ছাড়া, আমার এই বুড়ো চাকর মধুয়া—একেবারে পাকা গিন্নী।"

বলিতে বলিতেই অনু এক পেয়ালা চা আনিয়া অবিনাশবাবুকে দিল।

আনন্দ দেখিল, চা দিয়া অনু বাঁ হাতে আঙুলগুলাতে ফুঁ দিতেছে। অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল!"

"ও কিছু নয়। একটু পুড়ে গেছে!"

শুনিবামাত্র আনন্দ বলিয়া ফেলিল, "তাই নাকি। আমার কাছে ফার্স্ট এড-এর সেট্ আছে। ওষুধ একটা দিলে হয়" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সে নামিয়া গেল। হস্তে একটা শিশি।

* * *

খেলা সবে শেষ হইয়াছে।

কিশোরদের টিম্ জিতিয়াছে।

তাহাদের দল আনন্দে চারিদিক ঘিরিয়া কলরব করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল।

দুইচারিজন লোক—এদিকে ওদিকে পদচারণা করিতে করিতে আপন আপন গন্তব্যপথ ধরিল।

আনন্দের গায়ের ঘামটা মরিতেই সে-ও বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাইতেছিল। এমন সময় মৃণাল দেখা দিল।

আসিয়াই বলিল, "পোনে ছটা হয়েছে। চল আস্তে আস্তে যাওয়া যাক্ তাহলে!"

আনন্দ বলিল—"হ্যাঁ চল!"

মৃণাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এত অন্যমনস্ক কেন বল দেখি! কি ভাবছিস্ তুই?"

"কি আবার ভাবব!"

"এত অন্যমনস্ক তাহলে কেন?"

"অন্যমনস্ক?—কই না!"

তাহারা ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল।

॥ তিন ॥

পরদিন সকালে উঠিয়া আনন্দ খবর পাইল, অবিনাশবাবুর কাল রাত্রে একটু জ্বর-ভাব হইয়াছিল। সকালেও ৯৯ 'আছে—একেবারে ছাড়িয়া যায় নাই। মধুয়া খবর আনিয়াছিল।—সে উপসংহারে বলিল, খোকাবাবুর আজ আসিবার কথা ছিল—কিন্তু তিনি না আসিতে দিদিমণি ঘাবড়াইয়া গিয়াছেন!

আনন্দ বলিল, "আমি যাচ্ছি এক্ষুণি। ভয় কি?" মধুয়া চলিয়া গেলে আনন্দের দাদা বৈঠকখানার দরজায় উঁকি দিলেন। তাঁহার কানে পৈতা জড়ান, হাতে গাড়ু।

"ও বাড়ীতে কারা এসেছে রে?"

আনন্দ বলিল, "অবিনাশবাবু। হরেরামবাবুর ভগ্নীপতি।"

"তুই চিনিস্ না কি?"

"না। গাড়ীতে আসবার সময় আলাপ হল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি কথাগুলি শুনিলেন। তাহার পর কিছু না বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া জানালাতে ঝুঁকিয়া সশব্দে নাকটা ঝাড়িয়া ফেলিলেন।

যাইবার মুখে কেবলমাত্র বলিয়া গেলেন, "ভগ্নীপতি কোত্থেকে জুটল আবার!"

আনন্দ কিছু বলিল না। হস্তস্থিত চায়ের খালি-পেয়ালাটি টেবিলে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল!

* * * *

ঘণ্টাখানেক পরে নবীন ডাক্তার অবিনাশবাবুর বাড়ীতে দেখা দিলেন। সঙ্গে আনন্দ।

ডাক্তার, নামে নবীন হইলেও—বয়সে প্রবীণ। মরণের নানা মূর্তি দেখিয়া এবং নিজের জীবনেও বারকয়েক শোক পাইয়া নবীনবাবু কেমন যেন একটু ভীতু ধরনের হইয়া গিয়াছিলেন। অথচ এ অঞ্চলে নবীনবাবুর নাম-ডাক খুব। লোক অত্যন্ত ভাল। কিন্তু সর্বদাই যেন ঘাবড়াইয়া আছেন—এই ভাব। অসুখের কথা শুনিয়াই আনন্দকে তিনি বলিলেন, "অ্যাঁ—বল কি—জ্বর আর মাথাধরা ছাড়ছে না? সারলে দেখছি।" অবিনাশবাবুর বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া নবীনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা থাকেন কোথায়?"

"লাহোরে—"

"লাহোরে ? ম্যালেরিয়া ও অঞ্চলে হয় না কি ?"

"হয়। তবে খুব যে বেশী তা নয়।"

"আপনার জিবটা দেখি।" অবিনাশবাবু জিব দেখাইলেন, আবার একবার পালস্‌-টা গুণিলেন। পরে বলিলেন—

"শীত করে জ্বর এসেছিল ?"

"আজ্ঞে না। মাথা ধরেছিল—এখনো ধরে আছে।"

"হুঁ।"

নবীন-ডাক্তার প্রেসক্রপশন লিখিলেন, কুইনাইন মিক্‌শ্চার। বলিলেন, "আজ একটা-ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল খেয়ে ফেলুন এখুনি। তার পর এই ওষুধ তিনদাগ করে—দিন-তিনেক খেয়ে দেখুন। ম্যালেরিয়া হলে কমে যাবে।"

বলিয়া তিনি উঠিতে গেলেন। অবিনাশবাবু ফী দিতে গেলে নবীনবাবু বলিলেন, "না, না—আনন্দের কাছ থেকে আমি ফী নিই না কি ? আজন্ম ও আমাকে জ্বালাচ্ছে। ওর বয়স যখন বছরখানেক তখনই একবার নিমোনিয়া হয়ে ভুগিয়েছিল আমাকে, তারপর সমস্ত ছেলেবেলাটা ওর নানা ব্যারামে কেটেছে ! একটু বড় হবার পর থেকেই সেবা-সমিতিতে পাণ্ডাগিরি সুরু করলে ! কোথায় কার কলেরা—কোথায় বসন্ত—কোথায় জলে ডোবা—ডাক নবীন-ডাক্তারকে ! ফী নিয়ে আর কি করব ওর কাছ থেকে—দেবে তো ও সেই সেবা-সমিতির ফাণ্ড থেকে ! আমাকে আবার করে দিয়েছে তার প্রেসিডেণ্ট ! কম জ্বালায় ও আমাকে ! আপনারা জানেন না।"

অবিনাশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "না, এ ফী আমি নিজে থেকে দিচ্ছি।"

নবীন ডাক্তার দমিবার পাত্র নহেন।

"বেশ তাহলে আমাদের সেবা-সমিতি ফান্ডে জমা করে দিন। আর দেখুন, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন। খাবেন বার্লি !"

নবীনবাবু যাইবার সময় আনন্দকে বলিয়া গেলেন, "দেখো হে, এরা বিদেশী মানুষ—কোন অসুবিধা যেন না হয়। আমি চলি তাহলে। আমাকে এখুনি একবার মিরজাচৌকি যেতে হবে।"

নবীনবাবু চলিয়া গেলে আনন্দও চলিয়া যাইতেছিল। সিঁড়িতে কিছুদূর নামিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে ডাক আসিল—

"—শুনুন।"

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল—অনুপমা।

"কি ?"

"বাবা বল্লেন, এই টাকা দুটো নিয়ে যান, আপনার সেবা-সমিতি ফাণ্ডে জমা করে দেবেন।"

আনন্দ হাত বাড়াইয়া বলিল, "দিন—"

অনুপমা তাহার হাতে টাকা দিতেই আনন্দ বলিল—"উঃ আপনার আঙুলগুলো তো ভারি ঠাণ্ডা ! সকাল থেকে জল ঘাটছেন বুঝি ? কালকে আঙুল যে পুড়েছিল, কেমন আছে, দেখি ?"

অনুপমা মাথা নত করিয়া বলিল, "ভাল হয়ে গেছে !" বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল ।

আনন্দ সেকেণ্ড-দুই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীচে নামিয়া গেল ।

নীচে নামিয়াই দাদার সহিত মুখোমুখি ।

দাদার কানে তখনো পৈতা । বৃন্দাবনবাবু সকালে উঠিয়া কানে পৈতা জড়ান এবং স্নান করিবার সময় নামান । কোঁচার টেপটা গায়ে জড়ান । আনন্দকে দেখিয়াই বলিলেন, "ওরে তুই পরের অসুখে মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছিস—এদিকে বুচকিটার যে দু'দিন থেকে পেটের অসুখ, তার খবর রাখিস ?"

"কৈ না—বৌদি কিছু বলেন নি তো ।"

সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বৃন্দাবনবাবু আবার বলিলেন, "ভোঁদার পড়া-শোনাটাও ত একবার দেখতে পারিস । জিওমেট্রি ও একেবারে কিছু বুঝতে পাচ্ছে না ।"

বলিয়া বৃন্দাবনবাবু ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে সামনের বাড়ীর দোতালাটার পানে চাহিয়া দেখিলেন ।

"আচ্ছা দেখছি," বলিয়া আনন্দ পাশ কাটাইল ।

* * * *

ক্ষণপরে দেখা গেল আনন্দ ভোঁদাকে জিওমেট্রি পড়াইতেছে : "বুঝলি—? Two sides of a triangle are together greater than the third side.—বুঝলি ? Together—মনে থাকে যেন !"

ভোঁদা বলিল, "হ্যাঁ বুঝেছি । ও বাড়ীতে কারা এসেছে কাকা ? ওই যে দেখ না—"

"কই ?"

জানালা দিয়া দেখিল, অনুপমা ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতেছে । সদ্য স্নান করিয়া—টক্‌টকে লাল-পাড় একটি কাপড় পরিয়াছে । সূর্যের আলো সেই কাপড়ে প্রতিফলিত হইয়া হঠাৎ আনন্দের মনে রঙ ধরাইয়া দিল ।

"ওরা অবিনাশবাবুর বাড়ীর । নে পড় । আচ্ছা—এটা বুঝেচিস্‌ ? আচ্ছা বলত straight line-এর defination কি ?"

"Straight line is not curved" চট্‌ করিয়া ভোঁদা বলিয়া ফেলিল ।

"ও ঠিক হল না ! তুই ডেফিনিশন্‌ একটাও পড়িস্‌ নি ?"

এইত রয়েছে—"A straight line is the shortest distance between any two points—"

ভিতর হইতে বৌদিদি হাঁক দিলেন—"ঠাকুরপো, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাবে এসো—"

আনন্দ ভিতরে গেল ।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি বুঁচকিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন ।

"বৌদি, বুঁচকির কি পেট খারাপ নাকি ?"

"পরশু দিন একটু হয়েছিল । আজ ভাল আছে । কেন ?"

"এমনিই ! সাবধানে রেখো । চারদিকে অসুখ-বিসুখ ।"

এই বলিয়া সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল।

চতুর্দিকে আগুন লাগিয়াছে। চারদিক লালে লাল! নীল আকাশটাও যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। লাল আগুনের লক্‌লকে রক্তশিখায় চতুর্দিক উত্তপ্ত।

জল চাই!—জলও যে লাল! লেলিহান আগুনের দীপ্ত আভায় কালো জল পর্যন্ত রাঙা—যেন রক্ত!

* * * *

আনন্দের দিবানিদ্রা ভগ্ন হইল। অদ্ভুত স্বপ্ন তো।

উঠিয়া জানালাটা খুলিয়া দিতেই চোখে পড়িল আবার লাল! অনু জানালায় দাঁড়াইয়া আছে, লালপাড় শাড়ীর পাড়ে আগুন জ্বলিতেছে! সে জানালা বন্ধ করিয়া দিল। চোখ বুজিয়া আবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। ঘুম কিন্তু আসিল না!

"আনন্দ দা—"

নীচে নামিয়া গেল। দেখিল কিশোর আসিয়াছে। হাতে একখানি খামের চিঠি। কিশোর বলিল, "মৃণালদা—আপনাকে এইটে দিতে বলছেন। তিনি আজ ট্রেনে কোথায় গেলেন।" বলিয়া চিঠি দিয়া কিশোর চলিয়া গেল।

আনন্দ চিঠি খুলিয়া পড়িল, "এখন কিছুদিন আমি এখানে থাক্‌বো না। তোমাকে আমার সঙ্গে আসতেই হবে। আগামী মাসের বুধবার দিন অমাবস্যা পড়েছে। সেই দিন তোমার কাছে আসব। গভীর রাত্রে প্রস্তুত থেকো।"

পাগল নাকি মৃণালটা? মাথায় তাহার কি খেয়াল ঢুকিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে আনন্দ কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। শহর ছাড়াইয়া মাঠ পড়িল। অন্যমনস্ক হইয়া সে মাঠের পর মাঠ ভাঙিয়া চলিল।

সন্ধ্যার পর ফিরিয়া শুনিল, অবিনাশবাবুর টেম্পারেচার বাড়িয়াছে। তাহারও সারা মনে অস্বস্তি।

॥ চার ॥

দিন তিনেক পরে।

সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত শুনিয়া নবীন ডাক্তার বলিলেন, "সারলে দেখছি! এ তো টাইফয়েডে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে!"

আনন্দ কেবল বলিল, "আপনি কখন যাচ্ছেন? আজ একবার আপনার যাওয়া দরকার।"

"বিকেলের দিকে যাব এখন।"

আনন্দ ফিরিয়া আসিতেই দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।"

"চল।"

অবিনাশবাবুর জ্বর—আজ সকালেই ১০২ ডিগ্রী আছে। একবারও ছাড়ে নাই।

আনন্দকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি। কিছু মনে কোরো না। কালকে অনুকে দেখতে দু'জন ভদ্রলোক আসবেন এখানে—আগে থাকতেই কথা হয়ে আছে। অশোক আজও কেন-যে এল না বুঝতে পারছি না।" অশোক অবিনাশবাবুর পুত্র। কলিকাতায় এম্‌-এ পড়ে। আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কোন চিঠিপত্র পেয়েছেন তাঁর ?"

"কিছু না। সে অবশ্য চিঠিপত্র কমই লেখে। যাক্‌ কাল-নাগাদ না এসে পৌঁছলে একটা 'তার' করতে হবে। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, কাল দুটি ভদ্রলোক আসবেন অনুকে দেখতে, তুমি বাবা একটু দেখাবার বন্দোবস্ত করো। তাঁরা আসছেন অনেক দূর থেকে—এখন মানা করাও যায় না।"

"বেশ তো, সব ব্যবস্থা করব। সকালের ট্রেনে আসবেন ত ?"

"হ্যাঁ, নবদ্বীপ থেকে আসছেন তাঁরা।"

"আচ্ছা, সব ব্যবস্থা আমি করব এখন !"

অনুপমা এক পেয়ালা চা আনিয়া আনন্দের হাতে দিতেই আনন্দ বলিয়া ফেলিল, "আপনি অবিনাশবাবুর কাছ থেকে বার বার উঠে যাচ্ছেন কেন ? আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না হয়—"

অনুপমা অকারণে লজ্জা পাইয়া গেল।

অবিনাশবাবু কেবল বলিলেন, "হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। মেয়েটা দু'তিন রাত্রি ঘুমুতে না পেরে রোগা হয়ে গেল। কাল আবার দেখতে আসবে ওকে। ভগবান যা করেন তাই হবে !"

আনন্দ বলিল, "না-না, ওঁর রোজ রোজ রাতজাগা ঠিক হচ্ছে না। আজ রাত্তিরে আমি অপর ব্যবস্থা করবো। কোন স্ত্রীলোক-নার্স যদি না পাই– পাওয়া শক্ত—আমরাই কেউ না-হয় আসব। আপনার এতে আপত্তি নেই তো ?"

"না, কিছুমাত্র না। তবে তুমিই এসো বাবা। অচেনা লোক এলে—বুঝলে কি না—"

"আচ্ছা বেশ। তবে যাই এখন। ডাক্তারবাবু বিকেলে আসবেন।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আনন্দ দেখিল, অনুপমা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখে আনন্দ কি দেখিল তাহা সে-ই জানে। কিন্তু সহসা নির্ভয়ে তাহার কাছে গিয়া বলিল, "রাত্রে কপাটটা খুলে রেখো তাহলে তুমি।"

"আচ্ছা।"

হঠাৎ সে অনুপমাকে 'তুমি' বলিল কেন তাহা সে নিজেও জানে না !

রাত্রি প্রায় এগারটা হইবে।

অবিনাশবাবু ঘুমাইতেছেন। অনুপমা ঘরের কোণে একটি চেয়ারে বসিয়া একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। পড়া কিন্তু হইতেছে না। নানা কথা মনে হইতেছে। এইবার তাহার আই-এ পরীক্ষা দিবার কথা। অথচ পড়া-শোনা তো কিছুই হয় নাই ! এখানে আসিয়া নির্জনে পড়িবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু বাবার জ্বর হইয়া সব মাটি হইয়া গেল। দাদাও আসিতেছে না কেন ? আনন্দবাবু না থাকিলে কি

মুশকিলেই না সে পড়িত তাহার বাবাকে লইয়া! সুন্দর ছেলে এই আনন্দবাবু। পদশব্দ শুনিয়া সে চকিত হইয়া উঠিল।

“কে?”

অতি মৃদুস্বরে আনন্দ বলিল, “আমি। অবিনাশবাবু কি ঘুমিয়েছেন?”

অনুপমার বুকটা অকারণে কাঁপিতে লাগিল।

“হ্যাঁ”—বলিয়া আলোটা কমাইয়া অনুপমা বাহিরে আসিল। বাহিরে মানে, দালানে। সেখানেও একটা তক্তাপোষ, একখানি চেয়ার। টেবিলে একটি বাতি জ্বলিতেছিল।

আনন্দ গিয়া চেয়ারটাতে বসিল।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিল, “নীচে খিল দিয়ে এসেছেন তো?”

“না, ভুলে গেছি। থামুন, দিয়ে আসি।”

“আপনি বসুন। আমি দিয়ে আসছি।”—বলিয়া অনুপমা নীচে নামিয়া গেল। একা বসিয়া অকারণ পুলকে আনন্দের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সহসা তাহার মনে হইল, এই চেয়ারটাতেই তো অনুপমা সকালে বসিয়াছিল—তাহার স্পর্শ যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। ওই যে আলনাতে কোঁচান কাপড়গুলি ঝুলিতেছে—ওই যে শেলফে বইগুলি সাজান—সবই ত অনুপমার!

অনুপমা ফিরিয়া আসিতেই আনন্দ বলিল, “আপনি শুতে যান।”

অনুপমা স্বভাবতঃই একটু গম্ভীর প্রকৃতির। আনন্দের কথা শুনিয়া তাহার গম্ভীর মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “হাসলেন যে?”

“আপনি কখনও আমাকে ‘আপনি’ বলছেন—কখনও ‘তুমি’ বলছেন। একটা যা-হয় ঠিক করে ফেলুন।”

আনন্দ একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, “ ‘তুমি’টা বলতে লোভ হচ্ছে—কিন্তু স্বাভাবিক ভদ্রতায় ‘আপনি’ বেরিয়ে পড়ছে। ‘তুমি’ বললে আপনি কিছু মনে করবেন না তো?”

‘মনে করবার কি আছে? আমি বয়সে কত ছোট! আপনি আমার দাদার ক্লাস-মেট।”

“বেশ, তাহলে শুয়ে পড়—রাত হয়েছে।”

অনু বলিল, “ঘুম আসছে না।”

“তবু চেষ্টা করা উচিত! তাছাড়া কাল দুজন ভদ্রলোক দেখতে আসবেন—রাত্রি জেগে থাকাটা—”

“ভারি বয়ে গেছে আমার। পছন্দ না হলেই বাঁচি—”

বলিয়া হঠাৎ সে লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

আনন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটু পরেই অনুপমা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “বাবা আজ বেশ ঘুমুচ্ছেন। কাল-পরশু মোটে ঘুম হয়নি রাত্রে!”

“ডাক্তারবাবু ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন আজ—!”

কিছ‌ুক্ষণ দ‌ুইজনই চুপচাপ।

মিনিটখানেক পরে আনন্দ বলিল, "কাল যাঁরা আসছেন—তাঁরা পাত্রের কে হন ?"

"পাত্র স্বয়ং আর তাঁর বন্ধ‌ু !"

"পাত্র স্বয়ং ? কি করেন তিনি ?"

"দালালি।" বলিয়া অন‌ু চুপ করিয়া গেল। তাহার পর বলিল, "আমি সব কথা ঠিক জানি না।"

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল, অন‌ুপমার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা অসহায় ভাব ফ‌ুটিয়া উঠিল।

"পাত্রটি শ‌ুনলাম নাকি দোজবরে ?"

চকিত হইয়া অন‌ুপমা বলিল, "শ‌ুনেছি তাই। কে বলল আপনাকে ?"

"আপনার বাবাই আজ বিকেলে বলছিলেন। তিনি আপনার বিয়ে দেবার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছেন, অথচ মনোমত পাত্র জ‌ুটছে না।"

অন‌ুপমা কিছ‌ু না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

আনন্দ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এদেশে মেয়ে হইয়া জন্মান কি দ‌ুঃখের ! পদে পদে অপমানিত হইতে হয়। লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা আরও দ‌ুর‌ূহ ! ভদ্রভাবে চাকরি করা ম‌ুশকিল, বন্ধ‌ুত্ব করা ম‌ুশকিল, বিবাহ করা আরও ম‌ুশকিল। আমাদের মনটা সতত কিশোরীম‌ুখী। অথচ লেখাপড়া শিখিতে গেলেই বয়স বাড়িবে ! তখন কোন অল্পবয়স্ক য‌ুবক তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিবে না। স‌ুতরাং অধিক বয়সের লোক চাই। সে লোকটাও কিশোরী-আহরণে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তবে আসে ! এই ভদ্রলোক দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিবেন তাহাও আবার নির্লজ্জের মত নিজে দেখিতে আসিতেছেন !

অন‌ুপমা ফিরিয়া আসিল। বলিল, "ওই কোণে কুঁজোতে জল আছে।"

আনন্দ বলিল, "শোন—"

"কি—"

"বল তো এ বিয়ে আমি পণ্ড করে দিতে পারি। তোমার কি মত আছে এ বিয়েতে ?"

"আমার আবার মতামত কি ! বাবার মতেই আমার মত !"

"তাহলে কাল যদি উনি পছন্দ করে যান, এবং পছন্দ করবেনই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তাহলে তুমি ওই দোজবরেটাকে বিয়ে করবে নাকি ?"

কিছ‌ু না বলিয়া অন‌ু শ‌ুইতে গেল। একা বিছানায় শ‌ুইয়া আনন্দের কথাগ‌ুলি তাহার কানে যেন গান গাহিয়া ফিরিতে লাগিল—'ওরা তোমায় পছন্দ করবেনই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই !' অন‌ুপমা শ‌ুইয়া শ‌ুইয়া আশা এবং আশঙ্কা করিতে লাগিল, কাল যদি আনন্দবাব‌ু উঁহাদের সহিত একটা অনর্থ বাধাইয়া বসেন ! বলা তো যায় না !—

আনন্দ বসিয়া আছে। চতুর্দিক নীরব। দ‌ূরে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। টেবিলে হাত বাড়াইয়া আনন্দ একটা বই লইল। Coming of Arthur. দ‌ু'চারি পাতা উল্টাইয়া ভাল লাগিল না।

সে সায়েন্স-স্টুডেন্ট—কবিতার ধার ধারে না।

কিন্তু মনে যে কবিতা জাগিতেছে—!

"অনু—মা"—অবিনাশবাবুর ঘুম ভাঙিয়াছে।

আনন্দ তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, "অনু ওঘরে ঘুমুচ্ছে। কি চাই।"

"একটু জল—।"

আনন্দ জল দিল।

টেম্পারেচার লইল, ১০৩ ডিগ্রী।

ঠিক এই সময় মৃণাল সুলতানগঞ্জের ঘাটে নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতেছে। তমসাচ্ছন্ন গঙ্গা!

॥ পাঁচ ॥

তাহার পরদিন দুইজন আসিলেন না, আসিলেন একজন। পাত্র নিজে। লোকটিকে দেখিলে নিতান্ত খারাপ লোক বলিয়া মনে হয় না, একটু-যাহা খারাপ লাগে তাহা এই যে তিনি যুবক না হইয়াও যুবজনোচিত ব্যবহার করিতে ব্যগ্র! একটু অস্বাভাবিক-রকম চট্‌পটে। কামাইয়া কামাইয়া গণ্ডদেশ গণ্ডারচর্মের মত—তাহার উপর ক্রীম, পাউডার! ওয়েস্টকোট-পরা। চুল-ছাঁটা ঘাড়, হাতে-বাঁধা ঘড়ি এবং ঠোঁটে-চাপা সিগারেট দিয়া তিনি যুবক সাজিতে চান। কিন্তু তাঁহার চোখ-মুখ নীরবে সকলকে বলিয়া দিতেছে, "বয়স পঁয়তাল্লিশের কম নয়!" ভাবগতিক দেখিয়া আনন্দের ইচ্ছা করিতেছিল—মেয়ে না-দেখাইয়া লোকটাকে বিদায় করিয়া দিতে। কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহারই বাড়ীতে অতিথি তিনি। ওই জন্যই আসিয়াছেন!

একটা রেকাবীতে নিমকি, কচুরি প্রভৃতি কতকগুলি খাবার এবং এক পেয়ালা চা দিয়া আনন্দ গুম হইয়া বসিয়াছিল। ভদ্রলোক খাইতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে শিস্ দিতেছিলেন।

আনন্দ ঈষৎ ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া নিকটেই একটি বেঞ্চে বসিয়া ভাবিতেছে—চা-খাওয়া শেষ হইলে সে কি করিবে। এখনি কি দেখিতে চাহিবে?

এমন সময় নবীন-ডাক্তার দেখা দিলেন।

"কেমন আছে হে আনন্দ তোমার রোগী আজ? চা আছে নাকি বেশী! দাও তো এক পেয়ালা! ভোর বেলা বেরিয়েছি এখনও বাড়ী ফেরা হয়নি!"

এক পেয়ালা চা লইয়া নবীনবাবু আনন্দের পাশেই বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িলেন।

"কাল রাত্রে জ্বর ১০৩ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠেছিল। এখন ১০২ ডিগ্রী আছে। পেটটাও একটু খারাপ হয়েছে।"

"সারলে দেখছি।"

বলিয়া তিনি খামখা চিবুকের নীচেটা চুলকাইতে লাগিলেন! তাহার পর বলিলেন—"নার্সিং-এর ব্যবস্থা কি হয়েছে? ওটাই তো আসল! লাহোর থেকে এসে ভদ্রলোক—সারলে দেখছি!"

"কাল রাত্রে আমি ছিলাম। দিনের বেলা আমাদের সেবা-সমিতির তিনটি ছেলেকে

সর্বদা থাকতে বলেছি। তিনজন-তিনজন করে থাকবে। একজন রোগীর বিছানার পাশে থাকবে—আর বাকী দু'জন 'অন ডিউটি' বাইরে থাকবে যদি কোন দরকার হয়। কিশোরকে 'ইনচার্জ' করে দিয়েছি।"

"কে কিশোর ?"

"হালদারদের কিশোর। সেই যে ওবছর যার নিমোনিয়া হয়েছিল।"

"ও—হ্যাঁ হ্যাঁ। সে ছোকরা বেশ ছেলে। এইবার ম্যাট্রিক দেবে না ?"

"না, আসছে বছর। বেশ ছেলে। ক্লাসে ফার্স্ট হয়—সব দিকে চৌকোষ।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "তোরই তো সব চেলা !—চল অবিনাশবাবুকে দেখে আসি।—দেরী হয়ে যাচ্ছে !"

আনন্দ আগন্তুক ভদ্রলোককে বলিল, "আপনি বসুন—এক্ষুণি আসছি।"

পথে নামিয়া নবীনডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বুঝি আবুহোসেন সাজবে ? মন্দ মানাবে না।"

আনন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবুহোসেন সাজবে, মানে ?"

নবীনডাক্তার বলিলেন, "তেলিপাড়ার ভারতী-নাট্যসমাজ আবুহোসেন প্লে করবে যে ! জানিস্ না ? কোলকাতা থেকে একজন ভাল আবুহোসেন আসার কথা। আমি ভাবলাম সেই বুঝি !"

"ইনি অবিনাশবাবুর মেয়েকে দেখতে এসেছেন।"

"অবিনাশবাবুর মেয়ের বিয়ে হয়নি নাকি এখনও ?"

"না। উনি আই-এ পড়ছেন।"

"তাই নাকি ?—সারলে দেখছি।"

উভয়ে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, অবিনাশবাবু চক্ষু মুদিত করিয়া শুইয়া আছেন। পাশে কিশোর বসিয়া—মাথায় জলপটি লাগাইতেছে। অনুপমা দালানে ফলের রস করিতেছে।

তিনবার ডাকিবার পর অবিনাশবাবু চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া বলিলেন, "এসেছেন আপনারা ? বসুন। ওরে অনু"—

"আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক করে নিচ্ছি !"

নবীনবাবু রোগী দেখিতে লাগিলেন। অবিনাশবাবু আবার চক্ষু মুদিত করিলেন—কেমন যেন একটা অসাড় অবসন্ন ভাব। জ্ঞান আছে অথচ কথার উত্তর দিতে দেরী হইতেছে—যেন বেশী কথা বলিতে নারাজ। কষ্ট কি জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "মাথাটা একটুও ছাড়েনি। বড় যন্ত্রণা !"

বাহির হইয়া ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কদিন হল ?"

আনন্দ বলিল, "আজ সেভেন্‌থ্ ডে।"

নবীনবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দ অনুপমাকে বলিল, "এইবার কাপড়-চোপড় পরে নাও—ভদ্রলোককে নিয়ে আসি—"

অনুপমা উত্তর দিল না। একবার যেন অধরদুটি কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু কিছু না বলিয়া সে আঙুরগুলোকে লইয়া কেবলই নিঙড়াইতে লাগিল।

আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল।

আনন্দ আসিয়া দেখিল, ভদ্রলোক বসিয়া একটু যেন উস্‌খুস্‌ করিতেছেন।

অধিক ভূমিকা না করিয়া আনন্দ বলিল, "আপনি এখনি কি মেয়ে দেখতে চান?"

"বেশ তো! আমার আর আপত্তি কি?"

"কিন্তু আপনাকে এমন ভাবে মেয়ে দেখতে হবে যেন মেয়ে তা জানতে না পারে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আপনি যেন অবিনাশবাবুকে দেখতে গেছেন এইভাবে সেখানে যাবেন। সেখানে যে-মেয়েটিকে দেখবেন, সেইটি বুঝবেন অনুপমা। অন্য কোন মেয়ে ও বাড়ীতে নেই।"

"এরকম লুকোচুরি করে দেখার অর্থ কি?"

"অর্থ এই-যে এই অসুখের বাড়ীতে আয়োজন করে মেয়ে দেখাবার লোকাভাব। মেয়ে এখন তার অসুস্থ বাবার সেবা করবে, না সাজগোজ করবে—বলুন!"

"আচ্ছা-আচ্ছা—তাই করুন। সাজগোজ করে দেখাটা আমি পছন্দও করি না!"

মেয়ে-দেখা কার্য শেষ হইয়াছে। আনন্দ ও সেই ভদ্রলোক নীচের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আনন্দ আসিয়াই বলিল, "আপনার কি আর এক প্লেট খাবার চাই?"

"কেন?"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "মেয়ে দেখার পর এক প্লেট খাবারের দাবী যে-কোন বাঙালী করতে পারে!"

"না-না—থাক্‌। বরং আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না!"

"বেশ। ওরে ভোঁদা, দু-পেয়ালা চা করতে বল।"

আনন্দ বলিল, "এইবার আসল কথা পাড়া যাক—মেয়ে আপনার পছন্দ হল কি না সেটা তো অবিনাশবাবু জানতে চাইবেন। কি বলব তাঁকে? সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে, 'গিয়ে চিঠি লিখে জানাব'। আপনি কি তাই বলবেন?"

ভদ্রলোক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "মেয়েটির বয়স কত হবে, বলতে পারেন?"

"ঠিক বলা শক্ত। তবে উনিশ-কুড়ি হবে নিশ্চয়ই। আই-এ যখন পড়ছেন; এর কম নয়।"

"তাহলে বয়স খুব বেশী। অবিনাশবাবু আমাকে আইডীয়া দিয়েছিলেন, ষোল-সতেরো।"

"কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স স্বভাবতই লুকোতে চায়। আপনার বয়স কত?"

এরূপ প্রশ্নের জন্য ভদ্রলোক প্রস্তুত ছিলেন না। বলিলেন, "সাঁইত্রিশ।"

আনন্দ হাসিয়া বলিল, "কন্যাদায়গ্রস্ত বাপেরা মেয়ের বয়স যেমন লুকোয়,

ব্রাহ্মণ—কায়স্থ। বাধা দুস্তর হইবে। অনুপমা এ বিষয়ে কিছু ভাবে কি? জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা হয়। কৌতুহলের কিন্তু অন্ত নাই!

সমাজ ও সংসারের নিয়ম জটিল। মনের নিয়ম কিন্তু সরল ও সহজ—পুরুষ নারীকে কামনা করে।

দূরে পাহাড়ের গায়ে সাবুই ঘাসে আগুন লাগিয়াছে।

রাত্রে আনন্দ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি দশটা হইবে। আসিয়াই শুনিল, অবিনাশবাবু দু-তিন বার তাহার খোঁজ করিয়াছেন। সকাল বেলা মেয়ে দেখানর পর হইতে আনন্দ আর অবিনাশবাবুর বাড়ী যায় নাই। অনুপমাকে অপছন্দ করিয়া গিয়াছে—এই অতি রূঢ় সংবাদটা সে অসুস্থ অবিনাশবাবুকে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। অথচ—

সেবক-সমিতির একটি ছেলে আসিয়া বলিল, "আনন্দদা, আপনি একবার আসুন। অবিনাশবাবুর জ্বর ১০৪ ডিগ্রী হয়েছে। আমরা ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন, 'বাথ্' দিতে।"

"আচ্ছা—তোরা গরম জল তৈরি কর, আমি আস্‌ছি।" বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল।

গিয়া দেখিল, বৌদিদি তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন—"কিছু আক্কেল নেই তোমার! কটা বাজে বল তো?"

অপ্রস্তুত আনন্দ বলিল, "আমার ভাত ঢাকা দিয়ে তোমরা খেয়ে নিলেই পার! দাও, তবে বেশী দিও না, ক্ষিধে নেই!"

বৌদিদি বলিলেন, "আজকাল ঠাকুরপোর ক্ষিধে-তেষ্টা সবই কমে গেছে দেখছি! ও-বাড়ীর মেয়েটি বেশ,—না?"

আনন্দ কিছু বলিল না। আসনটা পাতিয়া বসিল। তাহার পর বলিল, "ছি বৌদি, ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক নয়, বিশেষতঃ তার অসাক্ষাতে।"

আনন্দ বৌদিদির মুখে ও-বাড়ির মেয়েটির সম্বন্ধে ইঙ্গিত শুনিয়া চটিয়া উঠিয়াছিল। ভয়ও পাইয়াছিল।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন,—"না-না, রসিকতা নয়—সত্যি মেয়েটি বেশ ভালই। ভালকে ভাল বলব না? ওরা যদি ব্রাহ্মণ হত তাহলে বেশ হত!"

আনন্দ জিনিসটাকে লঘু করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "আমি ভাবছি তুমি যদি বোবা হতে বেশ হত। দাদা কোথায়?"

"তিনি সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। বোধহয় তাসের আড্ডায়।"

অবিনাশবাবু মাঝে মাঝে দুই-একটা ভুল বকিতেছেন। রাত্রি দুইটা হইবে।

আনন্দ বসিয়া একখানি বই পড়িতেছে।

ঘরে অনুপমা নাই।

অবিনাশবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "রেখে দাও তোমার গান্ধী!" আনন্দ জলপটি বদলাইয়া হাওয়া করিতে লাগিল। খানিকক্ষণ হাওয়া করিবার পর অবিনাশবাবুর যেন একটু ঘুম আসিল। আনন্দ আবার পুস্তকে মনোযোগ দিল।

মনোযোগ স্থায়ী হইল না। বইটা সে রাখিয়া দিল।

তাহার পর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে দালানে গেল। দালানে গিয়া ধীরে ধীরে পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু বেশী দূর নয়।

অর্ধ-মুক্ত জানালা দিয়া সে দেখিল, অনুপমা ঘুমাইতেছে!

শাড়ীর পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তেমনি নিঃশব্দ-পদে আবার সে ফিরিয়া আসিল।

'টং'—ঘড়িতে আড়াইটা বাজিল!

আর একটা ছেলে নীচে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল!

সেবক-সমিতির একটি ভলাণ্টিয়ার। আনন্দ তাহাকে জাগাইল।

"ওরে তুই একটু ওঠ। আমি স্টেশনে যাব একবার, এই গাড়ীতে বরফ আসার কথা আছে। ঘুমিয়ে পড়বি না তো?"

"নাঃ"—বালক উঠিয়া বসিল।

আনন্দ এখনি বাহির হইয়া যাইতে চায়। নিজের উপর আস্থা সে ক্রমেই হারাইয়া ফেলিতেছে। ট্রেন আসিতে এখনও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী আছে। থাকুক।—সে বরং রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবে। এখানে থাকা ঠিক নয়।

"কোথা যাচ্ছেন?"

আনন্দ পিছন ফিরিয়া দেখিল—অনুপমা! "একি, তুমি ঘুমওনি!"

"ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমটা ভেঙে গেল!—কোথা যাচ্ছেন আপনি? বাবা এখন কেমন আছেন?"

"সেই রকমই। আমি স্টেশনে যাচ্ছি বরফ আনতে।"

বলিয়া সে নামিয়া যাইতেছিল, অনুপমা বলিল, "বাইরে ঠাণ্ডা। আপনি বরং একটা কিছু গায়ে দিয়ে যান!"

বলিয়া সে নিজের র‍্যাপারটা আনিয়া দিল।

স্টেশনের 'ওভারব্রিজে' দাঁড়াইয়া অনুপমার র‍্যাপারটা সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আনন্দ অনুপমাকেই ভুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

দূরে 'সাইডিং'-এ একটা এঞ্জিন একটানা শব্দ করিয়া চলিয়াছে—সস্‌সস্‌—।

ট্রেন আসিল।

আনন্দ নামিয়া গেল। প্রত্যেক কামরায় খোঁজ করিল। কই জালালপুর হইতে বরফ লইয়া কেহ আসে নাই তো!

এই শীতকালে বরফ পাওয়া মুশকিল ব্যাপার। কি করা যায়? দেখা যাক—কাল আটটার ট্রেনটাতে যদি আসে।

—"কি হে আনন্দ—কোথা যাচ্ছ!"

দেখিল, রেলের এক চেনা বাবু। গোল-লণ্ঠন হাতে। রুপোলি বড় বড় বোতাম লাগান গলা-বন্ধ কোট। কাঁধের উপর রেল কোম্পানীর লেবেল মারা T. T. C.।

"কোথায় যাব আবার! বরফ আসার কথা ছিল।—কই দেখতে তো পাচ্ছিনা কাউকে!"

"বরফ কেন?"

"এক ভদ্রলোকের টাইফয়েড হয়েছে—তাঁর জন্যে!"

"ও বুঝেছি বুঝেছি। বৃন্দাবনদা বলেছিলেন বটে আজ ক্লাবে। ভদ্রলোকের বুঝি এক মেয়ে আছে!"

আনন্দ বলিল—"হ্যাঁ! কেন?"

"না এমনি। বৃন্দাবনদা বলছিলেন কিনা, মস্ত মাগী, অথচ বিয়ে হয়নি। বিয়ে দিলে অ্যাদ্দিন—" তাহার পর হঠাৎ থামিয়া আনন্দের পিঠটা চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, "বেড়ে আছ তুমি আনন্দ!—"

ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চলতি-ট্রেনে টি-টি-সি লাফাইয়া উঠিলেন। উঠিয়া টুপিটা খুলিয়া আনন্দকে গুডবাই করিয়া বলিলেন, "চলি। Wish you good luck."

তাঁহার বিকশিত দন্তগুলি আনন্দকে যেন কামড়াইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল!

॥ সাত ॥

গায়ে গলা-বন্ধ কোট। পায়ে ফিতা-বিহীন স্প্রিং-এর জুতা—পরনে থান-কাপড়, কদমছাট চুল। কানে খড়কে গোঁজা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনীতে একটি অষ্ট-ধাতুর অঙ্গুরীয়। হস্তে পানের বোঁটায় কিঞ্চিৎ চুন। পান চিবাইতে চিবাইতে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন-মোহন রায় আপিসে যাইতেছেন। আনন্দের বৈমাত্রেয় দাদা বৃন্দাবনবাবুর প্রবীণ-মহলে নিষ্ঠাবান বলিয়া খাতির আছে। আহ্নিক না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না। মাছ-মাংস খাওয়া বিরোধী,—হিন্দুরাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন এবং হিন্দুত্ব বজায় রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টাও করেন। আপিসে পিপাসা পাইলে তিনি মৈথিল ব্রাহ্মণ চাপরাশিকে দিয়া লোটা মাজাইয়া সম্মুখস্থ কূপ হইতে জল উত্তোলন করাইয়া, জুতা খুলিয়া—আলগোছে তাহা পান করেন,—ইহা আপিসস্থ সকলেই জানে! আপিসের সাহেবরা বৃন্দাবনবাবুকে উপযুক্ত কর্মচারী বলিয়াই মনে করেন এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে খাতিরও করেন। বৃন্দাবনবাবু যদিও সম্মুখে গদগদ হইয়া তাঁহাদের সেলাম করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইতেন, আড়ালে কিন্তু তিনি তাঁহাদের সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা ভদ্ররুচি বিগর্হিত। "গোখাদক ম্লেচ্ছব্যাটারা"—ইহাই ছিল তাঁহার মৃদুতম সম্ভাষণ।—অবশ্য আড়ালে।

এই সব কারণে প্রবীণ বিজ্ঞ মহলে বৃন্দাবনবাবুর একটি শ্রদ্ধার আসন ছিল।

যাহারা অপেক্ষাকৃত কম বিজ্ঞ, তাহারা কিন্তু বৃন্দাবনবাবুকে এতখানি শ্রদ্ধা করিত না। এমন কি, দুইচারিজন অপরিণতমস্তিষ্ক যুবক তাঁহাকে "বাস্তু ঘুঘু" আখ্যা দিতেও দ্বিধা করে নাই। পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু দুই-চারিজন এমন সন্দেহও করিত যে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাস খেলিবার অছিলায় বৃন্দাবনবাবু যে-গৃহে যাতায়াত করেন, এবং যে কারণে যাতায়াত করেন তাহার মূলে সেই গৃহের বিধবা পুত্রবধূটি! কু-লোকে নানারূপ গুজব রটাইয়া থাকে—তাহার উল্লেখ আর না-ই করিলাম।

বৃন্দাবনবাবু আপিস যাইতেছিলেন এমন সময় গলির মোড়ে আনন্দের সহিত তাঁহার

দেখা হইয়া গেল। আনন্দ সাধ্যপক্ষে তাহার দাদার সম্মুখীন হইত না। এবং দৈবাৎ দেখা হইলে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিত। আজ কিন্তু সে সক্ষম হইল না।

বৃন্দাবনবাবু পানের বোঁটাটায় একটা কামড় দিয়া বলিলেন, "ওরে শোন। একটা দরকারী কথা আছে"—বলিয়া তিনি পকেট হইতে পোস্টকার্ড একখানি ও চশমার খোলটি বাহির করিলেন। "কাশী থেকে পরেশবাবুর চিঠি এসেছে। তুই, বেড়াতে যাচ্ছি বলে কাশী গিয়ে বসে রইলি, অথচ আমাকে একটা ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে গেলি না! আবার খরচ করে যেতে হবে তো?"

আনন্দ প্রমাদ গণিল। মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, "এখন ওসব কথা থাক। পড়াশোনা করতে করতে এখন বিয়ে করাটা ঠিক নয়!"

বৃন্দাবন বলিলেন, "আহা, তুমি ঠিক নয় বললেই তো চলবে না! ও-দিকে মেয়ের বয়স যে হুহু শব্দে বেড়ে চলেছে। পরেশবাবু হিন্দু ব্রাহ্মণ—তার মুখে অন্ন রুচছে না। তিনি লিখেছেনও তাই।"—বলিয়া বৃন্দাবনবাবু চশমাটি পরিধান করিয়া পোস্টকার্ডখানি তুলিয়া ধরিয়া পড়িলেন, "কি বলিব বৃন্দাবনবাবু, মেয়ের বয়স তেরো পার হইয়া চোদ্দতে পড়িল—আমার রাত্রে নিদ্রা ও দিনে আহার ঘুচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আজকাল যা দিনকাল পড়িয়াছে, আমার সহধর্মিণী সর্বদা ভয়ে কাঁটা হইয়া থাকেন, কখন কি অনর্থ ঘটিয়া যায়!' এখন শুনলে ত? এ অবস্থায় আর দেরী করা ঠিক নয়। আমি তো মনে করছি আগামী মাঘমাসেই—"

আনন্দ বর্তমান সংকটটা এড়াইবার জন্য বলিল, "আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।"

"এতে আর ভাবা-ভাবি কি আছে? আজকাল ওই হয়েছে তোমাদের এক দস্তুর—'ভেবে দেখি!' তাছাড়া তোমার ভাবার আছে কি?—আমি যতদিন বেঁচে আছি—"

আনন্দ তর্ক না করিয়া কেবল বলিল, "তবু একটু ভেবে দেখি!"

"আরে কি মুশকিল। আমি তাদের কথা দিয়ে রেখেছি গেল আশ্বিনে। ভদ্রলোক টাকাও প্রায় হাজারখানেক অগ্রিম দিয়ে রেখেছেন"—বলিয়া তিনি কৌটা খুলিয়া কপ করিয়া এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন!

আনন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেল! হাজারখানেক টাকা অগ্রিম লওয়া হইয়া গিয়াছে! সে কি একটা পণ্য-দ্রব্য? খরিদ্দার পূর্ব হইতে দাদন দিয়া গিয়াছে।

বৃন্দাবনবাবু বলিলেন, "তাহলে একটা দিন-স্থির—"

আনন্দ হঠাৎ বলিয়া বসিল, "টাকা ফেরৎ দিন। ওখানে আমি বিয়ে করবো না।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল!

বৃন্দাবনবাবুর বিস্মিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "মানে?" কিন্তু তাহা তিনি ছাড়া আর কেহ শুনিল না।

বৃন্দাবনবাবু আপিস চলিয়া গেলেন। আনন্দ বাড়ীতে আসিয়া নিজের ঘরে খিল দিল! দাদার কাণ্ড দেখিয়া সে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু বিস্মিত হয় নাই। স্বার্থের জন্য দাদা সবই করিতে পারেন। যাক সে কথা। আনন্দ অনুপমার কথা ভাবিতে লাগিল। জীবনে কোন স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাহার এরূপ মনোভাব কখনও হয় নাই। দুই চারি দিন মাত্র আলাপ, অথচ অনুপমার চিন্তাই তো সে সারাক্ষণ করিতেছে! অনুপমার দাদা অশোক কেমন লোক? সে তো টেলিগ্রাম করা সত্ত্বেও আসিয়া পৌঁছিল না!

ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাইতেছে না। অবিনাশবাবুর জ্বর খুব বাড়াবাড়ি—১০৩ হইতে ১০৪, কখনও বা ১০৫ পর্যন্ত উঠিতেছে। নবীনবাবু বলিলেন, বুকেও নাকি সর্দি বসিয়াছে। বেশ প্রলাপ বকিতেছেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল, জামালপুর হইতে বরফ কিছু আসিয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতে কুলাইবে না। জামালপুরে একজন ভলান্টিয়ারকেই পাঠাইতে হইবে। খানিকটা ভাল টিঞ্চার ডিজিটেলিস্‌ও আনাইতে হইবে—নবীনবাবু বলিয়াছেন। কাহাকে পাঠানো যায় আনন্দ ভাবিতে লাগিল।

আর এক উপদ্রব আসিয়া জুটিয়াছে, তেলিপাড়া ভারতী নাট্যসমাজ। তাহারা আনন্দকে আসিয়া ধরিয়াছে, ষ্টেজ ম্যানেজমেন্টের ভার তাহাকে লইতে হইবে। দুই-চারিজন ভলান্টিয়ারও তাহাদের চাই। স্কুলের ছেলেরা থিয়েটার লইয়া বেশী মাতামাতি করে, ইহা আনন্দের ইচ্ছা নয়। তথাপি কিছু-একটা রফা করিতে হইবে! কারণ, তেলিপাড়ার বাবুরা সেবক সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং লোকও ভাল। একটু থিয়েটারপ্রবণ এই যা। এই সময় মৃণালটা কোথা গেল! তাহাকে ভিড়াইয়া দিলেই, সব গোল চুকিয়া যাইত। মৃণালও তাহার জীবনে একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লবণ-আইন-অমান্য করার দরুণ জেল খাটিয়া মৃণাল যেন বদলাইয়া গিয়াছে। সর্বদাই কি যেন ভাবে। মাঝে মাঝে তাহাকে শুধু বলে, "আমার আদর্শ বদলাইয়াছে।" হঠাৎ আনন্দ আবিষ্কার করিল যে এত চিন্তার মধ্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অনুপমার চিন্তা তাহার মনে সমানে বহিয়া চলিয়াছে। দুয়ারে ধাক্কা পড়িল—কপাট খুলিয়া দেখে বৌদিদি!

বৌদিদি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "ঘরে খিল দিয়ে কি হচ্ছে? ও-বাড়ী থেকে তোমাকে ডাকতে এসেছে! চা খেয়ে তবে যাও।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আনন্দ বাহিরে গিয়া দেখিল, মধুয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া মধুয়া বলিল, "কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে। দিদিমণি আপনাকে একবার ডাকছেন! সময় হবে কি আপনার এখন!"

আনন্দ বলিল, "আমি চা খেয়েই যাচ্ছি।"

ভিতরে যাইতেই বৌদিদি বলিল, "এত বেলায় চা আর না-ই খেলে! ভাত তো রান্না হয়ে গেছে।"

আনন্দ বলিল, "তুমিও বৌদি পেছনে লাগলে! Thou too Brutus! সংসারের নানাবিধ জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে তুমিই একমাত্র লোক আছ যেখানে—"

বৌদিদি বলিলেন, "থাক্‌ থাক্‌—বোঝা গেছে! সেদিন সামান্য একটা জামার ছিট এনে দিতে বল্লাম, বলা হল, এখন সময় নেই! ভোঁদাকে দিয়ে আনাতে হল! সে বিচ্ছিরি এনেছে!"

আনন্দ গম্ভীর মুখে বলিল, "একটা লোক টাইফয়েডে ভুগছে। নিতান্ত অসহায়—বিদেশে একা। তার কাজটা আগে করা উচিত, না তোমার ছিট্‌ খুঁজে বেড়ান উচিত? বল! আচ্ছা—আজই তোমার ছিট্‌ এনে দিচ্ছি! ব্লাউসের তো? কি ধরনের চাই?"

আসল কথা, বৌদিদির ছিটের আর প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সাধারণতঃ বৌদিদি-জাতীয় মহিলাদের এ সম্বন্ধে মাথার ছিট্‌ আছে, তাই তিনি বলিলেন, "ওই ও-বাড়ীর মেয়েটি একটি জামা পরে বেড়ায়—দেখনি তুমি?"

"কোন্‌ বাড়ীর মেয়েটি?"

“আহা, কিছু যেন বুঝতে পারছেন না ! ওই তোমার অনুপমা গো—! সেই যে কাল বিকেলে পরেছিল—চকোলেট রংএর উপর লাইট্ হলুদ রঙের ফুট্ফুট্ দাগ—”

আনন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল, “বেশ। আজ খুঁজে আনব।”

অন্যমনস্ক হইয়া আনন্দ চা শেষ করিয়া উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় বৌদিদি আবার বলিলেন, “দেখ, ডবল বহর যদি হয়, তাহলে এক গজ আর সিংগল্ বহর হলে কিন্তু দেড় গজ লাগবে।”

আনন্দ অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিল, “আচ্ছা।”

বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

অবিনাশবাবুর বাড়ী গিয়া আনন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল অনু কাঁদিতেছে !

“কি হল ? কাঁদছ যে !”

অনুপমা একটি পত্র আনন্দের হাতে দিল। পত্রে লেখা—

অনু দেবী,

আপনার টেলিগ্রাম যথাসময়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি—অশোকবাবুকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। পলিটিক্যাল সাস্পেক্ট—এই অজুহাতে। যদি আপনারা প্রয়োজন মনে করেন, আমি যেতে পারি। টেলিগ্রাম করবেন তাহলে।

বিমান।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “বিমান কে ?”

“দাদার একজন বন্ধু।”

“তোমার সংগে আলাপ আছে না কি ?”

“হ্যাঁ, খুব। আমাদের বাড়ীতে সেবার সমস্ত পূজা ভেকেশানটা কাটিয়ে এসেছেন।”

আনন্দের মুখটা অকারণে অন্ধকার হইয়া উঠিল।

অনুপমা কহিল, “বিমানবাবুকে কি টেলিগ্রাম করব—আসতে ?”

“সেটা আমি কি করে বলব। তুমি যা ভাল বোঝ কর। তোমার যখন এমন বিশেষ বন্ধু—তখন বিপদের সময় ডাকা উচিত। এখন কোন কাজ নেই তো ?—চললাম !”

বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আনন্দ বাহিরে চলিয়া গেল। এমন আকস্মিকভাবে আনন্দ কোন দিন চলিয়া যায় নাই। আজ হঠাৎ এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অনুপমার অধরে অতি-ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

ছানার জল করিতে হইবে।

অনুপমা স্টোভ জ্বালিতে বসিল।

স্টোভে স্পিরিট ঢালিয়া দেশলাই জ্বালিয়া বসিয়া-বসিয়া স্বচ্ছ নীল শিখাটি দেখিতে দেখিতে অনুপমা ভাবিতে লাগিল, বিমানবাবুর চিঠি দেখিয়া আনন্দবাবু অমন করিয়া হঠাৎ চলিয়া গেলেন কেন ?

তাহার অধরে ক্ষীণ হাস্যরেখাটি আবার ফুটি ফুটি করিতে লাগিল !

॥ আট ॥

আনন্দ তাহার শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজকে এড়াইয়া চলিতেছে। আপিস হইতে ফিরিয়া তিনি আনন্দের খোঁজ লইয়াছিলেন, আনন্দ ত্রিসীমানায় ছিল না! সন্ধ্যাহ্নিক, আহারাদি প্রভৃতি সারিয়া যখন তিনি তাদের আড্ডায় যাইবার আয়োজন করিতেছেন—তখনও তিনি আর একবার আনন্দের সন্ধান করিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ভোঁদা আসিয়া বলিল যে অবিনাশবাবুর বাড়ীতেও আনন্দ নাই—তাহারা বলিল, চারিটার পর হইতে সে আর ও-বাড়ীতে যায় নাই। মলিদার কমফরটারটা গলায়, কানে এবং মাথায় বেশ করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বৃন্দাবনবাবু খবরটা শুনিলেন। তাহার পর ভোঁদাকে বলিলেন, “তোর মাকে ডাক।”

ভোঁদার মা আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আনন্দ কোথায় গেছে জান গা ?”

“বলতে পারি না তো—”

“রাত্রে যখন খেতে আসবে, বলো তো যে আমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা না করে যেন কোথাও না বেরোয়।—বুঝলে ?”

“আচ্ছা।”

কোণ হইতে লাঠিটা তুলিয়া লইয়া বৃন্দাবনবাবু নৈশভ্রমণে বাহির হইলেন।

খানিকটা ছিট্ বগলে করিয়া আনন্দ রাত্রি ন'টা নাগাদ বাড়ী ফিরিল! ছিট্ দেখিয়া বৌদিদি উল্লসিতা! বৌদিদির যাহা কিছু সখের সামগ্রী আনন্দই তাহা চিরকাল আনিয়া দিয়াছে, হয় নিজের স্কলারশিপের টাকা দিয়া, না হয় নিজের হাতখরচ হইতে পয়সা বাঁচাইয়া। বৃন্দাবনমোহন এই সব বিলাসিতার সমর্থন করিতেন না। কিন্তু রোধও করিতেন না। আপিসে যেমন তাঁহার সহিত বড়সাহেবের সম্পর্ক, বাড়ীতে তাঁহার নিজের সহিত স্ত্রীর সম্পর্ক অবিকল সেইরূপ ছিল। বড়সাহেব যেমন নিম্নতন কর্মচারীদের তুচ্ছ দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করেন, গৃহস্থালির বড়সাহেব বৃন্দাবনবাবু তেমনি এইসব সামান্য বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি ছোটখাটো অপরাধ দেখিয়াও দেখিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মহত্ত্ব ছিল স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার দুইটি বিষয়ে কড়া নজর ছিল—স্ত্রীর সতীত্ব ও গৃহকর্মনিপুণতা! স্ত্রীর সহিত তিনি কথাবার্তা কমই বলিতেন—কিন্তু যখনই বলিতেন উপরোক্ত দুইটি বিষয় লইয়াই বলিতেন। বাজে-কথা—বিশেষতঃ স্ত্রী-জাতির সহিত—বৃন্দাবনবাবু একেবারেই পছন্দ করিতেন না। লোকে কিন্তু—যাক্ সেকথা!

আনন্দ বৌদিদির মারফৎ দাদার আদেশ শুনিয়া বলিল, “তুমি দাদাকে বলে দিও—এ বিয়ে আমি কিছুতেই করতে পারব না! তিনি যেন আমাকে মাপ করেন!”

“বেশ তো বাবু, তুমি নিজেই বলো। আমার এসব বিষয় নিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে।”

“না, আমি আর এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করব না!”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজও তুমি যাবে নাকি ও-বাড়ীতে।”

"দেখি—!"

আহারাদি শেষ করিয়া আনন্দ বাহির হইয়া গেল।

॥ নয় ॥

আনন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইল বটে—কিন্তু কোথায় যাইবে ঠিক ছিল না। অবিনাশবাবুর চিকিৎসা ও সেবা ঠিকই চলিতেছে, সেবা-সমিতির বালকগণ ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহার বার-বার না গেলেও চলে। বস্তুতঃ অকারণে যাওয়াটা তাহার নিজেরই যেন নিজের কাছে খারাপ লাগিতেছে। সে নিজের কপটাচরণ নিজেই যেন ধরিয়া ফেলিয়াছে—সে সহসা আবিষ্কার করিয়াছে যে অবিনাশবাবুর অসুখের ছুতা করিয়া আসলে সে বার-বার অনুপমার কাছেই যাইতে চায়। আবিষ্কার করিয়া অবধি সে মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া আছে। ঠিক করিয়াছে, বিনা প্রয়োজনে সে আর অবিনাশবাবুর বাসায় যাইবে না। অন্যায় হইতেছে।

রেল-লাইন পার হইয়া সে মাঠের দিকে অগ্রসর হইল। অন্ধকার মাঠ। জনপ্রাণীশূন্য! মাঠের প্রান্তে দূরে একটা পাকা বাড়ী আছে বটে, কিন্তু এই শীতে কপাট জানালা সব বন্ধ।

একাকী অন্ধকারে আনন্দ প্রেতের মতন মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত কথা মনে হইল। এই মাঠে কত খেলায় সে জিতিয়াছে ও হারিয়াছে। কত আঘাত পাইয়াছে ও দিয়াছে। আশৈশবের ক্রীড়াভূমি এই মাঠ—অন্ধকারে জননীর মত তাহার আর্ত মনে যেন সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিল!

কত বন্ধুবান্ধবের কথা মনে হইল। কে কোথায় ছড়াইয়া গিয়াছে। স্কুলের সহপাঠী রামদেও, হরেন, নন্দকিশোর, ললিত—কোথায় তাহারা এখন! নিতাই কি এখনও বাঁচিয়া আছে? স্কুল-জীবনে নিতাই ছিল তাহার ধ্যান, জ্ঞান। নিতাই যদি মেয়ে হইত তাহাকে ঠিক সে বিবাহ করিত। নিতাই এখন কোথায়?—যাহাকে না হইলে একদণ্ড চলিত না—তাহার কথা এখন আর কই মনেও পড়ে না তো!

কোথায় সেই রসিকলাল? তাহার টিকি লইয়া অহরহ সকলে ঠাট্টা করিত। বেচারীকে ভাল-মানুষ পাইয়া একদিন সকলে তাহার টিকিটা কাটিয়া পর্যন্ত দিয়াছিল। রসিকলাল বেচারী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। কোথায় সে এখন। বাল্যকালের বিস্মৃতপ্রায় সঙ্গীদল এই অন্ধকার মাঠে যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। থাকিবার মধ্যে আছে এক মৃণাল। এই একমাত্র লোক যে তাহার আশৈশব সহচর। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন হইতে মৃণালের একি খেয়াল হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে না। মৃণালের বহু বক্তৃতা সে বহু গোপন স্থানে বসিয়া শুনিয়াছে—কিন্তু আজও সে বুঝিতে পারে নাই—কি ব্যাপারে সে লিপ্ত আছে। অথচ মৃণাল খুলিয়া কিছু বলে না। আভাসে-ইঙ্গিতে সে বলে, কার্যটি দুরূহ। বুধবারে সে সব খুলিয়া বলিবে বলিয়াছে—দেখা যাক্!

আশ্চর্য ছেলে এই মৃণাল! যেমন শরীর—তেমনি বুদ্ধি! মৃণাল তাহাকে বারম্বার বলিয়াছে যে কার্যে সে ব্রতী তাহাতে আনন্দের সাহায্য সে চায়। অথচ কি সে কার্য তাহা খুলিয়া বলিবে না। আগেই সে প্রতিশ্রুতি চায়! আনন্দের সাহায্য তাহার চাই-ই! তাহারও পাত্তা নাই। কোথায় সে?

হঠাৎ কাছে একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিতেই আনন্দের চমক ভাঙিল ! কোথায়-আসিয়া পড়িয়াছে ! এ যে একেবারে পাহাড়ের কাছাকাছি !

ফিরিয়া যাওয়া দরকার। ফিরিতে ফিরিতে সে আবার ভাবিতে লাগিল। দেখিল তাহার এত এলোমেলো চিন্তার মধ্যেও একটি চিন্তা তাহার মনের মধ্যে অটুট আছে তাহা অনুপমার। তাহার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিয়া অনুপমার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। আশ্চর্য !

হঠাৎ তাহার মনে হইল, অবিনাশবাবুর অসুখ যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে !—সে তো কাহাকেও কিছু বলিয়া আসে নাই, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাকে তো কেহ খুঁজিয়া পাইবে না।

যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে সে ফিরিতে লাগিল। অন্ধকারে তাড়াতাড়ি রেল-লাইন পার হইতে গিয়া সে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। হাঁটুটা বোধহয় ছড়িয়া গেল !

গলিটার মোড়ে আসিয়া সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। মিউনিসিপালিটির বাতিটা হেলিয়া-পড়া পোস্টের উপর হইতে যৎসামান্য আলোক বিকীরণ করিতেছে। সামনের একটা বাড়ীর পাকা বারাণ্ডায় একটা কুকুর কুণ্ডলী-পাকাইয়া শুইয়া আছে। পদ-শব্দ পাইয়া কতকগুলা ছুঁচা কিচকিচ করিয়া সরিয়া পড়িল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

অতি ধীরে ধীরে চোরের মতন, আনন্দ অবিনাশবাবুর বাড়ীটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশবাবুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। তাহার পাশের ঘরের জানালায় মনে হইল যেন অনুপমা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল।

আনন্দ একবার নিজেদের বাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত চুপচাপ। তখন সে ধীরে ধীরে ডাকিল, "বিনয় !"

"যাই"—বলিয়া একটি বালক আসিয়া বাতায়নে দাঁড়াইল।

"কপাটটা খুলে দিয়ে যা—"

"যাই"—বলিয়া বিনয় নামিয়া আসিল ! আসিয়া বলিল, "বাঃ কপাটটা তো খোলা রয়েছে ! আমি যে বন্ধ করে গেলাম ! খুললে কে ?"

আনন্দ ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন অবিনাশবাবু এ বেলা—"

"ভাল না। জ্বর একটু আগে দেখেছিলাম ১০৪ ডিগ্রী ! সর্বদাই বিড় বিড় করে কি বক্‌ছেন—আর বিছানায় কি যেন খুঁজছেন।"

"অনুপমা জেগে আছেন না কি ?"

"এক্ষুণি তো জেগে ছিলেন।"

আনন্দ আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। উঠিয়া দেখিল, আপাদ মস্তক ঢাকা দিয়া অনুপমা ঘুমাইতেছে। কে বলিবে এখনই জাগিয়াছিল !

আনন্দ অবিনাশবাবুকে দেখিয়া ধীরে ধীরে আবার নামিয়া চলিয়া গেল। ভারতী নাট্যসমাজে একবার যাওয়া দরকার ! অনেক করিয়া তাহারা বলিয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে তাহার মনে হইল, অনুপমা কি সত্যই ঘুমাইতেছে ?

॥ দশ ॥

পরদিন আনন্দের উঠিতে বেলা হইল। শুইতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল। উঠিয়াই বৃন্দাবনমোহনের সহিত দেখা হইয়া গেল। কানে পৈতা-জড়ান বৃন্দাবন আনন্দকে দেখিয়া বলিলেন, "বেলা আটটা পর্যন্ত শুয়েই থাকবি না কি ? উঠে পড়।"

আনন্দ উঠিয়া পড়িল। পলাইতে পারিল না।

বৃন্দাবনমোহন বলিলেন, "কাশীর ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলতে চাই। ও-সব ছেলেমানুষী ছাড়—"

আনন্দ চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনমোহন ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন, "চুপ করে থেকে লাভটা কি বল! 'হাঁ' 'না' একটা কিছু বলতেই তো হবে! এক্ষেত্রে যখন 'না' বলার পথটা বন্ধ, তখন 'হাঁ' বলাটাই ভাল! শুনেছি মেয়েটি দেখতে বেশ সুশ্রী—তোকে যা-তা একটা ধরে দিতে চাই না।"

আনন্দ উপস্থিত বিপদটা এড়াইয়া যাইবার জন্য বলিল, "তার চেয়ে আপনি নিজে একবার দেখে আসুন।"

"তুই বাপু নিজেই যা না।"

"না, আমি যাব না।"

"এই শীতে আমাকে আবার কাশী পর্যন্ত দৌড়তে হবে! আচ্ছা বেশ, তাই হবে।"

আনন্দ রেহাই পাইয়া হাঁফ ছাড়িল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া সে যখন বৌদিদির কাছে চা পান করিতে গেল, তখন বৌদিদি একটি খবরের মতন খবর দিলেন।

"ও-বাড়ীর মেয়েটি এসেছিল একটু আগে! বেশ সুন্দর কথাবার্তা।"

আনন্দ আশ্চর্য হইয়া গেল।

"হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে কেন ?"

"চায়ের দুধ নিতে এসেছিল। তোমার সেবক-সমিতির ছেলেরা সব ঘুমুচ্ছে। মধুয়া বাজারে গেছে। নিজেই এসেছিল বেচারী!"

"তার বাবা কেমন আছেন ?"

"ভাল নয়। বাঁচবে তো ? মেয়েটির মুখখানি ভারী শুকনো!"

"ভগবান জানেন"—বলিয়া আনন্দ চায়ের বাটিতে চুমুক দিল। তাহার মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা আপসোস ঘনাইয়া উঠিতেছিল। আহা, অনু আসিয়াছিল, অথচ সে গাধার মত শুইয়া ঘুমাইতেছিল!

নীরবে চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া আনন্দ উঠিতে যাইবে এমন সময় বৌদিদির কোল হইতে বুঁচকি বলিয়া উঠিল, "তা-তা।"

"শুনছ ঠাকুরপো, তোমাকে ডাকছে! একটু কোলে নাও বেচারীকে! অবিনাশবাবুরা এসে-থেকে এদের আর ছোঁওনি তুমি!"

আনন্দ হস্ত-প্রসারণ করিতেই বুঁচকি ঝাঁপাইয়া কোলে আসিল। আনন্দ তাহাকে

লইয়া বাহির হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিল, থানার দারোগা বিনোদবাবু আসিয়া বসিয়া আছেন।

"নমস্কার বিনোদবাবু! খবর কি?"

বিনোদবাবু ও আনন্দ পরস্পর পরিচিত। বিনোদবাবু আনন্দকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। বিনোদবাবু বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, প্রাইভেটে।"

"খুকীটাকে দিয়ে আসি তাহলে।"

খুকীকে দিয়া আনন্দ ফিরিয়া আসিল। কহিল, "চলুন বেরোনো যাক।" পথে চলিতে চলিতে বিনোদবাবু বলিলেন, "আপনাদের বাড়ীর সামনে যে ভদ্রলোকেরা এসেছেন, চেনেন আপনি তাঁদের?"

"আগে আলাপ ছিল না, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তারপর এসেই অসুখে পড়েছেন সেই সূত্রে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে।"

"কে কে আছেন ও বাড়ীতে?"

"অবিনাশবাবু আর তাঁর এক মেয়ে। তাঁর এক ছেলে—"

"ওই ছেলেই তো যত গোল করেছে মশাই! কলকাতায় পলিটিক্যাল সাসপেক্ট বলে তাকে ধরেছে! আমার উপর হুকুম এসেছে বাড়ী সার্চ করতে। শুনলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ—তাই আপনাকে একবার—প্রাইভেটলি—"

আনন্দ ভয় পাইয়া গেল।

"বাড়ী সার্চ? সে তো অসম্ভব! অবিনাশবাবুর টাইফয়েড, নবীনবাবু বলছেন সীরিয়স ব্যাপার। এ অবস্থায় সার্চ করা—"

বিনোদবাবু লোকটি ভাল। দেখিলে মনে হয় না তিনি কোন নিষ্ঠুর কার্য করিতে পারেন। ধপধপে ফর্সা রঙ। নাকের ডান পাশে একটি কালো আঁচিল—এই আঁচিলটাই ছিল তাহার মুখের মধ্যে একটু খুঁৎ তাহা না হইলে বিনোদবাবুকে সুপুরুষই বলা চলে! তিনি বলিলেন, "সার্চ তো করতেই হবে। তবে অবিনাশবাবুর যাতে কোন কষ্ট না হয় সেটা আমরা দেখব। তাছাড়া আপনি যখন রয়েছেন এ ব্যাপারে—কোন রকম—সে কথা বলাই বাহুল্য। বুঝলেন কি না আমাদের চাকরি! কিছু মনে করবেন না! চলুন তাহলে।"

"হ্যাঁ—সেরেই ফেলা যাক্—"

বলিয়া বিনোদবাবু ফিরিলেন। আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

সার্চ করিয়া বিশেষ কিছু বাহির হইল না।

বিনোদবাবু কার্য-সমাধা করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বারম্বার ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া গেলেন। সত্যই লোকটি ভাল।

কিছুক্ষণ পরে নবীনবাবু আসিলেন।

সব কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উত্তেজনার চোটে ষ্টেথোস্কোপটা বার-দুই তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল!

"তার মানে? পুলিশ এসেছিল?—আমাদের বিনোদ-দারোগা! ডেঞ্জারাস লোক তো! মুচকি মুচকি হাসে, দেখলে মনে হয় খুব ভালমানুষ! পেশেন্টের বিছানার নীচেও সার্চ করেছে? সারলে দেখছি। টাইফয়েড রুগী—সীরিয়স কেস! সটান এসে রুগীটাকে ডিস্টার্ব করে গেল! তার কি এটা জ্ঞান নেই যে এসব রুগীর নাড়াচাড়া

একেবারে বারণ ! হঠাৎ একটা স্লাফ আলগা হয়ে গেলেই তো বাস—খতম—সারলে দেখছি ! আজ কদিন হল ?”

আনন্দ বলিল, “আজ তেরো দিন !”

“কাল রাত্রে কেমন ছিলেন ?”

আনন্দ বলিল, “এই বিনয়, বল ।”

বিনয় একটা খাতা দেখিয়া মুখস্থ করার মত বলিয়া গেল, “কাল রাত্তির নটায় টেম্পারেচার ১০৩·৪, বারটায়, ১০৩·৬, তিনটের সময় ১০৩, ছটার সময় ১০২·৮, এখন ১০৩·২ । ইউরিন মাত্র একবার হয়েছিল ।”

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভুল বকছিলেন ?”

“হ্যাঁ ! বিড় বিড় করে —”

নবীনবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সব শুনিলেন । রোগী দেখিলেন । তাহার পর বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “সুবিধে নয়—! আনন্দ দেখিস এ ছেলেগুলো যেন ভাল করে হাত-টাত ধোয় । এদের কারো হলেই তো গেছি !”

আনন্দ বলিল, “আচ্ছা ।”

টেলিগ্রাম করিতে হয় নাই ।

স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিমানবাবু পরদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন—পশ্চাতে কুলী । কুলীর মাথায় খাকি ওয়াড়-দেওয়া চামড়ার সুটকেস । তদুপরি একটি হোল্ডল । ভদ্রলোকের গলায় মাফলার জড়ান—গায়ে হালফ্যাশানের চেস্টারফিল্ড, চেস্টারফিল্ডের দুই পকেটে ভর্তি কমলালেবু ! হস্তে নেভিকাটের টিন—বগলে একটি বিলাতী মাসিক-পত্র, চক্ষে হোয়াইট গোল্ডের ফ্রেম-দেওয়া চশমা ! মুখে নিখুঁত ভদ্র-ভাব । গোঁফ-দাড়ি কামান ।

কুলী বলিল, “এহি হরেরামবাবুকা বাসা ।”

আনন্দ, নবীন-ডাক্তারের নিকট হইতে ফিরিতেছিল ।

আগন্তুক ভদ্রলোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কাকে খুঁজছেন ?”

“অবিনাশবাবু বলে একজন ভদ্রলোক—”

“হ্যাঁ—ওইটেই ! ওরে পচা, কপাটটা খুলে দিয়ে যা ।”

‘অন ডিউটি’ পচা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ।

“থ্যাঙ্কস”—বলিয়া বিমানবাবু ভিতরে চলিয়া যাইতেছিলেন এমন সময় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার নাম কি বিমানবাবু ?”

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বলিলেন, “হ্যাঁ—!”

“টেলিগ্রাম পেয়ে আসছেন বুঝি ?”

“না । কোন খবর পাই নি । তাই চলে এলাম”—বলিয়া তিনি ফিরিয়া বলিলেন, “আচ্ছা যাই—নমস্কার—!”

“নমস্কার । আমিও আসছি একটু পরে—”

আনন্দ দাঁড়াইয়া দেখিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি আধুনিক যুবক ভিতরে অনুপমার কাছে চলিয়া গেল । নিজের অর্ধ-মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবীটাকে তাহার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করিল ! হঠাৎ উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অনুপমা জানালায় দাঁড়াইয়া

আছে ! মনে হইল যেন সে আনন্দের চোখের দিকে চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। ক্ষণকালমাত্র ! তাহার পর সে সরিয়া গেল। হয়ত মনের ভুল কিন্তু আনন্দের মনে হইল, দৃষ্টিটুকু যেন মিনতি-ভরা।

আনন্দ আর উপরের দিকে না চাহিয়া সোজা নিজের বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়া বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, উনুন খালি আছে না কি ?"

মৃদু হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন, "চা চাই তো ! তোমার সাড়া পেয়েই জল চড়িয়েছি।"

"ও থ্যাংকস"—বলিয়া আনন্দ রান্নাঘরের দাওয়াতেই একটা পিঁড়ি লইয়া বসিয়া পড়িল। বলিল, "দু' পেয়ালা চা তৈরী কর। এক কাপ বিমানবাবুকে পাঠিয়ে দিই।"

"বিমানবাবু কে আবার ?"

"এইমাত্র কলকাতা থেকে এলেন ভদ্রলোক। অনুপমার দাদার ক্লাস-মেট—"

বৌদিদির বঙ্কিমচন্দ্র পড়া ছিল। হাসিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ ওসমানের আবির্ভাব হল !"

আনন্দ শুধু বলিল, "কি যে বল পাগলের মত। কেউ শুনে ফেললে কি হবে বল তো ? তোমাদের ওই এক চিন্তা—"

বৌদিদি বলিলেন, "ওদের বাড়ীতে পুলিশ এসেছিল না কি—সার্চ করতে ?"

"হ্যাঁ। অবিনাশবাবুর ছেলেকেও পুলিশে ধরেছে কলকাতায় ! মুশকিলে পড়েছেন ভদ্রলোক !—"

বৌদিদি শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি মিশো না বাপু ওদের সঙ্গে, কোথা থেকে কি হয় বলা যায় না !"

আনন্দ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "দেখা যাক—অদৃষ্টে যা থাকে সে হবে ! চা হল ?"

চা লইয়া গিয়া আনন্দ দেখিল, দালানে বসিয়া অনুপমা ও বিমান কথা কহিতেছে। বোধহয় অশোকের অ্যারেস্ট-হওয়া সম্বন্ধেই কোন কথা হইতেছিল, আনন্দকে দেখিয়া তাহারা থামিয়া গেল।

"আপনার জন্যে চা নিয়ে এলুম।"

"So very kind of you. Thanks. বসুন। অনুর কাছে সব শুনছিলাম ! ওর তো ধারণা দেখছি—আপনি মানুষ নন, দেবতা !"

"তাই না কি ? এরকম ভাবে আমাকে গালাগালি দেবার অর্থ ? আমার জটা নেই,—তিনটে চোখ, চারটে হাত, পাঁচটা মাথা, ছটা আনন, কিছুই তো নেই। যানের মধ্যে মাঝে মাঝে বাইক চড়ি। ষাঁড়, ময়ূর কিম্বা ইঁদুর-চড়া আমার পক্ষে অসম্ভব ! হঠাৎ আমাকে দেবতা বলে' অপদস্থ করবার মানে কি ?"

"না, না, ঠাট্টা নয় ! অনু সত্যিই খুব প্রশংসা করছিল আপনার—"

"কি যে বলছ তুমি বিমানদা ! না আনন্দবাবু, আমি বিশেষ কিছু বলিনি—" বলিয়া লজ্জিত অনুপমা উঠিয়া গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "অবিনাশবাবুকে দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ, দেখলাম। খুব সীরিয়স্ বলেই তো মনে হচ্ছে। নবীনবাবু বেশ ভাল ডাক্তার তো ? I mean, যদি দরকার হয় কলকাতা থেকে ডক্টর সেনকে আনাতে পারি !"

"নবীনবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে বড় ডাক্তার। প্রবীণ লোক। সদাশয় ব্যক্তি। আমরা তো ছেলেবেলা থেকে ডাক্তার মানে নবীনবাবুকেই বুঝি।"

"বুড়ো ডাক্তারেরা একটু সেকেলে ধরনের হন কি না। আজকালকার আপ-টু-ডেট্ সব চিকিৎসা—"

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কলকাতায় আপ-টু-ডেট্ চিকিৎসা করে টাইফয়েড-রোগী কি আর মরছে না আজকাল ?"

"না তা নয়—তবে— '

'তবে ?"

"তবে অনুর হয়তো একটু স্যাটিসফ্যাকশন হত।"

অনুপমা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "না—না। নবীনবাবুর হাতেই চিকিৎসা থাক। বড় যত্ন করে দেখেন উনি। বিমানদা এসে অবধি ডাক্তার সেন—ডাক্তার সেন করছেন। নবীনবাবুকে আমার তো খুব বিশ্বাস হয়।"

"একটা কিছু যদি হয়ে যায়, তখন বলো না যেন যে বিমানদা কিছু করলে না। অশোক অনুপস্থিত, এ অবস্থায় কোন ত্রুটি যেন না হয়, খরচের ভয় করি না।"

বলিয়া তিনি বিলাতী কায়দায় 'shrug' করিলেন।

অনু বলিল, "না—ওসব থাক্—"

আনন্দ বলিল, "বেশ তো, নবীনবাবু তো আজ বিকেলে আসবেন, তখন তাঁকে বললেই হবে। তিনি যদি দরকার বোঝেন, তখন ব্যবস্থা করলেই হবে।"

বিমানবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—সেই বেশ।"

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—"

অনুপমা বলিল, "সে সব হয়েছে।—আপনি আজ আসবেন তো রাত্তিরে ? কষ্ট হয়তো থাক—"

আনন্দকে বলিতে হইল, "না, কষ্ট কি ? আসব আজ।"

বৈকালে আনন্দ অবিনাশবাবুর বাড়ী যাইতে পারে নাই। তাহার স্পোর্টিং ক্লাবের মীটিং ছিল। মীটিং শেষ হইবার পর তাহার অবিনাশবাবুর বাড়ীতে গিয়া বিমানদার সহিত মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

"—কে আনন্দ না কি ? শুনেছ ?"

আনন্দ ফিরিয়া দেখিল, জীবনদা।

"কি শুনব ?"

' মৃণাল মারা গেছে—"

"অ্যাঁ—সে কি ! কি করে ? কোথায় ?"

"মুঙ্গেরে—রেলে কাটা পড়েছে !"

আনন্দের হঠাৎ মনে হইল আজই তো বুধবার—অমাবস্যা। আজই তো তাহার আসিবার কথা ছিল। মৃণালের কত কথা যে বলিবার ছিল !—অকথিত রহিয়া গেল চিরদিনের মত। এ কি সত্য ?

আনন্দ নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

॥ এগারো ॥

সেই মাঠ! আনন্দ একা আবার অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মৃণাল মারা গিয়াছে? বিশ্বাস হয় না।

বলি-বলি করিয়াও কি কথা সে না বলিয়া সহসা চলিয়া গেল। সেই তেজস্বী মৃণাল!—লোকের বিপদে কি প্রাণ দিয়াই না সেবা করিত। এই সেবক-সমিতি তো তাহারই প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি সে কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘুরিত!—জিজ্ঞাসা করিলে বলিত বৃহত্তর সত্যের সন্ধান সে পাইয়াছে। কি সে সত্য? তাহার সন্ধান সে তো আনন্দকে দিয়া গেল না। মৃণালের জীবনের কত ছোট-খাটো খুঁটিনাটি তাহার মনে পড়িতে লাগিল! ভারি অভিমানী ছিল সে। আনন্দ কাহারও সহিত বেশী ভাব করিলে মৃণাল মনে মনে চটিয়া যাইত। আনন্দ তাহার একার বন্ধু থাকিবে—কোন তৃতীয় ব্যক্তির স্থান সেখানে নাই!—দিব্য তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল তো! সত্যই কি মৃণাল মরিয়াছে? আর আসিবে না!

আনন্দের চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল!—হঠাৎ তাহার মনে হইল, অনুপমা তাহার জীবনে সহসা আবির্ভূত হইয়াছে—তাই কি মৃণাল চলিয়া গেল? অভিমানী মৃণাল!

অনুপমা? কোথাকার কে! অথচ সারা মনটা জুড়িয়া বসিয়া আছে। আজ বিমানের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছে। শুনিয়া-অবধি আনন্দের মন আকাশে-আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আজ রাত্রে সেখানে যাইতে হইবে। বিমান আসিয়াছে—যাইবার আর দরকার আছে। তাহা ছাড়া, অনুপমা নিজমুখে আসিতে বলিয়াছে এবং সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে।

—যাইবে বই কি!

বিমান আর অনু কি এক ঘরে শুইবে! সেটা ঠিক হইবে না। উপরে তো দুখানি ঘরও নাই। এই শীতে বিমানবাবু কি দালানে শুইতে রাজী হইবেন? দালানও তো ঘর। একই ঘরে দুইজনের শোওয়াটা—আনন্দ অনুপমা-সমস্যায় মগ্ন হইয়া গেল।

বিচিত্র মানুষের মন! আশৈশবের সহচর মৃণালের মৃত্যুশোক ভুলিয়া আনন্দ কোথাকার অচেনা অনুপমার স্বপ্ন দেখিতেছে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে।

অবিনাশবাবুর খবর লইবার জন্য আনন্দ আবার নবীন ডাক্তারের বাড়ী গেল। এবার দেখা হইল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "কমপ্লিকেশন এসেছে।"

শঙ্কিত-কণ্ঠে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "এ বেলা কি অবিনাশবাবুর অবস্থা খারাপ দেখলেন না কি?"

"অবস্থা তো খারাপই। ভীষণ টক্সীমিয়া—তার ওপর এক ফোড়নদার ছোক্‌রা এসে জুটেছে। সাঁরলে দেখছি!"

"বিমানবাবু কিছু বললেন না কি?"

"বললে, রক্ত দেওয়ার যদি দরকার মনে করেন—আমি রক্ত দিতে পারি স্বচ্ছন্দে। আজকাল কলকাতায় রক্ত-দেওয়া একটা ফ্যাশান হয়েছে কি না!"

আনন্দ তাহার পর বলিল, "কলকাতা থেকে ডাক্তার আনাবার কথা কিছু হল না কি!"

"হ্যাঁ। বলছিল ওই ছোক্‌রা। আমি বললাম, একটা কেন, দশটা ডাক্তার তোমরা আনাতে পার। মেয়েটি কিন্তু বাইরে থেকে কাউকে আনাতে রাজী নয় দেখলাম—"

অকারণে আনন্দ বলিল, "মেয়েটি বেশ ভাল!"

নবীনবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মৃণালের খবর শুনেছিস্?"

"শুনেছি।"

"উঃ—বড় লোকসান হয়ে গেল একটা! এমন ছেলে এ তল্লাটে আর হবে না। তোরা দুটিতে মাণিকজোড় ছিলি।"

"চললাম।"—মৃণালের কথা মনে করিয়া হঠাৎ তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন মুচড়াইয়া উঠিল!

বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, একখানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে—তিনপাহাড় হইতে। সেখানে তাহার ছোট বোন বীণার অবস্থা সংগীন। দুই দিন হইতে প্রসব-বেদনা, ছেলে এখনও হয় নাই। বীণার স্বামী তিনপাহাড় স্টেশনে কাজ করেন। তিনি আনন্দকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

আনন্দ আবার নবীন-ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। তিনি বারকয়েক 'সারলে দেখছি' বলিয়া শেষটা ঠিক করিলেন যে হাসপাতালের ধাত্রীটিকে লইয়া অবিলম্বে আনন্দ চলিয়া যাক—তাহার পর দরকার যদি হয়, তিনি যাইবেন।

নিজের ভগ্নীর অসুখ। যাইতেই হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আনন্দ মনে মনে যেন একটু বিরক্তই হইল! আজ রাত্রে সে যেন এখানে থাকিতে পাইলে বর্তিয়া যাইত। যাইবার পূর্বে সে একবার অবিনাশবাবুর বাড়ী গেল। দেখিল ছবি আঁকিয়া বিমানবাবু 'টেলিভিশনের' তথ্য অনুপমাকে বুঝাইতেছে এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনুপমা তাহা দেখিতেছে। তাহার আগমন তাহারা জানিতে পারিল না। তাহারও জানাইতে প্রবৃত্তি হইল না—ধীরে ধীরে সে নামিয়া গেল!

॥ বারো ॥

তিন দিন পরে।

রাত্রি দুইটা হইবে। অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। একটি ইন্‌টার-ক্লাস কামরায় আনন্দ একা বসিয়া আছে। যমে-মানুষে টানাটানি করিয়া মানুষ এবার জয়ী হইয়াছে—বীণা বাঁচিয়াছে। আনন্দ সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া চলিয়াছে। তিন দিন সে অনুপমার কোন খবর পায় নাই।

এই তিন দিন আনন্দ যাহা ভাবিয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার নহে। অনুভব করিবার। এ অনুভূতির ভাষা নাই!

সাহেবগঞ্জে যখন সে পৌঁছিল—তখন শেষ-রাত্রি! স্টেশনে চেনা কাহারো সহিত দেখা হইল না।—স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিল শুকতারাটা জ্বল-জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে! অত্যুজ্জ্বল শুক্র-গ্রহ!

তাহার সমস্ত অন্তর কানায় কানায় পরিপূর্ণ!

—ধীরে ধীরে সে গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিউনিসিপ্যালিটির বাতি নিবিয়া গিয়াছে।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

গলির ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবিনাশবাবুর বাড়ীর দিকে সে তাকাইয়া দেখিল।—অন্ধকার। অবিনাশবাবুর ঘরে-পর্যন্ত আলো জ্বলিতেছে না। ইহার মানে কি?

"বিনয়—কিশোর—"

কাহারো সাড়া নাই। ইহারা ঘুমাইয়া পড়িল না কি? দেখিল, কপাটটা খোলা! ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গাঢ় অন্ধকার; হাত বাড়াইরা হাতড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিতে লাগিল। উপরেও অন্ধকার। কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, "অনু—অনুপমা—"

কেহ নাই। অবিনাশবাবুর শয্যা শূন্য!

নীচে নামিয়া গিয়া নিজেদের বাড়ীর দরজায় সে সজোরে করাঘাত করিতে লাগিল। বৌদিদি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "অবিনাশবাবু কাল সকালে মারা গেছেন। ওঁরা সব চলে গেছেন—কালই সন্ধ্যা বেলা।" একটু থামিয়া বৌদিদি আবার বলিলেন, "উনিও ফিরেছেন কাল কাশী থেকে। ১৭ই মাঘ দিন স্থির হয়েছে।"

আনন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার মুখে কথা জোগাইল না।

বৌদিদি বলিলেন, "ভেতরে এসো। বীণা কেমন আছে?"

"ভাল।"

বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। আলোটা জ্বালিতেই চোখে পড়িল মৃণালের ফোটোখানা।

মৃণাল তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে!

রূপকথা

সুন্দর জ্যোৎস্না!

চারিদিকে জনমানবের সাড়া নাই। গভীর রাত্রি। দূর হইতে নদীর কলকল ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। স্বপ্ন-বিহ্বল নেত্রে দেখিতেছি, জ্যোৎস্নায় ভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। কুৎসিত জিনিসও সুন্দর হইয়া উঠিল। ওই পচা-ডোবাটাও যেন জরিদার কাপড় পরিয়া মোহিনী সাজিয়াছে। আকাশের কালো মেঘটাতেও রুপালি আবেশ।

নির্জন প্রান্তরে একা দাঁড়াইয়া আছি। তাহারই প্রতীক্ষায়। তাহারই প্রতীক্ষায় এই গভীর রাত্রির সমস্ত জ্যোৎস্নাও যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আসিতেছে।—হ্যাঁ ওই যে। সর্বাঙ্গে তাহার জ্যোৎস্নার আকুলতা। তাহার নূপুর শিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিতেছে।…ওই সে আমার পানে চাহিয়া হাসিল।

সহসা একটা দুর্ধর্ষ দস্যু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই কিশোরীর বুকে ছুরি

বসাইয়া দিল। জ্যোৎস্নায় শাণিত ছোরাটা চক্-চক্ করিয়া উঠিল! রক্তের ধারায় জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিলাম। ধরিয়া দেখি—একি, এ যে আমারই বিবেক।

ঐরাবত

॥ এক ॥

ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয়, বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক—প্রচণ্ড সংযম—অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিতেন—তিনবার দন্তধাবন করিতেন—দুইবেলা স্নান করিতেন। পালোয়ানের মত স্বাস্থ্য। লেখাপড়াও জানিতেন—শোনা যায় তিনি বি-এ পাশ। দরিদ্র নন—খাইবার পরিবার সংগতি আছে, চাকুরি করিতে হয় না। পৈত্রিক জমিজমা যাহা আছে, তাহাতেই চলিয়া যায়। হাতে দু'পয়সা আছে। কিন্তু ত্রিগুণাবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ তাঁহার মৌলিকতা, এবং তাঁহার মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণ প্রণালী সংক্ষেপত এই—তিনি উঠিতেন খুব ভোরে। উঠিয়াই তিনি কার্বলিক লোশনে ভিজান নিমের দাঁতন লইয়া দন্ত-পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর করিতেন ব্যায়াম। মুগ্দর, ডাম্বেল, ডেভালাপার। অর্ধঘণ্টাকাল ব্যায়াম করিয়া তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে নিকটবর্তী নদীটিতে গিয়া অবগাহন স্নান করিতেন।

স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি বাড়ী ফিরিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম নদীতে প্রাতঃকালে অবগাহন তাঁহার করা চাই। বাড়ী ফিরিয়া তিনি স্টোভ জ্বালিতেন।

আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন চা খাইবার জন্য।

মোটেই তা নয়। কোনরূপ মাদকদ্রব্যের বশীভূত তিনি ছিলেন না। স্টোভ জ্বালিয়া তিনি ভাতে-ভাত চড়াইয়া দিতেন। স্টোভের নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহ্নিকটাও শেষ করিয়া লইতে হইত। প্রাণায়ামও করিতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বেই ত্রিগুণাবাবুর আহ্নিক, স্নান, আহার সমস্তই সমাধা হইয়া যাইত। কম্‌প্লিট।

তিনি বলিতেন যখন খাইতেই হইবে—অনাহারে থাকা যখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত—তখন ও বখেড়া সকাল সকাল চুকাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত!

সমস্তদিন সময় পাওয়া যায় কত!

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি একজোড়া মিলিটারি বুট পরিধান করিতেন। মিলিটারি বুট পরিলে আরও যে সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ পরিধান করা সাধারণ লোকে সংগত মনে করেন ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি বুটজুতা পরিতেন কেবল বখেড়া মিটাইয়া রাখিবার জন্য। একবার সকালে উঠিয়া বাগাইয়া পরিয়া ফেলিতে পারিলে—ব্যস নিশ্চিন্ত।

অন্য জুতা পরিলে বার বার খোল আর পড়—খোল আর পড়। সময় নষ্ট হয় কত!

তাহার পর তসরের কাপড়টি মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন। তসরের কাপড়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল—ওই একই কারণে। একবার কিনিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

আরও দুইটি জিনিস তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

একটি মোটা বাঁশের লাঠি। যেমন তেমন লাঠি নয়। বেশ শক্ত তৈলপক্ক গাঁটে গাঁটে লোহার তার জড়ানো সমর্থ একখানি লাঠি। আর থাকিত চামড়ার একটি বড় ব্যাগ—পোস্টাফিসের পিওনরা সাধারণত যে জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়—সেই জাতীয় একটি ব্যাগ। ব্যাগটি তিনিও কাঁধে ঝুলাইয়া লইতেন। ব্যাগটিতে তাঁহার টুকিটাকি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত। যথা—কাপিং পেন্সিল, একটি বাঁধানো নোটবুক—শুকনো খেজুর—টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মাথায় তাঁহার একটি টোকা থাকিত। যে টোকা পরিয়া কৃষকগণ মাঠে চাষ করিয়া থাকে। রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণকল্পে বেশ মজবুত গোছের একটি টোকা ত্রিগুণাবাবু কৃষকদের দ্বারাই প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। ছাতার বখেড়া মিটিয়া গিয়াছিল। সর্ববিষয়ে গোড়া বাঁধিয়া এবং বখেড়া মিটাইয়া কাজ করাই ত্রিগুণাবাবুর বিশেষত্ব। দাড়ি-গোঁফ সম্বন্ধেও তিনি বখেড়া মিটাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা মনের আনন্দে বাড়িয়া—তাঁহার মুখ ত বটেই—বুক পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিগুণাবাবু জামা পরিতেন না।

প্রশ্ন করিলে গোছা গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভ্রূর অন্ধকারে অবস্থিত তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিত। বলিতেন—"গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা একটা বখেড়া নয় কি?"

সকলেই স্বীকার করিত—বখেড়া।

বাঁশের লাঠিটি ভীষণদর্শন।

ত্রিগুণাবাবুও রাগী লোক।

সুতরাং বখেড়া বাড়াইয়া লাভ কি!

কিন্তু যখন মিলিটারী বুট পায়ে, মালকোঁচা-মারা, উপবীতধারী নগ্নগাত্র বলিষ্ঠ বখেড়া-বিরোধী ত্রিগুণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ এবং মস্তকে টোকা পরিয়া পথে বাহির হইতেন, তখন তাহা সত্যই একটি দেখিবার মত দৃশ্য হইয়া উঠিত।

অনেকে হাসিত—

অনেকে ঠাট্টা করিত—

অনেকে প্রণামও করিত।

ত্রিগুণাবাবু অবশ্য এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। প্রাকৃতজনের স্তুতি-নিন্দা তাঁহার নিকট চিরকাল উপেক্ষার বস্তু ছিল।

স্ত্রী?—তিনি বহুপূর্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাবাবুর দুইটি পুত্র অবশ্য আছে। তাহারা মামার বাড়ীতে মানুষ হইতেছে। তাহাদের নামকরণ ব্যাপারেও ত্রিগুণাবাবুর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একজনের নাম রাখিয়াছিলেন রায় বাহাদুর—আর একজনের রায় সাহেব।

বলিয়াছিলেন—"রায় বাহাদুর আর রায় সাহেব হবার জন্যে পরে হয়ত ব্যাটারা প্রাণপাত করবে। আগে থাকতে বখেড়া মিটিয়ে রাখাই ভালো।"

॥ দুই ॥

অতি প্রত্যুষে আহারাদি শেষ করিয়া ত্রিগুণাবাবু চার ক্রোশ দূরবর্তী কিষণপুর গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য—গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতায় আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয় তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে। গোড়া বাঁধিয়া কাজ করাই তাঁহার নিয়ম।

সুতরাং তিনি অল্পবয়স্কদের—বিশেষ করিয়া বালকদের লইয়া পড়িয়াছিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন—ইহার জন্য তাঁহাকে চারক্রোশ দূরে যাইতে হয় কেন ? নিজের গ্রামে কি বালক ছিল না ?

ছিল।

কিন্তু কেহ তাঁহাকে আমল দিত না।

গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায় না—একথা সুবিদিত।

চারক্রোশ দূরে ত্রিগুণাবাবুর কয়েক বিঘা জমি প্রজাবিলি করা ছিল। প্রজাদের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল।

সুতরাং তাহাদের পুত্রদের তিনি অনায়াসে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বালকেরা সকাল হইতে নয়টা পর্যন্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্যবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া তাহার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে মামুলি লেখাপড়া শিখিতে যাইত।

একটু সুবিশাল বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াই ত্রিগুণাবাবু তাঁহার উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন।

একদিন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে বখেড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিগুণাবাবু বখেড়া-বিরোধী।

সুতরাং তিনি বখেড়া মিটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ওই বটবৃক্ষতলেই একটা পাকাঘর তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

॥ তিন ॥

কিন্তু অকস্মাৎ—এ কি !

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়া দেখেন ব্রহ্মচর্যলোলুপ তাঁহার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বসিয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।

ত্রিগুণাবাবুকে দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিল। মাসিক পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তুলিয়া তিনি দেখিলেন।

দেখিবামাত্রই চক্ষু স্থির।

প্রথমেই মলাটের উপর দেখিলেন রঙীন অক্ষরে লেখা—"মরমী" তাহার পর পাতা উল্টাইতেই একটি নগ্ন নারীমূর্তি!

তাহার পরই একটি কবিতা।

কবিতার ছন্দ বোঝা যায় না—

অর্থ কিন্তু পরিষ্কার।

পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাহার পরই একটি গল্প—

একটি রোগা গোছের ছোকরা একসঙ্গে চারিটি তরুণীর মোহড়া লইতেছে।

এ ত ভয়ানক কাণ্ড!

পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া ত্রিগুণাবাবু দেখিলেন—সব সরিয়া পড়িয়াছে।

একটি ছাত্রও নাই।

॥ চার ॥

সেই দিনই ত্রিগুণাবাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ঠিক ইহার দুই দিন পরে যে সংবাদটি চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। তাহা এই।

"মরমী" কাগজের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

চিত্রকর নিধিরাম বসাকও অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাঁহার মস্তকের আঘাতও সাংঘাতিক।

গল্পলেখক সুজিত সেনের দক্ষিণ হস্তটি শোচনীয়ভাবে জখম হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাঁহার জীবন-সংশয়।

কবি অমিয় পালিত মারা গিয়াছেন।

একজন ভীষণদর্শন লোক অকস্মাৎ "মরমী" অফিসে ঢুকিয়া বিনা কারণে উক্ত মনস্বী-চতুষ্টয়কে আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং একটি বাঁশের লাঠির দ্বারা তাঁহাদের গুরুতররূপে প্রহার করিতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়া সত্ত্বেও কিন্তু কেহ গুণ্ডাটাকে ধরিতে পারে নাই। সে সকলের হাত ছিনাইয়া ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বুঝিলাম আর কেহ নয়—ত্রিগুণাবাবুই।

বখেড়া মিটাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

॥ পাঁচ ॥

ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ।

কোন সঠিক খবর তাঁহার কেহ পাইতেছে না।

নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি টেররিস্ট দল গড়িয়া তুলিতেছেন।

কাহারও মতে তিনি ভারতবর্ষেই নাই—খালাসির বেশে জাহাজে চাপিয়া রাশিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আর একদল দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল—ওসব বাজে কথা—তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যদলভুক্ত হইয়াছেন। এইরূপ নানা কথা।

লোকে কিন্তু এক কথা বেশী দিন বলিতে চাহে না।

তাহারা ক্রমশ ত্রিগুণানন্দের কথা ছাড়িয়া অন্য কথায় মাতিল।

ত্রিগুণানন্দ-গুজব-ভারাক্রান্ত দিবসগুলি ক্রমে ক্রমে কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকে ক্রমশ ত্রিগুণাবাবুর কথা ভুলিতে লাগিল। এমন কি পুলিশও।

॥ ছয় ॥

আমারও মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একখানি চিঠি আসিয়া হাজির।

ত্রিগুণাবাবুরই চিঠি।

লিখিয়াছেন—

ভায়া,

অনেকদিন পরে আমার চিঠি পাইয়া সম্ভবত বিস্মিত হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই —এতদিন আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় যে কাণ্ড করিয়াছিলাম খবরের কাগজের মারফৎ আশা করি তাহা অবগত আছ। পরে বুঝিয়াছিলাম কাণ্ডটি করিয়া ভুল করিয়াছি। বখেড়া অত সহজে মিটিবার নয়। আমি যে ভাবে উহা মিটাইতে চাহিয়াছিলাম সেভাবে মিটাইতে হইলে কলিকাতা শুদ্ধ লোককে খুন করিতে হয়। কলিকাতা শহরে যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রয় হয় সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। সমস্ত স্টলগুলি পরিদর্শন করিয়া, সিনেমা দেখিয়া এবং আধুনিক যুবক-যুবতীদের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল—রক্তারক্তির রাস্তা ধরিলে সকলকেই সাবাড় করিতে হয়—কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ঠগ বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা উজাড় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং ও পথ আমার পক্ষে অপ্রশস্ত। পুলিশের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকি—মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি এবং চিন্তা করি কি উপায়ে বখেড়া মিটানো যায়। ইহাই যদি দেশের প্রগতি হয়,

তাহা হইলে সে প্রগতির শেষফল দেখিবার জন্য শেষ পর্যন্ত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে কি ? থাকিবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ অবস্থায় কোন পন্থা অবলম্বন করা সংগত তাহাই একদা রাত্রে শ্বইয়া শ্বইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে মনে হইল মানস-পটে সিনেমা-দৃষ্ট এক নায়িকার ম্বখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। ম্বখখানি যেন আমার ম্বখের পানে চাহিয়া ম্দ্ব ম্দ্ব হাসিতেছে।

বলা বাহ্বল্য—একটু বিব্রত হইলাম।

কিন্তু যাক্, ঈশ্বরেচ্ছায় কিছ্বক্ষণ পরে ম্বখ মন হইতে সরিয়া গেল্। নিশ্চিন্ত হইয়া ঘ্বমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘ্বমাইবার পরই বোঝা গেল বখেড়া মেটে নাই—কারণ সংগে সংগে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে কি ঘটিল তাহা লিখিতে পারিব না। এইটুকু শ্বধ্ব জানিয়া রাখ, সে স্বপ্ন অবর্ণনীয়।

ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম—দেখিলাম ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরে মাথা কুটিতেছে। স্বপ্নের ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া রহিলাম। কিন্তু দেখিলাম জাগিয়াও নিস্তার নাই—ম্বখ ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে লাগিল।

এইর্প প্রত্যহ। কোনদিন সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তর্বণী—একটা না একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।

বলিব কি ভায়া, শেষটা উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম।

ভয়ও হইল। চিন্তা করিতে লাগিলাম—এ অবস্থার প্রতিকার কি! মাঝে মাঝে রাগও হইত—কিন্তু স্বপ্নের মাথায় ত লাঠি মারা যায় না। ঘোর জালে পড়িয়া গেলাম। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা কথাটা যে নিতান্ত অম্বলক নয়, তাহা মর্মে মর্মে অন্বভব করিতে লাগিলাম।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমশ এই সত্যটি আমার কাছে পরিস্ফ্বট হইয়া উঠিল যে, আমার মনের কামনা মরে নাই। ঘ্বমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষ্বধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবী করিতেছে।

কি উপায় করি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

একদিন সহসা পৌরাণিক গল্প একটা মনে পড়িয়া গেল।

গংগার তোড়ে ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

তোড়ের ম্বখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাব্ব হইয়া যায়।

আশা করি তুমি গল্পটা জানো।

……সুতরাং, কাল বিলম্ব না করিয়া বখেড়া মিটাইয়া ফেলিয়াছি। কিছ্ব অর্থব্যয় করাতে প্বলিশের বখেড়াও মিটিয়াছে। আগামী পরশ্ব গ্রামে পেঁাছিব। তুমি আমার বাড়ীটা পরিষ্কার করাইয়া রাখিও। সম্ভব হইলে দেওয়ালগ্বলিতে চ্বনকাম করাইয়া দিও। মোট কথা চতুর্দিক বেশ পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। ইতি—ত্রিগ্বণানন্দ।

॥ সাত ॥

ঐরাবত আসিতেছেন।

স্টেশনে গেলাম।

যথা সময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।

সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।

ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

ঐরাবত 'ক্লীন শেভড'—গোঁফদাড়ি একেবারে নাই।

মাথায় দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা।

মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট।

পরিধানে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি। পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্প্‌স্‌! হাতে সোনার রিস্টওয়াচ।

সর্বাঙ্গ হইতে ভুর ভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে। আমি নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

চমক ভাঙিল যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন—"হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি! বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।"

হেঁট হইয়া বৌদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

উৎসবের ইতিহাস

॥ এক ॥

সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে।

—সান্ডেল মশাইকে আরো চারটি পোলাও দাও।

—আন্—আন্—ওরে এ দিকে লুচি নিয়ে আয়—লুচি—লুচি।

—মাংস আপনাকে দেব আর একটু?

—না—না—সে কি কথা! দাও খানিকটা মাংস—

—ডাল—ডাল চাই—ডাল।

—ছ্যাঁচড়া—ছ্যাঁচড়া।

—ওহে ছ্যাঁচড়া রেখে তুমি পায়েসটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও দিকি—

—এ হে হে জলের গেলাসটা পা লেগে পড়ে গেল যে! তোমরা দেখেও চলতে পার না? উটের মত চলছ সব!

—এই রসগোল্লা এদিকে এস—মুখুজ্জে মশাইকে গোটা-আষ্টেক দাও—খাইয়ে লোক উনি—

—তুমি যাও ত হে—কয়েক 'পিস' ভাল দেখে মাছ বেছে বেছে নিয়ে এস ত—মিত্তির মশাইকে দাও—

—দেখো হে, আখতার মিঞা আলাদা বসেছেন ব'লে যেন কিছু বাদ না পড়ে! নরেন তুমি ওঁর কাছেই থাক—

—সিঙ্গি মশাইকে খানিকটা ছ্যাঁচড়া দিয়ে যাও—চাট্‌নিও—

নানা আকৃতির জন তিরিশেক লোক আহারে প্রবৃত্ত।

জন পাঁচ-ছয় ছোকরা পরিবেশন করিতেছে।

স্বচক্ষে দেখিলে তবে বিশ্বাস হইবে।

না দেখিলে মনে হইবে শতখানেক লোক ভিতরে দাঙ্গা করিতেছে।

॥ দুই ॥

ঠিক ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়টি করুণ রসাত্মক।

কিন্তু সত্য!

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়ের নিকট টাকা ধার করিতেছেন। অসহায় মল্লিকের ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে ত!

দেখা গেল মুখুজ্জে বাস্তবিকই সহৃদয় লোক।

চাহিবামাত্র টাকাটা ঝড়াৎ করিয়া দিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"ফিষ্টি একটা করতে হবে বইকি! ফিষ্টি না করলে চলে! এ কটা টাকা —যদি সিক্‌স্‌ পারসেন্টই দাও—কদিন যাবে শুধতে! অমন তৈরি ছেলে তোমার! বড় ভাল ছোকরা নরেন—বড় ভাল—ভাগ্যবান লোক তুমি, ঠিক উন্নতি করবে ও—দেখো—"

মুখুজ্জের অর্থে উৎসবের আয়োজন হইল।

পোলাওটা সামান্য একটু ধরিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে বিশেষ রস-ভঙ্গ হয় নাই।

সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়াছে।

॥ তিন ॥

ইহার পূর্ববর্তী ঘটনা-পরম্পরা একটু জটিল।

সংক্ষিপ্ত তালিকাবদ্ধ আকৃতি নিম্নলিখিত রূপ।

(১) অনন্যোপায় নরেন মল্লিক (প্রবীণ মল্লিকের পুত্র) দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া সাগ্রহে বিশু সান্ন্যালকে তৈলাক্ত করিতেছে।

(২) তৈলনিষিক্ত বিশু সান্ন্যাল দিশাহারা হইয়া একখানি পত্র লিখিলেন।

(৩) খবরটি গোপন রহিল না।

(৪) ফলে, বিশু সান্ন্যালের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমশক্তিশালী বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তীও সক্রোধে লেখনী আস্ফালন করিলেন এবং একখানি পত্র লিখিলেন।

(৫) উভয় পত্রই আখ্‌তার আলির হস্তগত হইল এবং সমস্যাকুলচিত্তে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

(৬) বিশু সান্ন্যালকে সুচারুরূপে তৈলাক্ত করিবার পর নরেন মল্লিক আবিষ্কার

করিল যে, তাহার তৈল-নিষেক-শক্তি মোটেই নিঃশেষিত হয় নাই। এখনও সে বহুলোককে তৈল-সুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ করা অনুচিত।

সে গিয়া 'খাইয়ে' মুখুজ্জে মহাশয়কে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "এইবার কাহাকে তৈলাক্ত করি বলুন ত! আখতার আলিকে গিয়া ধরিব কি?"

ঈষদ্ধাস্যসহকারে মুখুজ্জে বলিলেন, "সুবিধা হইবে না। আখতার আলি নিরামিষ তৈল পছন্দ করেন না। তুমি বরং সিঙ্গীর কাছে যাও। পরাণ সিঙ্গী ঘাগি লোক! যদি রাজী করাতে পার—নির্ঘাৎ লেগে যাবে।"

(৭) অবিলম্বে তৈল ও তুলি লইয়া নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হইল এবং তাহাকেও যৎপরোনাস্তি তৈলাক্ত করিল।

(৮) তৈলার্দ্র সিংহ মহাশয় নরেনকে আশ্বাস দিলেন এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া পানু মিত্রের নিকট গেলেন।

(৯) ঘাগি-ঘুঘু-সম্মিলন হইল। পানু মিত্তির ঘুঘু। বোঝা গেল তিনি কেবলমাত্র তৈল-নিষেকে নরম হইবার পাত্র নহেন। তিনি নরেন মল্লিকের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে অকস্মাৎ একটি নিরীহ মতলব আত্ম-প্রকাশ করিল। তিনি সিংহ মহাশয়কে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং তাঁহার কর্ণকুহরে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব বলিতে লাগিলেন। ঘাগি-ঘুঘু-সংবাদ নরেনের অগোচর রহিয়া গেল।

(১০) প্রকাশ্যে পানু মিত্র নরেনকে কেবল বলিলেন, "শুধু হাতে হবে না হে! একটা ভালগোছের ডালি চাই—বুঝলে? ডালিটি নিয়ে কাল বিকেলে এসো—দু বোতল হুইস্কিও এনো—"

(১১) ঘাগি সিঙ্গি মহাশয় ঘুঘু মিত্তিরের নিকট গোপনে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা প্রবীণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থাৎ নরেনের পিতার কর্ণগোচর করিলেন।

প্রবীণ মল্লিককে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হইতে হইল।

(১২) পরদিন ঘুঘু-সমভিব্যাহারে স-ডালি নরেন এক সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইল।

(১৩) ইহার ফলে সাহেব যাহা করিলেন তাহা প্রকৃতই গুণীজনসুলভ। তিনি নরেনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং 'ফোন' করিলেন।

(১৪) সমস্যাচ্ছন্ন আখতার আলি বসিয়া বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতেছিলেন—এমন সময়—ট্রিং—ট্রিং—ট্রিং—ফোন বাজিয়া উঠিল।

(১৫) আখতার আলি অন্ধকারে ধ্রুবতারা সন্দর্শন করিলেন। তাঁহার সমস্যা বিদূরিত হইল।

(১৬) নরেন নির্বিঘ্নে কেল্লা মারিয়া দিল।

॥ চার ॥

যে ঘটনাটি এখনও ঘটে নাই কিন্তু যাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই ঘটিবে তাহার উল্লেখ না করিলে কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে।

তাহা এই—নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পাণি পীড়ন করিতে হইবে।

প্রবীণ মল্লিক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়াই ঘুঘু মিত্তিরের মধ্যস্থতায় নরেন সাহেবকে সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং সেলাম করিবার সুযোগ পাইয়াছে বলিয়াই নিয়োগকর্তা আখতার আলির জটিল সমস্যার সমাধান হইয়াছে—অর্থাৎ নরেনের এতদিনের শ্রম সার্থক হইয়াছে।

সংক্ষেপে, সে চাকুরি পাইয়াছে।

হউক কেরাণীগিরি—হউক বেতন ত্রিশ টাকা—

চাকুরি ত!

প্রস্‌পেক্‌টও আছে।

উপরোক্ত ভোজনোৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই।

॥ পাঁচ ॥

অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই আর একটি কথা ইতস্ততঃ করিয়া সর্বশেষে উল্লেখ করিতেছি।

নরেন মল্লিক প্রথম শ্রেণীর এম. এ.।

অলকনন্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

"শশকগণের সহিত মেষগণের ঘোরতর সংঘর্ষ! উভয় পক্ষেরই আর্যশোণিত আকস্মিক উন্মাদনায় মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়াছে। ভীষণ আরাবে সকলের কর্ণপটহ বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম। সত্যই এরূপ শব্দ-ঝঙ্কার অশ্রুতপূর্ব। ওই শোন—শশকগণের দামামা-ধ্বনি মেষেদের নাকাড়া-নিনাদকে ছাপাইয়া উঠিতেছে—আবার সংগে সংগে মেষগণের তূর্যাস্ফালন শশকদিগের ভেরী-হুঙ্কারকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

চরাচর কম্পমান।

শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি হিংস্র পক্ষীকুল চক্রাকারে গগনে উড্ডীয়মান। সিংহগণ এই লোমহর্ষক সংঘর্ষের সাংঘাতিক পরিণতি চিন্তা করিয়া সভয়ে রুদ্ধশ্বাসে ইষ্টনাম জপ করিতেছে।

আকাশে বাতাসে আশঙ্কা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—"

বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যঙ্গকার দিগিন্দ্র সোম ক্ষিপ্ত হইয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল এবং কহিল—

"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—পাকা খবর শুনে এলাম—"

দিগিন্দ্রের লেখনী হস্তচ্যুত হইল।

তিনি ব্যায়তআননে হেবোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

॥ দুই ॥

অতি আধুনিক জনৈক প্রতিভা—অর্থাৎ সুকবি পঞ্চু মিত্র—হর্ষোৎফুল্ললোচনে গদ্য ছন্দে ফাঁদিয়াছিলেন—

শাওন রাতের প্রিয়া
ওগো শুনছ ?
এসো তুমি তোমার নরম পা ফেলে ফেলে
আমার মনের ওপর।
এসো।
হয়ত তোমার কষ্ট হবে একটু,
কারণ মন যে আমার গোটা নয়—
তোমার নরম পা রাখবে কোথায় তুমি !
লক্ষ টুক্‌রোয় ভাঙা যে আমার মন
তোমার গোটা নরম পা দুখানি রাখবার মত
গোটা মন নেই ত !
তবু এসো ভাই তুমি
বুঝলে ?
ওগো
শাওন রাতের প্রিয়া আমার !···

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন আর মিছিমিছি—"

বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া কবি বলিলেন—"সত্যি বলছেন আপনি !"

হেবো চটিয়া বলিল—"বিশ্বাস না করেন—লিখে যান—"

লেখনী ত্যাগ করিয়া কবি কহিলেন—"এ কি খবর শোনালেন আপনি এই দারুণ দুপুরে"—এই বলিয়া অর্ধদগ্ধ বিড়িটিতে শেষ টান মারিয়া সেটি ফেলিয়া দিলেন এবং প্রাচীর-সংলগ্ন টিক্‌টিকি-দম্পতীর পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিলেন। উহারাই তাঁহার উপরোক্ত কবিতাটি উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল।

॥ তিন ॥

বিখ্যাত জীব-বিদ্যা-বিশারদ প্রখরেশ পাল বিদ্যা-সমুদ্র মন্থন করিয়া অপূর্ব প্রবন্ধ-রত্ন—"উটপাখীর ডিম"—উদ্ধার করিতেছিলেন। প্রখরেশ ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি। তাঁহার

চতুর্দিকে নানারূপ ভয়াবহ আকৃতির বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালা উত্তুঙ্গ হইয়া তাঁহাকে প্রায় সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। উট পাখীর ডিম্ব সম্বন্ধে জনৈক বিশেষজ্ঞ জার্মান পণ্ডিতের মতামত তিনি তন্ময়চিত্তে প্রণিধান করিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কহিল—"ধনেশ এক পয়সা দেবে না—কেন মিছে খেটে মরছেন!"

"অ্যাঁ—বলেন কি!"

পাল মহাশয়ের চশমা নাসিকা-চ্যুত হইল।

ডিম ভাঙিয়া উষ্ট্র পক্ষী নিমেষে মরীচিকায় বিলীন হইয়া গেল।

হেবো হাসিয়া বলিল—"ঠিকই বলছি—নিট খবর!"

পাল মহাশয় নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্তূপীকৃত গ্রন্থরাজির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

॥ চার ॥

প্রসিদ্ধ গল্পলেখক মুরারিমোহন 'সর্পিনী' নামে একটি চমকপ্রদ গল্প শুরু করিয়াছিলেন্। মুরারিমোহনের বিশেষত্ব এই যে, তিনি গল্প অল্প করেন না। "সর্পিনী" গল্পের ষোড়শী তন্বী নায়িকা তিনজন বলিষ্ঠ পুরুষকে হত্যা এবং পাঁচজনকে মৃতপ্রায় করিয়া গলায় দড়ি দিতে উদ্যত হইয়াছিল—

এমন সময় হেবো আসিয়া উপস্থিত।

তাহার বার্তা পূর্ববৎ।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

মুরারিমোহন মুখে বলিলেন বটে—"যাক্ বাঁচা গেল!"

তাঁহার অন্তরাত্মা কিন্তু অন্য কথা বলিতে লাগিল।

॥ পাঁচ ॥

পণ্ডিত প্রভাকর শর্মা "গীতার রাজনৈতিক আদর্শ" লিখিতেছিলেন।

হেবো আসিয়া তাঁহাকে আদর্শভ্রষ্ট করিল।

শর্মা মহাশয় প্রথমটা হেবোর কথা বিশ্বাসই করিতে চান না।

হেবো কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়।

অবশেষে শর্মা মহাশয়কে বিশ্বাস করিতেই হইল যে, ধনেশ সত্যই পয়সা খরচ করিতে রাজী নয়।

বিশ্বাস হইবামাত্র তিনি গামছা পরিয়া তেল মাখিতে বসিয়া গেলেন।

উদ্দেশ্য গঙ্গা-স্নান করা।

এই গ্রীষ্মে 'গীতার রাজনৈতিক আদর্শ" লইয়া মাথা ঘামানো অপেক্ষা গঙ্গা-স্নান করা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল।

॥ ছয় ॥

প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠকও মুদ্গর পরিত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণার্থে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"প্রাণায়াম ও ব্যায়াম"। রচনাটি গবেষণামূলক।

তিনি প্রমাণ করিতে চাহিতেছিলেন যে, প্রাণায়ামহীন ব্যায়াম করার কোন সার্থকতা নাই। চিনিহীন সন্দেশের ন্যায় তাহা নিতান্তই অর্থহীন। ভীম, অর্জুন, শ্রীরামচন্দ্র, হনুমান প্রমুখ পৌরাণিক বীরগণ প্রাণায়াম করিতেন কিনা তাহাই তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি উল্টাইয়া আবিষ্কার করিবার চেষ্টায় ছিলেন।

এমন সময় হেবো আসিয়া হাজির।

বলে কি!

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা পাঠকজির ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিল।

রক্তাভ চক্ষু দুইটি হইতে স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল।

গর্দানের ও বাহুযুগের পেশীসমূহ ফুলিয়া উঠিল।

তিনি গর্জন করিয়া উঠিলেন।

"ইয়ার্কি না কি? পয়সা দেবে না! একটি ঘুষিতে ব্যাটার—"

হেবো সরিয়া পড়িল

॥ সাত ॥

ঐতিহাসিক বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় একটি অতিশয় মৌলিক প্রবন্ধের মালমশলা জোগাড় করিতেছিলেন।

প্রবন্ধের নাম—"আলিবর্দী খাঁ নামে সত্যই কি কেহ ছিলেন?"

হেবো আসিয়া তাঁহার এই সাধু প্রচেষ্টায় বাধা দিল।

ধনেশ এক পয়সা দিবে না।

আলিবর্দী খাঁর অস্তিত্ব ছিল কি না সে চিন্তা সুতরাং নিরর্থক।

দাঁ মহাশয় রুগী দেখিতে বাহির হইয়া গেলেন। ঐতিহাসিক হইলেও কবিরাজী তাঁহার পেশা।

॥ আট ॥

এই প্রকারে হেবো প্রায় পঞ্চাশজন লেখককে নিবৃত্ত করিল।

সে পাকা খবর পাইয়াছে, ধনেশ এক পয়সা খরচ করিবে না।

সুতরাং 'অলকনন্দা' নামে যে মাসিক পত্র বাহির হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল তাহা আর বাহির হইবে না।

দিগিন্দ্র সোম কর্তৃক প্রভাবিত হইয়া ধনেশ পোদ্দার ইহার জন্য দশ হাজার মুদ্রা খরচ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

কিন্তু কে নাকি তাহাকে ভুজুং দিয়াছে, টাকাটা জলে পড়িবে।

ফলে ধনেশ বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

দিগিন্দ্র সোম কিন্তু দমিবার পাত্র নহেন।

তিনি সহজে কোন ব্যাপারে হাল ছাড়েন না। অনেক নৌকাই তিনি বহু দুর্যোগে তীরে ভিড়াইয়াছেন। তা'ছাড়া শক্তিশালী লোক। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত ব্যঙ্গকার, তৃতীয়ত শুধু তাঁহার লেখনীরই জোর নাই—গলারও জোর আছে।

অথচ হঠকারি নহেন।

মাথা ঠাণ্ডা।

'অলকনন্দা' বাহির হইলে তাঁহারই সম্পাদক হইবার কথা। বেশ মোটা মাহিনা মিলিবার আশা ছিল সুতরাং সোম মহাশয় হাল ছাড়িলেন না। কি ভাবে চলিলে 'পানি' পাইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, যদিও ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ কিন্তু এই সব কার্য (বস্তুত যে কোন বৃহৎ কার্যই) সুচারুরূপে হাঁসিল করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তিনি দল পাকাইলেন।

আশাহত যাবতীয় লেখকবৃন্দ তাঁহার দলে জুটিল।

উদ্দেশ্য—যেমন করিয়া হোক্ ধনেশকে পুনরায় তাতাইতে হইবে।

বিবাহের স্বাভাবিক পরিণতি যেমন প্রজাবৃদ্ধিতে—সঙ্ঘের স্বাভাবিক পরিণতি তেমনি সভায়। নিষ্ফলা বিবাহ বরং সম্ভবে—কিন্তু নি-সভা সঙ্ঘ অসম্ভব।

সুতরাং অচিরেই দিগিন্দ্র সোমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনিবার্য হইয়া উঠিল।

কথা হইল সভা মাঠে বসিবে।

বাড়ীতে সভা আহ্বান করিলে এতগুলি লোককে চা-চুরুট জোগানো সোম মহাশয়ের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইত—দ্বিতীয়ত তাঁহার বাড়ীতে স্থানাভাব। এতগুলি লোককে বসাইবার মত প্রশস্ত স্থান তাঁহার ভাড়াটে বাসায় ছিল না। সুতরাং সভা মাঠে বসিবে ঠিক হইল। কিন্তু তাহাতেও গোলযোগ ঘটিল। মাঠে এতবড় সভা করিতে হইলে পুলিশের অনুমতি চাই। দিগিন্দ্র বাবু সভাপতি জানিলে পুলিশের অনুমতি পাওয়াও মুশ্কিল। সুতরাং নির্বাচিত কয়েকজন সভ্য লইয়া একটি ছোট পরামর্শ-সভা বসিবে স্থির হইল। মাঠেই বসিবে।

নির্বাচিত সভ্যগণের নাম—

(১) দিগিন্দ্র সোম
(২) সুকবি পঞ্চু মিত্র
(৩) বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল
(৪) গল্প-লেখক মুরারিমোহন সাঁতরা
(৫) ব্যায়াম-বীর ও সাঁতারু পুষ্কর পাঠক
(৬) ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ
(৭) হেবো—

অর্থাৎ সপ্তরথী সম্মিলন।

দুর্দমনীয় দিগিন্দ্র সোম অধিনায়ক। সভা বসিল।

দিগিন্দ্রবাবু তাহার অনিন্দনীয় ওজস্বিনী ভাষায় কহিলেন, "বন্ধুগণ, আমরা কি এখনও বাঁচিয়া আছি? আমরা জীবিত—না, মৃত? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি নির্ভর করিতেছে। আশা করি, আপনারা অবগত আছেন কেন আজ আমি আপনাদের আহ্বান করিয়াছি। পরম স্নেহাস্পদ হেবো আপনাদের প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া যে বার্তা বিতরণ করিয়া ফিরিয়াছে তাহার সম্যক অর্থ কি আপনারা সকলে উপলব্ধি করিয়াছেন? আমি যতদূর বুঝিয়াছি তাহার সরল অর্থ এই—ধনগর্বিত ধনেশ পোদ্দার সমস্ত লেখক জাতির মুখে জুতা মারিয়াছে। এই পাদুকা-কর্দম-লাঞ্ছিত মুখ আর কি আমরা সভ্যসমাজে দেখাইতে পারিব? আমরা দরিদ্র তাহা ঠিক, আমরা অসহায় তাহাও ঠিক, ভাগ্যনিয়ন্তা ভাগ্যহীন করিয়াই আমাদের এই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি দেশের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা প্রাণপাত করিতেছি না কি? নিরন্ন আমরা অশক্ত দেহে বাণীসাধনার একাগ্রতায় কত বিনিদ্র রজনী যে যাপন করিয়াছি ধনেশ কি তাহার খবর রাখেন? তিনি আমাদের বাণীপূজার সহায়ক হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহা আমরা সকলেই জানি। হঠাৎ কোন অধিকারে তিনি আমাদের অপমান করিলেন? ইহার কোন প্রতিকার নাই? ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছি—ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই?"

পুষ্কর পাঠক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না!

দন্ত কড়মড় করিয়া পেশীবহুল মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উৎক্ষিপ্ত করত বলিয়া উঠিলেন—"বলেন ত এক্ষুণি ব্যাটার দফা নিকেশ করে দিয়ে আসি। ও ব্যাটাকে সাবড়াতে কতক্ষণ! ফুটপাতে একটি আছাড় মারলেই মুণ্ডুটি ছাতু হয়ে যাবে—"

প্রাণায়াম-সাধক পাঠকজি চটিলে আর রক্ষা নাই।

এ কথা সকলেই জানিতেন।

সুতরাং সকলেই নিঃশব্দে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন—কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করা নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না।

সভাপতি দিগিন্দ্র সোম মাথা-ঠাণ্ডা লোক।

তিনি একটু পরে একটু কাসিয়া সংযত কণ্ঠে কহিলেন—

"পাঠকজির উত্তেজনার স্বাভাবিকতা আশা করি আপনারা কেহই অস্বীকার করেন না; তাঁহার এই উক্তি তাঁহার মত বীরের উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু পাঠকজির প্রস্তাবিত কার্যটা শুধু যে দুরূহ ও বিপজ্জনক তাহাই নয়—তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধনেশবাবুকে ক্ষমা করিতে চাই এবং সম্ভব হইলে দলে টানিতে চাই। আর যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।"

ঐতিহাসিক কবিরাজ বৈশ্বানর দাঁ মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শীর্ণকান্তি লোক। গলা খাঁকারি দিয়া তিনি বলিলেন—

"আমার দৃঢ় ধারণা, ধনেশবাবুর বায়ু প্রকুপিত হইয়াছে। বর্তমানে যদি কিছু করিতেই হয়, তবে তাঁহার কবিরাজী মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। তিনি এখন রুগী। ধনাধিক্য হেতু বায়ু-বিকৃতির নজির—বলেন ত—ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি। রোমে নীরো, ইজিপ্টে ইখন্যাটান, পারস্যে নাদির শাহ—"

সভাপতি মহাশয় দাঁ মহাশয়কে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—

“দাঁ মহাশয়ের প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে ইহা তাদৃশ কার্যকরী হইবে না—ধনেশবাবু কিছুতেই আমাদের অনুমোদিত উপায়ে চিকিৎসিত হইতে রাজী হইবেন না। সহজ অথচ কার্যকরী কোন পন্থা অবলম্বন করাই আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি—”

উস্‌কো-খুস্‌কো চুলগুলি ঠিক করিয়া লইয়া হরিকুমার-শিষ্য সুকবি পঞ্চু মিত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মিহি গলায় বলিলেন—

“অনুমতি করেন ত ধনেশবাবুকে গদ্য কবিতায় চিঠি লিখ্‌তে পারি আমি একটা। সমালোচিকা তপতী দেবীর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলে পাষাণ গলাবার ক্ষমতা আছে আমার ছন্দ-লক্ষ্মীর—”

বৈজ্ঞানিক প্রখরেশ পাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অধীর ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। “থামুন ত মশায় আপনি। বাজে ফক্কুড়ি করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে পরে। কাজের কথা হোক আগে। আমার ধারণা ধনেশ পোদ্দারকে ছলে অথবা কৌশলে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই। বলে তার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। যাঁরাই জীবন-যুদ্ধের অর্থাৎ স্ট্রাগল ফর এক্‌জিস্‌টেন্সের রীতিনীতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলন করেছেন তাঁরাই জানেন যে, জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে ছল ও কৌশলও কম উপযোগী অস্ত্র নয়। আমার বিশ্বাস ধনেশকে ছলে অথবা কৌশলে আয়ত্তে আনতে হবে।”

গল্প-লেখক মুরারিমোহন বলিলেন—

“গণেশবাবুকে ধরলে হয় না? বেশ ভাল লোক তিনি—”

প্রায় সমস্বরে সকলে প্রশ্ন করিলেন—“গণেশ কে?”

“ধনেশের বাবা।”

মুরারিবাবু বলিতে লাগিলেন—“গণেশবাবু চমৎকার লোক। আমার সঙ্গে আলাপও আছে। গণেশবাবু যদি অনুরোধ করেন, ধনেশবাবু তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয় না। ধনেশবাবু আর যাই হোন খুব পিতৃভক্ত শুনেছি—”

“তাই চলুন—গণেশবাবুকেই ধরি গিয়ে সকলে মিলে—”

রুদ্ধ আবেগে দিগিন্দ্রবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

বাকী সকলেও সোৎসাহে সম্মত হইয়া গেলেন!

হেবো কিছু বলিল না।

সে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

মুরারিবাবু ভুল জানিতেন।

আসল কথা জানিত হেবো।

কথাটি এই—ধনেশ পিতৃভক্ত ছিল না—গণেশই পুত্রভক্ত ছিলেন। কারণও ছিল।

বৃদ্ধ গণেশ তরুণী তৃতীয় পক্ষ ও বিগত দ্বিতীয় পক্ষের অনেকগুলি অপোগণ্ড কাচ্চাবাচ্চা লইয়া প্রথম পক্ষের পুত্র ধনেশের দাক্ষিণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। ধনেশ ঘাড় ধরিয়া বৃদ্ধ পিতাকে কাচ্চাবাচ্চা সমেত রাস্তায় বাহির করিয়া দেন নাই, ইহাই যদি পিতৃভক্তের নিদর্শন হয়—তাহা হইলে ধনেশ পিতৃভক্ত।

পিতার প্রতি ভক্তি থাকিবার ধনেশের কোন হেতুও ছিল না।

এক জন্মদান করা ছাড়া গণেশ ধনেশের আর কোন উপকার করেন নাই। এই বিপুল ধন-সম্ভার ধনেশ উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই—নিজে উপার্জন করিয়াছেন। গণেশ সামান্য চাকুরি করিতেন এবং স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে আজীবন তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি ধনেশকে লেখাপড়াটা পর্যন্ত শিখাইবার অবসর পান নাই। ধনেশ স্বকীয় প্রতিভাবলে পাট ও লোহার কারবার করিয়া বিগত যুদ্ধের বাজারে বহু টাকার মালিক হইয়া বসিয়াছেন।

তবে ইহা সত্য কথা, ধনেশ পিতার প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করে না। কিন্তু পিতৃভক্ত বলিতে যাহা বুঝায়, ধনেশ তাহা নয়।

পিতা গণেশ পুত্র ধনেশের আধিপত্যে দুই পক্ষ লইয়া গরুড় পক্ষীটির মত সসংকোচে বাস করিতেন।

এই গণেশকে গিয়া দিগিন্দ্রবাবুর দল গোপনে ধরিয়া পড়িলেন। গণেশ লোক খারাপ নন।

তিনি আশ্বাস দিলেন যে, ধনেশকে তিনি অনুরোধ করিবেন।

করিলেনও।

শুনিবামাত্র ধনেশ বলিয়া বসিলেন—"ক্ষেপেছ ? এ সব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? তোমাকে এসে ধরেছিল বুঝি ! যত সব বোগাসের দল।"

গণেশ চুপ্‌সাইয়া গেলেন।

সুতরাং পরদিন দিগিন্দ্রবাবুকেও চুপ্‌সাইতে হইল।

এ রকমটা যে ঘটিবে, হেবো তাহা জানিত।

॥ দুই ॥

আবার পরামর্শ-সভা বসিল।

গল্প-লেখক মুরারিমোহন আবার একটি পরামর্শ দিলেন এবং রাজনৈতিক দিগিন্দ্রবাবু আবার তাহাতে নাচিলেন। সুতরাং বাকী সকলেও নাচিলেন।

"কংকরানন্দের কাছে যাওয়া যাক্।"

কংকরানন্দ ধনেশের গুরু।

কংকরানন্দকে ভিজাইতে পারিলে ধনেশ তাতিবেই।

গুরুবাক্য ধনেশ কিছুতেই ঠেলিতে পারিবে না।

সদলবলে গিয়া সকলে কংকরানন্দের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত শুনিয়া কংকরানন্দ বলিলেন—"তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু—ধনেশকে আমি অনুরোধ কোরব—"

সকলে আশ্বস্ত হইলেন।

এইবার নিশ্চয়।

হেবো কিন্তু হাসিল।

* * * *

হেবোর হাসি বিফল হইল না।

ধনেশ অটল।

গুরুবাক্য সে অবহেলা করিয়াছে, অথচ গুরু চটেন নাই!

ধনেশ-কঙ্করানন্দ-সংবাদ নিম্নলিখিত প্রকার।

সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিয়া ধনেশ গুরুদেবকে বলিলেন—

"গুরুদেব, আপনার আদেশ আমি নতশিরে মানতে বাধ্য। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করবার অনুমতি দিন আমাকে। এতগুলো টাকা কি আপনি জলে ফেলে দিতে আদেশ করেন? যদি করেন—দেব—জলেই ফেলে দেব আমি! আমার বিজ্‌নেস্‌ পার্টনার নাথমল স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাকে যে, মাসিক পত্র বার করলে টাকাটা ডাহা জলে পড়্‌বে! তা ছাড়া অতগুলো টাকা বাজে ব্যাপারে আটকে ফেল্‌তে ইচ্ছে নেই আমার। আমার আন্তরিক ইচ্ছে আপনাকে—"

স্মিতহাস্যভরে কঙ্করানন্দ বলিলেন—"আমার কিসের দরকার বল! আমি কাঁকর খাই, কাঁকরে শুই—"

"না—না, না—আপনার জন্যে নয়—সে স্পর্ধা আমার নেই! আপনাকে কেন্দ্র করে একটা আশ্রম স্থাপন করব বলে অনেকদিন থেকে আমার বাসনা।"

"তবে যা ভাল বোঝ—কর!"

সুতরাং কঙ্করানন্দকে ভিজাইয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

রাত্রিকাল।

বাহিরের ঘরটাতে বসিয়ে দিগিন্দ্রবাবু কানে কলমের উল্টা দিকটা ঢুকাইয়া বিকৃতমুখে কান চুলকাইতেছিলেন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে হেবো আসিয়া প্রবেশ করিল।

আসিয়া বলিল—"দিগিন দা—জোগাড় করেছি—"

"কি?"

"কান থেকে কলমটা বার করুন আগে।"

বেশ করিয়া একবার শেষ চুলকানী চুলকাইয়া লইয়া দিগিন্দ্র কলমটা কান হইতে বাহির করিলেন।

করিবামাত্র হেবো তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"ঠিকানা পেয়েছি। ধনেশও আজ কোলকাতার বাইরে গেছে। আজই সুযোগ, যাবেন এখন?"

"এক্ষুনি।"

॥ দুই ॥

উদ্‌ভ্রান্ত দিগিন্দ্র সোম বাহির হইয়া পড়িলেন।

চিৎপুর অঞ্চলে এক সুসজ্জিত কক্ষ।

মদিরাক্ষী একটি যুবতীর সম্মুখে দিগিন্দ্র কাঁচুমাচু হইয়া বসিয়া আছেন।

যুবতী হাসিয়া বলিলেন—"নিন্ পান খান একটা।"

"হ্যাঁ—এই যে—"

ত্রস্ত দিগিন্দ্র একটি পান তুলিয়া লইলেন।

"মাসিক পত্র আপনাদের বার করিয়ে দেবই—কথা দিলাম। নিশ্চয় দেব! কিন্তু তার বদলে আমাকে কি দেবেন বলুন!"

যুবতীর কৌতুকদীপ্ত নয়ন দুটিতে চাপা হাসি ফুটি ফুটি করিতে লাগিল।

দিগিন্দ্র উত্তর দিবে কি! তাহার অবস্থা তখন শোচনীয়।

গরম দুধে পাঁউরুটি পড়িলে তাহার যেমন অবস্থা হয়—দিগিন্দ্রের অবস্থা তখন অনেকটা তাই—অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

আবদার-তরল-কণ্ঠে যুবতী আবার বলিলেন—"আপনাদের কাগজে আমার ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে কিন্তু—"

দিগিন্দ্র নিরুত্তর।

দিগিন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া হেবোই শেষে উত্তর দিল।

"নিশ্চয়—প্রত্যেক মাসেই আপনার ছবি থাকবে—"

॥ তিন ॥

বলা-বাহুল্য, ধনেশ পুরুষ মানুষ।

সুতরাং সে কাবু হইল।

শুধু কাবু নয়—ঢালা হুকুম দিল—'যত টাকা লাগে—কুছ পরোয়া নেই।' সুতরাং অলকনন্দা এইবার নির্ঘাৎ বাহির হইবে।

মহাসমারোহে আয়োজন চলিতেছে।

কয়েকজন উদীয়মান শিল্পী চিৎপুরে গিয়া ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছেন। হেবোর নির্দেশ অনুযায়ী অলকনন্দার প্রথম সংখ্যার প্রথম রঙীন ছবিটির নাম হইবে 'পূজারিণী'—দ্বিতীয় ছবিটির 'স্নানার্থিনী'। তৃতীয় ছবিটির নামকরণ হেবো এখনও করে নাই।

যুগান্তর

॥ এক ॥

এককড়ির প্রপৌত্র, দুকড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার স্বীয় পুত্র ছকড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোদ্দারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত। বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মতটাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইত। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যে কোন বিষয়ে—সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্তমান সামাজিক অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জনী আস্ফালন করিয়া জাহির করিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা সানন্দে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

অন্য উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এবং গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। সুতরাং হরিণহাটি গ্রামে সংগীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে যাঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছেন তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোদ্দার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করাতে সারা জীবনটা ভরিয়া নানা-প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি লইয়া যেখানে-সেখানে যখন-তখন আস্ফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার করেন। ফিতা-বাঁধা ফতুয়াই তাঁহার সাধারণ অংগচ্ছদ। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখে নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোদ্দার পুত্র ছকড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া দিয়া গৃহিণী ছকড়ির মাথাটি এমন ভাবে খাইয়াছেন যে পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ন্যায় মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কলিকাতায় পড়াশোনা করিতে যান দূরদর্শী পোদ্দার মহাশয় তখনই আপত্তি করিয়াছিলেন। বি-এ, এম-এ, পাশ করিয়া দশটা মুণ্ড, বিশটা হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে—তাহাতেই বা কি ? এই বাজারে অতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন—এখন নাও—ছেলে 'লভে' পড়িয়াছে!

॥ দুই ॥

ছেলে যে 'লভে' পড়িয়াছে এ-কথাটা প্রথমত পোদ্দার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব কুণ্ডুর সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের পত্রের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ ঃ

একদা পাঁচকড়ি পোদ্দার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ছকড়ির বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না, ইহা অত্যন্তই অন্যায় হইতেছে। বিবাহ-প্রসংগটা উত্থাপন করিলেই ছকড়ি লেখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এবং মাধব কুণ্ডুও সে-কথা সমর্থন করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছকড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না করিলে নানা প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত শহরে।

পোদ্দার মহাশয়ের স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়েকেই তিনি ছকড়ির জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহুদিন পূর্বেই বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফলাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোদ্দার মহাশয়ের ভারি পছন্দ। তাছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্বোপরি বছর-চারেক পূর্বে বিশ্বনাথ যখন দেশে আসিয়াছিল তখন তিনি তাহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং ঐখানেই বিবাহ দেওয়া ঠিক। মাধব কুণ্ডুও এ বিষয়ে এক মত। পাকা কথা দেওয়ার পর হইতেই —অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর ধরিয়া—পোদ্দার মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোদ্দার মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

"দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। ইস্কুলে-পড়া হাল-ফেশিয়ান মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে। বউমাটিকে গৃহকর্মনিপুণা কর। আমার সহধর্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রান্না একাই রাঁধিতে পারেন। তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ত্ব গ্রামশুদ্ধ লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই চাল বজায় রাখিতে পারে—"

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

"ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সংসারধর্মে সুনিপুণা করিতে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তোমার বউমা মশলা বাঁটা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার গৃহকর্ম নিয়মিতভাবে করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জরির কার্য করিতেও শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন সুতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হয়—"

ইহার উত্তরে পোদ্দার মহাশয় জবাব দিতেন—

"উল বোনা ও জরির কার্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা এমন কি উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে

পুনঃ পুনঃ আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি, বউমাটিকে ফেশিয়ান-দুরুস্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে। মাধব কুণ্ডু খবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া যায়—"

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

"উল-বোনা ও জরির কার্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না—"

এই ভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছকড়ি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশোনা করে। বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে সে বিবাহ করিবে—তৎপূর্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ডুর পরামর্শ অনুযায়ী পোদ্দার মহাশয় ঠিক করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছকড়ি বিবাহ করিবে না। আজকালের ছেলেছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ডু বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোদ্দার মহাশয় মাধব কুণ্ডুর নির্দেশমত ছকড়িকে পত্র দিলেন যে আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসে।

॥ তিন ॥

ইহার উত্তরে ছকড়ি যাহা লিখিল তাহাতে পাঁচকড়ি আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে এত দূর ভয়ংকর হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাধব কুণ্ডুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছকড়ি লিখিয়াছে—

"বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পূর্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ-কথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিয়া আসিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

কুণ্ডু আসিলে পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "ছকড়ির চিঠি! পড়ে দেখ—এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোদ্দার-বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মায়!"

কুণ্ডু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "লভে পড়েছে—"

"কিসে পড়েছে?"

"লভে—লভে—মানে প্রেমে—"

পোদ্দার মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "এর মূলে কি আছে জান?"

কুণ্ডু বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষা—"

"না, আমার গিন্নি। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটাকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই —দাও চিঠিখানা—"

পোদ্দার পত্রখানি লইয়া খড়ম চট্‌চট্‌ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সংকুচিত হইতেছি।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোদ্দার মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোদ্দার মাধব কুণ্ডুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আত্মগোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ডু বলিলেন, "চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনের তীর্থটা সেরে আসা যাক। এক ঢিলে দুই পাখীই মরবে"—পাঁচকড়ি পোদ্দার তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ডু সংগী।

॥ চার ॥

দীর্ঘ ছয় মাস পোদ্দার মহাশয় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ডু সংগে থাকাতে ভ্রমণটা মনোরমই হইয়াছিল। ফিরিবার পথে কাশীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

"ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমার নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়ীতে কোন ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম তুমি না-কি কাশীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মর্মে হরিণহাটিতে কুণ্ডু মহাশয় একখানি পত্রও না-কি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমার ঠিকানা যোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পাই নাই। এখন অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি এবং তোমার মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

"তুমি স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিসটা ধীরেসুস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস করি লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।

"শ্রীমান ছকড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তাহাদের মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে মেলামেশাটা একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছকড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টই বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত এবং ইহাও সে বলিল যে তুমি

যদি জানিতে পার যে মেয়ে স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ডু মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটিতে দিবে না। তোমাকে ত আমিও চিনি। তুমি একগুঁয়ে লোক—হয়ত বাঁকিয়া বসিবে। নানারূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছকড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্বিঘ্নেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছকড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে এবং ছকড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে এইবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমি হরিণহাটি গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ।

“সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না-হয় দু ঘা মারিয়া যাও। কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্কুলে পড়িলেও সত্যই গৃহকর্মনিপুণা হইয়াছে! নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার··” ইত্যাদি।

॥ পাঁচ ॥

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটারফ্লাই ফ্যাশানে গোঁফ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক বাড়ির বৈঠকখানার বারান্দায় বিলাতী মরশুমী ফুলের কয়েকটি টবও বসান হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডুর মুখের দিকে শুধু একবার চাহিলেন।

কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, “সব লক্ষ্য করছি—”

* * *

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরীর বেণী রচনা করিতেছেন। বৌ!

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্বৃত বেশবাস সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধূ ছুটিয়া গৃহমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, “হঠাৎ খবরটবর না দিয়ে এসে পড়লে যে। যাক্—এলে বাঁচলাম। ভাল ছিলে ত বেশ ?”

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিলেন, “ওটা কি ?”

“ওমা, ছকড়ির খোকা হয়েছে যে! অমলকুমার -”

“কি ?”

“অমলকুমার! বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।”

পোদ্দার স্তম্ভিত।

বিস্ময় কাটিলে তিনি বলিলেন, “অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা! আমি কাশী ফিরে চললাম—”

বলিয়া তিনি সত্যই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা গো—"

"অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না—"

"বেশ ত তুমিই একটা নাম দাও না।"

"নকড়ি—"

"বেশ তাই হবে—"

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

বাস্তব ও স্বপ্ন

॥ এক ॥

আদেশ শুনিয়া পলাশ অবাক হইয়া গেল।

তাহার পর যথোচিত সংযত কণ্ঠে কহিল—"তা কি করে সম্ভব ?"

বড়বাবু রুক্ষ্ম স্বরে উত্তর দিলেন—"সম্ভব অসম্ভব বুঝি না মশাই, কাল বেলা ন'টার মধ্যে আপনাকে লেজার কমপ্লিট করে দিতে হবে। দশটার সময় ইনস্‌পেকশন হবে—"

পলাশ আবার বলিল—"সমস্ত লেজারটা কমপ্লিট করতে হলে ত সমস্ত রাত কেটে যাবে। আমি কি সমস্ত রাত এইখানে বসে কাজ করব ?"

"সমস্ত রাত ! দশটা পর্যন্ত কাজ করলে অমন দুটো লেজার কমপ্লিট হয়ে যায়। এখন ত মাত্র আড়াইটে বেজেছে। সাত আট ঘণ্টা ভাল করে কাজ করলে লেজার কমপ্লিট হবে না ? কাকে শেখাচ্ছেন আপনি ! আমিও একদিন আপনার পোস্টেই চাকরি করেছি।"

"বাড়ীতে আমার ছোট মেয়েটির জ্বর দেখে এসেছিলাম—অত রাত্রি পর্যন্ত আপিসে থাকলে—"

পলাশ তাহার কথা শেষ করিতে পারিল না। বড়বাবু তাঁহার 'রিভলভিং' চেয়ারখানাতে বোঁ করিয়া ঘুরিয়া পলাশের মুখের দিকে সোজা তাকাইয়া কঠিন স্বরে বলিলেন—"দেখুন এইজন্যেই আমি সায়েবকে বলেছিলাম যে, এম-এস-সি ফেমেস্‌সি ক্লার্ক আমার দরকার নেই ! ওঁরা 'স্টিক' করে থাকবেনও না, আর যতদিন থাকবেন ততদিন কাজকর্ম না করে খালি তর্ক করবেন। আপনার ছোট মেয়েটির জ্বর হয়েছে বলে কি আমরা আপিস বন্ধ করে দেব নাকি ? আমার বাড়ীতেও দুটো ছেলের হুপিং কাসি, একটির চোখ উঠেছে, পিসিমার হাঁপানি, গিন্নির কোমরে ফিক্ ব্যথা—তাই বলে কি আমি ঘরে বসে বুক চাপড়াব ? না, বুক চাপড়াইলেই কিছু উপশম হবে ?"

পলাশ বলিল—"কিন্তু এত কাজ যে 'এরিয়র' পড়েছে তা ত ঠিক আমার দোষে নয়। আমি যতদিন থেকে—"

উত্তপ্ত তৈলে এইবার বার্তাকু নিক্ষিপ্ত হইল।

বড়বাবু টেবিল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"I order you to do it. You shall suffer if you do not obey. Go—"

পলাশ চলিয়া যাইতে যাইতে শুনিল, বড়বাবু প্রাকৃত ভাষায় স্বগতোক্তি করিতেছেন—"আরে মোলো—কচু খেলে যা—" বড়বাবুর মুখটি লম্বা ধরনের—অনেকটা মোচার ন্যায়। থুৎনীর কাছে এবং মাথার দিকে একটু সুচালো। মস্তক কেশবিহীন। সামনের দিকটাতে এত টাক পড়িয়াছে যে আলো পড়িলে চক্ চক্ করে। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অস্বাভাবিক রকম শাদা। গায়ের বর্ণ ঘোর কালো হওয়ায় আরও শাদা দেখায়। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, পরিষ্কার কামানো। বলা বাহুল্য বড়বাবুর দেহ-সৌষ্ঠবে নয়ন-মুগ্ধকর কিছু নাই। তাহাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয় নাই। কারণ তিনি কোন প্রণয়-ব্যাপারে নায়ক-পদপ্রার্থী নহেন। জীবনে তিনি যাহা কামনা করিয়াছিলেন তাহা তিনি এই বদ চেহারা এবং স্বল্প বিদ্যা সত্ত্বেও পাইয়াছেন। মাত্র প'য়তাল্লিশ বৎসর বয়সে এত বড় আপিসের বড়বাবুর পদে উন্নীত হওয়া কি সোজা কথা ?

॥ দুই ॥

বড়বাবুর ঘর হইতে বাহির হইয়া পলাশ দেখিল যে, বড়বাবুর উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন কৌতূহলী কেরাণী বড়বাবুর দ্বারের কাছে উৎকর্ণ হইয়া আড়ি পাতিয়াছে। পলাশকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া তাহারা বুঝিল যে, শ্রবণযোগ্য আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাহারা নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল। পলাশও আসিয়া নিজের স্থানটিতে বসিল। তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। এত অপমানিত সে জীবনে কখনও হয় নাই। ছি, ছি— মাসে চল্লিশটা টাকার জন্য এই লাঞ্ছনা ! একটু পরেই একটি সুদর্শন ছোকরা আসিয়া পাশের টুলটা টানিয়া বসিল এবং এক টিপ নস্য টানিয়া হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বললে হুঁকো-মুখো ?"

আপিসে সকলেই বড়বাবুকে আড়ালে হুঁকো-মুখো বলিয়া ডাকিত। পলাশ কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিল না।

অমিয় বলিল—"কি বললে—বল না ?"

অমিয় পলাশের বন্ধু। এককালে সহপাঠী ছিল।

পলাশ বলিল—"বললে এই লেজার বুক কমপ্লিট করে দিতে" বলিয়া পলাশ এক বিরাটকায় খাতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

অমিয় বলিল—"এখন বলবে বৈকি। কাল 'অডিট' আসছে কি না। তোমার পোস্টে ওর শালা এতকাল ছিল। কুটোটি নাড়ত না—তাই এতসব বাকী—"

পলাশ নির্বাক হইয়া রহিল।

অমিয় সহানুভূতির স্বরে বলিল—"এখন আর ভেবে কি হবে ভাই। উঠে পড়ে লেগে যাওয়াই ভাল। বল, ত তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার ফাইল আমি ক্লিয়ার করে ফেলেছি—"

এমন সময় চশমা সামলাইতে সামলাইতে বিশ্বাস মহাশয় প্রবেশ করিলেন। স্ফীতোদর বর্তুলাকার ভদ্রলোক। মাথায় অবিন্যস্ত কাঁচাপাকা চুল ; হাসিলে কালো পানের ছোপধরা কয়েকটি দন্ত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই আপিসের অনেককালের কর্মচারী।

আপিসের সকলের সহিত তাঁহার দাদামহাশয় সম্পর্ক ; তাঁহার সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা সকলেই করে। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করাতে রসিকতার মাত্রাটা সম্প্রতি একটু বাড়িয়াছে।

বিশ্বাস মহাশয় আসিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া অভিভাবক-ভঙ্গীতে বলিলেন—“ছি, ছি, কাজটা তোমার অন্যায় হয়েছে ভাই, বড়বাবুর মুখের উপর অমন জবাব দেওয়াটা তোমার উচিত হয়নি ; হাজার হোক প্রবীণ লোক—তাছাড়া শিবতুল্য মানুষ—” বলিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তিনি নিম্নস্বরে গল্প জুড়িয়া দিলেন—“আমাদের আপিসে আমরা ত সুখে আছি হে, রাম রাজত্বে আছি বললেই চলে। ওই আমাদের সামনের আপিসের বড়বাবুর তুলনায় আমাদের বড়বাবু ত সাক্ষাৎ শিব। ওদের বড়বাবু রেগে গেলে শুনেছি জুতো পর্যন্ত ছোঁড়েন।”

একবার গল্প শুরু করিলে বিশ্বাস মহাশয়ের হ্রস দীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। সত্যের বড় বড় নদী পর্বত তিনি অনায়াসে মিথ্যা কল্পনার এরোপ্লেনে উড়িয়া পার হইয়া যান। এ ক্ষমতা তাঁহার আছে সুতরাং তিনি তাঁহার শ্লথ চশমাটা নাকের উপর ঠিকমত বসাইয়া লইয়া শুরু করিলেন—

“সেকালে শুনেছি পালা করে বড়বাবুদের পা টিপে দিতে হত—তামাক সেজে দিতে হত। তবে চাকুরি বজায় থাকত। শঙ্কর খুড়োর মুখে গল্প শুনেছি—একবার তাঁর আপিসের বড়বাবুর হ’ল ‘ডিস্‌পেপ্‌সিয়া’। ডাক্তার উপদেশ দিলেন, গন্ধভাদালের সঙ্গে চুনো মাছের ঝোল করে খেতে। তাই শুনে শঙ্কর খুড়ো সকালে উঠে নিজেদের খিড়কির পুকুর থেকে স্বহস্তে জাল ফেলে চুনো মাছ ধরে আর এক বোঝা গন্ধভাদালের লতা সংগ্রহ করে নিয়ে আপিসে হাজির হলেন। আপিসে গিয়েই কিন্তু শঙ্কর খুড়োর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। গিয়ে দেখেন, সেখানে ইতিমধ্যে প্রায় মণখানেক চুনো মাছ আর গাড়ী খানেক গন্ধভাদালের লতা এসে পেঁৗছে গেছে, দুর্গন্ধে আপিসে টেকা মুস্কিল। সাহেব চটে লাল—”

অমিয় হাসিয়া করজোড়ে বলিল—“বিশ্বাসদা—ঢের হয়েছে। এইবার একটু দয়া করুন। এই বিরাট লেজার কমপ্লিট করতে হবে।”

বিশ্বাস মহাশয় একটু অনুকম্পা-মিশ্রিত বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—“এতে আর দয়া করা-করি কি ভাই। তোমরা হিতকথা বললে ত আর শুনবে না। তোমাদের মেজাজ ‘তেরিয়া’ হয়েই আছে। মাথা ঠিক রেখে কথাটা পর্যন্ত কইতে পার না। বাঙালীর ছেলে চাকরিটি গেলে তখন খাবে কি ?” বলিয়া তিনি মাথা ঝাঁকিয়া পলাশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ চশমাটা আবার নাকের উপর বসাইয়া দিলেন তাহার পর চোখের ইসারায় পলাশকে ডাকিয়া বলিলেন—“একটা কথা বলছি শোন—প্রাইভেটলি—”

পলাশ উঠিয়া গেল। বারান্দায় গিয়া বিশ্বাস মহাশয় বলিলেন—“বড়বাবু চলে যাওয়ার আগে একবার গিয়ে ‘অ্যাপলজি’ চেয়ে এসো।”

“অ্যাপলজি ? কেন ?”

ইহার বেশী আর পলাশ বলিতে পারিল না। সে এই অল্পদিন হইল চাকুরিতে ঢুকিয়াছে, এখনও তাহার গায়ে ইউনিভার্সিটির গন্ধ লাগিয়া আছে ; এই সদাগরি আপিসের রীতি-নীতি এখনও সে ঠিক মত বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিশ্বাস মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“এখনও ‘টেম্পোরারি’ লিস্টে রয়েছ বুঝছ না ?

বড়বাবুর কলমের এক খোঁচায় তোমার চাকরিটি খতম হয়ে যেতে পারে, ওঁর ছোট শালা মুকিয়ে রয়েছে, তোমাকে ত উনি নিতেই চান নি প্রথমে। এম-এস্‌-সি পাশ ব'লে ঘোর আপত্তি করেছিলেন। তোমার শ্বশুর হেরম্ববাবুর সঙ্গে 'টম লিনসন' সাহেবের অত্যন্ত দহরম মহরম, তারই জোরে তুমি চাকরিটি পেয়েছো ; তুচ্ছ একটা কথার জন্যে চাকরিটি খুইয়ো না। বড়বাবুকে বল যে, 'আমায় মাপ করুন—এমন আর কখনো হবে না।' সব ঠিক হয়ে যাবে—এধারে শিবতুল্য লোক উনি!" দ্বারপ্রান্তে অমিয় দেখা দিল, অমিয়কে দেখিয়া বিশ্বাস মহাশয় শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ যাও—কাজ করোগে তোমরা, আমার কাজ হয়নি এখনও। ওরে এক পয়সার মিঠে পান বোঁ করে নিয়ে আয় ত বাবা", বলিয়া তিনি একটি পয়সা একটি পাংখা কুলিকে দিলেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিলেন—"একটু দোক্তাও আনিস্‌—ওই মোড়ের দোকানটা থেকে নিস্‌—বেড়ে দোক্তা মাগীর"—

বিশ্বাস মহাশয় চলিয়া গেলেন।

অমিয় এবং পলাশ আসিয়া লেজার লইয়া পড়িলেন।

॥ তিন ॥

রাত্রে পলাশ বাড়ী ফিরিতেছে।

দশটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় সংকীর্ণ গলিটার মুখে দাঁড়াইয়া পলাশ খানিকক্ষণ কি ভাবিল। এই দুর্গন্ধ গলিটার এক প্রান্তে সে তাহার সাধের সংসার পাতিয়াছে! মেয়েটা কেমন আছে কে জানে! নানা আবর্জনা পার হইয়া সে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল ; স্ত্রী হেমাঙ্গিনী আসিয়া দ্বার খুলিল এবং প্রশ্ন করিল—"আজ ফিরতে এত রাত হল?"

"আপিসে আজ কাজ বেশী ছিল—"

বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া হেমাঙ্গিনী আবার প্রশ্ন করিল—"আপিসে তোমাদের ফুলবাগান আছে নাকি?"

"তার মানে?"

"ফুল কোথায় পেলে?"

"কই? ও—ভুলেই গেছলাম! খুকী কেমন আছে?" বলিয়া সে কোটের 'বাটন হোল' হইতে একটি ক্ষুদ্র যূথিকাগুচ্ছ খুলিতে খুলিতে বলিল—"নাও তুমি খোঁপায় পর, ময়লা কোটে এসব মানায় না। অমিয়র বউ দিলে!"

"অমিয়র বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে একটু ঝাঁজ অনুভব করিয়া জবাবদিহির সুরে পলাশ বলিতে লাগিল—"মানে, অমিয়ও এতক্ষণ আপিসে আমার সঙ্গে সমানে ছিল কি না। আমার কাজের সাহায্য করছিল। আজ অমিয়র ভায়রাভাই এসেছে—বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার একটু আয়োজন ছিল—আমাকে নেমন্তন্ন করলে—'না' বলতে পারলাম না ; অমিয় না থাকলে আজ লেজার কম্‌প্লিট করা অসম্ভব হত। খুকী কেমন আছে?"

"খাওয়া-দাওয়া ওদের বাড়ীতে সেরেই এসেছ তাহলে?"

"হ্যাঁ—খুকীটা কেমন আছে—?"

"রাত্রে ওখানে শুলেও পারতে ! আসবার দরকার কি ছিল ! খুকীর জন্যে ত তোমার ঘুম হচ্ছে না। ভারি এক ব্যাগারি হরেন ডাক্তার জুটেছে—সন্ধেবেলা এসে পনর ষোল টাকার ইন্‌জেকশনের ফরমাস করে গেছেন। এদিকে মেয়ের দুধ পর্যন্ত পেটে যাচ্ছে না—নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে—"

ঝনাৎ করিয়া সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী সরিয়া দাঁড়াইল। পলাশ বুঝিল এখন আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলে পাশের বাড়ীর লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইবে মাত্র। সুতরাং সে নীরবে ঘরে গিয়া ঢুকিতেই চোখে পড়িল তাহার 'ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস্'খানা দিয়া একটা বাটিতে কি ঢাকা রহিয়াছে। বোধ হয় সাবু কিম্বা বার্লি। নিকটে একখানা চিঠিও রহিয়াছে, দেখিল হরেন ডাক্তার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। চিঠি পড়িয়া পলাশের গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল ! মেয়ের ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে, আজ রাত্রেই ইন্‌জেকশন না দিলে জীবন সংশয়। সর্বনাশ, ইন্‌জেকশন কিনিবার মত টাকাও যে তাহার হাতে এখন নাই ! অথচ—

ঘর হইতে বাহির হইয়া সে দেখিল হেমাঙ্গিনী খাইতে বসিয়াছেন। বাঙালী ঘরের অধিকাংশ সাধ্বী স্ত্রীগণের আদর্শ-অনুযায়ী হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ স্বামীর প্রত্যাশায় অভুক্তা ছিলেন এবং স্বামীর বিলম্বহেতু মনে মনে চটিতেছিলেন।

স্বামী বন্ধুর বাড়ীতে আহারাদি সমাপনান্তে যুবতী বন্ধু-পত্নীর নিকট হইতে পুষ্পগুচ্ছ উপহার পাইয়াছেন দেখিয়া হেমাঙ্গিনী উক্ত সাধ্বী স্ত্রীগণের অনুকরণে ক্লান্ত স্বামীকে কটুক্তি বর্ষণান্তে কড়কড়ে ঠাণ্ডা ভাত লইয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনীর দোদুল্যমান দুল দুইটির প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া পলাশ ভাবিতে লাগিল—"শেষ পর্যন্ত কি—"

॥ চার ॥

কল্পনাপ্রবণ পলাশকান্তির যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন বেলা পাঁচটা। নিদ্রাভঙ্গ হইলেও স্বপ্ন ভঙ্গ হইতে চায় না ! অত্যন্ত দীর্ঘ স্বপ্ন দেখিয়াছে সে ! তাহার মনে হইতে লাগিল কুপিতা হেমাঙ্গিনী আশে পাশে কোথাও ঘুরিতেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিল যে সে তাহার সেই পুরাতন মেসের সনাতন জারুল কাঠের চৌকিতেই শুইয়া আছে। সমস্তটাই স্বপ্ন ! আঃ বাঁচা গেল।

সে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল ; 'শেলফ' হইতে হেমাঙ্গিনীর 'ফোটো'খানা লইয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিল। দেখিতে মন্দ নয় মেয়েটি। তবুও খপ্পরে আর সে পা দিবে না।

এমন সময় হেরম্ববাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র পলাশ 'ফোটো'খানি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল—"আমি ভেবে দেখলাম ভাল একটা রোজগারের জোগাড় না করে এখন বিয়ে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না !"

হেরম্ববাবু হাসিয়া বলিলেন—"চাকরি ত আমি জোগাড় করে রেখেছি তোমার জন্যে। টম লিন্‌সন্ সায়েব আমাকে প্রমিস্ করে রেখেছেন। তোমার বন্ধু অমিয়বাবু, তোমাদের এই মেসেই থাকেন বিশ্বেস মশাই, এঁদের আপিসেই তোমার ভাল একটা চাকরি জোগাড় করে দেব। প্রথমেই চল্লিশ টাকা থেকে—"

পলাশ সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে না—অত কম মাইনেতে আমি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারব না। দেখি যদি একটা প্রোফেসারি জোটাতে পারি। বি, সি, এসটা দেবারও চেষ্টা করব—"

ক্ষুণ্ন হেরম্ববাবু বিষণ্ন চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার ধারণা হইল ফটোগ্রাফারটা ঠিক ফটো লইতে পারে নাই। 'পোজ'টা ঠিক হয় নাই।

॥ পাঁচ ॥

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পলাশ এবং অমিয় একটি 'সিনেমা শো'তে যাইতে যাইতে গল্প করিতেছিল। বিশ্বাস মহাশয়ও সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিনেমা দেখা নয়, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে একটি মনোহারিণী শাড়ি কিনিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পলাশ এবং অমিয়ের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইহাদের পছন্দের উপর বিশ্বাস মহাশয়ের অগাধ বিশ্বাস।

অমিয় বলিতেছিল—"স্বপ্নে নিজের সংসারটা কেমন দেখলি ?"

"ঠিক দাদা-বৌদির সংসার যেমন !"

"আর আপিস কেমন লাগল ?"

"আপিসে তুমি, বিশ্বাস মশায় আর তোমাদের হুঁকো-মুখো ! বিরাট এক লেজার বুক !"

অমিয় হাসিয়া উঠিল।

"একটু দাঁড়াও ভায়ারা" বলিয়া বিশ্বাস মহাশয় মোড়ের একটি পানওয়ালির নিকট পান খরিদ করিতে গেলেন।

অমিয় বলিতে লাগিল—"আচ্ছা গাধা ত তুই। একটা স্বপ্ন দেখে অমন একটা দাঁও ছেড়ে দিলি ? অমন সুন্দরী মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকরিও। কার ভাগ্যে জোটে অমন !"

বিশ্বাস মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া কথাবার্তার সূত্র ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ঠিক করলে না দাদা ! বাজার বড় খারাপ। তাছাড়া স্বপ্নে তুমি যাই দেখ আমাদের আপিসে কাজ করে সুখ পেতে ! বড়বাবু আমাদের শিবতুল্য লোক !—ও কি তোমরা ওদিকে বেঁকলে যে ! আমার শাড়িটা—"

হাত ঘড়িটা দেখাইয়া অমিয় বলিল—"মাত্র দশ মিনিট সময় আছে আর। কাল নিশ্চয় কিনে দেব। আপনি আজ আটটার পর যাবেন কিন্তু—"

॥ ছয় ॥

আলোকোজ্জ্বল চৌরঙ্গী। নানা বর্ণের সুদৃশ্য মোটরকার হইতে নানাবিধ মূল্যবান পরিচ্ছদে সুসজ্জিত নানা জাতীয় মানব-মানবী অবতরণ করিতেছে। আনন্দের স্বপ্নলোকে এই মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া পলাশ ত্বরিতপদে টিকিট কিনিতে গেল এবং সেইদিন সকালেই দাদার নিকট হইতে মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত দশ টাকার নোটখানা ভাঙাইয়া দুইখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ফিরিবার মুখে টিকিট ঘরের প্রতি ধাবমান একটি লোকের সহিত অন্যমনস্ক পলাশের ধাক্কা লাগিয়া গেল, পলাশ মুখ তুলিয়া দেখিল ! লোকটি আর কেহ নয়, কন্যাদায়গ্রস্ত হেরম্ববাবু। তিনিও স্বপ্নাতুর !

খড়মের দৌরাত্ম্য

॥ এক ॥

ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, দশ-আনা-ছ-আনা চুল, পরনে বিচিত্র লুংগী, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ—এ হেন লোকের নাম রাধাবল্লভ। পিতামহপ্রদত্ত নাম। রাশিয়ায় শুনিয়াছি নাম বদলাইবার সুযোগ আছে। এদেশেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে নিজেদের পছন্দসই নামকরণ করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভ একবার ম্যাট্রিক দিবার সুযোগ অবশ্য পাইয়াছিল, কিন্তু নাম বদলাইবার কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। পৃথিবীতে এই সব অঘটন কেন ঘটে তাহা বলা শক্ত। সে দুরূহ গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে রাধাবল্লভের নামটা আরও একটু আধুনিক হইলে যেন মানাইত ভাল। কারণ রাধাবল্লভ সত্যই একজন আধুনিক যুবক। চিন্তায়, পোষাকে, কথায়-বার্তায়, বিশেষ করিয়া উপার্জন ব্যাপারে রাধাবল্লভ একেবারে অতি-আধুনিক। 'ব্রিজ' এবং 'ফ্লাশ' খেলায় রাধাবল্লভ সুদক্ষ। এই পথে তাহার অর্থাগমও হয়। হয় বলিয়া রাধাবল্লভের মাতুল রাধাবল্লভের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ সিগারেট সিনেমার খরচটা আর তাঁহাকে জোগাইতে হয় না। এই বাজারে তাহাও কম লাভজনক নয়।

॥ দুই ॥

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিবার পর হইতে রাধাবল্লভ তারুণ্য-চর্চা করিতেছে। তারুণ্য-চর্চা বলিতে কি বুঝায় তাহা এ যুগের পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বোঝেন। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। নিরংকুশভাবে রাধাবল্লভের তারুণ্য-চর্চা চলিতেছিল। হঠাৎ একদিন বেচারা ঘা খাইয়া গেল।

মহাদেব-ঘায়েল-কারী দুষ্ট দেবতাটি হঠাৎ একদা রাধাবল্লভ পোদ্দারকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁর অব্যর্থ শর-সন্ধান করিলেন। মদনাহত মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা সুবিদিত। মদনাহত রাধাবল্লভ পোদ্দার কি করিয়াছিল তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। আমি জানি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেচারা ধারে খানিকটা 'স্নো' কিনিয়া ফেলিয়াছিল। আয়না, 'স্নো', এবং রাধাবল্লভ যখন পরস্পর পরস্পরে নিমজ্জিত তখন কিন্তু পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন আবেগ-জর্জরিত রাধাবল্লভ তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না।

॥ তিন ॥

পুঁটি নাম্নী যুবতীটিই একদা রাধাবল্লভের হৃদয়-নাট্যনিকেতনে বিনা নোটিসে ঝড়াৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া গেল ট্রামের জানালা গলিয়া। কখন পৃথিবীতে কি ভাবে যে কি ঘটে তাহা বলা দুষ্কর। পুঁটির সম্বলের মধ্যে অবশ্য তাহার বয়স। কিন্তু সেই বয়সটা কত—ষোল কি ছাব্বিশ—তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার পূর্বেই বেচারা রাধাবল্লভ মুগ্ধ

হইয়া গেল। একবার মুগ্ধ হইয়া গেলে আর চালাকি চলে না। মন-রূপ অশ্বের মুখ হইতে মানুষ তখন যুক্তি-রূপ বল্গা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়! ঘোড়া চার পা তুলিয়া লাফাইতে থাকে। হইলও তাই। মুগ্ধ রাধাবল্লভ লুব্ধভাবে হ্যারিসন রোডে ঘুরিতে লাগিল। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। এমন ত কতবারই ঘটিয়াছে। হ্যারিসন রোডের ট্রামে আসিতে আসিতে কত বার কত মেয়েই ত রাধাবল্লভের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু ওই দ্বিতলবাসিনী গবাক্ষবর্তিনী পুঁটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একযোগে বলিয়া উঠিল, মোনা লিসা! আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সমস্ত নায়িকাগণ আসিয়া যেন রাধাবল্লভের মন-প্রাঙ্গণে শঙ্খ-হস্তে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল পুঁটিকে বরণ করিবার জন্য। এমন ত আগে হয় নাই।

এত বড় বিপর্যয় রাধাবল্লভের জীবনে আর কখনও হয় নাই। প্রেমে পড়িলে শোনা গিয়াছে জ্যোৎস্নাকে উত্তপ্ত এবং রৌদ্রকে হিমশীতল বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভের স্পর্শ-শক্তির কোন বৈকল্য ঘটিল না বটে, কিন্তু তাহার জনবহুল হ্যারিসন রোডকে নিতান্ত নির্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ওই দ্বিতল বাড়ীটা ছাড়া যেন হ্যারিসন রোডে আর কিছু নাই, বাকী সব হাওয়া,—প্রেমাক্রান্ত রাধাবল্লভের এইরূপ ধারণা হইল। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বোধ হয় রাধাবল্লভ সেদিন ঠিক হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে ঊর্ধ্বমুখ হইয়া শিস্-যোগে পুঁটিকে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। এমন সময় পিতামহ প্রজাপতির খড়মখানা সজোরে আসিয়া লাগিল। কোথায় যে লাগিল তাহা ঠিক করিয়া দেখিবার পূর্বেই বেচারা অজ্ঞান হইয়া গেল।

খড়মখানা আসিল অবশ্য 'লরি'রূপে।

॥ চার ॥

দয়ার শরীর ছিল বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি জীবনে বহুবার নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন। দয়ালু রামকিঙ্কর হাজরাও হইলেন! নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই হাবলি-মিল্টা-পল্টু-বিশু-খোকনের পিতা ছা-পোষা হাজরা মহাশয় অচেতন রাধাবল্লভকে আনিয়া নিজের বাহিরের ঘরটাতে স্থান দিলেন। পাশে যে সদ্য-পাস-করা নবীন ডাক্তারটি ছিলেন তাঁহাকেও ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তারবাবু রাধাবল্লভকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এঁকে নড়ান উচিত নয়। নাড়া-চাড়া করলে মারা যেতে পারেন।" সুতরাং রাধাবল্লভকে হাসপাতালে পাঠাইবার উদীয়মান ইচ্ছাটি দমন করিয়া দয়ালু রামকিঙ্করবাবু বাড়ীতেই তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। মনে দয়ার সঞ্চার হইলে পয়সা খরচ অনিবার্য। রামকিঙ্করবাবুকে গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া ডাক্তার ছোকরাটির নির্দেশ অনুযায়ী একটি 'আইস্ ব্যাগ' খরিদ করিতে হইল। যদিও হাজরা মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি তিনি মনে মনে কহিলেন, "গেরো আর কি!"

॥ পাঁচ ॥

দুই দিন পরে অচেতন রাধাবল্লভ চক্ষু খুলিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখে, দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি নয়, হাবলি।

সে চক্ষু মুদিল।

একটু পরে আবার খুলিয়া দেখে, পুঁটি নয়, হাবলি।

ফলের রস করিয়া দিল হাবলি।

ঔষধ খাওয়াইল হাবলি। পুঁটি কই?

রামকিংকরবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছে?"

"আজ একটু ভাল।" কি সুন্দর স্বর হাবলির!

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে হাবলি।

বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দেয় হাবলি!

মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় হাবলি।

সব হাবলি।

আরও তিনদিন কাটিল।

পুঁটি নাই।

খালি হাবলি।

আবার খড়ম দেখা দিল।

এবার ছদ্মবেশে নয়, স্বরূপে।

রামকিংকর হাজরার হস্তে।

পাশাপাশি

॥ এক ॥

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চা ও পরনিন্দা করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব। আমরা যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির জন্য দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইন্সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকী আছে। স্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততঃ পক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ মাছির জ্বালায় অস্থির! যেই একটু শুইব ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে। এত মাছি আর এত গরম। সুস্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে ঠায় বসিয়া চিন্তা করাও ত মুস্কিল। শুইলেই মাছি! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারিবার আরক ছিটাইয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়ত হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন "আচ্ছা চিন্তাশীল লোক ত!"

পেটের চিন্তার মত এত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিনরাত সেই চিন্তাই করিতেছি। আমি চিন্তাশীল নই, চিন্তাগ্রস্ত।

……ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয় কলিকাতাই বেস্ট্ ফিল্ড! চাকুরিও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

এত কাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলিকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে আমি কোন জমিদার-তনয়। তাহা নয়। বাবা সৌখীন লোক ছিলেন এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা-দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

॥ দুই ॥

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে বিকাশবাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোন-ঝির খুড়শাশুড়ীর ভাইপোর পিস্তুতো শালার আপন ভায়রাভাই এই বিকাশবাবু। রীতিমত অংক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম-সাক্ষাতেই তাহাকে বলিয়া বসিলাম, "কি ভায়া, চিন্তে পারছ!" ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, "অনেক দিন পরে কিনা! তাই একটু—মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?"

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম, "নাঃ চিন্তে পারনি দেখছি। চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে। মানে বাঁকুড়ারও ইন্টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের," বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে ফরমুলাটা মুখস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম, "তুমি হ'লে গিয়ে আমাদের হেমন্তর ভায়রাভাই। আপন লোক সব কলকাতার গলি-ঘুঁজিতে পড়ে আছে—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠেনা। এবার মনে করলাম যাই একটু বিকাশ-ভায়ার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

কুলীর মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাংক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "থাক্‌বেন নাকি এখানে?"

"বেশী দিন নয়—দু-চার দিন!"

"ও।"

কুলী বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম বিকাশভায়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্থৈর্য অবশ্য বেশীক্ষণ টিকিল না। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। কেহ বলে, "লজেঞ্জুস্ দাও!" কেহ বলে, "ঘুড়ি চাই!" কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল! আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল—তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুসী হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরাই শুধু জমাইতে পারে!

বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

॥ তিন ॥

তিন দিন কাটিল। কলিকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত একজনও নাই। সহপাঠিগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্বে থাকিতাম তাহা এখন "ডাইং ক্লিনিং" হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না—আমিও কাহাকেও চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্য্যুপরি তিন দিন এই রূপে কাটিল। বিকাশবাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন, যেন 'লেট' না হইয়া যায়। নিজেই গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—বাজার করিয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে ফিরিয়া আসেন, বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসিয়া যান। কোন রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপড়াইয়া কলতলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন, "ভাত বাড়। ওগো শুনছ—লেট হয়ে যাবে—পোনে নটা হ'ল—যেতেও ত আবার খানিকক্ষণ লাগবে—" তাহার পরই ঊর্ধ্বশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোন দিন রাত্রি দশটা, কোন দিন এগারটা। সুতরাং বিকাশবাবুর সহিত আলাপ বেশীক্ষণ জমাইবার অবসর পাইনা। ভাবি—"কাজের মানুষ!" বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে—রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকরি ও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

॥ চার ॥

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক যখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে তখন বলিলাম, "ভায়া আমিও তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।"

"আমার সঙ্গে? কেন?"

"একটা কথা ছিল। মানে—"

"তাহ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার 'লেট' হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকারটা কি?"

"অর্থাৎ—" কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

"টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না,—সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।"

"না—না, টাকাকড়ি চাইনা। আচ্ছা, চল ট্রামেই বলব এখন!"

"ট্রামে ত আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

"বেশ ত! চল আমিও হেঁটে যাই। কত দূর?"

"ইডেন গার্ডেন।"

"ইডেন গার্ডেনে আপিস ? কিসের আপিস ?"

"আপিস কে বল্‌লে আপনাকে !" বলিয়া বিকাশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"তবে ?"

"আরে রামঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই ?"

"কোথা যাও, তাহ'লে ?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে যাই !"

নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম ! বিকাশবাবু বলিয়া চলিলেন, "বাবা কিছু টাকা fixed deposit রেখে গিয়েছিলেন—তারই ৪০ টাকা সুদ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারিনি। অথচ এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম ! চলুন—'লেট' হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না !"

উভয়ে আবার খানিকক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশবাবু আবার বলিলেন, "বাড়ীতে কথাটা ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন ! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেতে 'অ্যাপ্রেন্টিস' করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয় !"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে আসি। বুঝলেন না ? বাড়ীতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে সারাদিন ব'সে থাকা অসহ্য ! সারাক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে ! বাঁশী কিনে দাও,—লজেনস্ দাও, পুতুল দাও ! পাশের বাড়ীর ছেলের লাল জামা হয়েছে সেই রকম জামা ক'রে দাও ! গিন্নিরও নানা রকম আবদার আছে !—সরে পড়ি ! বুঝলেন না !"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীতে থাক্‌লেই গোলমাল। বুঝলেন না ! সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে ! নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়ীতে থাক্‌লে হৈ হৈ ক'রে একটা ডাক্তার-ফাক্তার ডাক্‌তে হ'ত ধার ক'রেও ! ছিলাম না—নিশ্চিন্ত !—চলুন একটু পা চালিয়ে—ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে—সেইটেতে গিয়ে শুয়ে-ব'সে সারাদিনটা—বুঝলেন—'লেট' হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে সেটা দখল করে—বুঝলেন !"

পাশাপাশি দুই জনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায় !

বিদ্যাসাগর

॥ এক ॥

বিদায় লইবার প্রাক্কালে বিনীত নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গেল—"ওই মোড়টায় ডিসপেন্‌সারি খুলেছি, মাস্টার মশায়—দয়া করে যাবেন মাঝে মাঝে—"

"আচ্ছা।"

…স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

পুরাতন ছবি।

*   *   *   *

তখন টিউশনি করিতাম।

উপর্যুপরি কয়েকবার বি. এ. ফেল করার দরুণই হউক অথবা শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎ লাভের ফলেই হউক—ধর্মে মতি হইয়াছিল। স্বামী চিন্ময়ানন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া হিন্দুধর্মের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতাম। বুঝিতাম কর্মজগতে যাহাই হউক ধর্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়। দিনের পর দিন স্বামিজী যে সকল তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে শুনাইতেন সেগুলি এই গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রাসঙ্গিক তাহাই শুনুন।

একদিন তিনি জন্মান্তর-রহস্য প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিতেছিলেন—এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আমি ইতিপূর্বে শুনি নাই। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাকে ধরিলাম—জন্মান্তর-রহস্য-উদ্ঘাটনের পন্থা বলিয়া দিতে হইবে।

প্রথমটা তিনি আপত্তি করিলেন।

ছাড়িলাম না—

শেষে তাঁহাকে বলিতেই হইল।

তাঁহার উপদেশানুসারে মুদিতনেত্রে নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিলাম।

জন্মান্তর-রহস্য-উদ্ঘাটন করিতেই হইবে।

*   *   *   *

ছাত্রের পড়া লইতেছিলাম।

—সাধু শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কি হবে?

বলিতে পারিল না।

—মুনি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে কি হবে?

পারিল না।

—নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কি হবে?

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া একটা উত্তর দিল—ভুল উত্তর। ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া উপক্রমণিকাখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

...এইরূপ প্রত্যহ।

হঠাৎ বাসনা হইল ছোকরা পূর্বজন্মে কি ছিল একবার দেখিলে হয়। আমার বিশ্বাস হয় গাধা না হয় গরু ছিল। স্বামিজীর প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা ত খুবই সহজ!

সেদিন গভীর নিশীথে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদিতনেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

এ কি – এ যে বিদ্যাসাগর—

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর!

স্বয়ং উপক্রমণিকার জনক জন্মান্তর রহস্যের ফেরে পড়িয়া নর শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছেন না। আশ্চর্য ব্যাপার!

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আমার আর শাসন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি—

অশ্রুজলে তাহার চরণ দুইখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা!

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম শাসন করিতে পারি নাই—সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।

ফলে সে ফোর্থ ক্লাস হইতে কিছুতেই প্রমোশন পাইল না।

আমার চাকরিটি গেল। ভাগ্যক্রমে অন্যত্র একটা কেরাণীগিরি জুটিয়া গেল—চলিয়া গেলাম।

* * * *

বছর পাঁচেক পরে আমার নূতন কর্মস্থলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সব কথা শুনিলাম। পড়াশোনা ছাড়িয়া দিয়া দিনকতক সে সখের থিয়েটারে মাতিয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্র নাকি উত্তম অভিনয় করিত। মেডেল পাইয়াছে।

সম্প্রতি কিন্তু সে লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট—আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কোম্পানীতে—

আমার চোখে জল আসিল।

সাধ্যাতীত হইলেও কিছু ইন্সিওর করিলাম।

আবার আজ সে আসিয়াছিল।

চেহারাটা বেশ ভদ্র ভারিক্কি গোছের হইয়াছে। বলিল, ইন্সিওরেন্সের দালালী করিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রাইভেট হোমিওপ্যাথি পড়িয়া সে ডাক্তার হইয়াছে এবং এই শহরে প্র্যাকটিস্ করিবে মনস্থ করিয়াছে। আমি যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

যথাসাধ্য করিব—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

নিষ্প্রয়োজনবোধে দুইটি খবর তাহাকে দিলাম না। খবর দুইটি এই—

(১) স্বামী চিন্ময়ানন্দ চৌর্যাপরাধে জেল খাটিতেছেন।

(২) আমি ক্রিশ্চান হইয়াছি।

পাঠকের মৃত্যু

॥ এক ॥

প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা।

আসানসোল স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। ঠিক আমার পাশেই আর একজন বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বই ছিল। বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। আলাপ-পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে ভদ্রলোককে ট্রেনের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমার ট্রেনের ঘণ্টা তিনেক দেরী ছিল।

আমরা উভয়েই বাঙালী।

সুতরাং পাঁচ মিনিট পরেই তাঁহাকে যে প্রশ্নটি আমি করিলাম তাহা এই—“আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি কি ?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ‍ুন না—”

এই উত্তরই স্বাভাবিক এবং আশাও করিয়াছিলাম।

অবিলম্বে বইখানি দখল করিয়া বসিলাম।

দ‍ুঃসহ গ্রীষ্মের দার‍ুণ দ্বিপ্রহর।

আসানসোল স্টেশনের টিনের ছাদ।

সমস্ত কিন্তু তলাইয়া গেল।

উপন্যাসটি অদ্ভ‍ুত !

বহির মালিক ভদ্রলোক আড়-নয়নে একবার আমার পানে চাহিয়া একটু ভ্র‍ূকুঞ্চিত করিলেন এবং একটি টাইম্‌টেব‍্‌ল বাহির করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

আমি র‍ুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া চলিলাম।

* * * * *

চমৎকার বই।

বস্তুতঃ এমন ভালো উপন্যাস আমি ইতিপ‍ূর্বে পড়ি নাই।

একেবারে যেন জ‍ুতাইয়া দিতেছে।

* * * * *

দ‍ুই ঘণ্টা পরে।

বহির মালিক ভদ্রলোক টাইম টেব‍্‌লটি বারম্বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—“আপনার ট্রেনের ত আর বেশী দেরী নেই। এইবার—”

বলিয়া একটু গলা খাঁকারি দিলেন।

আমি তখন তন্ময়।

চকিতে একবার হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্ধেকের উপর বাকী। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

অদ্ভুত বই।

বাকী ঘণ্টাটা যেন উড়িয়া চলিয়া গেল।

আমার ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

বইয়ের তখনও অনেক বাকী।

রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।

বলিলাম—“নেক্‌স্‌ট ট্রেনে যাব—এ বই শেষ না করে উঠছি না !”

বহির মালিক ভদ্রলোক একটু কাসিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ট্রেন চলিয়া গেল—বই পড়িতে লাগিলাম।

শেষ কিন্তু করিতে পারি নাই।

শেষের দিকে অনেকগ‍ুলি পাতা ছিল না।

বহির মালিককে বলিলাম—"এঃ, শেষের দিকে এতগুলো পাতা নেই! আগে বলেননি কেন? ছি ছি—"

এতদুত্তরে ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

॥ দুই ॥

দশ বৎসর পরে উক্ত পুস্তকখানি আর একবার আমার হস্তগত হইয়াছিল।

আমার ভাগিনেয়ীর শ্বশুরালয়ে।

তাহাকে পেঁছাইতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই ফিরিয়া আসার কথা! কিন্তু বইখানির লোভে থাকিয়া গেলাম।

সুযোগমত বহিখানি সংগ্রহ করিয়া আবার সাগ্রহে শুরু করা গেল। খাপছাড়া ভাবে শেষটুকু না পড়িয়া গোড়া হইতেই আবার জমাইয়া পড়িব ঠিক করিলাম।

কয়েক পাতা পড়িয়াই কেমন যেন খট্‌কা লাগিল।

উল্টাইয়া দেখিলাম—হ্যাঁ সেই বইই ত!

আবার কয়েক পাতা অগ্রসর হইলাম—নাঃ কেমন যেন গোলমাল ঠেকিতেছে।

তবু পড়িতে লাগিলাম।

নাঃ—আর ত চলে না।

এ কি সেই বই যাহা আমি আসানসোল স্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে উর্ধ্বশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম?

এমন রাবিশ্‌ মানুষে লেখে!

এ শেষ করা ত অসম্ভব!

দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়াছিল টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।

দত্ত মহাশয়

॥ এক ॥

"ছোকরার গোঁফ ওঠে নি এখনও ভাল করে—এরই মধ্যে এই কাণ্ড—গোঁফ উঠলে না জানি—"

এই পর্যন্ত বলিয়া দত্ত মহাশয় নয়নের দৃষ্টিকে নিজ গুম্ফমুখী করিলেন এবং একটি পাকা গোঁফ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট বিশ্বাসকে বলিলেন—

"আর কটা আছে দেখ ত হে। এঃ এরকম ভাবে পাকলে ত দু'দিনেই সব সাফ হয়ে যাবে দেখছি—"

"কই আর নেই ত। যেটা ছিঁড়লে দেখি ওটা—"

ছিন্ন রোমটি দত্ত মহাশয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যেই ছিল।

বিশ্বাসকে সেটি তিনি দিলেন।

বিশ্বাস সেটি নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন এবং অবশেষে বলিলেন—"তুমি কাঁচা গোঁফগুলো অমন পট্‌ পট্‌ ছিঁড়ে ফেল্‌ছ কেন বল দিকি ? এ গোঁফ কি পাকা ? এ ত তামাকের ধোঁয়া লেগে অমন হয়েছে—"

দত্ত মহাশয় ইতিমধ্যে আর একটি গোঁফ ছিঁড়িয়াছিলেন।

বলিলেন—"আচ্ছা, এটা দেখ ত—"

"এটা ত একেবারে ডাহা কাঁচা—তামাকের রঙ্‌ পর্যন্ত ধরেনি। আর ছিঁড়ো না।"

দত্ত দক্ষিণ চক্ষুটি বুজিয়া বক্রায়িত বাম চক্ষুর দৃষ্টিটিকে বাম গুম্ফপ্রান্তে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ওষ্ঠটিকে নানাভাবে কুঞ্চিত প্রসারিত করিয়া আবার নূতন শিকারের চেষ্টায় ছিলেন। বিশ্বাসের কথার তিনি কোন প্রতিবাদ করিলেন না—কিন্তু অচিরাৎ তৃতীয় একটি রোম তিনি মুখভঙ্গী সহকারে উৎপাটন করিলেন এবং সেটিও বিশ্বাসের হস্তে অর্পণ করিয়া প্রথম প্রসঙ্গে উপনীত হইলেন।

"ছোকরা তাহলে মোকদ্দমায় পড়েছে ? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা ! তুমি শুনলে কোথা থেকে খবরটা ? সেদিন সন্ধেবেলা আমি স্টেশনের দিকে গিয়েছিলাম একবার বেড়াতে বেড়াতে, তখনি ছোকরার রকম সকম দেখে কেমন যেন আমার সন্দেহ—"

এই পর্যন্ত বলিয়া দত্ত মহাশয় থামিলেন।

বিশ্বাস তৃতীয় গোঁফটির সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করিলেন না। গা চুলকাইতে লাগিলেন।

দত্ত মহাশয়ের মুদ্রাদোষ যেমন গোঁফ ছেঁড়া—বিশ্বাস মহাশয়েরও মুদ্রাদোষ তেমনি গা চুলকানো, শুধু চুলকাইয়াই তিনি নিরস্ত হন না। সর্বাঙ্গে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কি যেন আহরণ করিয়া আনেন, সেই আহরিত বস্তুটি আঘ্রাণ করেন এবং পর মুহূর্তেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সেটি ফেলিয়া দেন। তাহাই করিতেছিলেন।

দত্ত নাসিকার ঠিক নিম্নবর্তী গুম্ফগুচ্ছটি পর্যবেক্ষণ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন—"তুমি কি শুনে এলে ?"

কণ্ডুয়ন-নিরত বিশ্বাস উত্তর দিলেন—"ওই বাঁড়ুয্যে উকীল কাকে যেন রাস্তায় বলছে কানে এল—একটা মেয়েকে নিয়ে ছোটবাবু আমাদের কেসে পড়েছেন। ভাল করে জিগ্যেস করি নি আমি—পথে আসতে আসতে কানে এল। স্টেশনে তুমি কি দেখেছিলে সেদিন ?"

দত্ত উচ্চস্বরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—"দেখব আর কি—আমার মাথা আর মুণ্ডু। প্লাটফরমের ওপর বসে আছে দেখলাম জরিদার ওড়না পরা এক বাঈজি গোছের—সুন্দরী—যুবতী। আর তার কাছে এক রোগা-গোছের বুড়ো। পাকা দাড়ীতে মেহেদির রঙ লাগানো—গায়ে আড়ময়লা গোছের পাঞ্জাবী আর পায়জামা। ওমর খৈয়াম কেতাবে যেমন সব ছবি থাকে আজকাল হে—ঠিক তেমনি। স্টেশনের ছোটবাবু দেখলাম ঘন ঘন চাইছেন সেদিকে—স্টেশনে আর জনপ্রাণী নেই—" বলিয়া দত্ত মহাশয় আবার হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন এত কথা বিশ্বাসটাকে না বলিলেই তিনি পারিতেন। কি দরকার ছিল।

বিশ্বাস অঙ্গ হইতে আহরিত বস্তুটি শুঁকিয়া কুঞ্চিত-নাসা হইয়া ছিলেন। দত্তের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিলেন "—ওই—ওই। ওড়না পরা মেয়ে আর—লাল দাড়ী বুড়োকেই আমাদের বাঁড়ুয্যে উকীল স্বচক্ষে আজ আদালতে দেখে এসেছে।

আমাদের ছোটবাবুও ছিল। তুমি যা বল কথাটা ঠিকই দেখছি। গোল্লায় গেছে আজকালকার ছেলেগুলো। আচ্ছা, তুমি অনর্থক বসে কাঁচা গোঁফগুলো ছিঁড়ছ কেন বল দেখি—”

বিশ্বাস মহাশয় গত একবৎসর হইতে দত্তের পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দত্ত ইহার প্রতিবাদ করেন না। বিশ্বাসের এই অত্যুক্তিটুকু উপভোগ করিতে করিতে তিনি পাকা গোঁফগুলি তুলিতে থাকেন। বিশ্বাসের কথায় ভুলিয়া পাকা গোঁফ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন তেমন কাঁচা ছেলে দত্ত মহাশয় নহেন।

পাত্রী পক্ষ পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া ভুল করিবে না।

বিশ্বাসও করিতেন না যদি না তাঁহার যখন তখন টাকা ধার লওয়ার প্রয়োজন থাকিত।

দত্ত বোঝেন সবই—বলেন না কিছু।

দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষটি গত হইয়াছেন।

তৃতীয় পক্ষের সন্ধানে আছেন তিনি।

দুইটি প্রধান অন্তরায়।

পাকা গোঁফ এবং অনূঢ়া বিবাহযোগ্যা কন্যাটি।

কন্যার বিবাহ না দিয়া তাঁহার পক্ষে বিবাহ করা অসম্ভব।

কন্যাটির বিবাহ হইয়া গেলে দত্ত মহাশয় স্বচ্ছন্দে শুভকার্যে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই মনোমত পাত্র জুটিতেছে না।

গা চুলকাইতে চুলকাইতে বিশ্বাস বলিলেন—“ছোকরা তাহলে বেশ ঘুঘু—”

দত্ত উঠিয়া গিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে ছোট হাত আয়নাটি বাহির করিয়া আনিয়া গুম্ফরাজি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাস আবার তিক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“জেল হওয়া উচিত—চাকরি যাওয়া উচিত—এসব লোকের। পাজী, চরিত্রহীন, বখাটে সব ছোকরা—”

বিশ্বাসের এত উষ্মার কারণ ছিল। তাঁহার ধারণা তিনি নবাগত স্টেশনের ছোটবাবুটির নিন্দা করিয়া দত্ত মহাশয়ের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। দত্তের কাছে আজকালকার ছেলেদের গালাগালি দিয়া বিশ্বাস মহাশয় বরাবর সুফল পাইয়া থাকেন। আজ তাঁহার কিছু টাকার দরকার। সুতরাং পাকা গোঁফকে কাঁচা বলিয়া এবং আজকালকার ছেলেছোকরাদের গালাগালি দিয়া—অর্থাৎ দুই-নলা বন্দুক দিয়া বিশ্বাস মহাশয় লক্ষ্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্বে বহুবার তিনি এই পন্থায় সফলকাম হইয়াছেন।

……দত্তর কিন্তু আজ কোন সাড়া শব্দ নাই।

গা চুলকানো বন্ধ করিয়া বিশ্বাস আড়চোখে একবার দত্তের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দত্ত উপরের ঠোঁটকে নীচের ঠোঁট দিয়া চাপিয়া নিবিষ্ট মনে দর্পণে নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়া রহিয়াছেন।

বিশ্বাস ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে দত্ত মহাশয়ের মনের প্রসন্নতা ঠিক ততদূর পর্যন্ত হইয়াছে কিনা যতদূর হইলে নির্ভয়ে টাকার কথাটা পাড়া যায়।

সুতরাং গা চুলকাইতে চুলকাইতে তিনি আর একটি গুলি ছাড়িলেন! “আজকালকার ছেলেরা, বিশেষতঃ ওই খদ্দরধারীগুলো।”

হঠাৎ দত্ত আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া চক্ষুর দৃষ্টি বিশ্বাসের দিকে ফিরাইলেন।

বিশ্বাসের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

চক্ষু দুইটি যেন—দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড।

একি হইল!

চক্ষু যাহাই হউক মুখে কিন্তু দত্তের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন—"টাকার দরকার আছে নাকি? আজ আমার হাতে টাকা নেই বিশ্বাস!"

বিশ্বাস মনে মনে মরিয়া গেলেন।

মুখে কিন্তু বলিলেন—"না টাকার দরকার নেই—"

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বিশ্বাস উঠিয়া পড়িলেন। আর বসা বৃথা। বিশ্বাস পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন দত্ত আজ চটিল কেন, এমন ত কখনও হয় নাই।

॥ দুই ॥

একটু পরেই দত্তের বৈঠকখানায় বাঁড়ুয্যের আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহারও আগমনের কারণ টাকা। দত্তের নিকট তিনিও আসিয়াছিলেন টাকা ধার করিতে। হঠাৎ দরকার পড়িয়া গিয়াছে।

উকীল হইলেও বাঁড়ুয্যে স্পষ্টবক্তা, সাদা-সিধা মানুষ।

দর্পণ হস্তে গুম্ফচয়ন-নিরত দত্তকে তিনি বলিলেন—"আরে উপড়ে কি আর ওর কিনারা করতে পারবে—তার চেয়ে ও আপদ কামিয়ে ফেল—"

দত্ত কোন প্রতিবাদ করিলেন না।

প্রতিবাদ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। যে যাহা বলে শুনিয়া যান—যেটুকু স্মরণযোগ্য মনে করিয়া রাখেন—বাকীটা অপর কর্ণ দিয়া বাহির করিয়া দেন। সোজা হিসাব। তর্ক করিয়া লাভ কি? বাঁড়ুয্যে কাজের কথা পাড়িলেন।

"শ পাঁচেক টাকা দিতে পারবে হে? হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব—সুদও দেব—"

দত্ত মহাশয় কুশীদজীবি এবং সেই কারণেই ধনী।

সুতরাং নিঃসংকোচে মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কত সুদ দেবে?"

"যত চাও—মাস খানেকের মধ্যেই শোধ করে দেব—"

দত্ত মহাশয় আয়নাটি টেবিলের উপর রাখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—

"আচ্ছা, স্টেশনের নতুন ছোটবাবুটির নামে কি মোকদ্দমা হয়েছে না কি একটা মেয়েকে নিয়ে। জানো তুমি?—"

"হ্যা জানি বই কি—আমিই ত উকীল ছিলাম রেলের পক্ষের। কিছুই নয়—একটা বাঈজি আর তার সংগে এক সারেংগিওলা বিনা টিকিটে যাচ্ছিল—ছোটবাবুটি তাদের ধরে চালান দিয়েছিল। ছোকরা ভারি অনেস্ট। অপর কেউ হলে দুচার পয়সা নিয়ে ছেড়ে দিত—"

দত্ত আবার আয়নাটি তুলিয়া গোঁফ দেখিতে লাগিলেন।

বাঁড়ুয্যে বলিলেন—"দেবে না কি টাকাটা?"

"এখুনি চাই?"

"পেলে ত ভালই—"

দত্ত তৎক্ষণাৎ কোমর হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া দেওয়ালে প্রোথিত লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ শত টাকার নোট বাহির করিয়া দিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাণ্ডনোট ফ্যাণ্ড নোট দিতে চাও দিও—সুদ আর দিতে হবে না তোমাকে। বামুনের কাছ থেকে এ কটা টাকার কি আর সুদ নেব এক-মাসের জন্য—"

"অনেক ধন্যবাদ—"

বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেলেন।

তিনিও পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন দত্ত আজ হঠাৎ এমন দিলদরিয়া হইয়া উঠিল কেন।

॥ তিন ॥

আধুনিক ছেলেদের নিন্দা করিলে দত্ত খুসী হইত কিন্তু বিশ্বাস আজ দত্তকে খুসী করিতে পারে নাই। বাঁড়ুয্যের স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি বাঁড়ুয্যের উপর চটা—অথচ তাহারই উপর আজ তিনি প্রসন্ন হইয়া বিনা সুদে বিনা হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিয়া দিলেন।

কারণ ছিল।

মূল কারণ—সেই তৃতীয় পক্ষ।

স্টেশনের ছোটবাবুটিকে দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের ভাল লাগে। স্বজাতি এবং পালটি ঘর শুনিয়া তিনি ছোটবাবুর পিতার ঠিকানা সংগ্রহ করেন। পত্রযোগেই তিনি নিজ অনূঢ়া কন্যাটির সহিত ছোটবাবুর বিবাহ প্রায় পাকাপাকি করিয়া আনিয়াছেন। কুষ্টি মিল হইয়াছে—দেনা-পাওনাও প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। দত্ত মহাশয়ের চাপা স্বভাব। গোপনেই তিনি সব করিতেছিলেন। হঠাৎ সেদিন স্টেশনে বেড়াইতে গিয়া—ওই বাঈজি মাগীকে দেখিয়া দত্ত মহাশয়ের মনে দারুণ খট্‌কা লাগিয়া যায়। ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভালো ত ? আজকালকার ছেলে, বলা ত যায় না। ছেলেটিকে দেখিলে ভাল বলিয়াই ত মনে হয়।

যাক্—এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পাত্রের অর্থাৎ ছোটবাবুর পিতাকে তিনি পত্র লিখিলেন যে অবিলম্বে তিনি যেন আসিয়া শ্রীমতীকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া যান। উঃ—বিশ্বাসটা মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল।

পত্রখানি লিখিয়া দত্ত মহাশয় আবার দর্পণটি তুলিয়া লইলেন এবং ভ্রূকুটিকুটিল মুখে গোঁফ জোড়াটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া দর্পণটি রাখিয়া পাঁজি খুলিয়া হঠাৎ পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। একটি পাতায় আসিয়া তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল এবং সেই পাতা হইতে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া আর একটি পত্র তিনি লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—"পয়সার মায়া করলে চলবে না—ভেস্তে যাবে সব—'

দ্বিতীয় পত্রখানি লিখিলেন কলপের জন্য।

মিস্টার মুখার্জি

মিস্টার মুখার্জি কবে যে আমাদের আড্ডায় আসিয়া জুটিয়াছিলেন তাহা মনে নাই। এইটুকু শুধু মনে আছে স্বর্গীয় মধুমামা একদিন তাঁহাকে আমাদের আড্ডায় লইয়া আসেন। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে তিনি ধূমকেতুর মত আমাদের আড্ডায় আসেন যান। তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমরা কেহ জানি না।

লোকটির বিশেষত্ব আছে।

তাঁহার কথাবার্তা শুনিলে মনে হইবে যেন সমস্ত দুনিয়াখানা তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি সেটা গুঁড়া করিয়া ফেলিতে পারেন—ফেলিয়া দিতে পারেন—পকেটেও পুরিতে পারেন। সম্প্রতি লুফিতেছেন—তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রায়ই তিনি তুড়ি মারিয়া বলিয়া থাকেন—"ওসব আমি থোড়াই কেয়ার করি—বুঝলেন।"

বুঝিত সকলেই।

মুখার্জি যে একজন উঁচু দরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু আমরা কেহ কোন দিন মুখার্জির কথার প্রতিবাদ করি নাই। করি নাই—কারণ তাঁহার মিথ্যা কথাগুলি শুনিতে বেশ লাগিত। এ বিষয়ে তিনি প্রকৃত আর্টিস্ট ছিলেন। রুগ্ন অনাহারাক্লিষ্ট চেহারা। ক্ষৌরির অভাব মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট। আধময়লা সাহেবী পোষাক গায়ে। শুনিয়াছিলাম লোকটি বিলাত ফেরৎ—পৃথিবীর অনেক দেশ নাকি তাঁহার দেখা আছে—নিজেই এসব বলিতেন। লোকটি যে নিতান্ত মূর্খ নয় তাহা অবশ্য তাঁহার কথাবার্তাতেই বোঝা যাইত! তিনি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনি নাকি ডবল এম্. এ.। তিনবার প্রফেসারি পাইয়া নাকি ত্যাগ করিয়াছেন—ইত্যাদি।

একদিন তিনি বলিতেছিলেন—

"মহাত্মাজীর সঙ্গে সেদিন দেখা—গাড়ীতে। থার্ড ক্লাসের একটি কোণে বসে বসে তক্‌লি ঘোরাচ্ছেন—আমাকে দেখতে পেয়ে একটু মৃদু হাস্‌লেন! আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে পড়ে গেল বোধ হয়। উনি যখন আফ্রিকায় যান তখন আমিও সেখানে কি না—খুব জমাতুম দু'জনে। দেখলাম ভদ্রলোক চিনেছেন আমাকে। এগিয়ে গেলাম। আফ্রিকার সে দিনগুলো মনে পড়ে গেল। ভাবলাম একটু ইয়ার্কি করা যাক। বললাম—মহাত্মাজী আপনি যে দেশশুদ্ধ লোককে নিরামিষাশী হতে বলছেন, তার আর একটা দিক ভেবে দেখেছেন? সবাই যদি আপনার কথা শোনে তাহলে আর একটা গুরুতর সমস্যা যে দেখা দেবে তা ভেবে দেখেছেন?

মহাত্মাজী বললেন—কি সমস্যা?

আমি বললাম—ছাগল সমস্যা। ওদের না খেয়ে ফেল্লে সর্বনাশ হয়ে যাবে এই কৃষিপ্রধান দেশের। ছাগলে একবার যে গাছে মুখ দেয় সে গাছের দফা রফা। এক একটা ছাগলের কটা বাচ্চা হয় জানেন বছরে?" এই পর্যন্ত বলিয়াই মুখার্জি বলিয়া উঠিলেন—"এক্সকিউজ মি, আমাকে উঠতে হবে এখুনি। বাইরের ঘরের টেবিলে আমার পার্সটা ফেলে এসেছি—তাতে একটা হাজার টাকার চেক আছে—যদিও ক্রস্‌ড্—তবু—" মিস্টার মুখার্জি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কলিকাতার কোন অঞ্চলে যে তিনি থাকেন তাহা কেহ জানিত না। কেহ বলিত বালিগঞ্জ—কেহ বলিত বেলেঘাটা। ভবেশ, পানু প্রভৃতির দৃঢ় বিশ্বাস বৌবাজার অঞ্চলেই কোথাও থাকেন তিনি। একদিন তাঁহাকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনার বাসাটা কোন খানে মিস্টার মুখার্জি?" হাসিয়া তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—'মঙ্গলগ্রহে এখনও জমি কিনে উঠতে পারি নি। এই পুরোনো পৃথিবীতেই এখনও বাস করতে হচ্ছে এই যা দুঃখ। কাশ্মীরই বলুন আর সুইজারল্যাণ্ডই বলুন—সব এক। নিউইয়র্কে, রোমে, প্রাগে, বার্লিনে, টোকিওতে, এমন কি ভল্‌গা নদীর তীরেও কাটিয়ে এসেছি বহুদিন—সর্বত্রই সেই বুড়ী পৃথিবী—একঘেয়ে! এরোপ্লেনটার আর একটু উন্নতি হলেই দেখবেন দলে দলে লোক অন্য প্ল্যানেটে পালাবে। ওহো, বাই জোভ্‌—উঠতে হল এবার—মিসেস্‌ নাইডুর সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে—"

সকলকে বিস্মিত করিয়া মুখার্জি প্রস্থান করিলেন।

সেদিনও আসিয়াছিলেন এবং সেদিনও বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বার্ণার্ড শ, বল্‌ডুইন, ব্লুম, শেক্সপীয়র, গ্যেটে সকলকে ছাতু করিতে করিতে তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল যে আমেরিকায় জনৈক কোটিপতির একমাত্র কন্যার জন্য উড়িষ্যার কারিগরের কাজ-করা এক-জোড়া মিনা-করা দুল পাঠাইবেন বলিয়া তিনি প্রতিশ্রুত আছেন। পরশু দিন দুল জোড়া উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছে—আজ এয়ার মেল ডে—সুতরাং আমরা যেন তাঁহাকে এক্সকিউজ করি।

লোকটা বেশীক্ষণ কিছুতেই বসিত না।

ধূমকেতুর মত আসিত এবং চলিয়া যাইত।

লোকটা চালিয়াৎ—মিথ্যাবাদী—সবই বুঝিতাম!

তবু বেশ লাগিত।

আমাদের আড্ডায় সেদিন একটু আহারাদির আয়োজন ছিল। উপলক্ষ—পানুর প্রেমের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। পানু তাহার প্রেমাস্পদকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। পাশের একটি রেস্তোরাঁ হইতে দেশী বিদেশী নানাবিধ খাদ্যসম্ভার আনানো হইয়াছে। ভবেশ আবেগ ভরে "স্বর্গ হইতে বিদায়" আবৃত্তি করিতেছে—বিমলদা দক্ষিণ চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া ক্ল্যারিওনেট্‌ বাঁশিটির 'নি' পরদার সুর খেলাইয়া করুণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন—বিকাশ টেবিলে তবলা বাজাইতেছে—জগু গ্লাসে গ্লাসে সরবৎ ভরিতেছে—পানু প্লেটগুলি সাজাইতেছে—আমি এক কোণে বসিয়া কড়ে আঙ্গুলের কড়াটা কাটিতেছি—অর্থাৎ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় মিস্টার মুখার্জি আসিয়া হাজির।

পানু সোল্লাসে বলিল—"বাঃ, ভালই হয়েছে, মিস্টার মুখার্জিও এসে পড়েছেন। আপনার ঠিকানাটা ঠিক জানি না ত যে আপনাকে খবর দেব। আজ আমাদের একটু খাওয়াদাওয়ার আয়োজন আছে—মিস্টার মুখার্জি—।" করজোড়ে মুখার্জি বলিলেন—"মাপ করবেন—খেতে পারব না কিছু। সন্ধের সময় এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে মিস্‌ মিউলের সঙ্গে দেখা। অস্ট্রেলিয়ায় আমার টেনিস্‌ পার্টনার ছিল। ছাড়লে না কিছুতে—ফির্পোতে ঢুকে গিলতে হল ওর সঙ্গে বসে। ফির্পোতে অনেক দিন ঢুকিনি। ভয়ংকর ডিটারিয়েট্‌ করেছে আজকাল। মিস্‌ মিউলের পাল্লায় পড়ে অনেকগুলো টাকা

বেরিয়ে গেল। কি আর করি! অনেকদিন পরে দেখা—তাছাড়া মেয়েটার সম্বন্ধে আমার একটু সফ্‌ট্‌ কর্ণারও ছিল সেকালে—হা—হা—হা।”

ভবেশ বলিল—“তবু খান কিছু। অন্ততঃ এক গ্লাস সরবৎ—”

“খেতাম। সরবৎ কেন—আরও অনেক কিছু খেতাম—কিন্তু মিস্টার আচারিয়ার ওখানে আমার আবার আজ নেমন্তন্ন যে। জেপ্যানো এশিয়াটিক্‌ সেফ্‌টিপিন্‌ কম্পানি একটা ফ্লোট করবে না কি—তারই একজন পাণ্ডা হবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করছে আচারিয়া—যত সব ফ্যাসাদ জোটে আমারই ঘাড়ে। আমি আইডিয়ালিস্ট মানুষ, ‘না’ বলতে পারি না চট্‌ করে। আচ্ছা উঠি এবার—এক্সকিউজ মি—” মুখার্জি চলিয়া গেলেন।

* * * * *

সেদিন আড্ডা ভাঙিতে অনেক রাত হইয়া গেল; রাত্রি প্রায় এগারোটা।

ট্রাম নাই—পদব্রজেই বাড়ী ফিরিতেছি।

একটু দূরে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে মনে হইল একটা লোক হাতে ঝোলানো একটি ব্যাগ লইয়া মদনানন্দ মোদক ফিরি করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি মিস্টার মুখার্জি। ডান হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়া ‘চাই মদনানন্দ মোদক’ বলিয়া মাঝে মাঝে হাঁক দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিন্তু অপ্রতিভ হইলেন না। সপ্রতিভভাবেই বলিলেন—‘জিনিসটা ভাল, আমি নিজে উপকার পেয়েছি বলে সাধারণ পাঁচজনের উপকারের জন্যে এই ব্রত গ্রহণ করেছি। হজমের এমন ওষুধ আর হয় না। দেখবেন একটু খেয়ে?”

আমি নির্বাক হইয়া গিয়াছিলাম।

আমার চমক ভাঙিল যখন মিস্টার মুখার্জি তাঁহার ডান হাত দিয়া সহসা আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—“একটা অনুরোধ—এ কথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়ত জিনিসটা ঠিক বুঝবে না—ভাববে হয়ত অভাবে পড়েই—”

বহুদিন কাটিয়াছে। মিস্টার মুখার্জিকে আর দেখি নাই। আর আমাদের আড্ডায় তিনি আসেন না।

খুড়ো

খুড়োর জন্য সকলেই চিন্তিত হইয়াছিলাম।

খুড়োর সহিত আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। কিন্তু খুড়োর মত আপনার লোকও আমাদের বড় বেশী ছিল না। খুড়ো বয়সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। চুল গোঁফ পাকিয়াছে এবং পাকিয়া নিজেরাই বেকুব বনিয়া গিয়াছে। খুড়োর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নাই।

গ্রামের সকলেই খুড়ো-অন্ত প্রাণ।

একটি লোক ছাড়া।

তিনি খুড়ীমা।

আজ সকালে তিনি ঝাঁটা মারিয়া খুড়োকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। বিপন্ন খুড়ো চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

মাধব ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করিল—"খুড়ো, ব্যাপারটা কি বল ত ?"

খুড়ো কিছুক্ষণ নীরব।

একটু পরেই কিন্তু খুড়োর চক্ষু দুইটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন—"লেপ-তোষক ছিঁড়ে গেছে—তা আমি কি করব বল দেখি ? পুরোনো জিনিস ছিঁড়বে না ? '

"বেশ ত—নতুন লেপ-তোষক করান আবার—"

"পাগল হয়েছিস তোরা ! ওই লেপ তোষকে বেশ চলে যাবে এ বছর। তা ছাড়া টাকাই বা কোথা ?···যা যা তোরা বাড়ী যা—ওসব আমাদের নিত্যি লেগে আছে। একটু পরেই মিটে যাবে। বাড়ী যা তোরা—"

আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাড়ী গেলাম না।

খুড়ীমার কাছে গেলাম।

খুড়ীমা যাহা বলিলেন তাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।

গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন ; লেপ-তোষক সম্বন্ধে খুড়োর ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই।

"তোমরাই দেখ না বাছা—এই লেপ গায়ে দেওয়া যায়—না—এই তোষকে মানুষ শুতে পারে। সামনে এই দুরন্ত শীত—পোড়ার-মুখো নিজেই যে নিমুনিয়া হয়ে মরবে সে খেয়াল নেই। বললেই একটি মুখ হাসি হেসে বলবে—'ওতেই চালিয়ে নাও এ বছরটা।' ঝাঁটা মারি অমন হাসির মুখে—! কচি খোকা !"

লেপ-তোষকের অবস্থা দেখিলাম সত্যই জরাজীর্ণ।

নবাবগঞ্জের জমিদারের মৃত্যু হওয়ার পর হইতে খুড়োর অবস্থা সত্যই খারাপ হইয়াছে। নানা সদ্‌গুণের জন্য নবাবগঞ্জের জমিদার মহাশয় খুড়োকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঁচ বিঘা লাখেরাজ জমি হইতেই খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার জীবিতকালে খুড়োর অন্যান্য অভাবও তিনি মিটাইতেন। তাঁহার পুত্র আধুনিক যুবক। এজাতীয় বাজে খরচ তিনি পছন্দ করেন না। আত্মসম্মানী খুড়োও নবাবগঞ্জের জমিদার বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন।

খুড়ীমা কিন্তু মেয়েমানুষ—এত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধার ধারেন না।

তাঁহার যুক্তি সহজ—শীত পড়িয়াছে—লেপ-তোষক চাই।

খুড়ীমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিলাম—খুড়োকে এবার শীতে কষ্ট পাইতে দেওয়া হইবে না। দুই টাকা করিয়া চাঁদা দিলে লেপ-তোষক হইয়া যাইবে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া গিয়া দেখি খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহা-উৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।

আমাদের দেখিয়া বলিলেন—"কি রে—আবার ফিরলি যে তোরা—"

"শুনুন—"

খুড়ো উঠিয়া আসিলেন।

"কি ?"

তাঁহার হাতে কুড়িটি টাকা দিয়া বলিলাম—"আপনি আজই শহরে চলে যান। লেপ-তোষক তৈরি করিয়ে আনুন—"

"টাকা কোথা পেলি ?"

"সে পরে বলব এখন—এগারটায় 'বাস্' ছাড়বে—ওইতেই চলে যান আপনি—সন্ধে নাগাদ হোয়ে যাবে লেপ-তোষক—রাত ন'টার বাসে ফিরতে পারবেন। যান—"

"তার মানে—"

"না, না যান আপনি—ও লেপ-তোষকে এ বছর আর চলবে না। আপনি চলে যান—বুঝলেন ?"

খুড়োর হাতে নোট দুইটা গুঁজিয়া দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। একবার পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—বিস্মিত খুড়ো নোট দুইটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

* * * * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম খুড়ো নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরিয়াছেন। দেখিয়া আসা যাক—কি রকম লেপ তোষক হইয়াছে। খুড়োর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ীর কাছাকাছি যাইতেই শুনিলাম খুড়ীমা তার-স্বরে চিৎকার করিতেছেন। ব্যাপার কি ?

আমি বাড়ী ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—"দেখ ত ভাই—জিনিসটা ভাল হয় নি ? আঠারো টাকায় এমন জিনিস কি পাওয়া যায় ?"

দেখি খুড়ো একটি সেতার হাতে বসিয়া আছেন।

অক্ষমের আত্মকথা

সে যেদিন আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল, সে দিনের কথা আমি ভুলি নাই। অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখখানি আমার বুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সে কি কান্না! কোন কথা নয়—খালি কান্না! অন্ধকার ঘর! সূচীভেদ্য অন্ধকার!—সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সে আর আমি একা। আর কেহ নাই। তাহার অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্ধকার থম্-থম্ করিতেছে।

আমি নির্বাক্।

* * * * *

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সে দিন অন্ধকার নয়—সে দিন জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যে উন্মাদনা সে প্রকাশ করিয়াছিল তাহারও ভাষা নাই। তাহার বুকের স্পন্দন আমি শুনিয়াছিলাম। উন্মত্ত সে স্পন্দন। তাহার স্পন্দিত বক্ষ আমার সর্বাঙ্গে যে শিহরণ তুলিয়াছিল তাহা তাহাকে বলি নাই। বলিলেও সে বুঝিত না। বলিলেই কি লোকে সব কথা বোঝে ? তাহা ছাড়া আমি বলিতেই পারিতাম কি ?

* * * * *

আর একদিনের কথা।

সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। আমি পাশেই ছিলাম। নির্জন দ্বিপ্রহর। সে একখানা বই পড়িতেছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম তাহাকে। কি অপূর্ব তাহার দেহখানি—যেন প্রস্ফুটিত একটি শতদল! পরিপূর্ণ যৌবন-নদী দেহের কূলে কূলে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। বেশ-বাসের আবরণ তাহাকে আর যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওই তুচ্ছ শাড়িটা তাহার যৌবন-স্পর্শ পাইয়া নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। টক্‌টকে চওড়া লালপাড়টা মর্মান্তিক রকমের লাল। অন্যমনস্ক হইয়া সে হাতটা একবার আমার উপর রাখিল। আমার সমস্ত শরীরে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল তাহা সে বুঝিল কি?

আমারও বলিবার ভাষা ছিল না।

* * * * *

কোন দিন তাহাকে কিছু বলি নাই। অথচ তাহার নিত্য সঙ্গী ছিলাম। তাহার সুখ, তাহার দুঃখ, তাহার উত্তেজনা, তাহার অবসাদ সবই অনুভব করিতাম। সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। সে কিন্তু একদিনও, এক নিমিষের জন্যও আমার কথা ভাবিত না।

ভাবিত না, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভাবিবে কেন?

মানবী ছলনাময়ী!

* * * * *

অবশেষে সে আসিল।

যাহার আশায় তাহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাহার বিরহে তাহার নয়ন-পল্লবে অশ্রু নামিত, যে পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহ-দোলায় এতদিন দুলিতেছিল, সে একদিন সশরীরে বরবেশে আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে অধিকার করিল।

আমি কিছু বলিলাম না। আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেম-সম্মিলন নীরবে দেখিলাম।

পৃথিবীতে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমি দেখিতে কেমন জানি না। হয়ত খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ আছে—আমিও অনুভব করি। আমি দেখিতে খারাপই ত! আমার সারা গায়ে ময়লা! যদিও সপ্তাহ-অন্তর আমার বহিরাবরণ একবার করিয়া বদলানো হয় তবু একথা লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি, আমার অঙ্গ মলিন। তেল-চিট্‌চিটে ময়লা। কেন? তাহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, আমি অক্ষম। কল্পনায় আমি বিলাসী—কিন্তু কি করিব, আসলে আমি যে বালিশ। ছোট তাকিয়া মাত্র! আমার কোন হাত নাই। তাহার দুঃখের অশ্রু-জলে আমার বক্ষ ভিজিয়াছে, সুখের স্পন্দনে সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, তাহার গোপন প্রেমলিপিকা সে নির্ভয়ে আমারই তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাহার অন্তরের সমস্ত নিগূঢ় বার্তাই আমি জানিতাম—তবু সে আমাকে হেলায় ত্যাগ করিল এবং বরণ করিল মানুষকে!

তাহার কতটুকু সে চেনে।

“ক্যান্‌ভাসার”

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল সেই সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত তাহা হইলে এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি সৌখীন শাড়ী কেনার সখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে সখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এই সব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোক-বাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন—“যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?—”

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়া সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্‌ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

“মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—”

ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট সুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।

ক্যান্‌ভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসিবার কথা নয়। তাহার সহরে যাইবার কথা! যাইতেওছিল—কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা ‘ওভারক্যারেড্‌’ হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু ‘বিজ্‌নেস’ হয় এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল—“আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশাই?”

“মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, রক্ত পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই—ভাল মাজন আছে—”

“তাতো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়া-গাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—”

“ব্যবহার করে দেখুন—ভাল মাজন—”

নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল—“কচু”—

হাসিয়া হিরালাল বলিল—“আজ্ঞে না—ভাল মাজন। ব্যবহার করে দেখুন—”

হীরালালের ঝকঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল, “আপনার দাঁতগুলি তো খাসা—এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?”

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ভৈরব একবার পিচ্ ফেলিয়া বিকশিত সম্মুখের দন্তগুলিতে নিমের দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

বলাবাহুল্য দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

"মাজন নেবেন কি এক কৌটা ?"

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল—"সরে পড়ুন মশাই। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত সৌখীন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন ?"

বলিয়া সে নির্বিকার ভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল, "বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।"

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল—"তাতে আপনার কি ? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে ! ওসব মাজন ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না—"

হীরালাল ক্যানভাসার হইলেও রক্ত-মাংসের মানুষ। সুতরাং বলিল, "আপনিই কি এই গ্রামের মালিক ?"

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য, তাহার পেটে বিদ্যে নাই তাহা সত্য—কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এই সব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতিগুলিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই দুষ্কর—দাঁতের মাজন !

সবেগে পিচ্ ফেলিয়া ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে !"

"গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি ?"

ভীম গর্জনে ভৈরব কহিল—"বেরিয়ে যান—"

"আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি মশাই—"

ইহার পরই কিন্তু ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাঁহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন ? কেন মার-ধোর করছেন মশাই ! গরীব মানুষ—এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—"

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল—"আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন—"

বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী—অসম্ভব ভীড়।

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া বসিয়া পরম শাক্ত কালীকিংকর বর্মা পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্মবিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্মার কৃষ্ণ বর্ণ, রক্ত চক্ষু, কপালে টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌরবর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ দাড়ী—চোখে নীল চশমা। খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেত-চন্দনের তিলক।

মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন—"যাই বলুন আপনি, ধর্ম সাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা একটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষে ও পারে না—পারা উচিতও নয়—"

অট্টহাস্য করিয়া বর্মা বলিলেন—"রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু শুনি? 'পৈশাচিক' কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনও? মুণ্ডমালিনী মহাকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?"

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—"যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট, মশায়! ওর বেশী ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম—"

এমন সময় ঘচাং করিয়া ট্রেনটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

স্টেশনে শশা ফেরি করিতেছিল। বর্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া কিছু শশা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রীবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেন ছাড়িলে গাড়ীর ঝাঁকানির সংগে সংগে মাদলের এক প্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাংগের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন—"একটু যদি সরে দাঁড়াতে বাবা দয়া করে—"

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটির সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল-আন্দোলন হইতে নিজের নাসা-রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথায় তির্যক্ ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্মা মহাশয় বলিলেন—"তোমরা বসে পড় না হে? দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু। যে যেখানে আছ বসে পড়।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার শুরু করিলেন—"এই যে

মাদল—অপূর্ব জিনিস এ ! বৈষ্ণব ধর্মেরও অপরিহার্য অংগ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী ! আপনার ধর্মে দেখান দিকি এমন জিনিস। আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া--"

নাকের উপর ঠকাস্ করিয়া আঘাত দিয়া মাদল বাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না। বর্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আবার দাঁড়ালে কেন গো—"

"আজ্ঞে পরের ইস্টেশনেই নামব।"

"সে ত এখন দেরী আছে—"

মাদল বাদক কিন্তু আর বসিল না। পরের স্টেশন পর্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের স্টেশন আসিল। গাড়ী ঘচাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গোস্বামী মহাশয়ের নাকে গিয়া লাগিল। একটুর জন্য চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেন থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু বর্মা আর গোস্বামী। বর্মা বলিলেন—"এ হে হে হে—আপনার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল যে ! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত ! একি বিড়ম্বনা !"

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন—"আসল জিনিস কি জানেন মশাই ? অর্থ ! পয়সা নেই বলেই না এই থার্ড ক্লাসে ভীড়ে চলেছি—তাই না এ দুর্দশা ! অর্থ না থাকলে ধর্ম টর্ম কিছু টেকে না !—"

অট্টহাস্য করিয়া শশা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্মা মহাশয় বলিলেন—"যা বলেছেন ! অর্থ নেই বলেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়ে শশা কেটে খেতে হচ্ছে। খাবেন নাকি শশা ?"

—"দিন ! সবই অদৃষ্টের রহস্য !"

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শশা খাইয়া নামিয়া গেলেন তখন ছদ্মবেশী ডিটেক্টিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল।

অন্তর্যামীর কাণ্ড

ঘুম যখন ভাঙিল তখন রাত্রি গভীর।

বাঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলাম এবং চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বগতোক্তি করিলাম—"বাঁচা গেল !"—গাড়ী একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে। যখন উঠিয়াছিলাম ভীষণ ভীড় ছিল। এখন আমি ত রাজা ! একলম্ফে নীচে নামিয়াই—কিন্তু রাজত্ব ঘুচিয়া গেল। উপরন্তু একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

বাঙ্কের ঠিক নীচেই একটি তরুণী বসিয়া।

একাকিনী।

আমার হাতে একখানা বই ছিল। বইটা বেঞ্চের উপর রাখিয়া অকারণে সোজা কামরাটার অপর প্রান্তে চলিয়া গেলাম এবং জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া রহিলাম।

অন্তর্যামী মন কহিল—মেয়েটি সুবিধার নহে।

রাগ হইতে লাগিল। কোথা হইতে জুটিল এ?

গাড়ীটা খালি দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম গান গাহিব। যদিও আমি সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী নহি, কিন্তু ট্রেনে চড়িলে এবং চেনাশোনা লোক কাছে না থাকিলে আমি গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া থাকি। মেয়েটি যদিও চেনা শোনা নয় কিন্তু অন্তর্যামী মন দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—ইহার সম্মুখে গান গাওয়া চলিবে না।

চোখে কয়লার গুঁড়া পড়িল।

মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইতে হইল। কয়লাক্রান্ত চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে দেখিলাম মেয়েটি আমার পুস্তকটি অধিকার করিয়াছে, পাতা উল্টাইয়া দেখিতেছে এবং মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

অন্তর্যামী মন ভুরু নাচাইয়া বলিল—বলিয়াছিলাম ত। পরিচয় হইতে দেখিলাম মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। শাশুড়ীর অসুখ হওয়াতে স্বামীর টেলিগ্রাম পাইয়া যাইতেছে। সংগে কোন লোক না থাকাতে ইচ্ছা করিয়াই ভীড়ওলা পুরুষমানুষদের গাড়ীতে চড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিল সকলেই মনে করিবে কেহ না কেহ একজন ইহার সংগে আছে। গাড়ীটা একেবারে খালি হইয়া যাওয়াতে একটু মুশ্কিল হইয়াছে। যাক্ পরের স্টেশনেই নামিবে।…পরের স্টেশন আসিল।

মেয়েটি নামিয়া গেল। একা বসিয়া আছি। মেয়েটির কোন খুঁত ধরিতে না পারিয়া অন্তর্যামী মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এমন সময় চোখে পড়িল বেঞ্চির নীচে কি যেন একটা রহিয়াছে। মেয়েটি ফেলিয়া গেল নাকি? তাড়াতাড়ি টানিয়া বাহির করিলাম। ছোট একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। ভিতরে কাপড় দিয়া কি যেন ঢাকা রহিয়াছে।

কাপড়টা খুলিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম।

ভিতরে একটা মরা শিশু!

তাড়াতাড়ি বাক্সটা যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম।

ক্রূর হাসি হাসিয়া অন্তর্যামী মন বলিল, দেখিলে ত!…পরের স্টেশনে গাড়ী থামিল।

ভাবিলাম নামিয়া যাই। উঠিতে যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম খাকি হাফ্ শার্ট হাফ্ প্যাণ্ট পরা একটি লোক তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিলেন, সংগে একজন পুলিশ কনেস্টবল! সর্বনাশ! হাফ্ প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক রূঢ়কণ্ঠে বলিলেন—"আরে বেকুব্—কাঁহা পর রাখ্ খা।"

"ওহি ত বা,—বিরিঞ্চ্ কা নীচে—" বলিয়া কনেস্টবল বেঞ্চির নীচে কেরোসিন বাক্সটা দেখাইয়া দিয়া নামিয়া গেল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল। আমার নামা হইল না।

ভদ্রলোকের সংগে আলাপ করিলাম। তিনি দারোগা। ক্রমশঃ মৃত শিশুর ইতিহাসও শুনিলাম। দারোগা সাহেব শিশুটিকে তাঁহার এলাকায় কুড়াইয়া পাইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে একটি লোককে তিনি গ্রেপ্তারও করিয়াছেন। শিশুটিকে সদরে পোস্টমর্টেম করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। এই কনেস্টবলের জিম্মায় জিনিসটা দিয়া তিনি এতক্ষণ সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ঘুমাইতেছিলেন। কনেস্টবলটা এমন বেকুব যে একটা

থার্ড ক্লাস কামরায় বেঞ্চের নীচে ওটাকে রাখিয়া দিয়া নিজে বেশ ইন্টার ক্লাসে ঘুমাইতেছিলেন। যদি নষ্ট হইয়া যাইত! একে ত এইরকমভাবে লইয়া যাওয়াটাই একটু বে-আইনী। অন্তর্যামী মন দেখিলাম মেয়েটির সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া দারোগা বেচারীকে লইয়া পড়িয়াছে এবং বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—বুঝিয়াছি। ব্যাটা ঘুষ-খোর কোথাকার।

স্ত্রী-চরিত্র

॥ এক ॥

গভীর রাত্রি।

মশারির মধ্যে শুইয়া শ্রীমতী সুনন্দা একটি পত্রিকায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। পাশেই শ্রীযুক্ত তমালকান্তি পাশ-বালিশ জড়াইয়া ধরিয়া নাক ডাকাইতেছেন। বলা বাহুল্য হইলেও বলিব, উহারা স্বামী-স্ত্রী। এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। সন্তানাদি এখনও কিছু হয় নাই।

সুনন্দা রোজই এইরূপ করে—অর্থাৎ শুইবার সময় একখানা বাঙ্‌লা বই লইয়া মাথার শিয়রে আলো জ্বালাইয়া বিনিদ্র নয়নে পড়িতে থাকে। তমালকান্তিও রোজ এইরূপ করে অর্থাৎ নির্বিবাদে ঘুমায়।

মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাইতে উলটাইতে হঠাৎ সুনন্দার নজরে পড়িল একটি গল্পের নাম "গল্প নহে"! আশ্চর্য নাম ত। লেখকের নাম নাই। সুনন্দা পড়িতে সুরু করিল। পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ সুনন্দার মন নির্মলা নাম্নী মেয়েটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ ছোকরাটির উপর সুনন্দার প্রথমটা রাগ হইয়াছিল, কিন্তু সে রাগও বেশীক্ষণ টিকিল না। বিশ্বনাথ যখন বিদায়কালে নির্মলার দুটি হাত ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল তখন সুনন্দার রাগও জল হইয়া গেল। বিশ্বনাথ নির্মলাকে পাইল না—পাইল কাদম্বিনীকে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরূপ—

বিশ্বনাথ নামক যুবকটি গ্রীষ্মের ছুটিতে মাতুলালয়ে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে অন্য কোন কাজ না থাকায় বিশ্বনাথ পুষ্করিণীতীরে গিয়া আড্ডা গাড়িল। উদ্দেশ্য মাছ ধরা। একদিন ফাৎনার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বেচারার প্রায় অন্ধ হইবার জোগাড় হইয়াছে এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ফাৎনা ডুবিল এবং বিশ্বনাথ মরিয়া হইয়া প্রচণ্ড এক খ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া বঁড়শি তুলিয়াই একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল!

"ওগো—মা গো—"

সচকিত বিশ্বনাথ পিছন ফিরিয়া দেখে বঁড়শি একটি কিশোরীর কাপড়ে গিয়া আট্‌কাইয়াছে। বলা বাহুল্য কিশোরী আর কেহ নহে—নির্মলা।

এই সুরু।

তাহার পর ভদ্রভাবে যত প্রকারে প্রেমালাপ করা সম্ভব তাহা ইহারা করিয়াছে এবং করিত যদি না বিশ্বনাথের মাতুল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন। মাতুল মহাশয় তাহার সুপ্রচুর গুম্ফরাজির অন্তরালে ঈষদ্ধাস্য করিয়া ব্যাপারটাকে যৌবনসুলভ বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং প্রতিষেধকস্বরূপ কাদম্বিনী প্রয়োগ করিয়া বসিলেন।

বিশ্বনাথ প্রথমটা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বনাথ বেচারা একা কি করিবে। সে বড় জোর মাতুলকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে কিন্তু সমস্ত সমাজকে ঠেকান তাহার সাধ্যাতীত। বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ এবং নির্মলা কায়স্থ। সুতরাং নির্মলার হাত ধরিয়া ক্রন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিল না।

বেশ লিখিয়াছে গল্পটি। নির্মলার জন্য সুনন্দার ভারি কষ্ট হইতে লাগিল। আলো নিভাইয়া সুনন্দা যখন শয়ন করিল, তখন নির্মলার দুঃখে একবিন্দু অশ্রু তাহার নয়নে টলটল করিতেছে। কি নিষ্ঠুর সমাজ।

॥ দুই ॥

তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে তমালকান্তি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে তুমুল কাণ্ড। বেচারা "ডেলি-প্যাসেঞ্জার" ; সকালে উঠিয়াই স্নানাহার করিয়া আটটা সাতান্নর 'লোকাল' ট্রেনে আপিস চলিয়া যায় এবং সাতটা বিয়াল্লিশের 'লোকাল'-যোগে ফিরিয়া আসে।

সুনন্দার এমন ভাবান্তর ইতিপূর্বে সে লক্ষ্য করে নাই। মুখখানি তোলো হাঁড়ির মত করিয়া সুনন্দা বসিয়া আছে। তমাল আসিয়া ঢুকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া গাড়ু-গামছা আগাইয়া দিয়া চায়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্নাঘর অভিমুখে চলিয়া গেল।

মুখে একটিও কথা নাই। জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে তমাল ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপার কি।"

মিনিট পাঁচেক পরে এক পেয়ালা গরম চা হস্তে সুনন্দা প্রবেশ করিল। মুখ তখনও তোলো হাঁড়ি।

তমাল চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া বলিল—"দেখ, আজ গাড়ীতে 'পুষ্পসুরভিসার' বলে একটা মাথার তেল বিক্রি করছিল। রোজই করে। কাল মনে করছি কিনে আনব এক শিশি। গন্ধটাও ভাল, আর আমাদের মল্লিক মশাই বলছিলেন যে মাথাও না কি বেশ ঠাণ্ডা রাখে!"

সুনন্দা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

তমাল বুঝিল গতিক সুবিধার নহে। হঠাৎ হইল কি! চা নিঃশেষ করিয়া তমাল বাহিরে গিয়া দেখে সুনন্দা তাহার অর্ধসমাপ্ত উলের মাফ্‌লারটা লইয়া বুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তমাল হাসিয়া বলিল—"আজ এত গম্ভীর যে! সমস্ত মুখখানা আজ এমন থমথম করছে কেন? ব্যাপার কি!"

সুনন্দা আর আত্মসম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিল না। বোমার মত ফাটিয়া পড়িল—

"আমার কাছে সোহাগ জানাবার দরকার কি? যাও না তোমার নির্মলার কাছে, যার হাত ধরে বিয়ের আগে কেঁদে বলেছিলে—আমার মন তোমায় দিয়ে গেলাম নির্মলা! বিয়ে করতে চলল এই দেহটা। সমাজের নিষ্ঠুর হাড়-কাঠে বলি দিতে চল্লাম নিজেকে!"

বিস্মিত তমাল কহিল—"নির্মলা কে! পাগল হয়ে গেলে না কি তুমি!"

সুনন্দা কিছু না বলিয়া 'গল্প-প্রভাকর' নামক মাসিক পত্রিকাটি এবং সম্পাদকের চিঠিখানি স্তম্ভিত তমালের হস্তে তুলিয়া দিল। সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছে—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার 'গল্প নহে' নামক গল্পটি এই মাসে প্রকাশিত হইল। এক সংখ্যা 'গল্প-প্রভাকর'ও আপনার নামে অদ্য পাঠাইলাম। গল্পটি প্রকাশ করিতে নানা কারণে বিলম্ব হইল বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। আর একটি গল্প চাই। ইতি

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ তালুকদার।

বিদ্যুৎ ঝলকের মত তমালের মনে পড়িয়া গেল যে প্রায় দুই বৎসর পূর্বে উক্ত গল্পটি সে "গল্প-প্রভাকরে" পাঠাইয়াছিল বটে। তাহার পর তমালের বিবাহ হইয়াছে, চাকরি হইয়াছে, সাহিত্য-চর্চা সে বহুকাল ছাড়িয়া দিয়াছে। এই গল্পটির কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল! আজ হঠাৎ এ কি আকস্মিক বিপদ!

আমতা আমতা করিয়া তমাল বলিল—"ওটা একটা গল্প লিখেছিলাম বটে, অনেকদিন আগে। তাতে হয়েছে কি?"

"গল্প? তুমি ত নিজেই লিখে দিয়েছ 'গল্প নহে'!"

তমাল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ওটা একটা—ইয়ে—ষ্টাইল—বুঝলে কি না—"

সুনন্দা কিছুই বুঝিল না। বুঝিতে সে চায়ও না। নির্মলার ঠিকানাটা জানিতে পারিলে একবার গিয়া দেখিত মেয়েটি কেমন রূপসী। স্বামী যেরূপ লিখিয়াছেন ঠিক সেইরূপ কিনা!

ঈর্ষায় তাহার সমস্ত অন্তর পুড়িতে লাগিল। অথচ এই কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই নির্মলার দুঃখে সুনন্দার চোখে জল আসিতেছিল।

'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি'

॥ এক ॥

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিলাম। আমার ধার আছে, গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরাণী-গিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব করিয়া বেড়াই, কলেজে আমার অপেক্ষা যে-সব সহপাঠী নিম্নস্তরের ছিল কর্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বির জোরে উচ্চস্তরে উঠিয়া গিয়াছে—এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমার সর্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ হইয়াছে এই বুড়ীটা। এই বুড়ী তাহার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু এই বুড়ীটা না সরিলে ··আঃ কি মুস্কিল।

পীড়িতা মাসিমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থরগতি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এই জাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে অর্ধমলিন পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন,—

"রাস্তাটা থেকে সরে দাঁড়ান একটু। 'বাথরুমে' যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া করে !"

যথাসাধ্য দেহ সংকোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক 'বাথরুম' হইতে প্রত্যাবর্তনের মুখে বলিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন ? ওধারে চলুন !"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওদিকে কি জায়গা আছে ?"

"আহা চলুনই না—"

বুড়ীর সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—"বসুন, আমার এই তোরঙ্গটার ওপরই বসুন। আসল 'ষ্টিল'—আপনার মত দশজন বসলেও এর কিছু হবে না।" তোরঙ্গটির চেহারা ভালই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না। বস্তুত আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন—"আমার জিনিস ভাল না দিলে নিস্তার আছে ছগ্গন লালের। তার মুনিব হ'ল গিয়ে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়াছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—"তাই নাকি ?"

"তাই নাকি মানে ? ছগ্গন লালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিস দেয় ? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হ'ল গিয়ে আমার খাতক।"

ভদ্রলোককে খুসী করিবার জন্য আমি আবার বলিলাম—"হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।"

ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি !"

নিরীহ ভাবে বলিলাম—"টাকা কুড়ির ত কম নয়ই। কত ?"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—"আপনার দোষ নেই—হয়ত আসল দাম ওই রকমই হবে। আমি গণ্ডা বারো পয়সা দিয়েছিলাম।"

সত্যই অবাক হইয়া গেলাম।

"বলেন কি ? বারো আনা ?"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"তাও নিতে চায় না। ছগ্গনকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা টাকা দিয়েছিলাম, তার থেকেও চারগণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে !"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগ্গন লালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইঁহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"যদিও আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না—" বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চের নীচ হইতে এক জোড়া ব্রাউন রঙের ভাল ডার্বি 'সু' বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—"এর দাম কত হবে বলুন ত ?"

“পাঁচ ছ'টাকা ত মনে হয়।” ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

“রায় মশায় কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশী কিছুতে নিলেন না। কারণও অবশ্য আছে। রায় মশায়ের ছেলের চাকরিটা এক কথায় করে দিলাম কি-না। টম্সন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।”

চকিতের মধ্যে বুঝিলাম এই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক সামান্য ব্যক্তি নহেন।…সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ীর বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ীর অপর প্রান্তে দেখিলাম সেই বুড়ীটা বেঞ্চিটার উপর জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়ীটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

॥ দুই ॥

“ওটা কি পড়ছেন?”

“ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।”

ভদ্রলোক কোণে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছিলাম।

ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুস্কি দিতে দিতে বলিলেন—“কার লেখা?”

“পান্নালাল চক্রবর্তীর।”

“মেয়েটি লেখে ভালই কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—”

“পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ নাকি?”

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—“মেয়েমানুষ শুধু নয়—একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী!”

আমি সত্যই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যুতের মত একটা পুলকিত শিহরণে সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা আমার ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে বলিলেই পর্যাপ্ত হয় না, তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা দেখিতে পাই সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ! তন্বী—গৌরী—যুবতী!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—“টুনি ত এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্যন্ত ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বেশ চালাক-চতুর। এক কথায় ওরকম মেয়ে আমি এদেশে বড় একটা দেখিনি—”

বলা বাহুল্য কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—“কি রকম?”

“ওর মত ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম স্বাধীন দেশে জন্মালে ও-মেয়ে একটা রিজিয়া, এলিজাবেথ হত। অন্তত পক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা স্টার। ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্যে অস্থির হল—”

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“ভূষণ কে?”

"ভূষণ হল গিয়ে টুনির বাপ ! বিয়ে দিলে তবে ছাড়লে। বিয়ের পরও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন।"

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন।

মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—"টুনি—পান্নালাল চক্রবর্তী—হেঁঃ !"

একটা স্টেশনে আসিয়া ট্রেন থামিল।

আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়াছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাহার মুখ দেখা গেল না, অনুমান করিলাম, কোন মাড়োয়ারী হইবেন !

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারম্বার একটি কথাই মনে হইতেছে—পান্নালাল চক্রবর্তী তন্বী—গৌরী—যুবতী !

॥ তিন ॥

ধপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয়—বাঙালীই। খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থূলোকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন ! সামলাইয়া লইয়া এক জোড়া বড় বড় সদ্য ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'স্টেটস্‌ম্যান' লইয়া 'ওয়াণ্টেড' পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেন আসিয়া ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া মাটির ভাঁড়ে খানিকটা চা যোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা-খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাৎলা ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে একি, পান্নালাল বাবু যে ! কোথা যাচ্ছেন ?"

খোঁচা গোঁফের মালিক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কোন্নগর।"

"দেখা হয়ে গেছে যখন তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ওবেলা যাবেন। এবেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্য-চর্চা করা হয়নি। এমাসের "কাহিনী-কুঙ্কুম" কাগজে আপনার 'চল্‌তি চাকা' পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা !"

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি ?

কিন্তু না—থার্ডক্লাশ গাড়ীতে উব্‌ু হইয়া বসিয়া এক ভাঁড় বিশ্রী চা হস্তে স্বপ্ন দেখাও ত সম্ভব নয়। "চল্‌তি চাকা" গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং "কাহিনী কুঙ্কুম" এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শ্‌ুনিলাম ট্রাংকের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ও গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—"আপনিই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী ?"

ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্বে বলিলেন—"হ্যা, ইনিই।"

ট্রাংকের স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—"নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হ'ল। এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তা হ'লে, আচ্ছা নমস্কার।"

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন। ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্রাংকের মালিকের দিকে র্‌ুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম।

সংক্ষেপেই বলিলাম—"এটা কি রকম হ'ল ?"

"কোনটা ?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করিলেন।

"বাঃ—কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন পান্নালাল চক্রবর্তী একজন মেয়েমান্‌ুষ—তাকে আপনি চেনেন—অথচ—"

নির্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"আর কি কি বলেছিলাম ?"

"আর বলেছিলেন আপনার ওই ট্রাংকের দাম বারো আনা—জ্‌ুতোর দাম চার আনা—"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"যিনি বলেছিলেন, তিনি চলে গেছেন। আমি অন্য লোক।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

"অন্য লোক মানে ?"

"অর্থাৎ আমার 'এ্যাংগল অব্‌ ভিশন্‌' মানে কিনা দ্‌ৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্য প্রকার।"

"ঠিক ব্‌ুঝতে পারলাম না—"

সহসা ভদ্রলোকের ম্‌ুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এক ম্‌ুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বল্‌ুন। কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল হয়ত পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমান্‌ুষ—ট্রাংকের দাম বারো আনা—জ্‌ুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়ছে এই ট্রাঙ্ক ও জ্‌ুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তের ও পোনে সাত টাকা দিয়েছিলাম। 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'—ব্‌ুঝলেন না ?"

ব্‌ুঝলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ গাড়ীর অপর প্রান্ত হইতে শ্‌ুনিলাম—

"আরে বাবুয়া তু কাঁহা⋯?"

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়ীটা আমাকে ডাকিতেছে।

রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই এখন চিনিলাম মাসিমার বাড়ীর পুরাতন দাই রুক্‌মিনিয়া। মাসিমারা যখন বেহারে ছিলেন তখন হইতে রুক্‌মিনিয়া মাসিমার বাড়ীতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসিমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ীর কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ী 'মহাবীরজী'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসিমা যাহাতে ভাল হইয়া যান। মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজীর 'পরসাদ' বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম!

'থিওরি অব রিলেটিভিটি'ই বটে!

মুহূর্তের মহিমা

॥ এক ॥

দেখা যাক, এইবার কি করে!

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরুগন খাঁ হাতের গুলি পাকাইতে লাগিলেন। আসল নাম অবশ্য গুরুগন খাঁ নয়, আসল নাম কালীকান্ত। কিন্তু গুরুগন খাঁ নামেই প্রসিদ্ধি। কারণ তিনি পুরাকালে চন্দ্রশেখরে গুরুগন খাঁর চরিত্র অভিনয় করিয়া বহু নর-নারীর হৃৎস্পন্দন দ্রুততর করিয়াছিলেন।

বর্তমানে গুরুগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।

মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তদুপযুক্ত গোঁফ।

রঙ বাদামি।

চক্ষু তীক্ষ্ণ।

বুকময় চুল।

—ইহা কিন্তু নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।

আসল পরিচয়, গুরুগন শাঁসালো শক্তিমান শিক্ষিত।

জমিদার।

অপত্নীক।

মাংসাশী।

॥ দুই ॥

শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরুগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী।

তাহার একটি রোগা গরীব-গোছের ছোকরাকে পছন্দ।

গুরুগনের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে থাকিতে ওই পিলে-রোগা ছেলেটা!

ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গের পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিত।

এক চড় মারিলে তাহার মুণ্ডটা যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই!

কিন্তু মুণ্ড উড়াইবার চেষ্টা গুরুগন করেন নাই।

বরং ভদ্রভাবেই নানাপ্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

অর্থাৎ ভাঙা মোটা গলায় রবীন্দ্র-সংগীত সাধিয়াছেন।

জরিদার নাগরা পরিয়াছেন।

স্নো ঘষিয়াছেন।

জুলফি পর্যন্ত রাখিয়াছেন।

কিন্তু অবিচলিতা শ্রীমতীর দৃষ্টি রোগা ছোকরাটির উপরই স্থির নিবদ্ধ।

গুরুগন আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।

॥ তিন ॥

আজ বৈকালে শ্রীমতী আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ছিলও। কিন্তু সে থাকা না-থাকারই সমান।

গুরুগন বেশ বুঝিতেছিলেন, তাহার মন পড়িয়া আছে সেই রোগাটার কাছে। গুরুগন ডাকিয়াছেন বলিয়া সে আসিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে গুরুগনের অবাধ্যতা করিয়া এ গ্রামে টেকা মুশকিল।

হঠাৎ গুরুগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই;

তাহা না হইলে—এই রিভলভার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্য-দীপ্ত চক্ষে গুরুগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি?

ভীমগর্জনে গুরুগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।

তিনু মানে সেই রোগা ছোকরাটি।

শ্রীমতী বলিল, আচ্ছা তা হ'লে আমাকে ভাববার সময় দিন একটু। একা ভেবে দেখতে চাই। আপনি একটু ও ঘরে যান। যাবার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে গুরুগন কহিলেন, কতক্ষণ ভাবতে চাও?

দশ মিনিট।

বেশ।

স্খলিতচরণে গুরুগন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

॥ চার ॥

দেখা যাক—এইবার কি করে!

স্ফীতপেশী গুরুগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট চিন্তার পর শ্রীমতী বলিয়া গিয়াছে যে, আজ রাত্রে সে আসিবে। ঠিক দশটার সময় যেন গাড়ী পাঠানো হয়।

ঘড়ির দিকে গুরুগন চাহিয়া দেখিলেন—মাত্র নটা বাজিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।

উঃ!

পিপীলিকায় দংশন করে নাই।

অধীর গুরুগনের প্রণয়ীসুলভ অনুচ্চ কাতরোক্তি।

হঠাৎ গুরুগনের হাসি পাইল—ভয়ংকর হাসি পাইল।

রোগাটার কি দশা হইবে? আহা বেচারী!

বেচারী?

দারুণ ক্রোধে গুরুগনের দন্তগুলি কড়মড় করিয়া উঠিল।

স্পর্দ্ধার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল বাঁদরটার!

আবার দর্পণে গুরুগন নিজের পেশীবহুল দেহটার পানে চাহিলেন।

মুখে স্মিত হাস্য।

॥ পাঁচ ॥

দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

গাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে গুরুগন সাগ্রহে প্রতীক্ষমান।

মনের অবস্থা?

উপমা দিতে হইলে বলিতে হয়, যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।

সহসা গলির মোড়ে গাড়ীর শব্দ।

দুইটা ঘোড়ার আটটা ক্ষুর যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

থামিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে।

পর্দার কাছে আসিয়া একটু থামিল, তাহার পর পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শ্রীমতী।

শ্রীমতীর মুখ দেখিয়া গুরুগনের উদ্যত প্রেম স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সজলকণ্ঠে শ্রীমতী বলিল, আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে এলাম।

কি কথা ?

তিনুকে আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো ?

না।

দুই জনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত।

সেই কয় মুহূর্তে কি ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরুগন বলিলেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরুগনের মনে হইল, এ কি করিলাম ? হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম ?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল ? কে এ ?

আশ্চর্য !

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার ক্ষুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেনে অসম্ভব ভীড়।

তিল ধারণের স্থান হয়ত আছে কিন্তু মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবি পোষাক পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, যে ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয় ত নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব সম্ভব হইল না। বারকয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার নিতান্ত প্রয়োজন।

বিগত তিনরাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতিনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে-পাতায় করিতে পারেন নাই।

কাল ত অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে না ঘুমাইবে!

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন—ওরে দাঁড়া!

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ন নহেন, তাহা ঠিক—কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র—যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-কোট-টুপি-পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন—

"টেরেনে ত আজ্ঞে চড়াই দায়, হুজুর! যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চড়ে পড়ি—"

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন—মূর্খলোক হয়ত বুঝিতে পারেন নাই—তাই!

বলিলেন—"ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো—"

'ফাসটো কেলাস' চেনেন না এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন—"আজ্ঞে ওটাতে নয়, এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে ত গদি মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন—আমি বুড়া মানুষ—গরীব লোক—আমার শরীরটাও খারাপ—বিশ্বাস করুন হুজুর, তিনরাত্রি ঘুম হয় নাই—"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে একটি ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরণে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত একজোড়া দিশি মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচফাটা চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডান্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা, চক্ষু দুইটি রক্তাভ—চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোম মুখখানি বিনয় গদগদ। মাথায় টাক! বর্ণ নাতিফরসা-কালো। হাতে থেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন—"এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্য ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি"—

প্রথম শ্রেণীর যাত্রিটি সাহেবী পোষাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন—

"দ্যাট কান্‌ট বি! আই কান্‌ট এলাউ!" সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন—"আমিও ত হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি! অনুমতি যদি করেন দয়া করে—"

এই বৃদ্ধের সহিত বাগবিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পায়দনে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহারই মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ —

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন!

"শুনলেন হুজুর—এইটাতেই চড়লাম আমি, ক্রুকে পাঠিয়ে দেন—ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি! ওরে, আন্ আন্ এইটাতেই আন্ সব—ওহে কালীকিংকর—শ্যামাপদ কোথায়— বাঞ্ছা.—ও বাঞ্ছা,—এই দিকে—এই খানেই চড়াও সব—"

হৈ হৈ শব্দে কালীকিংকর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা, কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটা তরমুজ, একটা বঁটী, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটুলি ও এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাসেই তুলিয়া দিল। কালীকিংকর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঞ্ছাকে বলিলেন —"তুই তাহলে ওই পাশের কামরাটায় থাক গিয়ে। তোরই মজা হল রে! তামাক টিকে সব গুছিয়ে রাখ—"

বাঞ্ছা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর!—কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার—অনেক টাকার কেনা-বেচা করতে হবে—"

যথাসময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবি ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু'র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু'র নির্দেশ মত নিজের যাবতীয় জিনিস-পত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবন্ধ করিলেন।

যদি কেহ গনিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবি ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইওর টিকেট্ প্লীজ্।"

"মাই টিকেট্ ইজ ইন্ মাই স্যুটকেস্। প্লীজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর ইট্।"

"আই কাণ্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড! মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ টিকেটস্—"

অবশেষে দেখা গেল বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা-সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বেশীক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়েই রাষ্ট্রভাষা হিন্দীর শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল—ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কি ফ্যাসাদ উপস্থিত হইল! ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি।

ভগবান বিরূপ হইলে কাহার বাবার সাধ্য ঘুমায়!

দুর্গা—শ্রীহরি!—

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।'

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল 'কুরু' যেন সাহেবটিকে বলিতেছে, যে, বাঙ্গালী বাবুদের সে ভালো করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুল-হীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

"ও কুরু মশায়—বাজে কথার কচ্‌কচিতে আর কাজ কি! কটা টাকা লাগবে বলুন—আমিই দিয়ে দি—ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন"—

সাহেব ও কুরু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি!

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন—

"আপনিও ত হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধা মত—"

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর কুরুর দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন—"কটা বাঙ্গালী আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি"—

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙ্গালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

শরশয্যা

॥ এক ॥

শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বন্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারী-ধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

...ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন...দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি?...সমস্ত ছাত্রজীবন

নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি·· কলেজের স্পোর্টে সকলের সেরা ছিলাম···কিন্তু শরীরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ যদি নারীত্বের মর্যাদা না রক্ষা করিতে পারি ?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে—উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলা আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলা তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভুতের রাজ্যে বাস করিতেছি!···দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু···ঘাপ্‌টি মারিয়া বসিয়া আছে—সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। এক জন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে···ছি, ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায়— বহু সন্তরণশীল, লম্ফনশীল বীর-পুরুষদের ছবি দেখি—ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেশের যৌবন চঞ্চল হইয়া ওঠে অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিত ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত না মৃত! অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম·· সাঁৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর একটা গাড়ী আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-স্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্তী হইয়াছে। স্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এ-দেশে আর কখনও আসি নাই। চাকুরির চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুরমহাশয় তাঁহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরী জুটিতে পারে।

॥ দুই ॥

এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর-মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। স্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম—হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌঁছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন—দ্বিতলের একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়াও দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

॥ তিন ॥

আবার কুরুক্ষেত্র-সমর বাধিয়াছে।

নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট। সুতরাং আমার পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কি রকম পাকেচক্রে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রৌপদ-ধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবী করিতে হইতেছে। একটি ঘুসিতে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নাসিকা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে অপূর্ব কৌশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ হেঁ হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতিকর ব্যাপার। ...সহসা সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আর দুর্যোধনকে দেখিয়া দেঁতো হাসি হাসিতে হইবে না—দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না—ধৃতরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছি। শরশয্যা ফুলশয্যা নহে। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি রোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছে।...সহসা মনে হইল আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না! কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা! স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট।...তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টর্চটা জ্বালিয়া দেখি সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছান রহিয়াছে। অগুণতি ছারপোকা! দেওয়াল বাহিয়া সারি সারি আরও নামিতেছে। সর্বনাশ। বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া যাইব কি না ভাবিতে লাগিলাম।..স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল। আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।..একেবারে অক্ষৌহিণী!

॥ চার ॥

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলাম। বাহিরে চাহিবামাত্র কর্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম ঠিক নীচের গলিটাতে চেক্-কাটা লুঙ্গি-পরা একটি গ্যাঁটাগোট্টা-গোছের লোক একটি বাড়ীর জানালায় উঁকি দিয়াই চোরের মত সরিয়া গেল। যে-জানালায় লোকটা উঁকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার দ্বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে—পরনে একটি আধ-ময়লা কাপড়—কোলের কাছে একটি শিশু। ঘরে আর কেহ নাই।...চকিতের মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে!—সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহা জীবনে সে আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতি পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে। রাস্কেল! সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বৎসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব। আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম! আশ্চর্য কাণ্ড! কিন্তু উপায় কি! ইনিই আমার শ্বশুরের পরিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উদ্যত চপেটাঘাত কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল, "আপনার কাছেই এসেছি—বিমলবাবুর জামাই আমি!"

ভদ্রলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও,—বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি?"

"ওই হোটেলে—"

"আচ্ছা—কাল সকালে দেখা ক'রো—"

ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

॥ এক ॥

স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জিভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

* * *

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশী করিয়া মেশে নাই।

স্কুলে পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিঙে আর তকু থাকিত বাড়ীতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই-দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওই তকুকে যেমন ক'রে হোক হারাতে হবে। পারবে ত?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তকু কি বস্তু।

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন, "ওই ছেলেটিকে কিন্তু

হারানো চাই। শুনেছি বটে ভালো ছেলে—কিন্তু হাজার ভাল হলেও পাড়া-গাঁ থেকে আসছে, ইংরেজীতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না—”

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ! তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই। সেই জন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তকু ছিল কবি—সে কবিতা লিখিতে সুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ-করা ভাল ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্স্ট হওয়ার গৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া আমি রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্স্ট বয় আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের একজন উদীয়মান কবি। তফাৎটা যে কি এবং কত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে,—তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

॥ দুই ॥

ক্রমশঃ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহ-কোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর একজন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। ‘অসাধারণ রূপ’ বলিতেছি কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া। এমন সুন্দরী সত্যই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোখ মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ব। চাঁপাফুলে গোলাপী আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর-দশেকের মেয়ে অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া। আমার সহিত কথাই বলিল না! আচারে, ব্যবহারে, ভাবে ভঙ্গীতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল যে আমাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কি-ইবা ছিল।… সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

* * * * *

তকুর বাড়ী প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারই। সুতরাং ক্রমশঃ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়াছিল, “দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফার্স্ট বয়?”

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, "হ্যাঁ –"

উত্তরে সে কি বলিল শুনিবেন ?

"বই মুখস্থ ক'রে ফার্স্ট সবাই হ'তে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি ?"

মনে পড়িতেছে একটু সলজ্জ গলা-খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম, "আমি তোমার দাদার মত নই ত। হ'তেও চাই না—"

"পারবেনই না— "

দশ বছরের মেয়ে !

॥ তিন ॥

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ী বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়ীটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—না হয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ীর মুখ-পানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল—মাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সেই সদ্যজাগ্রত যৌবনে—বেশী বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না —আপনারা যাহা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গীতে কথায়-বার্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে ! আশ্চর্য প্রেমের নিয়ম ! আমি ঠিক তাহাদের পালটি ঘর ছিলাম, আমার ভাল ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত—বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাবগতিক দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলবেন না ! নিজের চেহারাটা কখনও দেখেছেন আয়নায় ?"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।……সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অত বড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই ! বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব করিবার মত রূপ আছে সে তাহা লইয়া গর্ব করিবে বই কি ! রূপসী মাত্রেই গরবিণী। গর্বটা সৌন্দর্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর মনের নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি।

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশোনায় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—তাহার পর পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

॥ চার ॥

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপ্টা গেল—বাবা, মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আর আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করিতে পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল। তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম—লিখিয়াছে মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি ভাল পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, "ভাল পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানাশোনা একটি ভাল পাত্র আছে—কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল ত সম্বন্ধ করি!"

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

॥ পাঁচ ॥

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম-এ পড়িতেছি। আশ্চর্য মানুষের মন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর একজন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস্ মিত্র। আমার সহপাঠিনী।··· আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরীতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিত্র আমার সমীপবর্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণতঃ যেভাবে ঘনিষ্ঠতর হয় সেই ভাবেই হইয়াছিল। মিস্ মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখে মুখে এমন একটা মার্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিয়াছিলাম যে মনে রং ধরিয়া গেল।··ক্রমশঃ দেখিলাম তাহার অনুপস্থিতিতেও আমি তাহার কথা চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলা-ফেরা লক্ষ্য করিতেছি, কোন্ কোন্ রঙের শাড়ী পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

॥ ছয় ॥

যখন মিস্ মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে—আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ—এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম !

বলিলাম, “সে কি সম্ভব ?”

তকু বলিল, ‘‘সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল ? অসাবধানে স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে—ছি, ছি, কি কাণ্ডটাই হয়ে গেল। মা বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতেও সাহস পাই না যে !—” বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, “না ভাই এখন আর সে হয় না। অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—”

মানপুর গেলাম।

* * * * *

পায়ের উপর উপুড় হইয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি, “কক্ষণো তুমি আমায় ভালবাস না—কক্ষণো না। একদিনও বাসনি, বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ-কেন—কেন—কেন—কেন—”

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

‘‘শোন—একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—”

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে তাহার এ মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া কদাকার ! অসাবধানে স্টোভ জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই তাহার পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

ঘটনাচক্র

॥ এক ॥

শ্রীমতী উষা সেন আধুনিকা মহিলা।

অর্থাৎ বি-এ পাস করিয়াছেন, ট্রামে, বাসে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই নানা দোকান ঘুরিয়া পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক বেহায়াপনা বা লজ্জা কোনটাই নাই। সাহিত্যে অনুরাগ আছে। কোন্ লেখক ভাল, কোন্ লেখক মন্দ সে-বিষয়ে নিজের একটা স্পষ্ট মতামত আছে। চেহারা ? সুন্দরী না হইলেও মোটের উপর সুশ্রী বলা চলে। আধুনিক বেশবাসে

সজ্জিতা হইয়া তিনি যখন পথেঘাটে বিচরণ করেন তখন অধিকাংশ দর্শকই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সংক্ষেপে, শ্রীমতী ঊষা—বেশ চটপটে, সুরুচিসম্পন্না আলোকপ্রাপ্তা ভদ্র তরুণী।

একটি বিষয়ে শ্রীমতী কিন্তু সাবেক-পন্থী। তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং সে বিবাহও আধুনিক রীতি ও রুচি অনুযায়ী হয় নাই। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য অন্নদা সেন—ঊষা সেনের বাবা। অন্নদাবাবু ভদ্রলোক, সনাতন মতাবলম্বী। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কন্যা মণীন্দ্রমোহন নামক একটি সহপাঠী কৈবর্ত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে তখন তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী ঊষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছর তিনেক হইল ডাক্তারী পাস করিয়া কলিকাতার রোগী-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় ঊষা বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সংকল্পই রহিয়া গেল—কার্যে পরিণত হইল না। একটি প্রতিজ্ঞা কিন্তু ঊষা সেন মনে মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই "—জর্জেট শাড়ী জীবনে আর কখনও পরিব না।" মণীন্দ্রমোহন জর্জেট শাড়ী অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ভবিষ্যতে ঊষাকে ঐরূপ একটি শাড়ী কিনিয়াও দিবেন কথা ছিল—কিন্তু ব্রজবিহারীর অভ্যাগমে তাহা আর হইল না। সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল : সুতরাং ঊষা সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে জর্জেট শাড়ী জীবনে তিনি আর ছুঁইবেন না।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি—দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। শেষকালে এ প্রতিজ্ঞাও টিকে নাই। কি করিয়া ইহা ঘটিল তাহা লইয়াই এই গল্প।

॥ দুই ॥

পারুল-দিদি বেড়াইতে আসিয়াছেন।

পারুল মৈত্র ঊষা সেনের এক বছরের 'সিনিয়র', অথচ এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ-বিন্যাস প্রসাধন সম্বন্ধে তিনি উদাসিনী নহেন। এই বেশ-বিন্যাসের কল্যাণে তাঁহাকে ঊষার অপেক্ষা ছোটই দেখায়। নানা কথার পর তিনি বলিলেন, "এইবার উঠি ভাই, একটু মার্কেটে যেতে হবে।"

"মার্কেটে কেন?"

পারুল-দিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, "একখানা শাড়ী কেনার ইচ্ছে আছে। শুনেছি না কি জর্জেট শাড়ীগুলো আজকাল খুব সুন্দর উঠেছে।"

"তাই নাকি?"

পারুল-দিদি চলিয়া গেলেন।

জর্জেট শাড়ীর কথায় ঊষার মণীন্দ্রমোহনকে মনে পড়িল। একটু দুঃখবোধও হইল। বিশেষ করিয়া এই জন্যই দুঃখ হইল যে মণিকে না-পাওয়ার দুঃখের তীব্রতাটা যেন কমিয়া গিয়াছে। কই, মণির কথা আর ত সে তেমন করিয়া ভাবে না। দুই বৎসর

অতীত হইয়া গিয়াছে মণির কোন খবরই সে ত রাখে না আর! এখন সে মিসেস গুপ্ত এবং এ-কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ব্রজবিহারীর সুখদুঃখের সংগে নিজেকে সে একান্তভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মন অতীতের স্মৃতির ধ্যান করিতেছে না। স্পন্দনশীল বর্তমানকে লইয়া সে ব্যস্ত। ব্রজবিহারী খারাপ লোক নয়, উষাকে খুশী করিবার জন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি নাই, তদুপরী সে উষার স্বামী। সুতরাং তিলে তিলে সে উষার হৃদয় জয় করিয়াছে।

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া উষা একটু আনমনা হইয়া পড়িল। মনে মনে অনর্থক একবার আবৃত্তি করিল—'তাকে আমি ভালবাসি। এখনও বাসি—জর্জেট আমি জীবনে কখনও পরব না—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।'

* * * * *

এই প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করিলেন তাঁহার সহোদরা ভগিনী সন্ধ্যা সেন। এখন অবশ্য সন্ধ্যা দাস। সন্ধ্যার স্বামী মিষ্টার দাস ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বলা বাহুল্য, ডেপুটি বাবুটি সদ্য-পাস-করা ডাক্তার ব্রজবিহারী অপেক্ষা অধিক উপার্জনক্ষম। এই জন্যও বটে এবং পিঠাপিঠি বলিয়াও বটে উষার মনে একটু ঈর্ষা ছিল। এখন অবশ্য দু-জনেই বড় হইয়াছে, চুলোচুলি খাম্‌চাখাম্‌চি করিয়া ঝগড়া চলে না। বরঞ্চ মুখে দুই জনেই দুই জনের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। ইহাদের পাল্লা চলে এখন নীরবে - গহনা-কাপড়ের মারফৎ। উষা যদি সোখীন দুল ক্রয় করিয়া কর্ণযুগল অলংকৃত করিলেন সন্ধ্যা অমনি সোখীনতার দুল দুলাইয়া উষাকে সোখীনতমের সন্ধানে উতলা করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা যদি কোন ছলে উষাকে জানাইলেন যে তাঁহার স্যাণ্ডাল জোড়াটার পাঁচ টাকা দাম, উষাকে অমনি জানাইতেই হইল - "হ্যাঁ, ওরকম স্যাণ্ডালগুলো বেশ,—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু ওঁর কিছুতেই ওরকম ষ্ট্র্যাপ্-দেওয়া পছন্দ হয় না। নিজে পছন্দ ক'রে কিনে এনেছেন দেখ না—সাড়ে ছ-টাকা দিয়ে! আঙুলগুলো এমন চেপে ধরে—বিচ্ছিরি!"

সুতরাং এই সন্ধ্যাই যখন উপর্যুপরি দুই দিন দুই বিভিন্ন প্রকার জর্জেট পরিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া গেল তখন উষা দেবী বেশ একটু বিচলিত হইলেন। জর্জেট কিন্তু তিনি পরিবেন না। মনে মনে কহিলেন, "আহা ভারি ত জর্জেটের দাম! প্রতিজ্ঞা না করলে এত দিন আমি কবে কিনতাম!"

* * * * *

তৃতীয় বোমা হানিলেন বান্ধবী ছায়া।

ছায়া সিনেমায় যাইবে—উষাকে ডাকিতে আসিয়াছে। পরিয়া আসিয়াছে একখানা জর্জেট শাড়ী। সুন্দর সাদা রঙের জর্জেটখানা—সুন্দর কাজ-করা। উষা দেবী তাঁহার মুর্শিদাবাদীখানি সযত্নে পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেই ছায়া প্রশ্ন করিলেন, "ওটা পরলি কেন এই গরমে! জর্জেট নেই তোর?"

"না।"

"আজকাল জর্জেটটার খুব চলন হয়েছে—কিনলেই পারিস একখানা! দামও ত বেশী নয়—আমার এইখানার দাম এগার টাকা—"

"মোটে?" অতর্কিতে উষার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মণীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটের সম্মুখে নানা বর্ণের কয়েক খানা জর্জেট শাড়ী আসিয়া

পড়াতে পটখানা বেশ একটু আবছা হইয়া গেল । ঊষা কেমন যেন আনমনেই সিনেমাটা দেখিতে লাগিলেন । সিনেমার গল্পও একটা করুণ ব্যর্থ প্রণয়কাহিনী । এই গল্পের নায়িকাও যাঁহাকে প্রথম জীবনে ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহাকে পান নাই এবং যাঁহাকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভালবাসিতেছিলেন । ইহাই জীবনের অদ্ভুত ট্রাজেডি । 'ইন্‌টারভাল' হইল—ইন্‌টারভালে ঊষা লক্ষ্য করিলেন যে মহিলা-দর্শকদের মধ্যে আরও দুই-এক জন জর্জেট শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছে ! এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিজের মনেই তিনি নিজেকে বলিলেন, ''আর এক জনকে বিয়েই যখন করতে পেরেছি তখন আর জর্জেট শাড়ী পরতে কি ! জীবনে কতবার কত প্রতিজ্ঞাই ত করেছি—সব কি আর পালন করেছি—না, পালন করা সম্ভব ! যাক্, তবু জর্জেট আমি কিন্‌ছি না—''

* * * * *

কয়েকটি দারুণ বোমার গুরুতর আঘাত সহ্য করিয়াও ঊষা দেবীর প্রতিজ্ঞা-দুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই । কোনরূপে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছিল । কিন্তু সেদিন 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিতে গিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন । তাঁহার প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল । চতুর্দিকেই জর্জেট শাড়ী ! ঊষাকে জব্দ করিবার জন্যই যেন সকলে দল বাঁধিয়া জর্জেট পরিয়া আসিয়াছে । তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি বোধ হয় একাই কাশ্মীরী শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলে তাঁহার এই জর্জেট-বিহীন আবির্ভাব লইয়া মনে মনে হাসাহাসি করিতেছেন ।

* * * * *

শেষ বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইল একটি মোটর হইতে ।

হঠাৎ সেদিন বিকালে ঊষা দেবী লক্ষ্য করিলেন যে একটি মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল । মোটরে বসিয়া একটি জর্জেট-পরিহিতা তরুণী । সুন্দরী । দ্বিতলের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া ঊষা লক্ষ্য করিলেন যে মোটরটি দাঁড়াইতেই একমুখ হাসি লইয়া স্বামী ডিস্‌পেনসারী হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া যুবতীটির পাশে বসিলেন—মোটর চলিয়া গেল । কে এ মেয়েটি ? রোগিণী ? চেহারা দেখিয়া মনে ত হয় না ! ঊষা দেবীর দোষ দেওয়া যায় না—এ অবস্থায় কৌতূহল অদম্য হইয়া ওঠাই স্বাভাবিক ।

স্বামী ফিরিতেই ঊষা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বিকেলে যে-মেয়েটি তোমাকে এসে নিয়ে গেল—কে ও ?"

''হাসপাতালের একজন নার্স । ডক্টর বিশ্বাস আমাদের আজ একটা টি-পার্টি দিলেন কি না—। সুষি অর্থাৎ ওই নার্সটি বেশ মেয়ে !''

''মেয়েটি দেখতে বেশ । জর্জেট পরে বেশ মানিয়েছিল । কিনে দাও না আমাকে একখানা জর্জেট''—ঊষা বলিয়া ফেলিল !

"বেশ ত ! দাম কত ?"

''কত আর হবে ! আজকাল সস্তাই হয়েছে শুনেছি । দশ-পনের টাকা হ'লেই হয় ।

ছায়া সেদিন প'রে এসেছিল একখানা, বললে এগার টাকা দাম। তাড়াতাড়ি নেই এখন—"

"আচ্ছা দেখি! আমার এক রোগীর কাছে ষোলটা টাকা বাকী আছে। কাল 'বিল' পাঠাব। টাকাটা যদি পাই কিনে দেব।"

॥ তিন ॥

ঠিক তাহার পর দিন সকালে বান্ধবী ছায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। গোপনীয় কিছু বলিবার ছিল। মুখচোখ রহস্যময় করিয়া কানে কানে কহিলেন, "মণিবাবু কলকাতায় এসেছেন আজ ক'দিন হ'ল। আমি জানতাম না। মালতী তার এক বন্ধুর কাছে নাকি শুনেছে। দেখা করবি নাকি? ঠিকানা জোগাড় করেছি—এই নে। আমার কাজ আছে ভাই—বসতে পারব না। যা না, দেখা ক'রে আয়। দেখা করতে আর দোষ কি?"

ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মণি আসিয়াছে। কলেজের অর্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভীড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভীতু মানুষটি—শান্ত, নিরীহ, নিরহঙ্কার। মণীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।—নাঃ, জর্জেট শাড়ী আর সে কিনিবে না! স্বামী আসিলেই বারণ করিয়া দিতে হইবে।...মণিবাবুর সহিত একবার দেখা করিতে হইবে বই কি! হরিশ মুখার্জি রোড কতটুকুই বা দূর!

* * * * *

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই উষা দেবী বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীটা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু ভিতরে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই।

"আপনি আমাকে খবর দিলেন না কেন?"

"আপনার ঠিকানা ত আমার জানা ছিল না। সেই যে আপনি কলেজ থেকে চলে গেলেন, আর ত কোন খবর দেন নি আমাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলাম—আপনার বিয়ে হয়ে গেছে। কোথায়, কার সঙ্গে—কিছুই ত জানি না—" বলিয়া মণিবাবু একটু হাসিলেন। এমন সময়—"কেমন আছেন আজকে আপনি" বলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া ডাক্তার ব্রজবিহারী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন!

"এ কি, তুমি এখানে!"

উষা দেবীও কম বিস্মিত হন নাই।

"আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তুমিই এঁর চিকিৎসা করছ নাকি?"

* * * * *

একটু পরেই ব্রজবিহারী বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে একটা কাগজের বাক্স দেখাইয়া বলিলেন—"এই নাও তোমার শাড়ী। এই ভদ্রলোকের কাছেই টাকা বাকী ছিল। ভাগ্যে আজ দিয়ে দিলেন, তাই তোমার কাছে মানটা থাকল। দেখ ত রংটা পছন্দ হয় কি না—" বলিয়া ব্রজবিহারী নিজেই প্যাকেটটা খুলিতে লাগিলেন।

উষার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না।

কালো

ভয়ানক বদরাগী ছিল কালো।

এ লইয়া কত গল্পই যে প্রচলিত আছে।

সেবার স্কুলে সামান্য একটা পেন্সিল লইয়া সে কি কাণ্ড।

ঝগড়ার কারণ এত তুচ্ছ যে শুনিলে হাসি পাইবে।

মিত্তিরদের ছেলেটা নাকি কালোকে প্রশ্ন করে—

"তোর পেন্সিলের রঙটা কেমন জানিস ?"

"কেমন ?"

"আমাদের বাঘা কুকুরের ল্যাজের যা রঙ্—অবিকল সেই রকম—" সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘুসি খাইয়া মিত্তিরদের ছেলে অজ্ঞান হইয়া যায়। স্কুলে মহা হৈ চৈ—

হেড্‌মাস্টার বলিলেন—"এমন গোঁয়ার ছেলেকে স্কুলে রাখা 'সেফ' নয়।" অনেক বলিয়া কহিয়া তবে হেডমাস্টার মহাশয় সেবারকার মত তাহাকে ক্ষমা করিতে রাজী হইলেন। নামটা রহিয়া গেল।

* * * * *

কিছুদিন পরেই আবার এক কাণ্ড।

এ ব্যাপারটাও হাস্যকর।

কিন্তু কালোর ভবিষ্যতের পক্ষে মারাত্মক।

ছেলেরা খাতায় শব্দরূপ লিখিতেছিল।

পণ্ডিতমশায় ঘুমাইতেছিলেন,—চেয়ারে ঠেস দিয়া এবং টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া—অর্থাৎ রোজই যেমন করেন।

হঠাৎ পণ্ডিতের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ-বোজা অবস্থাতেই তাঁহার কানে আসিতেছিল পিছনের বেঞ্চি হইতে যে জাতীয় শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা ঠিক শব্দ-রূপ লেখার শব্দ নয়।

'খিক্—খিক্—খিক্—'

পণ্ডিত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। আবার সেই শব্দ—খিক্—খিক্—! কারণ কি অনুসন্ধান করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই কারণটি হৃদয়ঙ্গম হইল। তাঁহার টিকিটি কে দড়ি দিয়া জানালার গরাদের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে।

পণ্ডিতের সন্দেহ হইল—এ কালোর কাজ।

কালো শপথ করিয়া বলিল যে সে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না।

পণ্ডিতের বিশ্বাস হইল না।

গেলেন তিনি হেডমাস্টারের কাছে।

হেডমাস্টার একটু পরেই বেত্র হস্তে দর্শন দিলেন।

ক্লাশ-সুদ্ধ ছেলে বেত খাইল কিন্তু অপরাধীর নাম বলিল না। তখন প্রত্যেক ছেলেকে আলাদা ডাকিয়া ডাকিয়া হেডমাস্টার মহাশয় আপিস-ঘরে জেরা সুরু করিলেন।

এই জেরার মুখে পড়িয়া ফটিক নামক ছেলেটি ভয়ে ভয়ে যে উক্তিটি করিল হেডমাস্টার ও হেড-পণ্ডিত সেটি বিশ্বাস করিলেন। ইহাই তাঁহারা চাহিতেছিলেন।

কালো 'রাস্‌টিকিট' হইয়া গেল।

কালোর মত গুণ্ডা ছেলেকে ইস্কুল হইতে দূর করিয়া দিয়া সমস্ত শিক্ষকের দল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু অন্ধকারে বোঁ করিয়া একখানা লাঠি আসিয়া লাগিল হেডমাস্টারের পায়ে। ভদ্রলোক খোঁড়া হইয়া গেলেন।

নিষ্ঠাবান হিন্দু পণ্ডিত মহাশয়ের মাথা লক্ষ্য করিয়া কে একদিন একটা পচা মুরগীর ডিম ছুঁড়িয়া মারিল। দরবিগলিত দুর্গন্ধ আমিষ ধারায় পণ্ডিতের নাক মুখ চোখ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছিল তাহা লইয়া আজিও অনেকে হাসাহাসি করে।

ফটিকের গালেও অন্ধকারে কে একদিন ঠাস করিয়া একটি চড় মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

সকলের সন্দেহ হইল—কালো।

কালোর বাড়ীতে খোঁজ করা হইল। কালোর মা বলিলেন, "কালো ত মামার বাড়ী গেছে—এখানে সে নেই ত—"

কথাটা অবশ্য মিথ্যা।

মরাইএর পিছনে বসিয়া মাতৃমুখনিঃসৃত এই মিথ্যা ভাষণটি কালো পরিতৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।

এইরূপে লেখাপড়া তাহার ইতি হইয়া গেল।

* * * *

বাড়ীতেও সে কি কম দৌরাত্ম্য করিত!

বিধবা মায়ের একটি মাত্র ছেলে।

পান হইতে চুন খসিবার জো ছিল না।

একদিন তরকারীতে নুনই বুঝি একটু কম হইয়াছিল। ছেলের সে কি রাগ! লাথি মারিয়া ভাতের থালাটাই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। অমন সুন্দর কাঁসার থালাটার কানাটা ফাটিয়া গেল। আর একবার—জলে বুঝি একটু ময়লা ছিল—আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল গেলাসটাকে। সেটাও ভাঙিয়া আছে কাঠের সিন্দুকটার ভিতর।

* * * * *

তারপর আর একদিন।

কি তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া কি তুমুল কাণ্ড!

পশ্চিম দিকের সিঁদুরে গাছটায় সেবার আম আসিয়াছিল প্রচুর। টুকটুকে লাল লাল আমগুলি—যেন আবীর মাখা।

কিন্তু ওই দেখতেই।

টক্—বিষ!

কালোই বলিত—"কাগ দেশান্তরি—বাঁদর বোবা—"

অর্থাৎ কাক যদি খায় দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে তাহাকে। বাঁদরের মত অম্লরসিকও যদি এ আম খাইতে সাহস করে বোবা হইয়া যাইবে। এমন আমের গুণ!

সেই আম গাছে একদিন কে একটা ছোঁড়া ঢিল মারিয়াছিল। কালোর নজরে পড়িয়া গেল।

কালো হাঁকিল—কে—রে—

ছোঁড়া ত দে ছুট!

কালোও ছুটিল।

বৈশাখ মাসের দুপুর বেলাকার কাঠ-ফাটা রোদ।

গ্রাহ্য নাই—ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছে কালো—ছোঁড়াটার পিছনে।

ধরিয়াই মার।

নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল ছোঁড়াটার।

তাহা লইয়া সে কি কাণ্ড। থানা-পুলিশ হইবার উপক্রম। গোটা দশেক টাকা খরচ করিয়া কালোর মা শেষে মিটাইয়া ফেলিল গোপনে।

* * * * *

তারপর কালোর বিবাহ।

এই ত সেদিনের কথা।

সুন্দরী একটি ডাগর-ডোগর মেয়ে দেখিয়া কালোর মা কালোর বিবাহ দিলেন। বেশ বড় সড়—সুন্দরী বউ।

ভাবিলেন ছেলের সংসারে মন হইবে—আর দস্যিপনা করিবে না। ছেলের মন কিন্তু গেল অন্য দিকে।

শ্বশুর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ একটি হার্মোনিয়াম দিয়াছিলেন। ওই হার্মোনিয়ামই হইল কাল।

দুনিয়ার যত বেকার ছোক্‌রা ওই হার্মোনিয়ামটাকে কেন্দ্র করিয়া আসিয়া জুটিল এবং গলা সাধিতে লাগিল।

ক্রমশঃ একটা সখের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিল।

কালোর নাওয়া-খাওয়ার অবসর নাই।

থিয়েটারে মহড়া দিয়া কালো বাড়ী ফিরিতে লাগিল কোন দিন বারোটায়—কোন দিন একটায়—কোন দিন তারও পরে। ছেলেমানুষ বউ বেচারি ভাত আগলাইয়া বসিয়া ঢোলে!

একদিন বুঝি সে বলিয়াছিল—“একটু সকাল সকাল ফিরতে পারো না তুমি? একলা রাত্রে জেগে বসে থাকতে ভয় করে না আমার বুঝি!”

উত্তরে কালো তাহার চুলের ঝুঁটিটা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিয়াছিল—“ইস্‌—ভারি মনিব এসেছেন আমার।” বউটার কি সে কম নাকাল করিত!

* * * * *

এমনই কত ঘটনা।

গ্রামের প্রত্যেকেই একটা দুইটা জানে।

কালোর বিরুদ্ধে সকলেরই একটা না একটা নালিশ ছিল। সকলকেই জ্বালাইত সে।

* * * * *

আজ কিন্তু সকলে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে।

খোঁড়া হেডমাষ্টার, পণ্ডিতমশায়—এমন কি ফটিক পর্যন্ত।

বিধবা মা কালোর সমস্ত দুষ্কৃতিগুলি পরম স্নেহভরে আজ স্মরণ করিতেছেন। বউটী তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানার স্মৃতিটিকে অশ্রুসিঞ্চনে পরম মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

আর তো সে চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে আসিবে না।

কাল রাত্রে সে মারা গিয়াছে—

হঠাৎ একদিনের জ্বরে।

বংশ গৌরব

—''জমিদার সূর্য চৌধুরীর কথা এখনও লোকে ভোলে নি, বুঝলে ? শোন তবে একটা গল্প বলি। গল্প নয়—সত্যি কথা। নিজের চোখে দেখি নি—বাবার মুখে শুনেছি।

সবে তখন সিংগাপুর জমিদারিটা কেনা হয়েছে। আসল জমিদার যিনি ছিলেন তিনি ত টাকা কড়ি নিয়ে চম্পট দিলেন বিলেতে। তিনি ছিলেন নীলকর সাহেব। তখন নীলকর সাহেবরা চাটি-বাটি গুটিয়ে সব সরে পড়েছেন। আসল জমিদার টম সাহেব চলে গেলেন—কিন্তু তাঁর ম্যানেজার লং সাহেব আর নড়তে চায় না। সে ব্যাটা কুঠি দখল ক'রে ব'সে রইল। তাঁকে খবর পাঠানো হ'ল।

ব্যাটা কি বল্লে জান ?

বল্লে 'আমার ছ'মাসের মাইনে ছ'হাজার টাকা বাকী আছে। আমার মালিক টাকাটা তোমাদের কাছে নিয়ে নিতে বলেছে। টাকাটা পেলেই আমি চলে যাব। জমিদারি কেনার সময় একটা সর্ত ছিল যে, ম্যানেজারের বাকী মাইনেটাও দিয়ে দিতে হবে।'

সর্বৈব মিথ্যে কথা—বুঝলে ?

ব্যাটা এক জাল ডকুমেণ্টও বার করলে।

সকলের চক্ষু স্থির।

সূর্য চৌধুরী কিন্তু দমবার ছেলে নয়, তাঁর তখন চারটে হাতী, চোদ্দটা ঘোড়া—শতখানেক পালোয়ান বরকন্দাজ। প্রবল প্রতাপ—বুঝলে ?

তিনি ইচ্ছে করলে সেই দিনই ব্যাটাকে মেরে গ্রাম ছাড়া করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সেদিন মেজাজটা খুব ভাল ছিল। সেইদিন তাঁর নাতি হয়েছে—অর্থাৎ শর্মা সেদিন জন্মগ্রহণ করেছে—''

বলিয়া বক্তা নিজের বক্ষঃস্থলে আঙুল দিয়া টোকা দিলেন।

''তাই সেদিন তিনি আর মার-ধোর দাংগা-হাংগামার মধ্যে গেলেন না। ম্যানেজার বেহারীবাবুকে ডেকে বল্লেন, 'ওহে, একটা কোন ফন্দি ক'রে লোকটাকে তাড়াতে হবে। এক কাজ কর, ব্যাটারা শুনেছি চা না খেলে টিকতে পারে না। এক কাজ কর—চা যাতে না খেতে পায় তার একটা ব্যবস্থা কর। বেশী কিছু করতে হবে না—গ্রামের সব গয়লাকে আজকে ডাকিয়ে আনাও—সকলকে—'

ম্যানেজারবাবু গয়লাদের ডাকবার বন্দোবস্ত করতে বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজারবাবু চলে গেলে তিনি তাঁর প্রিয় বরকন্দাজ শংকর সিংকে ডেকে পাঠালেন। শংকর সিং—দুর্ধর্ষ জোয়ান, লম্বা প্রায় সাত ফিট—ইয়া বুকের ছাতি—ইয়া গালপাট্টা।

শংকর সিং এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই তার উপর হুকুম হয়ে গেল—লং সাহেবের যত গরু মহিষ আছে—সব রাতারাতি হাঁকিয়ে নিয়ে গিয়ে বিশক্রোশ দূরে—আমেদাবাদ খোঁয়াড়ে দিয়ে এসো। কাল সকালে সাহেবের গোয়ালে যেন একটি গরু মহিষ না থাকে—

শংকর সিং সেলাম করে চলে গেল।

বিকেল নাগাদ সব গোয়ালারা এসে পৌঁছে গেল। আশপাশের দশখানা গ্রামের যত গোয়ালা ছিল—সব হাজির। ঠাকুরদা তাদের উপর কড়া হুকুম জারি করলেন যে, তাদের

যত দুধ হয় সব তিনি কিনবেন—লং সাহেব যেন এক ফোটা দুধ না পায় ; যদি কেউ লং সাহেবকে এক ফোটা দুধ বিক্রি করে তা'হলে তাকে আর আস্ত রাখা হবে না। ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে জুতো মেরে তাকে জমিদারি ছাড়া করা হবে।

গোয়ালারা সমস্বরে বল্লে—'যো হুকুম—'

গোয়ালার দল চলে গেল।

ঠাকুরদা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—'চা খাওয়া বার করছি ব্যাটার—'

তার পরদিন লং সাহেবের কুঠিতে হুলুস্থূল ব্যাপার।

খানসামা এসে সেলাম ক'রে জানালে—'হুজুর দুধ কাঁহু নেই মিলত'—শুনে লং সাহেবের মুখখানা লাল হয়ে গেল।

মেমসাহেব স্তম্ভিত।

মেমসাহেব ভীতু লোক ছিলেন। তিনি সাহেবকে অনুরোধ করতে লাগলেন—'মিণ্টার চৌধুরী শুনেছি ভয়ানক লোক। ওর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করা ঠিক নয়—'

লং সাহেবের মুখ তখন ক্রোধে রক্তবর্ণ।

বল্লেন—'ইউ কিপ কোয়ায়েট।'

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

গেলেন থানায়।

জমিদার সূর্য চৌধুরীর নামে গরু-চুরির নালিশ করতে। গিয়ে দেখেন থানায় দারোগা নেই—সেই দিন ভোরেই দারোগা সাহেব মফঃস্বলে 'টুরে' বেরিয়েছেন। কবে ফিরবেন তা জমাদার সাহেব বলতে পারলেন না।

দারোগা সাহেব ঠাকুরদার মহা-ভক্ত ছিলেন।

না হবেনই বা কেন ?

তখনকার দিনে এমন কোন অফিসার ও'অঞ্চলে ছিলেন না যিনি ঠাকুরদার দই, দুধ, ক্ষীর, ঘি, মাছ না খেয়েছেন। আর তা-ও কি একটু আধটু ! মণ মণ।

যাক—লংসাহেব ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিনা দুধেই খানিকটা চা গলাধঃকরণ করলেন। বেচারা !

তার পরদিন কিন্তু এক কাণ্ড ঘটল !

কে একজন এসে ঠাকুরদাকে খবর দিলে যে সায়েব দুধ পেয়েছে।

সে কি ? কে দুধ দিলে ? কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে !

তখ্খুনি চর ছুটল সঠিক সংবাদ আনবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে চর এসে খবর দিলে—সে খানসামার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে—সাহেব শহর থেকে টিনের দুধ আনিয়েছে, টিন ছ্যাঁদা করে তার থেকে দুধ বের করে চায়ের সঙ্গে গুলে খাচ্ছে !

ঠাকুরদা বল্লেন—'টিনের দুধ ? সে কি ?'

তখনও কন্‌ডেন্সড্ মিল্কের চলন হয় নি—বুঝলে ?

ঠাকুরদা ত আকাশ থেকে পড়লেন।

টিনের দুধ ? বলে কি !

যাই হোক সূর্য চৌধুরী দমবার ছেলে নয়।

বজ্র-নির্ঘোষে হাঁক ছাড়লেন—শঙ্কর সিং—

শঙ্কর সিং এসে হাজির হল।

ঠাকুরদা হুকুম দিলেন লং-সায়েব কুঠিতে বসে এক টিনের দুধ দিয়ে চা খাচ্ছে—এক্ষুণি গিয়ে সেই টিন কেড়ে নিয়ে এসো। যাও—

শঙ্কর সিং বেরিয়ে গেল।

পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা সাহেব ভাল করে চা খেতে পায় নি। অবস্থাটা বোঝ একবার—প্রাণ একেবারে খাঁ খাঁ করছিল। টিনের দুধ শহর থেকে আনিয়ে বেশ বাগিয়ে স্বামী স্ত্রী বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে! সকাল বেলা।

চায়ের টেবিলের ঠিক সামনেই—কাচের দরজা বন্ধ। চা খাওয়া চলছে, এমন সময় প্রকাণ্ড এক ঘোড়ায় চড়ে—টগবগ টগবগ করতে করতে শঙ্কর সিং এসে হাজির—হাতে প্রকাণ্ড বর্শা। তড়াক করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে শঙ্কর সিং সোজা সেই কাচের দরজার সামনে এসে হাজির হ'ল।

এসেই এক লাথি।

ঝন ঝন করে দরজা ভেঙে পড়ল।

বিদ্যুদ্বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে দুধের টিন নিয়ে আবার বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গিয়ে শঙ্কর সিং ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাহেব হতভম্ব।

মেমসাহেব মূর্চ্ছিত।

সেই দিনই সাহেব তল্পি-তল্পা গুটিয়ে—"

এমন সময় বাহিরে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

"ঘণ্টা বেজে গেল নাকি? আর নয় ভাই, আমাদের সাহেব ব্যাটা ভয়ানক স্ট্রিক্ট! একটু দেরী হলেই 'ফাইন' করে—"

এই বলিয়া বক্তা ত্রস্ত চকিত হইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি অফিসে ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের পৌত্র চরণবাবু—বর্তমানে সদাগরি অফিসে কেরাণীগিরি করেন।

খাসা গল্প বলিতে পারেন ভদ্রলোক।

ভূত

॥ এক ॥

জনশ্রুতি, দেবরাজ ইন্দ্রই বজ্রধর।

কিন্তু জরাজীর্ণ বুড়া পিওনটাও যে বজ্র হানিতে সমর্থ তাহা সেদিন সকালে বোঝা গেল। সুষমার মস্তকে অনায়াসে সে একটি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া নির্বিকারচিত্তে চলিয়া গেল।

পত্রখানা হাতে করিয়া নির্বাক সুষমা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রশান্ত লিখিতেছে—

"আমার চিঠি পেয়ে কষ্ট পাবে জানি—কিন্তু তবু না লিখেও ত উপায় নাই। বিশ্বাস করো, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি—কিন্তু বাবা, মা, ইন্‌টারকাস্‌ট্‌ বিয়ে দিতে কিছুতেই

রাজী নন। এ অবস্থায় তাঁদের মনে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করা অসম্ভব। যাঁরা আমাকে এত কষ্টে মানুষ করেছেন তাঁদের মনে এতবড় একটা আঘাত দিতে পারব না। তাঁদের আশীর্বাদবঞ্চিত দাম্পত্য-জীবনও কি সুখের হবে? কি করব বল—এ জীবনে আমাদের মিলন সম্ভবপর হ'ল না। যদি পরজন্ম থাকে এবং সেই পরজন্মে যদি আমরা এক জাত হ'য়ে জন্মাই এবং এই জন্মের স্মৃতি যদি পরজন্মে জাগরূক থাকে তা হ'লে হয়ত আবার মিলন হবে।

তুমি রাগ কোরো না। আমার মনে যে কি হচ্ছে তা তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার দুঃখের ভাষা নেই। এইটুকু শুধু সান্ত্বনা যে, তোমার জন্যই আমি দুঃখ ভোগ করছি। দুঃখই প্রেমকে মহিমান্বিত করে। যদি সম্ভব হয় অল্প কয়েকদিন পরেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

ইন্দ্রের বজ্র কি ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ?

॥ দুই ॥

কিন্তু নিদারুণতর আর একটি বজ্র উদ্যত হইয়াছিল।

সেটি পড়িল দুই দিন পরে।

সেই জরাজীর্ণ রোগা পিওনই সেটি ছাড়িয়া গেল।

ক্ষুদ্র পত্র—কিন্তু সাংঘাতিক সংবাদ।

প্রশান্ত আত্মহত্যা করিয়াছে।

সূর্য-সমেত সমস্ত আকাশখানা সুষমার চোখের সম্মুখে দুলিতে লাগিল।

॥ তিন ॥

সুষমা মফঃস্বলের স্কুলে শিক্ষয়িত্রী।

বিস্তৃত স্কুল কম্পাউণ্ডের এক ধারে তাহার ফ্রী কোয়াটার্স। সেই কোয়াটার্সে সুষমা ও আর একজন প্রবীণা শিক্ষয়িত্রী মিসেস্ বোস থাকেন। পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইজনে শয়ন করেন। মাঝে একটি পরদাবৃত দরজা।

গভীর রাত্রি।

হঠাৎ সুষমা আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আলুথালুবসনা মিসেস্ বাসু পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন।

ব্যাপার কি?

জানালায় কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

মিসেস্ বোস্ মেদবহুল চিবুকটা কুঞ্চিত করিয়া সন্দেহ করিলেন, নিশ্চয়ই সেক্রেটারী বাবুর বখাটে ভাইপোটা! ছোক্‌রার চালচলন, আচার-ব্যবহার বহুদিন হইতে মিসেস্ বোসের বিরক্তির কারণ হইয়া আছে। অথচ হাতে-নাতে ছোকরাকে ধরিবার উপায় নাই। সঙীন ধূর্ত।

সুষমা মিসেস্ বোসকে কিছু বলিল না।

সে কিন্তু স্পষ্ট দেখিয়াছিল।

প্রশান্তর ছায়া-মূর্তি।

অবিকল!

তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

॥ চার ॥

সুষমা খাট টানিয়া মিসেস্ বোসের ঘরে আসিয়া আশ্রয় হইল।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই।

মিসেস্ বোসের শয়নঘর হইতে স্কুলের পিছন দিক্কার অশ্বত্থ গাছটা স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্রে কি ভীষণ ঝাঁকড়া দেখায় গাছটা! সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুষমা সভয়ে দেখিল, ওই গাছটার নীচু ডালটাতে বসিয়া কে যেন পা দোলাইতেছে! অস্তমান চন্দ্রকিরণে ওই যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

প্রশান্ত!

সুষমা শিহরিয়া চক্ষু বুজিল।

* * * * *

আর একদিন মনে হইল, বাগানের বেড়াটায় হেলান দিয়া সে যেন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!

তাহার চক্ষুতে ক্ষুধার্ত সে কি দৃষ্টি।

চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার।

পাশের খাটে শুইয়া মিসেস্ বোস নাক ডাকাইতেছেন। সুষমার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রশান্তর প্রেত-দৃষ্টি যেন টর্চের আলোর মত তাহার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে।

সে সভয়ে চক্ষু বুজিয়া মনে মনে রাম-নাম জপ করিতে লাগিল।

আর একদিন সন্ধ্যার পর সে বেড়াইয়া ফিরিতেছিল।

গেটে ঢুকিতে যাইবে—মনে হইল, তাহার পাশ দিয়া সাঁৎ করিয়া সে চলিয়া গেল। হঠাৎ যেন গেটের পাশের ঝোপটায় মিলাইয়া গেল।

* * * * *

জীবিতাবস্থায় যে প্রিয়তম ছিল—মরিয়া সে ভীতিকর হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা হইলেই সুষমার গা ছম্ ছম্ করে।

॥ পাঁচ ॥

সেদিন ছুটি ছিল।

মিসেস্ বোস ছিলেন না—ছুটিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। রাত্রে সুষমা ভাবিল করুণা দিদিকে (আর একজন শিক্ষয়িত্রী) পাশের কোয়ার্টার্স হইতে ডাকিয়া আনিবে।

ডাকিতে গিয়া দেখিল, করুণা দিদির আপত্তি নাই—কিন্তু মেনতুদির ঘোর আপত্তি। তিনি একা শুইতে পারিবেন না।

নিরুপায় সুষমাকে চাকরটার উপর ভরসা করিয়া একাই শুইতে হইল!

গভীর নিশীথে ললাটে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সচকিতা সুষমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

হিমশীতল স্পর্শ!

ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, একেবারে শিয়রে বসিয়া আছে।

চীৎকার · ফিট্!

কিছুক্ষণ পরে সুষমা চক্ষু মেলিল।

স্বয়ং ভূত জলের ঝাপটা দিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভাঙাইতেছে।

সুষমার গলায় কেমন যেন একটা ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। পেটের মধ্যে কি যেন একটা পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। ভূত কিন্তু না-ছোড়!

ক্রমাগত জলের ঝাপটা দিয়া চলিয়াছে।

॥ ছয় ॥

পরদিনই সুষমা কাজে ইস্তফা দিয়া দিল।

গত্যন্তর ছিল না।

জিনিসপত্র গুছাইয়া অপেক্ষমান ট্যাক্সিটাতে গিয়া সে যখন উঠিল তখন তাহার মুখ লজ্জারুণরঞ্জিত।

"ছি-ছি কি লজ্জা—"

"বাবা-মার মত যখন পেয়েছি তখন আর কাকে ভয়? ট্রেনটা পেলে হয় এখন! তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখছিলাম আর কি!"

ট্যাক্সি স্টার্ট দিল!

জগমোহন

॥ এক ॥

বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।

জগমোহন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং চোখের ইঙ্গিত করিয়া বলিল—বাইরে শোন্।

বাহিরে উঠিয়া আসিলাম।

কি?

কিছু নয়। একটা বিড়ি দে।

বিড়ি দিলাম।

জগমোহন কখনও বিড়ি কিনিয়া খায় না। চিরকাল সে পরস্মৈপদী ধূমপান করিয়া আসিতেছে। বন্ধুবান্ধব মহলে জগমোহনকে বিড়ি দেওয়াটা একটা রেওয়াজের মত হইয়া গিয়াছে।

নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জগমোহন বলিল,—

বিপ্‌নের আদিখ্যেতার কথা শুনেছিস্? সে গোঁফ কামাতে রাজী নয়।

সংবাদটা উড়াইয়া দিবার মত নহে।

কারণ বিহার বন্যায় অর্থ সাহায্য করা যে নাট্যাভিনয়ের উপর নির্ভর করিতেছে সেই নাটকের প্রধান নায়িকা বিপিন।

বলিলাম,—আগে তো কিছু বলেনি সে—

গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া বার করছি থাম্‌না ওর।

রোষকষায়িত লোচনে জগমোহন বিড়িতে টান দিতে লাগিল।

॥ দুই ॥

বিপিন সমাদ্দার গত বৎসর পূজার সময়ও 'সীতা' সাজিয়া ছিল। সম্প্রতি অর্থাৎ বউ আনিবার পর হইতে সে পৌরুষকামী হইয়াছে।

শুনিয়াছি ডাম্বেল-মুদগর-সহযোগে পেশীসমূহের উন্নতিবিধান করিতেছে—গোঁফও আর কামায় না। অধিকন্তু কস্‌মেটিক সাহায্যে গুম্ফপ্রান্তদ্বয়কে সূচালো করাই বর্তমানে তাহার সাধনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মণিকাঞ্চন জাতীয় একটা শোভা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়েই সম্ভবতঃ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে জমকালো একজোড়া জুল্‌ফিও সে রাখিয়াছে।

রাখুক!

কিন্তু জগমোহনের যুক্তি ও উক্তি সাধু-ভাষায় ব্যক্ত করিলে এই দাঁড়ায়—গ্রামের মুখ রক্ষা করা প্রত্যেক গ্রামবাসীরই কর্তব্য। যে করে না সে শূকর। দেশের এই দুর্দিনে থিয়েটার করিয়া কিছু অর্থ সাহায্যই যদি না করিতে পারা যায় তাহা হইলে আর্ট-চর্চ্চা করার কোন অর্থ হয় না। 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'—ইহা নিতান্ত উজবুকের কথা। বাজে কথাও।

জগমোহনের মুখে এসব কথা সাজে।

কারণ গ্রামের জন্যে জগমোহন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। তাহার গ্রামপ্রীতি এতই প্রবল যে গ্রামের মাইনর ইস্কুলটা হাই স্কুল হইল না বলিয়া জগমোহন মাইনর পর্যন্ত পড়িয়াই পড়াশুনা খতম করিয়া দিল। তাহারই লেখালেখি ও চেষ্টায় গ্রামে ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তাটি হইয়াছে। সে চাঁদা সাধিয়া না বেড়াইলে গ্রামের বারোয়ারি-মণ্ডপটি হইত কিনা সন্দেহ। গ্রামের সমস্ত বিবাহে জগমোহন বাঁধা বরযাত্রী। সে যাইবেই এবং কন্যাপক্ষের বাড়ীতে গিয়া গ্রাম-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-জিহ্বা হইয়া থাকিবে। এ লইয়া বহুবার বহুস্থানে সে হাতাহাতি করিয়াছে। একবার নিকটবর্তী শহরে সমাগত এক সার্কাস দেখিতে গিয়া জগমোহনের সার্কাসে ঢুকিবার বাসনা হয়। সুতরাং সার্কাসের একটি ছোকরার সহিত ভাব করিয়া সে সেই আশায় তাহার সহিত একটু মাখামাখি করিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেই ছোকরা

নাক তুলিয়া তাহাকে বলিয়া বসিল—সার্কাসে ঢোকা কি সোজা কথা হে! আমাদের মত শহুরে ছেলেই হিমসিম খেয়ে গেছি। অজ পাড়াগাঁয়ে ত কাটালে এতদিন—মুখের কথা খসালেই অমনি নিয়ে নেবে তোমাকে! এ কি চাট্টিখানি কথা—

জগমোহন ঘৃণায় সেই দিনই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল—ধড় থেকে মুণ্ডুটি তক্ষুণি বাছাধনের নামিয়ে দিতুম যদি না—

বলিয়া রোষকষায়িত লোচনে সে চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর সক্ষোভে বলিল—ডিস্‌পেপ্‌সিয়া একেবারে মনুষ্যত্বের মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করেছে—বুঝছ না? দাও একটা বিড়ি দাও! দেখি যদি মিত্তির মশাইকে পটিয়ে একটা দরখাস্ত করাতে পারি। গ্রামে একটা চেরিটেব্‌ল ডাক্তারখানা নইলে আর চলছে না। কিনে আর কাঁহাতক ওষুধ খাওয়া যায়—

পরদিনই সার্কাসের তাঁবুতে আগুন ধরিয়া গেল।

মিত্র মহাশয়কে দিয়া দরখাস্ত লিখাইয়া, চাঁদা সাধিয়া সে বহু চেষ্টায় ছোটখাট সরকারি ডিস্‌পেনসারিও একটি খাড়া করিয়াছে। চাঁদার পরিমাণ প্রথমে আশানুরূপ হয় নাই। কিন্তু জগমোহন নিজেই দুইশত টাকা দান করিয়া বসিল। দান করিবার অব্যবহিত পূর্বেই কিন্তু জমিদারদের বাড়ীর একটি ছোট মেয়ের গলা হইতে একটি সোনার হার চুরি হইয়া গেল।

জগমোহন শুনিয়া বলিল—ওদের চুরি যাবে না ত যাবে কার! চাঁদা চাইতে গেলুম কুকুরের মত তাড়িয়ে দিলে! ভগবান বলে একজন আছেন ত!

গ্রামের যাবতীয় কুৎসা সংগ্রহ করা জগমোহনের দৈনন্দিন কর্তব্য। কিন্তু গ্রামের কুৎসা লইয়া গ্রামান্তরের কেহ আলোচনা করুক দেখি! ছলে বলে কৌশলে জগমোহন তাহাকে বিপর্যস্ত করিবেই।

সুতরাং গ্রামে জগমোহনের অনুরাগী একটি দল ছিল।

জগমোহন নিজে থিয়েটার করে না।

কিন্তু থিয়েটারের সে-ই প্রধান পাণ্ডা। স্টেজ বাঁধা, চাঁদা তোলা, টিকিট বিক্রী করা, ড্রেস আনানো, রিহার্সালের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেক অভিনেতাকে উৎসাহ দেওয়া—সব জগমোহন।

নবাগত ডাক্তারবাবুটিও থিয়েটার ভক্ত।

তিনিও জগমোহনের বন্ধু ছিলেন।

আমি ত ছিলামই।

॥ তিন ॥

গভীর রাত্রে জগমোহনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গেল।

ধড়মড় করিয়া নামিয়া আসিলাম।

যাহা শুনিলাম তাহাতে চক্ষু কপালে উঠিল।

জগমোহন বলিল—শীগ্‌গির চল্‌—বিপ্‌নের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। একটা বিড়ি দে চট্‌ ক'রে।

জগমোহনের সঙ্গে দেখিলাম নিতাই, করালি ও হাবুল রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে ভীত চকিত ভাব।

জগমোহন বলিল,—তুই এদের নিয়ে এগো—আমি থানায় চললাম।

* * * *

বিপিনের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিলাম তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

অজ্ঞান বিপিনের গোঁফ ও জুলফি অন্তর্হিত হইয়াছে।

পরিষ্কার কামানো।

বউ পাশে বসিয়া কাঁদিতেছে।

গ্রামের প্রান্তে বিপিনের বাড়ী। জগমোহনের বাড়ীর পাশেই। বিপিনের বৃদ্ধ পিতামাতা সম্প্রতি তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন। কাছে-পিঠে এক জগমোহন ছাড়া আর কেহ নাই। সুতরাং ডাকাতির সুবিধা আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ডাকাতে গোঁফ ও জুলফি ব্যতীত আর কিছুই অপহরণ করে নাই। বিপিনের স্ত্রীর সহিতও তাহারা সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে।

ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ।

গভীর রাত্রে হঠাৎ কয়েকজন মুখোসপরা লোক প্রাচীর টপকাইয়া প্রবেশ করে এবং বিপিনকে ডাকিতে থাকে। বিপিন বাহির হইবামাত্র তাহারা তাহাকে ধরিয়া চিৎ করিয়া ফেলে এবং একটা ঠোঙার মত জিনিসে কি একটা ঔষধ ঢালিয়া শুঁকাইতে থাকে।

বিপিনের স্ত্রীর চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিবেশী জগমোহন যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় তখন দস্যুগণ বিপিনের গোঁফ ও জুলফি কামাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

বিবরণ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

একটু পরেই স-দারোগা জগমোহন আসিয়া হাজির হইল।

গম্ভীরভাবে সব শুনিয়া দারোগাবাবু কি সব টুকিয়া লইলেন।

তাহার পর হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অদ্ভুত কাণ্ড! যাক্ আর কোন ভয় নেই।

বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

দারোগাবাবু লোক ভাল!

জগমোহনের বন্ধু। নাট্যামোদী।

যে নাটকটি অভিনয় হইবে তাহাতে তিনিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন।

জগমোহন আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিল এবং বলিল—দে একটা বিড়ি দে—

চৌধুরী

॥ এক ॥

পুরা নাম কংসারি চৌধুরী।

লোকে সংক্ষেপে বলে চৌধুরী।

বহুকাল পূর্বে কংস চৌধুরীকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই একবার দর্শনের ফলেই মনের মধ্যে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল তাহা আজও মোছে নাই। মনে হইয়াছিল যেন একটা সিংহ অথবা শার্দূল মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছে।

ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখখানা।

আরক্ত চক্ষু দুইটি জাজ্বল্যমান।

ভ্রূযুগল মধ্যে রক্ত সিন্দুর বিন্দু।

একমাথা কোঁকড়ান বাবরি চুল—মাঝখানে সিঁথা।

শক্তিব্যঞ্জক মাংসল ওষ্ঠাধরে স্পর্ধা-ক্রূর নীরব হাস্য।

হাসিলে অথবা কথা কহিলে উগ্র শাদা শ্বাদন্তগুলি চক্ চক্ করিয়া ওঠে—নাসিকা কম্পিত হইতে থাকে।

ললাট-ভ্রূকুটি-কুটিল।

॥ দুই ॥

একবার মাত্র দেখিয়াছি বটে কিন্তু তাহার কথা শুনিয়াছি অনেক। বস্তুত এই স্বল্পভাষী দুর্ধর্ষ লোকটির সম্বন্ধে নানা কাহিনী না শুনিয়াছে এমন লোক এ অঞ্চলে বিরল!

সমস্ত কাহিনীরই মূল কথা এক।

চৌধুরীকে কেহ কখনও কোন বিষয়ে হটাইতে পারে নাই।

চৌধুরী গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু এখন তিনি প্রবল প্রতাপশালী জমিদার।

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী"—শিরোনামা-সম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাঁহার দরবারে পৌঁছিতেছে।

দুর্দান্ত কর্মী—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সর্বপ্রধান কথা এই যে তিনি অপরাজেয়।

কখনও কাহারও কাছে হার মানেন নাই।

জাল, জুয়াচুরি, ঘুস, খোসামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল—কার্য সিদ্ধির জন্য যখন যেটার প্রয়োজন কাজে লাগাইয়াছেন।

কিছুতেই চৌধুরী পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন।

দারোগা, উকীল, ডাক্তার, হাকিম সকলেই চৌধুরীর নামে তটস্থ—সকলেই তাঁহার করায়ত্ত।

চৌধুরী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ম হাস্য করিয়া বলিতেন—

"জুতো মারব আর কাজ আদায় করে নেব। চামড়ার জুতোয় না কুলোয় চাঁদির জুতো লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে সব !"

এবং সত্যই সব ঠিক হইয়া যাইতেছিল।

চৌধুরী করেন নাই কি ?

গ্রামে পিতার নামে স্কুল-স্থাপন, মাতার নামে অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ—এমন কি শিশু-হত্যা পর্যন্ত।

যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

এ দেশে এরূপ অদম্য চরিত্র সত্যই বিস্ময়কর।

একটা গরুর গাড়ী যেন মন্ত্রবলে মোটরের গতি লাভ করিয়া দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সকলেই আমরা আশ্চর্য হইতাম।

লোকটা কখনও কোন বিষয়ে হার মানিল না !

হাতীর মুখে লাগাম লাগানো যায় না বলিয়া চৌধুরী হাতীই চড়িতেন না !

॥ তিন ॥

হঠাৎ কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল।

চৌধুরী সহসা অন্ধ হইয়া গেলেন।

অকস্মাৎ !

চতুর্দিক হইতে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য আসিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন—দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিবে না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন—

"কিছুতেই না ?"

"না—"

"লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও না ?"

"না—"

একটা প্রেসক্রপ্‌শন লিখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে চৌধুরী তাঁহার বিশ্বাসী দেওয়ানকে বলিলেন—"বল কি হে। পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে ? শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল !"

দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরী আবার বলিলেন—

"আচ্ছা যাও—তুমি ওষুধটা নিয়ে এস—"

দেওয়ানজী চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চৌধুরীর রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটাইতেছে।

রিভলভার দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

গুলি করিয়াছেন চোখেই।

ভোম্বলদা

মোটাসোটা গোলগাল চেহারা।

দেখা হইলেই মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া ওঠে। হাতে এক টিপ্ নস্য লইয়া এবং নাকের আশেপাশে নস্য লাগাইয়া ভোম্বলদা সকাল হইতেই রাস্তার মোড়টিতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং পরিচিত পথিকমাত্রকেই সহাস্যমুখে সম্ভাষণ করেন।

ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কার্য।

—মাতুল যে,—মাছ কত ক'রে কিনলে? গ্র্যাণ্ড মাছ ত! ছ'আনা সের? বল কি!

—বাজার দর অবশ্য আট আনা, আমি পেয়েছি ছ'আনাতে।

ভোম্বলদা সবিস্ময়ে বলিলেন—ড্যাম চীপ্!

সস্তায় জিনিসপত্র কিনিতে পারেন বলিয়া মাতুলের অহংকার আছে। কেহ সে কথার উল্লেখ করিলে তিনি খুসি হন। মাতুলের কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ছিল না—অফিস আছে। তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

—ভুতো যে রে, তুইও মাছ কিনেছিস দেখছি—কত ক'রে পেলি? ছ'আনা সের? ড্যাম—

ভোম্বলদার কথা শেষ করিতে না দিয়াই ভুতো সক্ষোভে বলিয়া উঠিল—আর বল কেন ভোম্বলদা! আমাদের মতন লোকের লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়াই উচিত হয়েছে এবার! ছ'আনা সের মাছ? কিনে খেতে পারি আমরা!

ভোম্বলদার চক্ষু কপালে উঠিল।

—ছ'আনা সের! বলিস্ কিরে! গলা কাট্‌ছে বল্!

ভুতো বলিতে লাগিল—

—আধ সের কিনেছি—এই দেখ না—বড় জোর চার-পাঁচ পিস্ হবে! তিনগণ্ডা পয়সা অর্থাৎ টুয়েল্‌ভ্ পাইস্ কিন্তু সাফ্ হয়ে গেল!

—দিনকাল বড় খারাপ পড়ল—সত্যি।

বলিয়া ভোম্বলদা সশব্দ নস্যটা টানিয়া লইয়া নস্যাভিভুত মুখখানাকে যথাসম্ভব চিন্তান্বিত করিবার প্রয়াস পাইলেন।

—এক টিপ্ আমাকে দাও ভোম্বলদা। আমার নাকেই ঢুকিয়ে দাও—দুটো হাতই জোড়া আমার—

—এই যে, টান্ ভাল করে—

ভোম্বলদা এক টিপ্ নস্য ভুতোর নাসারন্ধ্রে ধরিলেন।

ভুতো যথাসম্ভব টানিয়া চলিয়া গেল।

অদূরে অক্ষয়বাবু দেখা দিলেন।

অক্ষয়বাবু কংগ্রেস-সেবক এবং উগ্র খদ্দরধারী। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির পাণ্ডা এবং সেই সূত্রে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন।

কাছে আসিতেই করতল হইতে নস্য ঝাড়িতে ঝাড়িতে ভোম্বলদা সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—

—অক্ষয়বাবু, কাল আপনার বক্তৃতাটা সত্যিই চমৎকার হয়েছিল—যাকে বলে হৃদয়গ্রাহী। আরে, এ যে গ্র্যাণ্ড পাঞ্জাবি করিয়েছেন—খদ্দর না কি? দেখি, দেখি—বাঃ—

পাঞ্জাবির কাপড়টা হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে ভোম্বলদা বলিলেন—বাঃ এ যে প্রায় সার্জের মতন। চমৎকার জিনিস ত! চক্ষু দুইটি বড় বড় করিয়া মোটা গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করার মত ধরণে অক্ষয়বাবু বলিলেন—

সার্জই হোক আর চটই হোক—খদ্দরই এখন আমাদের একমাত্র গতি—উপায় নেই এ ছাড়া—

বলিয়া চক্ষু দুইটি হঠাৎ ছোট করিলেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব কায়দা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভোম্বলদা বলিলেন—সে কথা আবার বলতে! দেশের জন্যে আপনারা যে প্রাণপাত করছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে দেশের বুকে। স্যাক্রিফাইস্ না হ'লে কিছু হয়? খদ্দরটা কিন্তু বেশ চমৎকার। থাপির ওপর বেশ ইয়ে—কত করে গজ?

দেড় টাকা বোধ হয়। ঠিক মনে নেই—

দামও ত এমন কিছু বেশী নয়—বাঃ।

ছাড়, একবার নিবারণ ঘোষালের ওখানে যেতে হবে। লোকটা শুনেছি অ্যান্টি-কংগ্রেস প্রোপাগাণ্ডা করছে!

ভোম্বলদা পাঞ্জাবির কাপড়টা দেখিতেছিলেন—ছাড়িয়া দিলেন।

অক্ষয়বাবু চলিয়া গেলেন।

দেখা দিলেন দয়াময় খুড়ো। খুড়ো রাস্তার ওপাশ দিয়া যাইতেছিলেন। ভোম্বলদা হাঁকিলেন—খুড়ো, পাশ কাটাচ্ছ যে! খবর সব ভালো ত?

খর্বকায় বালাপোষ-আবৃত খুড়ো রাস্তাটা পার হইয়া আসিলেন। নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—খবর আর কি! সূর্য চন্দ্র এখনও উঠছে ভালোর মধ্যে এই। সারা বাজারটা ঢুঁড়ে বিলিতি গরম মোজা একজোড়া পেলাম না হে।

তাই না কি?

হ্যাঁ হে! আগে সেই যে সাদা—একটু হল্‌দেটে গোছের এক রকম মোজা আসত! এক জোড়া কিনলেই নিশ্চিন্দি! প'রেও আরাম—টেকেও অসম্ভব। গত বছরের আগের বছর কিনেছিলাম এক জোড়া। ঠেসে-মেড়ে দুটি বছর পায় দিয়েছি। এ বছর কিন্তু আর পাচ্ছি না। ঐ যে মোড়ে এক ডেঁপো ছোকরা কাটা-কাপড়ের দোকান করেছে—সে ত লম্বা এক লেকচারই ঝেড়ে দিলে—বিলিতি কেনা উচিত নয়। উচিত নয় সে কি আমাকে শেখাবি তুই? কিন্তু ওরকম মোজা বার করুক দিকি দিশি—দেখাক্ দিকি আমাকে!

বলিয়া রোগা দয়াময় খুড়ো সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দক্ষিণ হস্তটি চক্রাকারে নাড়িয়া দিলেন।

ভোম্বলদা সহাস্যমুখে কিছুক্ষণ দয়াময় খুড়োর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর কৌটা হইতে এক টিপ্ নস্য লইতে লইতে চাপা-কণ্ঠে চুপি চুপি বলিলেন—এ সব কথা চেঁচিয়ে বলতে নেই আজকাল খুড়ো—এইমাত্র অক্ষয়বাবু গেলেন! বিলিতি জিনিসের তুলনা আছে? যাকে বলে মার নেই! কাকে বলি বলুন! আজকাল

অসহায় বিপন্ন মুখচ্ছবি !

দূরে গঙ্গার ওপারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন।

সরল গোলগাল মুখখানি বিমর্ষ।

হাসি নাই।

মানুষ

অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

গঙ্গা-বক্ষে সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণনাতীত বর্ণসমারোহ। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্ন-সায়রে নিমগ্ন। শাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান মাছ-রাঙা পাখীগুলি সন্ধ্যারুণরাগরঞ্জিত। টলমল নদীজল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।

প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শোভা।

তৃণাঞ্চিত শ্যামল তীরে দেবালয়।

দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধর দেহ একটি গাভী।

আরো একটু দূরে মুদিত নয়ন একটি মার্জার।

দেবালয়ে করুণ গম্ভীর সুরে নহবৎ বাজিতেছে।

পূরবীর অপরূপ আলাপ।

চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।

ভাবিতেছিলাম—কি সুন্দর এই পৃথিবী।

* * * * *

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

আমার পিছনে কে যেন জড়িতকণ্ঠে কথা কহিল।

ফিরিয়া দেখি একটি ভিখারী এবং তাহার সহিত একটি মেয়ে।

ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।

নাসিকার স্থানে একটি গহ্বর।

বিকৃত বীভৎস মুখখানায় মিনতি ফুটাইয়া অনুনাসিককণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে।

একটি পয়সা বাবু—

সঙ্গের মেয়েটিও সে কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

মেয়েটির বয়স ষোল সতেরো—

শরীরে কোন ব্যাধি আছে বলিয়া মনে হইল না।

পরণে একটি মাত্র বসন—শতছিন্ন।

বসনের শত ছিদ্রপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।

দারিদ্র্যের মলিনতায় তাহা লাঞ্ছিত।

তবু তাহা যৌবনশ্রী।

মেয়েটিও সে সম্বন্ধে সচেতন।

তাহার মুখ-চোখ ভাব-ভঙ্গী ইঙ্গিতময়।

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিণী ইতিপূর্বে আরও দেখিয়াছি।

কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।

ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্যে।

ক্ষুধার অন্ন চাই।

ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।

সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে—আর একজন যৌবনকে।

দুইজনকে দুইটি পয়সা দিলাম।

চলিয়া গেল।

কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে।

মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছুদূর গিয়া সে আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।

মুখে মুচ্কি হাসি।

নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম।

তাহার ছিন্ন বসনের শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

* * * * *

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার।

সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম—বিড়ালটা একটা ইঁদুর ধরিয়াছে।

ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল।

গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।

তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।

* * * * *

আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষ মেলিয়া সারি সারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পালতোলা নৌকাগুলি দেখিলাম জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া দেখিলাম।

আলোক সমারোহ আর নাই।

অস্তমিত রবির বর্ণ-সমারোহ চক্রবালরেখায় ম্রিয়মাণ।

অন্ধকার নামিতেছে।

উঠিয়া পড়িলাম।

পথে দেখিলাম সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিণী একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া একটি গুণ্ডাগোছের লোকের সহিত হাস্য পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম পাশের বাড়ীর বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আনন্দ শঙ্খধ্বনি সে শুভবার্তা ঘোষণা করিতেছে। সদ্যপুত্রশোকাতুরা আমার গৃহিণী সজল চক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন—ভগবান, বাঁচাইয়া রাখ।

অন্যমনস্কভাবে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজগুলা উল্টাইতে লাগিলাম।

বহু বাধাসত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

—বহু বিফলতাসত্ত্বেও আর একদল দুঃসাহসী এভারেসট্ অভিযানে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

চীন-জাপান-যুদ্ধ।

স্পেন।

বাঙালীর দুর্গতি ও তাহার নানা প্রকাশ।

কংগ্রেস—

দুয়ারে কড়া নাড়িয়া উঠিল।

পিওন তার আনিয়াছে। সুসংবাদ। আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এ চাকুরিটির জন্য পাঁচশত প্রার্থী ছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাই-ই চাকুরিটি পাইয়াছে।

এতবড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না।

উপরন্তু খুসী হইলাম।

ছাদে উঠিলাম।

কালো মেঘের স্তর-ভেদ করিয়া অপরূপ শোভায় চাঁদ উঠিতেছে।

পূর্ব দিগন্ত জ্যোৎস্না-পুলকিত।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার জন্য একটি সিগারেট ধরানো প্রয়োজন।

পকেটে হাত দিয়া দেখি—সিগারেট কেস খালি।

সিগারেট আনিতে ভুলিয়াছি।

আবার মনটা বিগড়াইয়া গেল।

উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আমি আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।

নরোত্তম

নরোত্তম কিছুদিন হইতে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। 'আকর্ষণ' কথাটার মধ্যে যে একটা জবরদস্তির আভাস আছে, তাহা এ ক্ষেত্রে অলীক নহে, সম্পূর্ণ সত্য। নরোত্তমকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইয়াছি। নানারূপ সামাজিক সদ্গুণে নরোত্তম মণ্ডিত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দেশের কাজে জেল খাটিয়াছে, পরোপকারী এবং সমাজ-সংস্কারার্থে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায়ই প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এ যাবৎ সে আমার শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করিতে পারে নাই। তাহাকে সাধারণ আর পাঁচজনের মতই মনে করিতাম। কিন্তু সেদিন জানিলাম, সে লুকাইয়া মদ্যপান করে। জানিবামাত্র বুঝিলাম, নরোত্তম সাধারণ লোক নহে—সে সত্যই শ্রদ্ধার পাত্র। সে সত্যই মানুষ।

মদ্যপান-প্রসঙ্গ লইয়া নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে গেলে আত্মার কথা আসিয়া পড়ে এবং আত্মার কথা আসিয়া পড়িলে সম্ভ্রম না করিয়া পারা যায় না। এই সম্ভ্রম অহেতুক নহে। আত্মা বস্তুটি কি তাহা আমার ঠিক জানা নাই। দেহের কোন অংশে তাহার অবস্থিতি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আত্মা কোন্ অবস্থায় সৎ, কোন্ অবস্থায় চিৎ এবং কোন্ অবস্থায় আনন্দস্বরূপ, তাহা বহু চিন্তাসত্ত্বেও আমার নিকট অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং আত্মার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িলেই শ্রদ্ধান্বিত হইতে হয় এবং ব্যাকরণ-সম্মত শুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যাবলী ব্যবহার করিতে লোভ জন্মে।

আত্মার তৃপ্তির জন্যই অবশ্য নরোত্তম মদ্যপান করে। আত্মাকে তৃপ্তিদান করা সকলেরই অপরিহার্য কর্তব্য, এবং সকলেই সে কর্তব্য করিবার জন্য নানা মার্গ অবলম্বন করেন। জ্ঞান-মার্গ, ভক্তি মার্গ এবং কর্ম-মার্গ—প্রধানত এই ত্রিবিধ মার্গ অবলম্বন করিয়া মানবগণ আত্মবিনোদন করিয়া থাকেন। ছুৎ-মার্গ কথাটা শুনিয়াছি ; কিন্তু মদ-মার্গ বলিয়া কোন বিশেষ মার্গের উল্লেখ আছে বলিয়া জানি না। আমার মনে হইতেছে, মদ্য বস্তুটি সমস্ত মার্গের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়াই হয়তো বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ ইহাকে একটি পৃথক মার্গরূপে চিহ্নিত করিয়া দিতে ইতস্তত করিয়াছেন। তাঁহারা হয়তো নিগূঢ়ভাবে এই ইঙ্গিতই করিয়াছেন যে, যে কোন মার্গেই আমরা বিচরণ করি না কেন, আত্মাকে প্রকৃত তৃপ্তিদান করিতে হইলে মদ চাই। বস্তুত জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম—অজ্ঞান, অভক্তি, অকর্ম, যে কোন অবস্থার সহিত ইহা বেশ মানাইয়া যায়।

কিন্তু এই মর্মামোদী আলোচনা করিতে করিতে একটি কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আমাদের সমাজে মদ জিনিসটা এখনও চায়ের মত চলে নাই। এমন কি মদ্যপান করিলে লোকে এখনও নিন্দাই করিয়া থাকে। কেহ কীর্তনে মাতিয়া রাস্তায় ঢলাঢলি করিলে আমরা বাহবা দিই, কিন্তু মদ খাইয়া রাস্তায় ঢলাঢলি করিলে আমরা তাহাকে পুলিসে দিয়া থাকি। ইহাই বর্তমান সামাজিক নিয়ম। সমাজ সৃষ্টি করিয়াছে মানুষ এবং মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন ভগবান। মানবের কার্যকলাপ ও বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করার অর্থ ভগবানের বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা করা। তাহা করিতে আমি অপারগ। বিশেষ ইচ্ছুকও নহি, কারণ আমি সমাজের পক্ষপাতী। আমি ইহা সার বুঝিয়াছি যে, এই জ্বালাযন্ত্রণাময় পৃথিবীতে যখন কিছুদিন বাঁচিতেই হইবে তখন অন্তত পরনিন্দা ও পরচর্চা করিবার জন্যই একটা সমাজ থাকা প্রয়োজন। আমি পরনিন্দাশীল পরচর্চামুখর সমাজের একজন রক্ষণশীল অধিবাসী। এমন কি পরনিন্দা ও পরচর্চার সুযোগ আছে বলিয়াই আমি সমাজের অস্তিত্ব সার্থক মনে করি। সত্য বটে অনেক ভাল পুস্তক, ভাল ছবি, ভাল লোক, ভাল গান এবং অন্যান্য অনেক ভাল জিনিস আমাদের সমাজে তাদৃশ জনপ্রিয় হয় নাই ; কিন্তু তাহার জন্য সমাজকে দায়ী করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইবে না। মদের মত এমন একটা উৎকৃষ্ট জিনিস সমাজে খোলাখুলিভাবে চলিতেছে না, তাহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহার জন্য দায়ী সমাজ নয়।

তাহার জন্য দায়ী সেই অজ্ঞাত হেতু, যাহা আমাদিগকে দিবসে জ্যোৎস্না এবং রাত্রে রৌদ্র উপভোগ করিতে দেয় না, যাহার জন্য আমরা তবলা বাজাইতে বাজাইতে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতে অথবা মুদ্গর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রিয়াকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিতে পারি না। এবম্প্রকার পরস্পরবিরোধী সুখ একসঙ্গে উপভোগ করিতে উৎসুক হইলে একের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমাজ ও মদ একসঙ্গে চলা কঠিন। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রেই

কঠিন কার্যকে সহজ করিয়া ফেলেন। মোটা লোকের যদি সার্বসম্মুখী প্রতিভা থাকে, সে অনায়াসে শূন্যে অবস্থিত সরু তারের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যায়। রাধার অন্তরে প্রেম ছিল কিন্তু মস্তিষ্কে প্রতিভা ছিল না। তাই সে শ্যাম এবং কুল দুই রাখিতে পারিল না। নরোত্তমের মত প্রতিভা থাকিলে সে শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখিতে পারিত।

নরোত্তমের সমাজে ভাল ছেলে বলিয়া সুনাম আছে, অথচ সে লুকাইয়া মদও খায়—একথা যতই ভাবিতেছি, ততই শ্রদ্ধায় আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

মেঘান্তরালবর্তী শশধরের ন্যায়, পত্রান্তরালবর্তী কুসুমের ন্যায়, অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত রূপসীর ন্যায় নরোত্তম দাসের প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। সন্দেহ করিতেছি, গতকাল সে আমার বোতল হইতে খানিকটা মদ লুকাইয়া পান করিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই তাহার উপর চটিতে পারিতেছি না। বরং আমার মনে এই দার্শনিক তত্ত্ব উদিত হইতেছে যে, যেমন 'ওঁ' নামক ক্ষুদ্রকায় বস্তুটি একটা বিরাট-কিছুর প্রতীক, আমাদের নরোত্তমও তেমনই আমাদের স্বদেশীয় প্রতিভার প্রতীক। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সমন্বয়সাধন। আমরা শৈব ও শাক্ত, তান্ত্রিক ও ব্রহ্মচারী, আমিষ ও নিরামিষ সমস্ত জিনিসের মধ্যে আপোষ করিয়া ফেলিয়াছি। রাধা নিজে যদিও দুই দিক রক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু রাধাকে দিয়া সব দিক রক্ষা করাইয়া ছাড়িয়াছি। আমরা সূর্যগ্রহণের সহিত ব্যাক্‌টীরিয়া-তত্ত্ব মিলাইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে হাঁড়ি ফেলিতেছি, গোবর জিনিসটা জীবাণুনাশক বলিয়া আমরা চতুর্দিকে গো-বিষ্ঠা লেপন করিয়া হিন্দুমতে জীবাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছি। বৃহৎ-কাষ্ঠে বসিয়া জাতিভেদ ভুলিয়া দিবার মত মানসিক প্রশস্ততা আমাদের আছে এবং লোভনীয় স্ত্রী-রত্ন পাইলে দুকুল হইতেও তাহা গ্রহণ করিবার শাস্ত্রীয় অনুমতি আমরা বহুকাল পূর্বেই পাইয়াছি। সেই সনাতন যুগ হইতে আমাদের জাতীয় প্রতিভা জীবনের সর্ববিভাগে নানা পরস্পরবিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সাধন করিয়া আসিতেছে। রাজনীতির সহিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শ আমাদের দেশের মহাত্মার কণ্ঠেই ধ্বনিত হইয়াছে, সন্ন্যাসীর জীবনে ভোগবিলাসের অপূর্ব সমন্বয় আমাদের দেশেই বহু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে অহরহ সাধিত হইতেছে।

শীর্ণকলেবর বাঙালীর জীর্ণ অঙ্গে এখন হ্যাট কোট প্যান্ট নেকটাই দেখি, তাহার ভয়কম্পিত কণ্ঠে যখন হিট্‌লার মুসোলিনি লেনিন ট্রট্‌স্কির তূর্যনিনাদ শুনি, ভূতভয়-গ্রস্তা বিলাস-লালায়িতা স্বামী-সন্ধানকারিণী রমণীগণের রসনায় যখন স্ত্রী-স্বাধীনতার উগ্র-বাণীমূর্তি রূপায়িত হইয়া উঠে তখন মনে হয় কোন অসূক্ষ্মদর্শী কবি বলিয়াছিল—The East is East and West is West, the twain shall never meet! এই তো meet করিয়াছে!

আমাদের স্বকীয় প্রতিভাবলে আমরা East, West, North, South, Zenith, Nadir সব একসঙ্গে মিলাইয়াছি। 'বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়!'

নরোত্তমের জয় হউক। ভাল ছেলে বলিয়া সে সমাজে সুনাম অর্জন করিয়াছে,—মদও খাইতেছে, কিন্তু লুকাইয়া। তাহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আমাদের শক্তি-সম্পদ

এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে যুদ্ধ অহরহ চলিতেছে, তাহার নাম জীবন-যুদ্ধ। কোন 'লীগ অব নেশন্‌স্‌'-এর মধ্যস্থতায় তাহা কোনদিন থামিবে না। তাহার বিরতি নাই—সন্ধি নাই, তাহা অহরহ চলিতেছে এবং চলিবে। আমাদের মত নিরীহ জাতিও এই ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত আছে এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, এখনও লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি। ভাবিয়া দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মশা, মাছি, প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র বিশ্ব-জগৎটাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। জীবন-যুদ্ধে সকলেই আমাদের শত্রুপক্ষীয়। এই বিরাট বিশ্বব্যাপী শত্রুবাহিনীর বিপক্ষে আমরা—নিধিরাম সরদারগণ—কি করিয়া টিকিয়া আছি, ইহা পরম বিস্ময়ের বস্তু। ইহা তো বিস্ময়ের বস্তু বটেই, অধিকতর বিস্ময়ের বস্তু এই যে, আমরা আমাদের শক্তি-সম্পদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা নিজেরাই জানি না, কিসের জোরে আমরা এই জীবন-যুদ্ধে যুঝিতেছি! ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি সত্য, কিন্তু এখনও পর্যন্ত পরাজিত হই নাই। এ যুদ্ধে পরাজয় মানে মৃত্যু। আমরা এখনও মরি নাই—এখনও বাঁচিয়া আছি।

কিন্তু, কিসের জোরে?

'আমাদের তো টিকিয়া থাকিবার কথা নহে'—এ কথা যিনি বলিবেন, তিনি জীবন-যুদ্ধের ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 'টিকিয়া থাকিবার কথা নহে' অপেক্ষা 'টিকিয়া আছি' প্রবলতর যুক্তি।

কেন টিকিয়া আছি, কি করিয়া টিকিয়া আছি, আমাদের শক্তি-সম্পদ কোথায়, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া বারম্বার আমার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, সত্যই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। নিজেদের সম্পদ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা মোটেই জাগরূক নহে। আমরা সোনা ফেলিয়া সর্বদাই আঁচলে গেরো বাঁধিতেছি!

আমাদের ঐতিহাসিকগণ, সাহিত্যিকগণ, কবিগণ যে সমস্ত সম্পদের কথা লইয়া বিস্তৃত বাগ্‌বিস্তারকরতঃ আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছেন, জীবন-যুদ্ধে সে সব সম্পদ অতি অকিঞ্চিৎকর।

ঐতিহাসিকগণ আমাদের অতীতের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন করিতেছেন। নানারূপ গবেষণা করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিতে উৎসুক যে, অতীত কালে আমরা—অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই কেষ্ট-বিষ্টু ছিলেন। ছিলেন তো ছিলেন। আনন্দের কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের কেষ্ট-বিষ্টুত্বের জোরেই কি আমরা বর্তমানে গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইতেছি?

আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পদ লইয়া অনেকেরই মস্তক আজকাল ঘর্মাক্ত। স্বাস্থ্যবান হওয়া ভাল কথা; কিন্তু স্বাস্থ্য জীবন-যুদ্ধের প্রধান সহায় হইলেও মূল শক্তি নয়। আহার না জুটিলে স্বাস্থ্য থাকে না। সুস্থ ব্যক্তিমাত্রেই যে আহার জুটাইতে পারিবেন, এমন কোন কথা নাই। ইহার প্রমাণ আমরা প্রত্যহই পাইতেছি। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ, অরণ্য-সম্পদ, শাস্ত্র-সম্পদ, সাহিত্য-সম্পদ প্রভৃতি নানাবিধ বাজে সম্পদ লইয়া আমরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, কিন্তু আমাদের জীবন-যুদ্ধে যাহারা আসল সম্পদ তাহাদের উল্লেখ পর্যন্ত করি না। আত্মবিস্মৃত জাতিই বটে!

আমরা যে আজও বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা মহাত্মার দার্শনিক রাজনীতি নয়—তাহার কারণ দোকানী আমাদের ধারে খাইতে পরিতে দেয়, দরজী আমাদের হালফ্যাশানদুরুস্ত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দেয়, নাপিত ধারে আমাদের চুল-গোঁফ-জুলফির তদারক করে, ধোপা ধারে আমাদের পরিচ্ছন্ন রাখে এবং বাড়িওয়ালা বাকি পড়িলে গলাধাক্কা দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দেয় না।

ইহারা আমাদের জীবন-যুদ্ধের শক্তি ও সম্পদ। অথচ ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়জন কবি কবিতা লিখিয়াছেন—ইহাদের উপলক্ষ করিয়া কয়টা উৎসবই বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে? একটাও নয়।

কিন্তু আমি বলিতেছি, এইবার অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। বাঙালীর ভাগ্যাকাশে দারুণ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাদের জীবন-যুদ্ধের প্রধান শক্তিগুলির সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

অর্থাৎ উহাদিগকে তোয়াজ করিতে হইবে।

সাহিত্যিকগণের তরফ হইতে আমি এইটুকু শুধু বলিতে চাই যে, হে কবিগণ, তোমরা এইবার ফুল জ্যোৎস্না প্রিয়া ছাড়িয়া মুদি-কৌমুদী রচনা কর, এইবার দোকানীর দো-কান তোমাদের কাব্যলক্ষ্মীর লীলা-ক্ষেত্র হউক। যে দরজীর প্রসাদে তুমি সভ্যভব্যবেশে ভদ্রলোক বলিয়া সমাজে পরিচয় দিতে পারিতেছ, তাহার সেলাই-কলের খচখচ ধ্বনিতে তোমার কবিতা খচিত হউক। সভা করিয়া রজক ও নাপিতের গলায় মালা দিয়া তাহাদিগকে সম্বর্ধনা কর। বাড়ি-ওয়ালাগণকে আর গালাগালি দিও না—তাহাদের বক্র হাসিতে বিচলিত হইও না, উদ্বোধিত হও। যেরূপ দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল তাহাতে রাস্তায় দাঁড়ানো মোটেই সুখজনক হইবে না।

এইবার সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে বাস্তবিক বস্তুতন্ত্রতা মূর্ত হউক। দোকানী, দরজী, ধোপা ও নাপিতকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে আঁকিবার চেষ্টা কর।

কামান, জাহাজ ও সেনাদল লইয়া যদি পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ সারবান সাহিত্য রচনা করিতে পারিয়া থাকেন—এই সব মহানুভব দোকানী দরজী ধোপা নাপিতকে লইয়া আমরাই বা পারিব না কেন? জীবন-যুদ্ধে ইহারাই তো আমাদের কামান, জাহাজ ও সেনাদল।

আধুনিক গল্প-সাহিত্য*

বর্তমান যুগ সম্মিলনের যুগ। সাহিত্যিকগণকেও মাঝে মাঝে সম্মিলিত হইয়া সপ্রমাণ করিতে হয় যে, তাঁহারাও এ যুগের অযোগ্য নহেন। ভাবিতেছি, দেশের সমস্ত পাখি কিংবা নদীনদ যদি যুগধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্মিলিত উৎসাহে নিজেদের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতে উদ্বোধিত হইত, তাহা হইলে কি বিরাট ব্যাপারই না হইত! কিন্তু হায়, তাহা হইবার নহে—কারণ উহারা মনুষ্য নহে। মানুষই আত্মপ্রচারার্থে দল বাঁধিতে ভালবাসে। যখন ছাপাখানা হয় নাই, তখন সাহিত্যিককে আত্মপ্রচার করিবার

---

* চন্দননগর-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশনে পঠিত।

জন্য দল গঠন করিতে হইত। সাহিত্য জিনিসটা যদিও নির্জনেই বিকশিত হয়, কিন্তু বিকশিত হইবামাত্রই জনতার দিকে তাহার স্বাভাবিক গতি। স্রষ্টা আপন সৃষ্টিকে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। লুকাইয়া রাখিতে চাহে না। সেইজন্য যখন ছাপাখানার সুবিধা ছিল না তখন কবিকে দল গঠন করিতে হইত, সুবক্তা, সুগায়ক সকলেই সেখানে সাহিত্যিক-সহযোগে সানন্দে সম্মিলিত হইতেন।

এখন কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের যুগ। এখন কবি বা সাহিত্যিককে যাত্রার দল বাঁধিয়া সাহিত্য-প্রচার করিতে হয় না, মুদ্রাযন্ত্র সে ভার লইয়াছে। বর্তমানে সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে—মাসিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য নানাবিধ সাময়িক পত্রিকার মারফৎ, এবং এই সব সাময়িক পত্রিকাগুলির ক্ষুধা এত প্রচণ্ড যে ইহাদের উদরপূর্তি করিতেই সাহিত্যিকগণকে অনেক সময় দেউলিয়া হইয়া যাইতে হয় ; সম্মিলনে পাঠ করিবার উপযোগী ভাল সাহিত্যিক-রচনা সঞ্চয় করিয়া রাখা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যিক-সম্মিলনে 'সম্মিলন' জিনিসটাই মুখ্য বস্তু। এই সম্মিলনে ভাল প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি যেমন আমাদের সম্মানিত করিয়াছেন, তেমনি অসুবিধাতেও ফেলিয়াছেন। প্রথমেই সমস্যা—কি লিখি! নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের ওজন করিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

সাধারণত যে সব প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বলিয়া প্রখ্যাত, তাহা লেখা অন্তত আমার সাধ্যাতীত। 'গীতার ভাষ্য' বা 'মোগল হারেমে বৈষ্ণব প্রভাব' অথবা 'বালীদ্বীপের উদ্ভিদ' জাতীয় প্রবন্ধ লেখার মত বিদ্যা আমার নাই।

সামাজিক কোন সমস্যা লইয়া আলোচনা করিতে যাওয়া আরও বিপজ্জনক। কারণ সামাজিক সমস্যার সহিত রাজনৈতিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, এবং ইহাও আমরা সকলে জানি যে এ দেশে রাজনীতি প্রজানীতি নহে। সুতরাং সাহিত্য-সভায় ও-সব সমস্যা না উত্থাপন করাই ভাল।

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কিছু আলোচনা করিলে হয়! কারণ বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আলোচনা করাটা একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অজস্র স্তুতিবাদ করিতে করিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে কিছু কিছু কবিতা উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসার সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দেওয়াও যত সহজ, আবার বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিদেশী সাহিত্য-সমালোচকগণের নিকট ধার-করা বুলি আওড়াইয়া রবীন্দ্রনাথকে নিন্দার নিম্নতম নরকে নামাইয়া দেওয়াও তত সহজ। উপরোক্ত কোন প্রকার কার্যের জন্যই রবীন্দ্র-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। 'রবীন্দ্র-কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ' কিংবা 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা' লইয়া সহজেই একটা উচ্ছ্বাস রচনা করা যায়। করিলাম না, কারণ আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। ছাই ফেলিতে ভাঙা কুলা—'আধুনিক বাংলা-সাহিত্য যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কি! এ সম্বন্ধে যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে দুই-চারি কথা বলা প্রাসঙ্গিক।

সুতরাং লিখিতে সুরু করিলাম—

"বাঙালীর রুদ্রপরিসর জীবনের প্রতিচ্ছবিই মুখ্য ও গৌণভাবে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। এই সজ্জার অধিকাংশ উপকরণ আবার বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। শুধু আধুনিক কেন, সমগ্র বাংলা-সাহিত্যটাই একটা

সঙ্কীর্ণ সাহিত্য। বাংলা-সাহিত্যে নাম করিবার মত কয়টা বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হইয়াছে? বৃহৎ উপন্যাস বলিতে বুঝি, বৃহৎ শহরের মত সৃষ্টি। তাহাতে যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজপথ আছে, আকাশ-চুম্বী কারুকার্যখচিত প্রাসাদ আছে, প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন মন্দির মিনার আছে, সুসজ্জিত বাগান, সুনির্মল পুষ্করিণী, সুরক্ষিত প্রান্তর, সুবিন্যস্ত পণ্যাবিপণি আছে, গলিঘুঁজিও আছে—নর্দমা-নালাও আছে, ধনী আছে, ভিখারীও আছে। পুণ্যাত্মাও আছে, পাপীরও অভাব নাই। সত্য, শিব এবং সুন্দরের সহিত অসত্য, অশিব এবং অসুন্দরের নিত্য দ্বন্দ্বে তাহা স্পন্দমান। এরূপ উপন্যাস একটাও নাই। নাই, তাহার কারণ আমাদের জীবনে বৃহৎ শিক্ষা ও বৃহৎ দুঃখ এখনও আসে নাই। সুশিক্ষিত মন দুঃখের আবেষ্টনীতে পড়িলে তবে বৃহতের দর্শন পায়। আমরা এখনও সুশিক্ষিতও হই নাই এবং চরম দুঃখ এখনও আমাদের জীবনে আসে নাই।

ডস্টয়েভ্স্কি, চার্লস্ ডিকেন্স অথবা ম্যাক্সিম গোর্কির আবির্ভাবের জন্য আমাদের এখনও নিদারুণ তপস্যার প্রয়োজন আছে। শৌখিন দারিদ্র্যের অভিনয় করিয়া বৃহৎ কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। আমরা উপন্যাস বলিয়া সাধারণত যাহা পড়ি ও লিখি, তাহা বড় ছোট গল্পমাত্র। উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও বৃহত্ত্ব তাহাতে নাই।

সত্যকার ছোটগল্পও আমরা সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। ছোটগল্প-রসিক পাঠক পাঠিকা আমাদের দেশে কম। একগাদা পান্তা ভাত খাইয়া যাহার তৃপ্তি হয়, সে একটি আঙুর কিংবা একটি আপেল খাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং একগাদা পান্তা ভাতের সহিত মিশাইয়া আঙুর বা আপেলের টুকরা চালাইতে হইতেছে। তাহা ছাড়া গল্প-সাহিত্যের আর একটা দুর্দশার কারণ এ দেশে গল্প-সাহিত্যের পাঠক অপেক্ষা পাঠিকার সংখ্যাই বেশি। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা এখনও খুব উচ্চস্তরে উঠে নাই। সুতরাং বর্তমান যুগের স্বল্পশিক্ষিতা পাঠিকাগণের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও রসবোধের উপর নির্ভর করিতে গিয়া আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য অশিক্ষিত মনরোচক ও লঘু হইয়া উঠিতেছে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাই মাসিকপত্রের কাটতি দেখিয়া। যে মাসিকপত্র সর্বাপেক্ষা বেশি বিক্রয় হয়, সাহিত্যিক আদর্শ তাহাতে কতটা অনুসৃত হয়?

আর দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত সমালোচনা বলিয়া কিছু নাই। একটাও এমন নিরপেক্ষ ভাল সাহিত্যিক পত্রিকা এ দেশে নাই, যাহার সমালোচনার প্রকৃত সাহিত্যিক মূল্য আছে। সমালোচনা করিতে বসিলেই বাঙালীর পরনিন্দাপ্রবণতা বা চক্ষুলজ্জা আসিয়া সমালোচনা-সাহিত্যকে একদেশদর্শী করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের তুলনায়—"

এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলাম, এমন সময় দেখিলাম, এক জোড়া নির্মম চক্ষু নিষ্পলকভাবে আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে চাহনিতে ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটির মালিক অপর কেহ নহে—আমারই বিবেক। বিবেকের কণ্ঠস্বরও ক্রমশ শোনা গেল। শুনিলাম, বিবেক বলিতেছে—

"তুমি বিশ্বসাহিত্যের কতটুকু খবর রাখ হে বাপু? তোমার বিদ্যা তো আমার অবিদিত নাই। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধেই বা তোমার জ্ঞান কতটুকু এবং তাহা লইয়া সমালোচনা করিবার অধিকারই বা তোমাকে কে দিল? আধুনিক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ

করা কি কোন আধুনিক লেখকের পক্ষেই শোভন, না সম্ভব ? এই সব সমালোচনা করিবার অছিলায় তুমি তো সুধু নিজের ঢাকটাই পিটাইতেছ ! ভাল করিয়া ভাবিয়া বল দেখি বাপু, ইহার মূলে তোমার পরশ্রীকাতরতা ও সস্তায় নাম কিনিবার লোভ আছে কি না ?”

দমিয়া গেলাম।

লেখনী সম্বরণ করিতে হইল।

আধুনিক গল্প-সাহিত্য লইয়া আসর জমাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ওই নির্মম চক্ষুর নিষ্পলক চাহনিকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময়ে একজন অতি-আধুনিক গল্পরচয়িতা আসিয়া আমাকে সংকট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি আসিয়া অতীব আগ্রহে তাঁহার স্বরচিত একটি গল্প আমাকে শুনাইলেন। আজিকার এই সাহিত্যিক মজলিসে আমি আপনাদের সেই গল্পটি শুনাইব। গল্পটি আধুনিকতম। কোথাও এখনও ইহা প্রকাশিত হয় নাই—লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতাই রচয়িতার নাই। মুখে মুখে বলিয়া গেল।

“এক ছিল রাজা আর তার ছিল এক রাণী।

সেদিন ভোরবেলা উঠেই রাজা ছুটে বাগানে চ'লে গেল। বাগানে গিয়ে দেখলে, গাছে বেশ সুন্দর লাল লাল জবাফুল ফুটেছে। সে বাগান থেকে একটা টক্‌টকে লাল জবাফুল তুলে নিয়ে এল। ফুলটা নিয়ে এসে রাণীকে বললে—দেখেছ, কেমন সুন্দর ফুল এনেছি একটা !

রাণী বললে—বেশ সুন্দর, আমাকে দাও।

রাজা ফুলটা দিতেই রাণী দৌড়ে গিয়ে ভেতর থেকে একটা ফুলদানি নিয়ে এল। তারপর ফুলদানিতে ফুলটা রেখে রাজা-রাণী দুজনে উবু হয়ে ব'সে ফুলটাকে দেখতে লাগল। তারপর রাজা বললে—চল, ফুলটাকে টেবিলে রাখি। রাণী বললে—না, এইখানেই থাক্।

দুজনে খুব তর্ক হতে লাগল। ঝগড়া করতে করতে বেলা অনেক বেড়ে গেল।

ঠাকুর এসে বললে—রান্না হয়ে গেছে।

দুজনে তখন উঠে স্নান-টান ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে-সুরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ফুলটা মেঝেতেই প'ড়ে রইল।

ঘুম ভেঙে উঠে রাজা গেল বেড়াতে। মাঠে গিয়ে দেখে একটা শেয়াল। রাজা তাকে ধরবার জন্য ছুটল। রাজাও ছুটেছে—শেয়ালও ছুটেছে। রাজার সঙ্গে শেয়াল পারবে কেন ? রাজা এক ছুটে গিয়ে দৌড়ে শেয়ালটাকে টপ ক'রে ধ'রে ফেললে, তারপর কান ধ'রে টানতে টানতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে এল। নিয়ে এসে মস্ত একটা খাঁচার ভেতর পুরে তাকে রেখে দিলে।

রাণী এসে বললে—আহা, বেচারি যদি ম'রে যায় !

রাজা বললে—একটু দুধ দাও না ওকে।

রাণী শেয়ালটাকে একটা মাটির ভাঁড়ে ক'রে দুধ এনে দিলে। শেয়ালটা চুক্‌চুক্ ক'রে খেতে লাগল। তারপর রাজা-রাণীও খাওয়া-দাওয়া সেরে খিল বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ল। রাত হয়ে গেল।

তার পরদিন সকালে রাজা-রাণী উঠল।

রাণী চা ক'রে দিলে, রাজা খেলে।

তারপর রাজা পাড়ায় বেরুল। বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক ক্যালেণ্ডারের ছবি রাজা যোগাড় করলে। সুন্দর সুন্দর বড় বড় সব ছবি। ছবিগুলো এনে টেবিলে রেখে রাজা ছুটে বাগানে চ'লে গেল। গিয়ে অনেক জবাফুল তুলে আনলে। তারপর রাজা-রাণী দুজনে মিলে ছবি আর জবাফুল নিয়ে ঘরের সমস্ত দেওয়াল সাজাতে লেগে গেল। সাজাতে সাজাতে সন্ধে হয়ে এল। সমস্ত দিন খাওয়াই হ'ল না।

সন্ধেবেলা দুজনে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে—আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেছে।

তার পরদিন সকালবেলা উঠেই রাজা বাড়ির পেছন দিকে যে পেয়ারা গাছটা ছিল তাতে গিয়ে উঠল। একটু পরে রাণীও এসে উঠল। অনেক পেয়ারা ছিল সে গাছটাতে। দুজনে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই. খেয়েই যাচ্ছে। পেয়ারা আর ফুরোয় না। শুধু পেয়ারা নয়, পেয়ারা পাতাও চিবুতে লাগল দুজনে।

রাণীটা এমন দুষ্টু, রাজার হাতে একটা বড় ডাঁশা পেয়ারা দেখে টপ ক'রে সেটা কেড়ে নিলে। রাজা অমনই রাণীর গালে ঠাস ক'রে এক চড়। রাণীও সংগে সংগে রাজার গালে খামচে দিল। দুজনে আড়ি হ'য়ে গেল। রাণী সে গাছ থেকে নেবে গিয়ে আর একটা গাছে উঠল।

রাজা একটু পরে রাণীকে ডেকে বললে—আয় ভাই, ভাব করি।

রাণী রাজী হ'ল না!

রাজা তখন নিজের গাছ থেকে নেমে রাণীর গাছে গিয়ে উঠে রাণীকে অনেক ভাল ভাল পেয়ারা দিয়ে ভাব করলে। ভাব হবার পর দুজনে পেয়ারা গাছের ডালে ব'সে পা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেক পেয়ারা খেতে খেতে অনেকক্ষণ ধ'রে গল্প করতে লাগল। একটু পরে দুজনে গাছ থেকে নেমে এল। আসবার সময় রাজা কিছু পেয়ারা পকেটে ক'রে নিয়ে এল—নিয়ে এসে খাঁচার শেয়ালটাকে দিল। শেয়ালটাও মজা ক'রে পেয়ারা খেতে লাগল।

বিকেলবেলা রাজা বন্দুক হাতে ক'রে বেরুল। একটু পরে অনেক পাখী শিকার করে নিয়ে এল। বড় বড় সব হাঁস। রাণী নিজের হাতে মাংস রান্না করলে। রাজা বললে, চল, ছাতে ব'সে খাওয়া যাক। ছাতে ওঠবার একটা সিঁড়ি ছিল। রাজা সেটা দিয়ে না উঠে এক লাফে ছাতে গিয়ে উঠল। রাণী বাসনকোসন ব'য়ে সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে রাজা আবার এক লাফে ছাত থেকে নেমে এল। নেমে এসে মাংসের হাড়গুলো শেয়ালটাকে দিলে।"

এই পর্যন্ত বলিয়া গল্পকার চুপ করিলেন।

আমি বলিলাম, তারপর?

"তারপর রাজা একদিন একটা বাঘ ধ'রে আনলে, আর একদিন একটা টিয়াপাখি—"

তাঁহার উৎসাহ আবার সঞ্জীবিত হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, আচ্ছা, থাক্, আজ আর নয়—কাল শুনব বাকিটা।

এই গল্প বাস্তব কি অবাস্তব, সুন্দর কি কুৎসিত, ভু-ভারতে এরূপ কোন রাজকীয় দম্পতি থাকা সম্ভবপর কি না সে বিচার আপনারা করুন. বিশ্বসাহিত্যে এ গল্পের স্থান

···সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে। চতুর্দিকে ঝিল্লির ধ্বনি। একা নিজের নির্জন ঘরটিতে বসিয়া আছি। ঘরের কোণে টেবিলে বাতিটি কমানো রহিয়াছে—ঘরে স্বল্পালোকিত অন্ধকার। সট্‌কায় মৃদু মৃদু টান দিতেছি। ধূপের মৃদুগন্ধে সমস্ত ঘরটি পরিপূর্ণ। বারান্দায় খুট্‌খুট্‌ শব্দ হইল। প্রাণকান্ত আসিতেছে। সন্ধ্যাকালটা প্রাণকান্তের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিয়াই কাটে। আজ প্রতিজ্ঞাদুর্গের মধ্যে অটল হইয়া বসিয়া আছি—আর যাই করি পরচর্চা করিব না। প্রাণকান্ত আসিয়া ঘরের নির্দিষ্ট কোণটিতে লাঠিটি রাখিয়া স্মিতমুখে বলিল, আজ এত গম্ভীর বদন যে?

মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলাম, তোমার বিরহে। চা খাবে না কি? ওরে ভুতো—

ভুতো নামক ভৃত্য আবির্ভূত হইলে দুই কাপ কড়া চা ফরমাস করিলাম।

প্রাণকান্ত র‍্যাপার দিয়া পা দুইটি ঢাকিতে ঢাকিতে বলিল, ঠাণ্ডাটা আবার জমকে পড়ল।

চা আসিল।

এক চুমুক চা পান করিয়াই প্রাণকান্তের প্রাণ খুলিয়া গেল। আবেগ-তরল কণ্ঠে কহিল, আমাদের পাশের বাড়ীতে কোলকাতা থেকে এক আপ-টু-ডেট মেয়ে এসে জুটেছে ভাই—

এইটুকু বলিয়া ডিশে চা ঢালিয়া সুড়ুৎ করিয়া আরও খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

লোকটার উপর আমার ঘৃণা হইতে লাগিল এবং এইরূপ লোকের সংগলাভের জন্য লোলুপ বলিয়া নিজেকেও মনে মনে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিলাম।

বলিলাম, ওসব পরচর্চা ছাড়। এই ক'রেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল। ছাড় ওসব।

এই অপ্রত্যাশিত উক্তিতে প্রাণকান্তের শারীরিক ভারকেন্দ্রই বোধ হয় বিচলিত হইল। খানিকটা চা চল্‌কাইয়া তাহার র‍্যাপারে পড়িয়া গেল। বিস্ফারিত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি সে আমার উপর নিবদ্ধ করিল।

সন্ধেটা কাটে কি ক'রে তা হ'লে বল?

মন আমার ধর্মভাবে পরিপূর্ণ। উত্তর সহজেই দিলাম, তার জন্যে ভাবনা কি? একটা বই চেঁচিয়ে পড় না, শোনা যাক। পরচর্চা করবার দরকার কি? এই নাও।—বলিয়া নিকটস্থ শেল্‌ফ হইতে একটি পুরাতন বাঁধানো মাসিকপত্র দিলাম। সেকালের 'বঙ্গদর্শন'। ভাল জিনিস।

ওর থেকে যে কোন একটা লেখা পড় না কেন? শিক্ষাও হবে, সময়ও কাটবে।

প্রাণকান্ত নিঃশব্দে বাকি চাটুকু নিঃশেষ করিল। তাহার পর নিঃশব্দেই গোঁফটি পরিপাটিরূপে মুছিয়া পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিল এবং দিয়াশলাই-বাক্সের উপর সেটি লঘুভাবে ঠুকিতে লাগিল।

সিগারেটটি ধরাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া পরিশেষে সে বলিল, এ তো অতি উত্তম কথা। আলোটা একটু উস্‌কে দাও তা হ'লে। পুরাতন 'বঙ্গদর্শন'টি লইয়া প্রাণকান্ত আলোর নিকট সরিয়া বসিয়া বহিটি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, এইটি পড়ছি তা হ'লে শোন—বিষয়টা ভাল ব'লেই মনে হচ্ছে। 'অক্ষরের প্রকৃতি ও স্বরবর্ণোচ্চারণ'। পড়ব?

পড়।

প্রাণকান্ত পড়িতে লাগিল—

“অক্ষরের দুই অবস্থা—এক লিখিত, আর শব্দিত। সেই লিখিত ভাবকে বর্ণ এবং শব্দিত ভাবকে অক্ষর বলা যাইতে পারে। লিখিত-অবস্থাকে বর্ণ বলার কারণ এই যে, কালো কিংবা রক্তিম কিংবা অন্য কোন বর্ণ দ্বারা তাহা লিপি করিতে হয়, আর শব্দিতাবস্থাকে অক্ষর বলার কারণ এই, তাহার ক্ষয় নাই, তাহা অবিভাজ্য। অ বলিতে যে শব্দটি হয় তাহাকে বিভাগ করা যায় না। সেই প্রকারে আ, ই, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ উচ্চারণ করিলে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হয় তাহারা প্রত্যেকে অবিভাজ্য। লিখিতাবস্থাকে অক্ষর বলা যায় না, কারণ লিখিত বর্ণ অবিভাজ্য নহে, তাহা রেখাদ্বারা গঠিত, সুতরাং সেই রেখাসকলকে ইচ্ছামত বিভাগ করা যায়; কিন্তু তাহাদের শব্দিতাবস্থা বিভাজ্য নহে। অ বলিতে যে শব্দ হয়—”

বিজৃম্ভণ করিয়া বলিলাম, এটা ভারি খটমট লাগছে। অন্য আর একটা কিছু পড়।

প্রাণকান্ত বলিল, এর আগের প্রবন্ধটি হচ্ছে ‘প্রাচীন সামাজিক চিত্র,’ পরেরটি হচ্ছে ‘রাজতপস্বিনী’—দুটোই পরচর্চা। সেইজন্যে এইটে ধরেছিলাম।

আচ্ছা, পড়া থাক তা হলে। এস, অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা যাক।

সেই ভাল। কি বিষয়ে বল?

বলিয়া সে স্মিতহাস্য করিয়া বইটি মুড়িয়া রাখিয়া দিল। তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, ‘সভ্যতা বলতে তুমি কি বোঝ?’ ইহার উত্তরে প্রাণকান্ত আর একটি সিগারেট ধরাইল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া আবার আমাকেই প্রশ্ন করিতে হইল, পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ-ই বড়, না, আমাদের সনাতন প্রাচীন আদর্শ-ই বড় মনে কর তুমি? অর্থাৎ ভোগী সভ্য, না ত্যাগী সভ্য?

ইহার উত্তরে প্রাণকান্ত যাহা বলিল, তাহা বিস্ময়জনক হইলেও প্রণিধানযোগ্য। তাহার মতে উদ্ভিদগণই পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম প্রাণী। উদ্ভিদের দানের উপর নির্ভর করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জীব জীবনধারণ করিতেছে। উদ্ভিদগণই আদিমতম এবং সভ্যতম। তাহারা শিল্পী, তাহারা সাধক, তাহারা সুন্দর, অথচ তাহারা নীরব। আমাদের মত তাহারাও জীবনযুদ্ধে নিযুক্ত, কিন্তু সে যুদ্ধ তাহারা এত সুনিপুণভাবে করিতেছে যে তাহাতে কোন আকস্মিক ছন্দ-পতন নাই। তাহাদের জীবনযুদ্ধ একটি সুলিখিত কাব্যের মতই সুললিত। তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়াও প্রস্ফুট, তাহা নিষ্ঠুর হইলেও দৃষ্টিকটু নহে।

প্রাণকান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আবেগপূর্ণ ভাষায় উদ্ভিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে বক্তৃতা করিতে লাগিল, তাহা নিঃসন্দেহে উপাদেয়। আমি ইহা আরও ভালভাবে উপভোগ করিতাম; কিন্তু উদরের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। পেটটা ফাঁপিয়াছে। মধ্যাহ্নে গুরুপাকদ্রব্য কি আহার করিয়াছিলাম মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি। এমন সময় দীর্ঘ বক্তৃতান্তে প্রাণকান্ত হঠাৎ থামিল।

বলিলাম, বাঃ, বেশ বলেছ তুমি!

এটা কিন্তু পরচর্চা পরনিন্দা দুই-ই হ'ল। অন্যান্য জীবদের নিন্দে ক'রে, তবে না গাছদের বড় করলাম।—বলিয়া সে একটি উদ্গার তুলিল এবং মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, এঃ, একটা চোঁয়া ঢেঁকুর উঠল। বাড়ি ফেরা যাক।

ঘড়িতে টং টং করিয়া আটটা বাজিল।

এতক্ষণ পরে আটটা বাজল। এর মধ্যে বাড়ি ফিরে কি করবে? নাও, আর একটা কিছু পড়—শোনা যাক। থাম, আমি বেছে দিচ্ছি।

বলিয়া আবার 'বঙ্গদর্শনে'র পাতা উল্টাইতে লাগিলাম।

নাও, এইটে পড়। 'নীলাম্বরী'—একটা গল্প।

স্মিতহাস্য করিয়া প্রাণকান্ত বলিল, আমিও তো গোড়ায় 'নীলাম্বরী'র কথাই পেড়েছিলাম, তুমিই তো থামিয়ে দিলে।

কি রকম?

ওই যে বলছিলাম না আমাদের পাশের বাড়িতে কোলকাতা থেকে এক আপ-টু-ডেট মেয়ে এসেছেন। তিনিও নীলাম্বরী।

তাই নাকি? আচ্ছা, বল বল শুনি। তা না হ'লে তোমার রাত্তিরে ঘুম হবে না দেখছি।

সোৎসাহে চিৎকার করিলাম, ওরে ভুতো, তামাক দিয়ে যা—

শুরু হইয়া গেল।

রাত্রি এগারোটার সময় বাড়ি হইতে চতুর্থবার ডাকিবার পর যখন খাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম, তখন আমরা উভয়ে কলিকাতা হইতে আগত সেই নীলাম্বরী, রাধু ময়রার ভাদ্রবধূ, হরিচরণের বিবাহযোগ্যা ভগিনী, আজকালকার যুবকদের আচরণ, নিতাই ঘোষালের আঙুল-ফুলিয়া-কলা-গাছ হওয়া, গুপি ডাক্তারের চরিত্র-হীনতা, স্থানীয় অ্যামেচার নাট্যসমাজে দলাদলি এবং তাহার মূল কারণ, অনাবৃষ্টিহেতু চাষের অসুবিধা, ইটালির অতি-বাড়, জার্মেনির যুদ্ধকৌশল, চণ্ডীখুড়োর কেলেঙ্কারি—প্রভৃতি সমস্ত আলোচনা শেষ করিয়াছি।

প্রাণকান্ত বলিল, এইবার ওঠা যাক তা হ'লে। ক্ষিদেও পেয়েছে বেশ, খানিক আগে চোঁয়া ঢেঁকুর মারছিল—

আমিও সবিস্ময়ে দেখিলাম, আমারও পেটের ফাঁপ একেবারে নাই, বায়ু সরল হইয়া গিয়াছে।

আহার করিতে করিতে মনে যে দার্শনিক ধারণা হইল, তাহা সংক্ষেপত এই যে, উদ্ভিদগণ কি করে তাহা জানা নাই; কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, মানুষ পরচর্চা না করিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না,—আর কিছু না হউক তাহার পেট ফাঁপিবে।

লীগ অব নেশন্‌স্‌, পার্লামেণ্ট, কাউন্সিল, কংগ্রেস, সাহিত্য-সভা, ধর্মসভা পরচর্চা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরচর্চা করিতে গেলে কিঞ্চিৎ পরনিন্দাও অবশ্যম্ভাবী। ইহা না করিলে এই গুরুপাক সভ্যতা হজম করা কঠিন।

বাজে খরচ

একদা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হরি বসাকের পিসামহাশয় কলিকাতায় গিয়া শীত-নিবারণ-কল্পে একটি গরম জামা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেকালে পিসামহাশয়ের সৌখিন লোক বলিয়া খ্যাতি ছিল। কোট পরিধান করিয়া বাড়ি ফিরিতেই পিসামহাশয়ের বাবা পিসামহাশয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কোটটার দাম কত পড়ল?

তে—তে—তে—তের টাকা।

পিসামহাশয় তোৎলা ছিলেন।

দাম শুনিয়া পিসামহাশয়ের পিতা বিস্ময়ে অবাক। তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইলে তিনি বলিলেন, তে—রো টাকা! বলিস কি রে? তেরো টাকায় যে একটা গরু হয়!

পিসামহাশয়ও ইহার যুক্তিযুক্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, গ-গ-গ-গরু তো আর গা-গা-গায়ে দেওয়া যায় না।

পিতাপুত্রের এই উত্তর-প্রত্যুত্তরে বাল্যকালে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম এবং মনে মনে পিসামহাশয়কেই সমর্থন করিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। আমি নিজেও যৌবনকালে খুব মিতব্যয়ী ছিলাম না। বরং অমিতব্যয়ী ছিলাম বলিলে সত্যের গুরুতর অপলাপ করা হইবে না। আমার যৌবনকালের সমস্ত দুষ্কৃতিগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার মত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোক প্রতি বৎসর লক্ষ্ণৌ শহরে লোক পাঠাইত কেবলমাত্র খরমুজা আনাইবার জন্য। বালক জ্যেষ্ঠ পুত্রের আবদারে বিগলিত হইয়া একটি টাট্টু ঘোড়া যে ব্যক্তি তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল, তাহার মাসিক আয় এক শতের অধিক ছিল না—এ কথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। কারণ আমিই সেই বিগলিত ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে গোরার বাদ্য আনিয়া যিনি ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন, তিনি অপর কেহ নন—এই শর্মাই! অথচ সেই শর্মাই পৌত্রের বাজে খরচ দেখিয়া আজ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছেন এবং তারস্বরে একালের বিলাসপ্রবণতাকে গালাগালি করিতেছেন, ইহার কারণ কি?

এই দুরূহ মনোবিকলনে ব্যাপৃত ছিলাম, এমন সময় হনহন করিয়া বাচস্পতি মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়াই তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সম্মুখস্থ চৌকিটতে উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে ট্যাক হইতে একটি নস্যাধার বাহির করিয়া তাহা আস্ফালন করিতে করিতে যে কয়টি বাক্য ব্যয় করিলেন, সেগুলি বেশ উষ্ণ বলিয়াই মনে হইল।

বিশুর কাণ্ডখানা দেখ একবার দাদা। ভাল একটা নস্যদানি পাঠাতে লিখেছিলাম। এই সেই ভালর নমুনা! কুলাঙ্গার কোথাকার!

বাচস্পতি মহাশয়ের অপেক্ষা আমি বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তিনি আমাকে বরাবর 'দাদা' সম্বোধন করিয়া সুখ পাইয়া থাকেন। ইহাতে আমি আপত্তি করি নাই। কিন্তু বিশুকে কুলাঙ্গার বলিতে আমার আপত্তি আছে। বিশু বাচস্পতি মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বেশ ভাল ছেলে। এম. এ. পাস করিয়া প্রফেসারি করিতেছে। তাহাকে কুলাঙ্গার বলা চলে না।

বলিলাম, মন্দ কি নস্যদানিটা? খারাপ নয় তো।

আরে, এ রকম নস্যদানি আমার দশটা আছে। ভাল নস্যদানি একটা শখ ক'রে পাঠাতে লিখেছিলাম, ভেবেছিলাম—চন্দন কাঠের না হোক, রুপোর কাজ-টাজ করা একটা পাঠাবে। না, পাঠিয়েছে সেই মোষের শিঙের! কুলাঙ্গার কোথাকার!

বুঝিলাম, বাজে-খরচেচ্ছু বাচস্পতিকে মিতব্যয়ী বিশু অজ্ঞাতসারে আঘাত দিয়াছে।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ বাচস্পতি মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, তারা, তারা, তারা, তারা! এইবার উঠি দাদা। আজকালকার ছেলেদের নজরটা কেমন, তাই তোমাকে দেখাতে এসেছিলাম। এই দেশেই শুনি শ্রীরামচন্দ্র পিতার আদেশে বনে গিয়েছিলেন। তারা—তারা—তারা—

বাচস্পতি অপসৃত হইলেন।

কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছি, যতই বয়স বাড়িতেছে বাচস্পতি মহাশয়ের শখও ততই বাড়িতেছে। গত শীতকালে বালাপোশ মনোমত হয় নাই বলিয়া মধ্যম পুত্রের উপর তিনি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়াইতেছে যে, বৃদ্ধ বাচস্পতি ও আমার পৌত্র প্রায় সহধর্মী হইয়া উঠিয়াছেন। আমিই বা সহসা এরূপ ঝুনা হইয়া উঠিলাম কেন? আমারই বা পুত্রের সমস্ত বাজে খরচ বাঁচাইয়া দিবার জন্য এই অহেতুকী ব্যগ্রতা কেন? ঠিক অহেতুকী অবশ্য নয়,—হেতু একটা আছে। আমার বাসনা, অন্যান্য খরচ কমাইয়া বর্তমানে পশ্চিম দিকের ও উত্তর দিকের ঘর দুইখানা সর্বাগ্রে মেরামত করাইয়া ফেলা প্রয়োজন এবং তৎপরে উত্তর দিকের বারান্দা ও পূর্ব দিকের বারান্দাকে সংযুক্ত করিয়া কোণাকুণি বাহিরের দিকে একটা বারান্দা বাহির করাও আবশ্যক। বাহিরের লোক আসিলে বসিতে দিবার সুবিধা হইবে। বর্তমানে নানা প্রকার অসুবিধা ঘটিতেছে। সিনেমা দেখিয়া, উপন্যাস কিনিয়া, মধুপুরে বেড়াইতে গিয়া যে সকল বাজে খরচ হইতেছে, সেগুলি বাঁচাইয়া অনায়াসেই এই প্রয়োজনীয় কর্মগুলি সুনিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করে না।

সর্বোপরি আমার নাতিটি এই বয়সে এমনই বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা কহতব্য নয়। সুযোগ পাইলেই সমগ্র কলিকাতা শহরটাই সে কিনিয়া পকেটস্থ করিয়া ফেলিবে মনে হইতেছে। ছোকরা এই তো সবে আই. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতে শুরু করিয়াছে—আজ সকালে তাহার পকেটে দেখি চকচকে এক সিগারেট-কেস এবং তাহার ভিতর ঠাসা অত্যন্ত দামী সিগারেট। সিগারেট-কেসটি কাড়িয়া লইয়া বহু কটূক্তি করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছি।

এখন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিতেছি—তোমার এ দুর্মতি কেন? উহাদের বাজে খরচ কমাইবার জন্য তোমারই বা এত শিরঃপীড়া কিসের?

বলা বাহুল্য, প্রশ্ন কঠিন ও চিন্তাসাপেক্ষ।

সুতরাং ভুতোকে তামাক সাজিতে বলিলাম।

পূর্ণ দুইটি ঘণ্টা মাথা ঘামাইবার পর দেখিলাম যে, চিন্তা-সমুদ্র মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং তাহাতে যে শ্রেণীর তরঙ্গমালা দেখা যাইতেছে সেগুলির সংক্ষিপ্ততম বর্ণনা দিতে গেলেও 'উত্তাল' বিশেষণটি ব্যবহার করিতে হয়। ক্ষুদ্র বুদ্ধির ভেলা উত্তালোর্মিসমাকুল চিন্তা-সাগরে বিপর্যস্ত হইয়া নাস্তানাবুদ হইবার যোগাড় হইল। এমন সময় বাগানের মালী আসিয়া বলিল, বাবু, চারাগাছটাকে একটু সরিয়ে পুঁততে হবে। তা না হ'লে চারাটা মারা যাবে—

বলিলাম, চল দেখি।

গিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ আমগাছটির নীচে তাহার আঁটি হইতে উদ্ভূত যে চারাগাছটি হইয়াছে, তাহাকে সত্যই স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। কারণ, দেখিলাম, বসন্তসমাগমে বৃদ্ধ আমগাছটি নবপল্লব-মুকুলে যতটা অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে, চারাগাছটি ততটা পারে নাই। তাহাতেও দুই-চারিটা কিশলয় না গজাইয়াছে এমন নয়, কিন্তু বুড়ো গাছটার বাহুল্যের নিকট তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বৃদ্ধের আওতায় পড়িয়া এই কিশোর চারাগাছটি এমন মধুমাসেও কেমন যেন ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে।

অকস্মাৎ যেন জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল।

উন্মীলিত জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, আমি এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছি। শুধু দাঁড়াইয়া আছি নয়—যুদ্ধ করিতেছি এবং এই যুদ্ধে আমি আমার পুত্র ও পৌত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিজের ষোল আনা সুখ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য তাহাদের সুখ-সুবিধাকে লক্ষ্য করিয়া নীতিকথার গোলাগুলি ছুড়িতেছি। দেখিলাম, সকলেই নিজের সুখান্বেষণে তৎপর এবং অপরের সুখ-সুবিধার প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন অথবা কটাক্ষশীল। আমার পুত্র মধুপুরে গিয়া সুখ পাইতেছেন, আমার পৌত্র দামী সিগারেট ফুঁকিয়া সুখ পাইতেছেন এবং আমি বর্তমানে বসতবাটির জীর্ণসংস্কার করাইয়া তৃপ্তি পাইতেছি। উপরন্তু এই তৃপ্তিলাভের অন্তরায় বলিয়া এখন কন্যার বিবাহে গোরার বাদ্য আনাটা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতেছে এবং খরমুজা-ভোজনের নানাবিধ দোষ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। অর্থাৎ বর্তমানে আমার সুখ, আমার পুত্রের সুখ এবং আমার পৌত্রের সুখ পরস্পরবিরোধী। সুতরাং যুদ্ধ বাধিয়াছে। এই যুদ্ধে আমার সম্বল নীতিকথা, আমার পুত্রের সম্বল উপার্জনক্ষমতা এবং আমার পৌত্রের সম্বল সদ্যলব্ধ যৌবন।

বাচস্পতিও দেখিলাম যোদ্ধৃবেশে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। অতি অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সংসারের গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পড়ে এবং যৌবনকালেই তাঁহাকে সংসারী সাজিতে হয়। সেই যৌবনকাল হইতেই বসতবাটি-মেরামতরূপ সুখ নানা ভাবে উপভোগ করিয়া বাচস্পতি এখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—ও-সবে তাঁহার আর রুচি নাই। যে সব সুখ তিনি ভোগ করিতে পান নাই, এই বৃদ্ধবয়সে সেই সবের জন্য তিনি লালায়িত। নস্যের ডিবা ও বালাপোশ লইয়া তাই তিনি স্বপ্নরচনা করিতেছেন, এবং আত্মসুখমগ্ন বিশু জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া কুপিত বাচস্পতি শাস্ত্রীয় গোলাগুলির আঘাতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

দেখিলাম, এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমি, বাচস্পতি, আমার পুত্র, পৌত্র এবং সংসারের সকলেই আপন আপন কামনা-ট্রেঞ্চে আত্মগোপন করিয়া নানা কৌশলে পরস্পরকে কাবু করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং কালক্রমে এক ট্রেঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ট্রেঞ্চে গিয়া হাজির হইতেছি। সকলেই আমরা জিঘাংসাপরায়ণ সৈনিক। কেহ পুরাতন বন্দুক হস্তে বীরত্ব করিতেছি, কেহবা অতি-আধুনিক বোমাহস্তে গ্যাস-মাস্ক পরিধান করিয়া আস্ফালন করিতেছি।

এইটুকু যা তফাত।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই নিজের সৈনিক মূর্তি নিজের নিকট প্রকট হইতে লাগিল। ক্রমশ ইহাও উপলব্ধি করিলাম যে, বাজে খরচ জিনিসটা শুধু যে অনিবার্য তাহা নয়—অপরিহার্য। যাহাকে আমরা বাজে খরচ বলি, তাহা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ওই যে দুরন্ত শিশুটা ক্রমাগত লম্ফঝম্প করিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে, স্থূল আপাত-দৃষ্টিতে দেখিলে তাহা অপব্যয় বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু দৃষ্টি একটু সূক্ষ্ম করুন, দেখিবেন লম্ফঝম্প ব্যতিরেকে ওই শিশুর পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ অসম্ভব। খানিকটা বাজে খরচ না করিলে এই পৃথিবীতে কোন বৃহৎ ব্যাপারই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যুদ্ধের কথাই ধরা যাউক। এমন কোন যুদ্ধের নাম করিতে পারেন যাহাতে সৈন্যসামন্ত, গোলাগুলি, রসদপত্র নিক্তির ওজনে আয়োজিত হইয়াছে?

এতটুকু অপব্যয় হয় নাই ? প্রয়োজনের অধিক আয়োজন না করিলে কোন জিনিসই সুসম্পন্ন হয় না—তা সে যুদ্ধেই হউক আর উৎসবেই হউক। পঁচিশ জনকে নিমন্ত্রণ করিলে অন্ততপক্ষে পঁয়ত্রিশ জনের মত ব্যবস্থা করিতে হয়—এ কথা কে না জানে ?

আরও একটা কথা। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলি বাজে খরচ বলিয়া মনে হয়, আসলে সেগুলি মোটেই বাজে খরচ নয়। সেগুলির বিনিময়ে আমরা এমন বহু মহার্ঘ জিনিস লাভ করি, যাহার মূল্য জীবনে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আমার মত নগণ্য ব্যক্তি যে এত বিভিন্ন লোকের স্নেহলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কারণ কি আমার দিলদরিয়া মেজাজ নয় ? সারা জীবন আমি যদি হিসাব করিয়া খরচ করিতাম, ওজন করিয়া কথা বলিতাম, তাহা হইলে এক পরমকারুণিক পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ আমার দিকে ফিরিয়া চাহিত কি না সন্দেহ এবং মনুষ্যসংগবর্জিত হইয়া কেবলমাত্র পরমেশ্বরের মুখ চাহিয়া এই জটিল সামাজিক জীবন যাপন করিতে পারা আমার পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইয়া উঠিত তাহা ভাবিতে গিয়া ভীত হইয়া উঠিতেছি। লাভ আছে বই কি ! আমার বেশ মনে পড়িতেছে, জনৈক উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারিকে খরমুজা খাওয়াইয়াছিলাম বলিয়াই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ভাল চাকুরিটি জুটিয়াছে।

আমার গুণধর পৌত্রটি দামী সিগারেট খাইয়া ও বিতরণ করিয়া কোন্ সমুদ্রে কি ভাবে জাল ফেলিয়া কোন্ রত্ন আহরণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? হয়তো সে নিজেও জানে না।

এই দার্শনিক চিন্তার সূত্র ধরিয়া আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। বাজে খরচ চিরকাল করা চলে না। একদিন তাহা বন্ধ করিতেই হয়—যেদিন মৃত্যু হয় ! তৎপূর্বে যাহার যাহা খুশি করুক—এই খুশির খরস্রোতে বাধা দিতে গেলে ঐরাবতও ভাসিয়া যাইবে। সুতরাং অনর্থক নাতিটার মনোকষ্টের কারণ হই কেন ? সিগারেট-কেসটি ফিরাইয়া দিব। কিন্তু সিগারেট-কেসের দিকে চাহিয়া চক্ষু স্থির হইয়া গেল। সিগারেট-কেস খালি। অন্যমনস্ক হইয়া একটির পর একটি নিজেই সবগুলি শেষ করিয়া ফেলিয়াছি !

* * * *

গভীর রাত্রে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নাতির ঘরে প্রবেশ করিলাম এবং অতি সন্তর্পণে তাহার পকেটে সিগারেট-কেসটি সিগারেট সমেত রাখিয়া আসিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। বাজার হইতে নূতন সিগারেট কিনিয়া দিতে হইল—ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

খোশামোদ

চক্ষু দুইটির খোশামোদ করিতে হইবে। নিতান্তই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেঁক দেওয়া প্রয়োজন। ভৃত্য ভুতোকে গরম জল আনিতে বলিয়াছি, কিন্তু আধ ঘণ্টা হইয়া গেল শ্রীমানের এখনও দর্শন নাই। বুঝিতেছি, তাঁহাকেও খোশামোদ করা আবশ্যক। তাহা না করিলে·· হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহাকে বেতন দিই বই কি ! কিন্তু বেতনভুক্ ভৃত্যের নির্মম নিত্য-নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম আমার পছন্দ হয় না। আমি কর্তব্যের সংগে সামান্য একটু মমতাও

কামনা করি, এবং সেই মমতাটুকু লাভ করিতে হইলে এমন কিছু তাহাকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি যাহা বেদনাতীত, যাহা তাহার আইনসংগত প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ তাহাকেও খোশামোদ করিতে হয়। যদি তাহাকে এখন ডাকিয়া ধমকাই এবং প্রশ্ন করি যে গরম জল এখনও হইল না, তাহার উত্তরে সে এমন জটিল কিছু একটা বলিবে যে আমার আর কোন কথা চলিবে না। এমন কিছু বলিবে যাহা নিতান্ত ন্যায়সংগত ও যাহার বিরুদ্ধে কোন ভদ্রলোকের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। সে হয়তো বলিবে, গিন্নীমা কয়লার পয়সা ঠিক সময়মত দেন নাই বলিয়া কয়লা আনিতে দেরি হইয়াছে—উনান সেইজন্য এখনও ধরে নাই। স্টোভ ধরাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু স্টোভটি তো জ্বলিতেছে না। বোধ হয় সারানো দরকার -বারো আনা পয়সা চাই।

এই জাতীয় কোন একটা উক্তির দ্বারা সে আমাকে নীরব করিয়া দিবে, এবং ধমকের প্রতিশোধস্বরূপ হয়তো আরও দেরি করিতে থাকিবে।

উহাতে সুখ নাই !

ওসব না করিয়া যদি তাহার একটু খোশামোদ করি, দেখিবেন, যাদুমন্ত্রবৎ কাজ হইবে। যদি এখনই তাহাকে ডাকিয়া বলি—বাবা ভুতনাথ, তোমার দ্বিতীয় পক্ষের বউটিকে আমি রূপার পৈঁচা গড়াইয়া দিব মনস্থ করিয়াছি ; তুমি আর কালবিলম্ব করিও না, আজই নীপু স্যাকরাকে খবর দাও। অথবা, যখন সে পাশের ঘরে কাজ করিতে থাকিবে, তখন যদি তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অপর কাহারও কাছে তাহার অজস্র প্রশংসা করিতে থাকি, তাহা হইলে দেখিবেন ভুতনাথের কর্তব্যবোধ অন্য মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তখন বাড়িতে তাড়াতাড়ি গরম জল করা অসম্ভব হইলে সে পাশের বাড়ির পাচকের হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদের উনানে আমার জন্য জল গরম করিয়া আনিবে। তাহাও অসম্ভব হইলে সে অন্য উপায় উদ্ভাবন করিবে—যেমন করিয়া হউও, যত শীঘ্র সম্ভব সে গরম জল আনিয়া দিবেই। বেতনভুক্ ভুতনাথ আমার জন্য এতটা করিবে না, কিন্তু খোশামোদ-বিগলিত ভক্ত ভুতনাথ করিবে।

সেও আনন্দ পাইবে, আমিও আনন্দ পাইব !

এমন একদিন ছিল যখন খোশামোদ করাটাকে ঘৃণা করিতাম। মনে করিতাম, উহা অত্যন্ত নীচ কার্য। এখন বয়স বাড়িয়াছে, আজ বুঝিতেছি যে, খোশামোদ করাটা নীচ কার্যই হউক বা উচ্চ কার্যই হউক, উহাই জীবনের সর্বপ্রধান কার্য। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে উহাই করিতেছি এবং উপলব্ধি করিতেছি যে ঠিক স্থানটিতে ঠিক সময়ে ঠিক তৈলটি নিষেক না করিলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় এবং এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়, যাহা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। সেই 'পরিস্থিতি'র মধ্যে আর যাহাই সুলভ হউক আনন্দ বস্তুটি সুলভ নহে।

আমি আনন্দকামী। সুতরাং আমি খোশামোদ করিতে ও খোশামোদ পাইতে ভালবাসি। এ বিষয়ে আমি নিরঙ্কুশ। আমি হনুমানকে কন্দর্পকান্তি বলিয়া অভিনন্দন করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিব না যদি সে আমার কবিতাগুলির সুখ্যাতি করে। এই আনন্দটুকু লাভ করিবার জন্য কত রাসভকে সুকণ্ঠ এবং কত বানরকেই সুকান্তি বলিয়াছি তাহার আর ইয়ত্তা নাই। মিথ্যাভাষণ ? হয়তো ! মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু সুখ পাই। যে রমণীটিকে বাহুপাশে বাঁধিয়া সোহাগ করি, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে, প্রণয়-

পেলব ভাষায়, অলঙ্কৃত বন্দনা-গুঞ্জনে যাহার শ্রবণপটহ স্পন্দিত করিয়া তুলি তাহাকে আমি সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিব না। তাহার সম্বন্ধে আমার সত্য ধারণাটি চিরকাল অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইবে। মনে মনে তাহার দোষ সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও মুখে তাহাকে বলিব, তুমি অনুপমা, অনবদ্যা, অনিন্দনীয়া। তোমার সকল কর্ম শোভন, সকল যুক্তি অখণ্ডনীয়, সকল চিন্তা সারবান। তোমার পরিচয় লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি।

পরিবর্তে সেও আমার কর্ণকুহরে ওই প্রকার অসম্ভব অসত্য অত্যুক্তিপূর্ণ প্রলাপ-বচন বর্ষণ করিবে।

ফলে—উভয়ে আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিবে।

প্রথম যৌবনে কিছুই বুঝিতাম না। বুঝিতাম না যে 'খোশামোদ করাটা হীন মনোবৃত্তি', এই বুলি আওড়াইয়া আমি আমার 'অহং'টার খোশামোদই করিতাম। তখন বুঝি নাই—এখন বুঝিতেছি, এবং প্রথম যৌবনের সেই অবুঝ 'আমি'টার প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা হইতেছে। সেই উদ্ধত অশিষ্টতা সকলকে স্পষ্ট কথা শুনাইয়া সত্যভাষণের গর্বে নাক উঁচু করিয়া প্রচুর সুখ পাইত, অর্থাৎ নিজের 'অহং'টার প্রচুর খোশামোদ করিত। খোশামোদ না করিলে সুখ পাওয়া যায় ? তোষামোদ ও তুষ্টি একই ধাতুতে গড়া—এ কথা মুগ্ধবোধ খুলিলেই দেখিতে পাইবেন। শুধু একের তুষ্টি নয়, উভয়েরই তুষ্টি। সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিমল আনন্দ পাইতে হইলে তোষামোদ করিতেই হইবে—তা সে ভূতোকেই হউক, ভগবানকেই হউক, কোন নারীকেই হউক বা নিজের 'অহং'কেই হউক। খোশামোদ করিয়া পরিবর্তে খোশামোদিত হইলেই আনন্দের উৎপত্তি। সকলেই এইরূপ একটা না একটা কাহাকেও ধরিয়া আনন্দ লাভ করিতেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়—সকলে সে কথা জানেন না।

আসল গল্পটি এইবার শুনুন।

আমার চক্ষু দুইটি চটিয়া অত্যন্ত লাল হইয়া আছে এবং করকর করিতেছে। অবশ্য এ বিশ্বাস আমার আছে যে, সেঁক-রূপ খোশামোদ দিয়া তাহাদের শান্ত করিয়া ফেলিতে পারিব। খানিকক্ষণ বসিয়া নিবিষ্ট মনে গরম গরম সেঁক দিলেই উহারা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। বেচারাদের দোষ নাই, চটিবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।

নিয়তির এমনই পরিহাস যে, কালই আবার ত্রিপুরাচরণের সংগে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যদিও বর্তমান আখ্যায়িকার পক্ষে ত্রিপুরাচরণ অবান্তর, তথাপি তাহার সহিত আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা শুনিলে আমার বক্তব্য আরও সুপরিস্ফুট হইবে। ত্রিপুরাচরণকে আমি খোশামোদ করিয়া সুখ পাই। ত্রিপুরাচরণ মুসোলিনী-ভক্ত। কাল সকালে সে রুখিয়া আসিয়া উপস্থিত। সে আকারে ক্ষীণ, কিন্তু তাহার ব্যবহার ও মতামত প্রচণ্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে টেবিল চাপড়াইয়া, চীৎকার করিয়া জমাইয়া তুলিল। তাহার বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, দেশের প্রায় সকলেই গোল্লায় গিয়াছে—যে দুই-চারিজন অবশিষ্ট আছে তাহারাও গমনোন্মুখ। ইহাদের বাঁচাইতে হইলে দেশের আইন বদলানো দরকার। সে পরিবর্তিত আইনের আভাস যাহা দিল তাহা এইরূপ ঃ প্রথমেই সিনেমা ও থিয়েটারের সংস্কার প্রয়োজন। এ দেশে সিনেমা ও থিয়েটার সম্পর্কিত যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই লোমহর্ষণকর। এই সব লোমহর্ষণকর ব্যাপার

হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আইন করিয়া ইহাদের প্রত্যেককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা কর্তব্য। প্রথমে আইন করিয়া সিনেমা ও থিয়েটারের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, সমস্ত প্রযোজকদের, সমস্ত গ্রন্থকারদের, সমস্ত দর্শকদের—সকলকে তোপের মুখে দাঁড় করাইয়া দিলে তবে এ বিষয়ের একটা সুরাহা হইতে পারে, তাহার পূর্বে নয়।—এই বলিয়া টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া ত্রিপুরাচরণ তাহার বক্তব্য শেষ করিল এবং তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, তুমি কি বল ?

অসংকোচে বলিলাম, নিশ্চয়, সব মেরে ফেলা উচিত।

বন্ধু কথঞ্চিৎ শান্ত হইল।

তাহার পর বলিল, আচ্ছা, এই সাহিত্যিকগুলোকে নিয়ে কি করা যায় বল তো ? তোমার এবং আমার লেখা ছাড়া বাকি সব তো রাবিশ ! এই বাজে সাহিত্যিকগুলোকে নিয়ে কি করা উচিত ?

এ সম্বন্ধে তাহার মতামত আমার ঠিক জানা ছিল না।

দ্বিধাভরে বলিলাম, একটু ভেবে বলতে হবে—প্রায় এক জাতেরই লোক অবশ্য সব—

ত্রিপুরাচরণ ক্ষেপিয়া উঠিল।

এতে আর ভাবাভাবি কি ? ও-ব্যাটাদের সাফ ক'রে ফেলা উচিত।

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, আরে, সে কথা কে অস্বীকার করছে ! ভাবনা তার জন্য নয়। ভাবছি, ওদের গুলি করা উচিত, না শূলে দেওয়া উচিত !

ত্রিপুরা বোকা নয়।

বলিল, ঠাট্টা করছ নাকি ?

আমি গম্ভীরভাবে ভর্ৎসনামিশ্রিত অনুযোগের সুরে বলিলাম, পাগল ! এ বিষয়ে যে কোন মার্জিতরুচি লোক তোমার সঙ্গে একমত হবে। দুঃখ কি জান ভাই, আমাদের স্বাধীন দেশে জন্মানো উচিত ছিল। আমাদের কি এ দেশে মানায় ?

এমন সময় ঘড়িটা ঢং ঢং করিয়া বাজিয়া আমাকে বাঁচাইল।

ত্রিপুরা উঠিয়া পড়িল এবং বলিয়া গেল, সন্ধ্যার সময় সুবিধা হইলে আসিবে। এখন আফিসের সময় বসিয়া আড্ডা দেওয়া চলে না।

ত্রিপুরাচরণ যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পীতাম্বর খুড়ো আসিয়া হাজির। হস্তে এক নিমন্ত্রণপত্র।

পাড়ার 'বীণাপাণি-মিলন-মন্দির' অদ্য থিয়েটার করিবে।

পীতাম্বর খুড়ো, বিশু সরকার, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, দীনু বোস প্রভৃতি চাঁই চাঁই ব্যক্তিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক।

পীতাম্বর খুড়ো পত্রটি আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, যাচ্ছ তো ?

স্মিতহাস্যে কহিলাম, নিশ্চয়।

পীতাম্বর খুড়ো সোৎসাহে বলিলেন, খুব ভাল বই। ফুল রিহার্সালের দিন গেছলাম আমি। চমৎকার দাঁড় করিয়েছে। যেও—বুঝলে ? ঠিক আটটায় ড্রপ উঠবে।

হ্যাঁ, নিশ্চয় যাব।

পীতাম্বর খুড়ো চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম।

ত্রিপুরাচরণকে যাহাই বলি না কেন, আসলে আমার থিয়েটার সিনেমা দেখিতে ভালই লাগে—তা সে যত কদর্যই হউক। কদর্যতার মধ্যেও নানা রসের উপাদান পাই। তা ছাড়া পীতাম্বর খুড়োকেই বা চটাই কেন? অত আহ্লাদ করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। যাইবার প্রাক্কালে বাড়িতে বলিয়া গেলাম যে, ত্রিপুরাচরণ যদি আসে তাহাকে যেন বলা হয়—আমি পূজা করিবার জন্য শিবমন্দিরে গিয়াছি। ফিরিতে রাত হইবে। ত্রিপুরাচরণকেও অনর্থক চটাইয়া লাভ নাই।

থিয়েটারে গিয়া দেখিলাম, আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। সমস্ত হলটা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গমগম করিতেছে। পীতাম্বর খুড়ো সম্বর্ধনা করিয়া আমাকে বসাইলেন। নিজেও পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সম্মুখেই দেখিলাম দীনু বোস, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ সারি সারি বসিয়া আছেন।

আমার এক পার্শ্বে পীতাম্বর খুড়ো, অন্য পার্শ্বে বিশু সরকার।

ড্রপ আটটার সময় উঠিবার কথা—উঠিল দশটায়।

এই দুই ঘণ্টা কাল আমরা ইতিহাস চর্চা করিলাম। দীনু বোস প্রাচীন ব্যক্তি। তিনি শুনিয়াছি সেকালে 'সীতার বনবাস' নাটকে রামের ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তা ছাড়া তিনি গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তোফী প্রভৃতি মহাত্মাগণের অভিনয় বহুবার দেখিয়াছেন। সুতরাং অভিনয়-প্রসঙ্গে দুই-চারি কথা বলিবার তিনি অধিকারী। তিনি বলিলেন যে সাগরের সঙ্গে বরং গোষ্পদের তুলনা চলিতে পারে, কিন্তু উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মাগণের সহিত আধুনিক অভিনেতাদের তুলনা পর্যন্ত করিতে তিনি রাজী নহেন।

যত সব জোচ্চোর ফেরেব্‌বাজ কোথাকার—

এই বলিয়া ঘৃণিত লোচনে তিনি একটি মোটা সিগার ধরাইলেন।

পীতাম্বর খুড়ো, বিশু সরকার, দামোদর বাঁড়ুজ্জে, হারাণ পালিত সকলেই তাঁহার সহিত একমত হইলেন। আমিও হইলাম।

এই জাতীয় আলোচনায় দুইটি ঘণ্টা হাওয়ার মত উড়িয়া গেল। ড্রপ উঠিল।

নাটকটি করুণরসাত্মক।

কিন্তু দীনু বোসের কথাই ঠিক—আজকালকার ছোকরারা অভিনয়ের 'অ' পর্যন্ত জানে না। এমন করুণ নাটক অভিনয়ের দোষে হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। পুরুষমানুষেরা গোঁফ দাড়ি কামাইয়া স্ত্রীলোক সাজিয়াছে—মনে হইতেছে যেন কতকগুলা হিজড়া। যে নায়িকার প্রেমে পাগল হইয়া নায়ক শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী হইল, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে যে কোন লোক প্রথমে ভয় পাইবে এবং পরে হাসিয়া ফেলিবে।

খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

অর্থাৎ করুণরস চরম হাস্যরসে পরিণত হইয়াছে। সকলে হো-হো করিয়া কেন হাসিতেছে না লক্ষ্য করিতে গিয়া হঠাৎ সম্মুখের চেয়ারটায় নজর পড়িল। দেখিলাম, দীনু বোস হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

পার্শ্বে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, পীতাম্বর খুড়ো কোঁচার খুঁটটা চোখে দিয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। কি সর্বনাশ, অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট বিশু সরকারের চক্ষু দুটিও সজল।

এ কি হইল !

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখিলাম, চতুর্দিকে সকলেই কাঁদিতেছে। দীনু বোস তো কাঁদিয়া একেবারে কাদা হইয়া গেলেন। আমারই চোখে এক বিন্দু জল নাই, বরং আমার হাসি পাইতেছে।

অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার।

ক্রমে সকলেই দেখিলাম কাঁদিতে কাঁদিতে আমার দিকে এক-একবার আড়নয়নে চাহিয়া দেখিতেছেন ! সে চাহনির অর্থও অতিশয় প্রাঞ্জল—'লোকটা আচ্ছা পাষাণ তো ! সকলে কাঁদিয়া অস্থির হইয়া গেল, এ ব্যাটার চোখে এক ফোঁটা জল নাই !'

ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিলেই হাসি পাইতেছে, অথচ চতুর্দিকে সকলেই রুদ্যমান। মহা বিপদ,—কি করি !

এমন সময় বিপদতারণ মধুসূদন মাথায় একটি বুদ্ধি দিলেন।

পকেটে নস্য ছিল। তাহাই বাহির করিয়া নাকে দিবার ছলে চোখে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরবিগলিত ধারা।

সমস্ত রাত থিয়েটার চলিল, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমি সমস্ত রাত্রি সমানে অনর্গল চোখের জল ফেলিলাম এবং এ কথাও অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, চোখ যদিও জ্বালা করিতেছিল, অন্তরে প্রচুর আনন্দলাভ করিলাম।

দীনু বোস, দামোদর বাড়ুজ্জে, হারাণ পালিত, পীতাম্বর খুড়ো—সকলেই অশ্রুবিসর্জন ব্যাপারে আমার 'সাহিত্য' লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

এখন চক্ষু দুইটির তোয়াজ করা প্রয়োজন।

ভূতনাথ গরম জলও আনিয়া হাজির করিয়াছে।

ভূতনাথকে বলিলাম, ওরে, তোর নতুন বউকে পৈঁচে গড়িয়ে দেব ভেবেছি—নীলু স্যাকরাকে একবার খবর দে।

গরম তুলোটা সাগ্রহে নিংড়াইতে নিংড়াইতে ভূতনাথ বলিল, এখন আমার মরবার অবসর নেই, হুজুর। বাসনপত্তর কিছু মাজা হয় নি এখনও। পরে যাব কোন এক সময়ে—

সানন্দে তাহার মুখের প্রসন্নতাটুকু লক্ষ্য করিলাম।

ভূতনাথ ভক্তিভরে আমার চোখে সেঁক দিতে লাগিল।

বাল্যকালে একটা গল্পে পড়িয়াছিলাম যে, এক বৃদ্ধ সকলকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া নিজের গর্দভটি হারাইয়াছিলেন। গর্দভটি হারাইয়াছিলেন সত্য কথা,—কিন্তু তাহার পরিবর্তে যে আর একটি পরম বস্তু লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার কিছু বলেন নাই। সে বস্তুটি আনন্দ—পরম আনন্দ। যে সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেদের গোঁ-ভরে কাহারও মতামতে কর্ণপাত না করিয়া চলেন, তাঁহাদেরও আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কেমন সন্দেহ হয় যে, জীবনে সত্যকার আনন্দরস তাঁহারা হয়তো পাইলেন না—গর্দভটাকে আঁকড়াইয়াই জীবনটা তাঁহাদের কাটাইয়া দিতে হইল।

স্থূল-সূক্ষ্ম

সুপ্রসিদ্ধ সেতারী এনায়েৎ খাঁ সুরবাহারে বাগেশ্রী আলাপ করিতেছেন। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনিন্দনীয় কণ্ঠে স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিবেন, তাহার পরই স্বনামধন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বেহালা এবং তৎপরেই সুপরিচিত অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের কীর্তন হইবার কথা।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধ গুণীগণ সমবেত হইয়া রহিয়াছেন—নাম করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইঁহারা সকলেই কৃতী।

এত গুণী-সমাগম সত্ত্বেও আমরা কিন্তু নিতান্ত নির্বিকার চিত্তে অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে রহিয়াছি—কোন প্রকার উত্তেজনা নাই। ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একজন আসিলেই যথেষ্ট চাঞ্চল্য-সৃষ্টি হওয়ার কথা, কিন্তু এতগুলি বিখ্যাত গুণী একত্রিত হওয়া সত্ত্বেও কোন উৎসব নাই। কোন 'হল' পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হয় নাই—স্বাগত-সঙ্গীত গাহিবার জন্য তালিমপ্রাপ্ত বালিকাদলও দেখা যাইতেছে না। কোন জনতা নাই, অভিনন্দন নাই—কিছু না। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হইবে আমরা যেন ইঁহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছি না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা—সংক্ষেপে—নিম্নলিখিত প্রকার।

আমার বাসাবাটির ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে শ্রীহীন ক্যাম্প-চেয়ারে অর্ধমলিন লুঙ্গি পরিয়া শিথিলাঙ্গ আমি সম্মুখস্থ গড়গড়া হইতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে ধূমপান করিতেছি। পাকশালার বারান্দায় আমার গৃহিণী যুগপৎ উবু এবং হেঁট হইয়া নির্বাণোন্মুখ চুল্লীটিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে একটি দুর্দশাগ্রস্ত তালবৃন্ত সবেগে সঞ্চালন করিতেছেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ইতস্তত হুড়োহুড়ি করিতেছে। দ্বাদশ দিবস পরে এক মোট লইয়া শ্রীমতী রজকিনী দর্শন দিয়াছেন এবং এনায়েৎ খাঁকে আমল না দিয়া ভৃত্যের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে প্রফেসর এনায়েৎ খাঁর অঙ্গুলীস্পর্শে সুরবাহারের উদারা মুদারা তারায় বাগেশ্রী রাগিণী কাঁদিয়া মরিতেছে।

মানবসুলভ ঔৎসুক্য থাকিলে যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই এই প্রশ্নটি করা স্বাভাবিক—এতগুলি গুণী লোকের সম্মুখে আমি সপরিবারে এমনভাবে নিজমূর্তি ধরিয়া রহিয়াছি কেন?

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তিপিসি আসিয়া হাজির হইলেও তো আমার গৃহিণী মাথার কাপড়টা টানিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া সশ্রদ্ধভাবে আসনখানা আগাইয়া দিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া ওঠেন, এবং আমিও প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের সম্মুখেও এমন শ্লথ-মূর্তি লইয়া প্রকাশ পাইতে লজ্জাবোধ করি। অথচ প্রফেসার এনায়েৎ খাঁর মত গুণীকে আমরা এটুকু খাতিরও দেখাইতেছি না—ইহার কারণ কি?

কারণ আছে বইকি—অত্যন্ত স্থূল কারণ—

প্রফেসার এনায়েৎ খাঁ সশরীরে উপস্থিত নাই। গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজিতেছে।

সশরীরী ক্ষেন্তিপিসি অথবা প্রাণকান্ত শারীরিক দাবির জোরে যে ভাবে আমাদের নিকট হইতে খাতির আদায় করিতে পারেন—অশরীরী এনায়েৎ খাঁ বা রবীন্দ্রনাথ তাহা

করিতে অক্ষম। এনায়েৎ খাঁ বা রবীন্দ্রনাথ যদি দয়া করিয়া এ দীনের কুটিরে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আহার-নিদ্রা বিস্মৃত হইয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের অর্চনা করিতাম এবং আচারে ব্যবহারে পরিচ্ছদাদিতে সৌষ্ঠব রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মনে মনে নাস্তানাবুদ হইলেও বাহিরে হাসিমুখে থাকিতাম। কিন্তু রেকর্ডবিহারী অদেহী রবীন্দ্রনাথ, এনায়েৎ খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দে বা আলাউদ্দিন খাঁকে লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে আমরা অভ্যস্ত নহি, প্রস্তুতও নহি।

কল্পনা করিতেও ভয় হয়।

যেই রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি শুরু করিলেন অথবা এনায়েৎ খাঁ সুরবাহার ধরিলেন অমনই যদি আমাকে ছুটিয়া গিয়া চুলটা আঁচড়াইয়া, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি এবং পায়ে পাম্পশু পরিয়া আসিয়া সস্মিতমুখে ঘূর্ণ্যমান রেকর্ডখানার দিকে তাকাইয়া শ্রদ্ধাভরে ঘাড় নাড়িতে হয় তাহা হইলেই তো গিয়াছি। ইহা করা অপেক্ষা রেকর্ডগুলি চুরমার করিয়া গ্রামোফোনটি পুড়াইয়া ফেলা ঢের কম অস্বস্তিজনক।

কিন্তু এ কথাও শতবার স্বীকার্য যে ক্ষেন্তিপিসি অথবা প্রাণকান্ত অপেক্ষা এই সকল গুণীগণকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা করি এবং সৌভাগ্যক্রমে ইঁহাদের দৈহিক সান্নিধ্যলাভ করিতে পারিলে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠি। অথচ যে গুণাবলীর জন্য আমরা ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান, মাত্র সেই গুণাবলী বাহ্যত আমাদের ততটা উদ্বুদ্ধ করে না। অর্থাৎ চিন্তা করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, সাকার শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য সাকার মূর্তির প্রয়োজন। নিরাকার গুণকে আমরা যে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি তাহাও নিরাকার—তাহার বাহ্যিক কোন সাড়ম্বর প্রকাশ নাই।

দেখিতেছি, ভগবান সম্বন্ধেও যাহা—এ ক্ষেত্রেও তাহাই।

একটা সাকার মূর্তি—তাহা সে মৃন্ময় প্রতিমাই হউক, ওঁ-ই হউক, ক্রসই হউক অথবা রক্তমাংসের মানবই হউক—মনের মত একটা সাকার মূর্তি পাইলেই আমরা ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি, না করিলে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য এ সব কিছুরই প্রয়োজন নই—তন্ময় হইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই হইল।

সুতরাং চক্ষু বুজিয়াই নিরাকার এনায়েৎ-বাগেশ্রী-রসে নিমজ্জিত হইয়া গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতেছিলাম, এমন সময় কড় কড় করিয়া বাহিরের দুয়ারের কড়াটা নড়িয়া উঠিল।

'ওরে ভুতো, দেখ্ তো—বাইরে কে এসেছে—'

ভুতো চলিয়া গেল।

সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইয়াছিল, সুতরাং এনায়েৎ খাঁ বিদায় লইলেন। এইবার রবীন্দ্রনাথের পালা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে—দ্বারপ্রান্তে জনৈক সাকারের আবির্ভাব হইয়াছে। নিরাকারের অপেক্ষা সাকারের দাবি প্রবলতর।

ভুতনাথ ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটি পত্র দিল এবং বলিল, বাহিরে একটি বাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

পত্রটি প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত লিখিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পত্র।—

এই ভদ্রলোকটিকে তোমার বৈঠকখানায় বসাও। আমি একটু পরে আসিতেছি।'

ভূতোকে বলিলাম, বাবুকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসা।

উঠিতে হইল। লুঙ্গি ছাড়িয়া একটি ফরসা কাপড় এবং জামাও পরিতে হইল।

বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত জনৈক ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

নমস্কার-বিনিময়ের পর আসন গ্রহণ করিলাম। রবীন্দ্রনাথের জন্য মনটা ছটফট করিতেছিল।

ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলাম। শুনবেন গ্রামোফোন?

ভদ্রলোক শুধু একটু মুচকি হাসিলেন। বুঝিলাম, কোন আপত্তি নাই। ভূতোকে আদেশ করিলাম, ওরে, গ্রামোফোন আর রেকর্ডগুলো এইখানেই নিয়ে আয়।

ভদ্রলোক হাসিমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গ্রামোফোন আসিল।

রবীন্দ্রনাথের রেকর্ডখানা তাঁহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এইখানাই দিই কি বলেন?

তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রেকর্ডখানা দেখিয়া সস্মিতমুখে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি শুরু হইল।

আবৃত্তি শুরু হইবামাত্র ভদ্রলোকের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। এরূপ তন্ময়, তদ্গত, শ্রদ্ধাবিষ্ট মুখচ্ছবি ইতিপূর্বে আমি দেখি নাই। এই রেকর্ডখানি আমি এবং বন্ধু-বান্ধবগণ সকলেই তো বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু এই ভদ্রলোকের মুখে যে সুগভীর রস-চেতনা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এমনটি তো আমাদের কাহারও হয় নাই!

বুঝিলাম, প্রকৃতই ভক্ত লোক। ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইলাম।

সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইতেই রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি বন্ধ করিলেন।

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি নিমীলিত নয়নে মুগ্ধমুখে বসিয়া আছেন, মনে হইল যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

রেকর্ডখানা আবার দিলাম।

ভদ্রলোক নিস্পন্দ হইয়া ঠিক সেইরূপ তন্ময়ভাবে ঠায় বসিয়া রহিলেন, যেন রস-সমুদ্রে তলাইয়া যাইতেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি অতিশয় উচ্চাঙ্গের, এ সম্বন্ধে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি যে কোন লোককে এমনভাবে আবিষ্ট করিতে পারে, ইহা আমার ধারণাতীত ছিল। এরূপ ভক্ত লোক আমি এই প্রথম দেখিলাম।

আমিও রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত। কিন্তু ইঁহার ভক্তির নিকট মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল।

আবার সাড়ে তিন মিনিট শেষ হইল।

ভদ্রলোক দেখিলাম ঠিক তেমনই বসিয়া আছেন,—স্তিমিতনয়ন, ভাবগদগদ।

তৃতীয়বার রেকর্ডটি দিব কি না ভাবিতেছিলাম, এমন সময় প্রাণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, ওসব এখন বন্ধ কর, কাজের কথা হোক আগে।

বলিলাম, আহা চটো কেন। ভদ্রলোক কেমন মুগ্ধ হয়ে শুনছেন দেখ দিকি!

প্রাণকান্ত সাধারণত মুচকি হাসিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথায় তিনি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

আরে, ও শুনবে কি! ও যে বদ্ধ কালা।

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়া যেন আর একটি সত্যের সম্মুখীন হইলাম। সত্যই ইনি অতি উচ্চস্তরের সাধক, নাম শুনিয়াই সমাধিস্থ হন। মানসপটে কৌপীনধারী, সংসারবিরাগী, শ্রুত-অশ্রুত বহু সন্ন্যাসীর মূর্তি ভাসিয়া উঠিল, কেহ হিমালয়কন্দরে, কেহ নিবিড় অরণ্যে, কেহ শ্মশান বক্ষে—নামমাত্র সম্বল করিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন,—বাহ্যজ্ঞানহীন রুদ্ধ-ইন্দ্রিয় ভূমাবিলাসী!

ইনিও সেই জাতের লোক।

হেঁট হইয়া পদধূলি লইতে যাইতেছিলাম, এমন সময় চমকিত হইয়া শুনিলাম, প্রাণকান্ত বলিতেছেন—ভদ্রলোকের একটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছেন। তোমার নাতিটির সঙ্গে বিয়ে দেবে? যদি দাও ভারি উপকার হয়। আমাকে এসে ভারি ধরেছেন এঁর মা—

কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার পর বলিলাম, আচ্ছা বেশ তো। মেয়েটির কুষ্ঠিখানা একবার পাঠিয়ে দেবেন। কুষ্ঠির মিল হ'লে তারপর কথাবার্তা হবে।

দুই-চারি কথার পর ভদ্রলোককে লইয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

আমি নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—

দুই এবং দুই যোগ করিয়া চার হইল। কিন্তু খুশি হইলাম না তো! লোকটাকে ভক্ত ভাবিয়া সুখী হইয়াছিলাম, ভণ্ড ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছি। বুদ্ধির যে বিশ্লেষণী-শক্তির সূক্ষ্মবিচারে ও নৈপুণ্যে ভক্ত ভণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল, সেই শক্তি লইয়া আমি করিব কি? এই শক্তি যদি না ক্রমশ লোপ পায় তাহা হইলে তো দেখিতেছি আনন্দলোক হইতে নির্বাসন অবশ্যম্ভাবী। এত বুদ্ধি লইয়া করিব কি!

দাদু!

দেখিলাম, ছোট নাতিনীটি আসিয়াছেন।

কি দিদি?

আমাদের খেলাঘরে আজ তোমার নেমন্তন্ন। খাবে চল।

গেলাম। দেখিলাম, ধূলোর পোলাও, কাঁকরের ডালনা, খোলাম-কুচির কাবাব, কাদার মোহনভোগ সাজাইয়া শিশুর দল মহা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে।

বিশ্লেষণী-শক্তিকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া কচুপাতার আসনে সানন্দে বসিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, তোমার ভীমরতি ধরল নাকি? গ্রামোফোনটা বাইরে ফেলে এলে, দুয়ার খোলা হাঁ-হাঁ করছে—

হাসিয়া বলিলাম, ভীমরতি কবে সত্যি ধরবে বলতে পার?

চিন্তার কথা

চিন্তা করিতেছিলাম।

বিনাব্যয়ে যুগপৎ সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। অবশ্য চিন্তাটা পরকীয়া, অর্থাৎ পরের বিষয়ে হওয়া প্রয়োজন। নিজস্ব দৈনন্দিন চিন্তা

নিজস্ব স্ত্রীর মতই মোহমুক্ত। তাহাতে কোন উত্তেজনা নাই। কিন্তু নিজেকে বাদ দিয়া বিরাট বিশ্বে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া একটু চিন্তা করুন, দেখিবেন আরাম পাইবেন। বিশেষত যদি চিন্তাটি দুশ্চিন্তা হয়। ধরা যাউক আপনি সুখী লোক। আপনার চতুর্দিকে সুখ উথলিয়া উঠিতেছে, দুঃখের কোন কারণ নাই। কিন্তু এ জাতীয় একটি দুশ্চিন্তার শরণাপন্ন হউন, দেখিবেন বিচিত্র একটি অনুভূতি মনের মধ্যে আলো-ছায়ার অপূর্ব মায়ালোক সৃজন করিতেছে।

ধরুন, 'বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ গতি কি হইবে'—তামাক টানিতে টানিতে এই নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাটাই যদি করিতে থাকেন, অবিলম্বে আপনার দশদিকে অন্ধকার নামিতে থাকিবে। কিন্তু মজা এই, সেই অন্ধকারের সূচীভেদ্যতা যতই নিদারুণ হইয়া উঠিবে, অর্থাৎ যতটা ভয়াবহরূপে আপনি তাহা মানসপটে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন, তাম্রকূটধূমাচ্ছন্ন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আপনার অন্তর ততই এক বিচিত্র রসে আপ্লুত হইতে থাকিবে। সহৃদয় ব্যক্তির নিকট সে রস মিষ্ট নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। রোষ ক্ষোভ হতাশা প্রভৃতির সংমিশ্রণে তাহা নিতান্তই তিক্ত। কিন্তু এই তিক্ততারই মাদকতাশক্তি আছে। তিক্ত সুরার ন্যায় ইহা আপনাকে ক্রমশ উত্তেজিত করিতে থাকিবে, এবং এই শোচনীয় দুঃখময় চিন্তাতেও আপনি উত্তেজনাজনিত একপ্রকার সুখ-ভোগ করিতে থাকিবেন। এমন কি সমস্ত জিনিসটাকে সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিবার জন্য বারম্বার কলিকা-বদলানো আপনার প্রয়োজন হইয়া পড়িবে।

আবার ধরা যাউক, আপনি সুখী নহেন—দুঃখী। দুঃখের আপনার অন্ত নাই। অর্থ নাই, শক্তি নাই, অথচ বেকার পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, রুগ্না স্ত্রী সম্বলিত বৃহৎ পরিবার। নানারূপ অভাব-অভিযোগের তাড়নায় আপনাকে অহরহ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাতেও যদি আপনি একটু সময় করিয়া 'বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ কি হইবে'—এই বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে পারেন, দেখিবেন মনের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যাইবে। অন্তরে অননুভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিবেন। গভর্নমেণ্ট, কংগ্রেস, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি, মন্ত্রীবর্গ এবং সর্বশেষে নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া সত্যই আপনি আরাম পাইবেন। নিজেকে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত যুযুধান অভিমন্যু বলিয়া মনে হইবে, এবং অন্যায় সমরে বিধ্বস্ত হইয়াও বড় বড় বীরপুরুষগণ যে সহানুভূতিময় গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আপনিও নিজেকে সেই জাতীয় গৌরবের ন্যায্য অধিকারী মনে করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিবেন। এতদ্ব্যতীত এই সূত্রে পরিচিত অধিকতর দুঃখী অন্যান্য বাঙালীগণের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং ভবিষ্যতে বাঙালী-সন্তানগণ কিরূপে একমুঠা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে হাহাকার করিয়া বেড়াইবে, তাহা কল্পনা করিয়া আপনার স্বকীয় দুঃখটা অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। আপনি সান্ত্বনা পাইবেন, এবং হয়ত ভগবানকে ধন্যবাদও দিবেন।

সুতরাং চিন্তা করা প্রয়োজন।

এই জাতীয় চিন্তা আপনাকে পারিপার্শ্বিক 'পরিস্থিতি'র কথা ভুলাইয়া দেয়, উপরন্তু অপূর্ব আনন্দরসে নিমজ্জিত করে। কেবল বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ-বিষয়ক চিন্তাই নয়, যে কোন চিন্তাই এ বিষয়ে সমান ফলপ্রসূ। 'ভগবৎ-চিন্তা' 'ইলেক্‌শন-

চিন্তা' 'পাটের ভবিষ্যৎ-চিন্তা' 'হিন্দু-মুসলমান-চিন্তা'—ইহার যে কোন একটা ধরুন এবং খানিকক্ষণ নিবিষ্টভাবে তন্ময় হইয়া থাকুন, দেখিবেন সুরাপান না করিয়াও আপনার কান গরম হইয়া উঠিয়াছে, এবং রগের শিরাসমূহ দপদপ করিতেছে।

আমি যে চিন্তাটি করিতেছিলাম, তাহার বিষয়—বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নয়, দুর্গাপ্রতিমার ভবিষ্যৎ। সামনেই পূজা, সুতরাং চিন্তাটা জগজ্জননীকে কেন্দ্র করিয়াই শুরু হইয়া গিয়াছিল।

চিন্তাটির সূত্রপাত করিয়াছিলেন আমার গৃহিণী।

অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলাম, আমার বৃদ্ধা সেকেলে গৃহিণী স্কার্টপাড় শাড়ি ও আধুনিক ধরনের ব্লাউজ পরিধান করিয়াছেন। বিস্মিত হইলাম।

তাহার পর মনে হইল, যুগ বদলাইবে না কেন! নিজেকে দিয়াই তো বুঝিতে পারিতেছি। পূর্বে খড়ম পরিতাম, এখন স্যাণ্ডাল পরিতেছি। সেকালে আমরা গোঁফ রাখাটা পছন্দ করিতাম এবং গোঁফের ডগাটা কি ভাবে রাখিলে মানানসই হইবে তাহার চিন্তায় সারা হইতাম। একালে যুবকেরা গোঁফ কামাইয়া ফেলিয়া অথবা গোঁফের ডগা দুইটাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া আরাম পাইতেছে।

রুচি বদলাইয়াছে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। বদলানো উচিতও। এই চিন্তার সূত্র ধরিয়াই দুর্গাপ্রতিমার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছিলাম। আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম সবই তো বদলাইতেছে, প্রতিমার রূপটা তো কই বদলাইতেছে না! সেই সাবেক দশভুজা মূর্তি।

শক্তি-পূজা অবশ্য মানুষ চিরকাল করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া শক্তির প্রতীক যে প্রতিমা, তাহার রূপ যে চিরকাল একই থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কস্তাপাড় যদি স্কার্টপাড় হইতে পারে, স্যাণ্ডাল যদি খড়মের স্থান গ্রহণ করিতে পারে, কেরোসিনের ডিবরি যদি টর্চে রূপান্তরিত হয়, দুর্গাপ্রতিমা বদলাইবে না কেন?

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পুনরায় তামাক হুকুম করিলাম।

মনে হইতে লাগিল, এই প্রগতির যুগে সেকেলে ধরনের একটা একঘেয়ে প্রতিমা লইয়া পূজা করাটা নিতান্তই অক্ষমতার পরিচয়। দুই-এক স্থানে শুনিয়াছি নাকি মূর্তির ঢঙ বদলাইয়াছে, ওরিয়েণ্টালী রীতিতে গঠিত মূর্তি আমদানি হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, ইহা প্রগতির যথেষ্ট পরিচয় নয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে শক্তিপূজার প্রতীক একটা মামুলী মাটির পুতুল, এই কথা স্মরণ-মাত্রেই মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হইতে লাগিল। আধুনিকা শক্তি-প্রতিমা কিরূপ হওয়া উচিত কল্পনা করিতে লাগিলাম।

মানসপটে নিম্নবর্ণিত ছবি ফুটিতে লাগিল। মা-দুর্গা রীতিমত এরোপ্লেন-বিহারিণী-বেশে মিলিটারি কায়দায় গগল পরিধান করিয়া এরোপ্লেন হইতে সামরিক-জাহাজ-রূপ অসুরের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতেছেন। নিম্নে টর্পেডো-রূপী সিংহ অতি আধুনিক কৌশলে জাহাজটিকে আক্রমণ করিতেছে। সেনাপতি কার্তিকেয় খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট হাফ্‌-শার্ট পরিধান করিয়াছেন, বামহস্তে ধূমায়িত পাইপ, গোঁফ মিলিটারি কায়দায় ছাঁটা। ময়ূরের পরিবর্তে মিলিটারি-সরঞ্জাম-সমন্বিত ভীষণদর্শন মোটরকার। লক্ষ্মী সরস্বতীর মেয়েলী মূর্তি নাই। লক্ষ্মীর স্থানে একটি প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরির এবং সরস্বতীর স্থানে একটি প্রকাণ্ড লাইব্রেরির কংক্রিট মিনিয়েচার বিল্ডিং। গণেশ নাই। কেবল গণেশের শুঁড়টি আছে, এবং তাহাও একটি জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-মূর্তি [?] পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই

জিজ্ঞাসা-চিহ্ন-মূর্তির নিচে এক স্থানে কতকগুলি টাকা, এক স্থানে একটা মস্তিষ্কের প্রতিমূর্তি এবং আর এক স্থানে কতকগুলি রেকমেণ্ডেশন লেটার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার মর্ম আধুনিক জগতে সিদ্ধিদাতা কি—অর্থ ? মস্তিষ্ক ? সুপারিশ ? কেহ সঠিক কিছু বলিতে পারে না। সুপারিশ-পত্রগুলির নিকট একটি মূষিক ঘুরঘুর করিতেছে। ওগুলি যদি সিদ্ধির সন্ধান না দিতে পারে মূষিকটি ওগুলিকে উদরসাৎ করিবে। অর্থ ও মস্তিষ্কও সিদ্ধিদানে অকৃতকার্য হইলে তাহাদিগকে কলা দেখাইবার জন্য কলাগাছটি মজুত আছে।

সিদ্ধিদাতার সংশয়-অঙ্কুশ-মূর্তি !

অকস্মাৎ কল্পনা-স্রোত ব্যাহত হইল।

তবলা ও হার্মোনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে এক দল ছোকরা আসিয়া উপস্থিত।

ব্যাপার কি ? কি চাই ?

তাহারা সংগীত দ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।

হৃদয়ঙ্গম করিলাম, জাপান-বিধ্বস্ত চীনদেশের দুঃখে তাহারা বিগলিত এবং তাহাই সুর-লয়-তাল-সংযোগে প্রকাশ করিতেছে।

অবশেষে একটি কথা তাহারা নীরস গদ্যে নিবেদন করিল, চাঁদা চাই।

কিসের চাঁদা ?

চীনাদের জন্য জগজ্জননী দুর্গার কৃপা আকর্ষণ করিতে হইবে, এবং তজ্জন্য স্পেশাল চণ্ডীপাঠ ও স্পেশাল অঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিছু অর্থ পাইলে পুরোহিত মহাশয় তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন।

কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম।

চাঁদা লইয়া যুবকবৃন্দ চলিয়া গেলে পুনরায় দুর্গাপ্রতিমার আধুনিক রূপ বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, মন আর তেমন উৎসাহভরে সাড়া দিতেছে না। পীড়াপীড়ি করাতে হাসিয়া বলিল, দেখ, ইহা লইয়া বৃথা কেন মাথা ঘামাইয়া মরিতেছ। আমাদের যতই না কেন প্রগতি হউক, এখনও বেশ কিছুদিন মাটি ও খড় দিয়াই এ দেশে পুতুলরূপে শক্তি-প্রতিমা নির্মিত হইবে।

মনের এতাদৃশ চিন্তা-পরাঙ্মুখতা দেখিয়া বুঝিলাম, আর একবার তামাক খাওয়া প্রয়োজন। তামাক খাইলেই মন বোধ হয় আবার সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং চিন্তা করিতে থাকিবে।

সুতরাং ভুতোকে হাঁক দিলাম।

প্রাণকান্ত

আমার বিশ্বাস, প্রাণকান্ত ভুল করিতেছে।

গণেশ পপুলার লোক। জনপ্রিয় হইতে হইলে যে সকল গুণাবলী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন গণেশের সে সকল আছে। সংক্ষেপে, সে মিথ্যাবাদী, মিষ্টভাষী এবং প্রয়োজনীয়। অনর্গল মিথ্যাভাষণ সত্ত্বেও তাহার মিষ্টবচনে আমরা বিগলিত হইয়া যাই

এবং নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। গণেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলে প্রাণকান্তের পরাজয় অনিবার্য।

জনপ্রিয় বলিয়া গণেশ যে অজাতশত্রু এমন কথা বলিতেছি না। জনপ্রিয় বলিয়াই তাহার শত্রু আছে। কিন্তু এই সকল শত্রু এখনও পরোক্ষচারি। প্রকাশ্যত গণেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার মত শক্তিসংগ্রহ এখনও তাহারা করিতে পারে নাই। মনে মনে তাহারা গণেশ-চরিত্রের ছোট বড় নানা দোষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে এবং সুযোগ-সুবিধামত সেগুলিতে নানা রঙ ফলাইয়া আড়ালে ফলাও করিয়াও থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহারা প্রাণকান্তের সহযোগিতা করিবে এমন আশা করি না। মাঝে মাঝে গণেশের কথা ভাবিয়া মর্মাহত হই। লোকটা পপুলার বলিয়াই বোধ হয় তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু খুব কম। সকলেই স্বার্থের খাতিরে তাহার সহিত লৌকিক ভদ্রতা রক্ষা করে, মৌখিক বিনয় প্রকাশ করে; কিন্তু মনে মনে অধিকাংশ লোকই তাহার উপর অপ্রসন্ন। হিতৈষী বন্ধুর মত দোষ দর্শাইয়া দুই-চারিটা কথা শুনাইয়া দিবে এমন লোক গণেশের জীবনে নাই বলিলেই চলে। সকলেই তাহাকে খাতির করে, ভোট দেয়, কিন্তু ভালবাসে না। কাগজে কলমে সে জনপ্রিয়, কিন্তু কাহারও অন্তরলোকে তাহার স্থান নাই।

শুধু গণেশ নয়, পৃথিবীসুদ্ধ পপুলার লোকের এই দুর্দশা। নিখুঁত মানুষ কখনও পপুলার হইতে পারে না;—চরিত্রে, শিক্ষায়, দীক্ষায় রীতিমত ভেজাল না থাকিলে পপুলার হওয়া শক্ত। খাঁটি সোনা দৈনন্দিন ব্যবহারের পক্ষে অচল, স-খাদ গিনি সোনারই বাজারে সমধিক প্রচলন। প্রচলন বটে, কিন্তু খাদের সম্বন্ধে আমরা উদাসীন থাকি না। রীতিমত কষিয়া আমরা তাহার পরিমাণ নির্ধারণ করি এবং খাঁটি সোনার সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া অ-খাঁটি সোনাকে হীনতর স্থান দিয়া থাকি। তেমনই স-খুঁত চরিত্র লইয়া এবং স-খুঁত চরিত্রের জোরেই কোনক্রমে যেই একটি মানুষ পপুলার হইয়া উঠেন অমনই তাঁহার চারিত্রিক খুঁতগুলিও লোকচক্ষে স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হইয়া নিন্দার ন্যায্য খোরাক যোগাইতে থাকে। পপুলারিটি-গগনে ক্রমে ক্রমে মেঘ-সঞ্চার হয় এবং অকস্মাৎ হয়তো ঝঞ্ঝাবৃষ্টির সূচনাও করে।

সুতরাং বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দেখা যাইতেছে যে নির্দোষ লোক পপুলার হয় না, এবং পপুলার হইবার পরই তাহার দোষগুলিও পপুলার হইয়া পড়ে।

চন্দ্র পপুলার তাহার কলঙ্কটাও পপুলার।

সূর্য পপুলার, তাহার স্পটগুলিও ক্রমশ পপুলার হইয়া উঠিতেছে।

সুতরাং পপুলারিটিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধান করিয়া দেখা কর্তব্য যে, যে সকল চারিত্রিক ত্রুটিকে মূলধন করিয়া তিনি জনসমাজে আধিপত্য বিস্তারের আশা করিতেছেন সেই সকল ত্রুটি পরে যদি ঘরে ঘরে আলোচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিতে পারগ কি না!

যদি অপারগ হন, তাহা হইলে তাঁহার ও-পথ ত্যাগ করাই উচিত।

প্রাণকান্ত ভোট-যুদ্ধে গণেশের সহিত পারিবে কি না তাহা আলোচনা করাও এ ক্ষেত্রে আমি অপ্রাসঙ্গিক মনে করিতেছি। কারণ প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তকে যতদূর জানি তাহাতে পপুলারিটি-মার্গে স্বচ্ছন্দে চলিবার মত চলিষ্ণুতাই তাহার নাই।

সে সমালোচনা-অসহিষ্ণু। প্রায়ই সত্য কথা বলে। তাহার মনের কথার এবং মুখের কথার অসঙ্গতি খুব বেশি লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ধর্মানুমোদিত

বিবেকবাঞ্ছিত পথে চলিবার দিকেই তাহার ঝোঁক বেশি। এরূপ লোক ভোট সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে পপুলার নেতা হইয়া উঠিবে এমন আশা দুরাশা। কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের পক্ষে সূচের ছিদ্রপথ দিয়া ন্যুব্জ দেহটা পার করিয়া লওয়া সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রাণকান্তের পক্ষে পপুলার নেতা হওয়া অসম্ভব।

সুতরাং তাহাকে ও-পথে যাইতেই দিব না।

আমি গণেশকেই ভোট দিব। বন্ধু বলিয়াই প্রাণকান্তকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আগামী উনিশ তারিখে পোলিং। মাঝে আর তিনটা দিন বাকি। পোলিং-স্টেশনও আবার ভিন্ন গ্রামে। গাড়িটা বলিয়া রাখিতে হইবে। গণেশকে ভোটটা দিয়া আসিব এবং চেষ্টা করিব যাহাতে আরও সকলে গণেশকেই ভোট দেয়।

প্রাণকান্ত কোনকালে নেতা হইতে পারিবে না। মাঝ হইতে আমার সান্ধ্য আড্ডাটা মাটি হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে ভোট দিব না।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছি।

প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিল।

দুই-চারি কথার পর আমার মনোভাব প্রাণকান্তের নিকট ব্যক্ত করিলাম এবং আমার যুক্তির সারবত্তা তাহার নিকট প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইলাম। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া প্রাণকান্ত বলিল, ডাক্তার দেখাও।

মানে ?

মানে, আমার ভোটের জন্য ভাবিতেছি না। কিন্তু তোমার বক্তৃতায় স্বাস্থ্যহানির আভাস পাইতেছি। সম্ভবত মস্তিষ্কটাই বিগড়াইয়াছে। অবিলম্বে ডাক্তার দেখাও।

বলিলাম, যতই না কেন রসিকতা কর, ভোট আমি তোমায় দিব না।

তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু নিজের চিকিৎসা করাও। তোমার যখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আমরা যুক্তি অনুযায়ী সমস্ত কার্য করি, তখন তোমার মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার ঘোরতর আশঙ্কা হইতেছে।

অর্থাৎ তুমি কি বলিতে চাও যে, কোন কার্যই আমরা যুক্তি অনুযায়ী করি না ?

আমরা সকল কার্যই খুশি অনুযায়ী করি এবং সংস্কারমুগ্ধ স্বকীয় বিবেকের নিকট এবং আর পাঁচজনের নিকট সাফাই গাহিবার জন্য পরে একটা যুক্তি খাড়া করি—বিচারালয়ে বিচারপতি ও জুরির নিকট সাফাই গাহিবার জন্য উকিল খাড়া করার মত।

বুঝিতে পারিলাম না।

অগ্রে ভুতোকে ডাকিয়া চা ও তামাকু দিতে বল। মনে হইতেছে, অনেকক্ষণ ধূমপান কর নাই।

ভুতোকে হাঁক দিলাম। যথাসময়ে চা ও তামাক আসিল। উভয়ে নীরবেই চা ও ধূমপান করিলাম।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রাণকান্ত আবার বলিল, চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, জীবনে যে সকল কার্য করিয়া প্রকৃত আনন্দলাভ করিয়াছ সেগুলির প্রেরণা কে যোগাইয়াছে ? যুক্তি, না, খুশি ? হাঁ, ভাল কথা, তোমার গৃহিণীর দুলজোড়া স্যাকরা দিয়া গিয়াছে, এই নাও।

দুলের বাক্সটি লইয়া টেবিলে রাখিলাম।

কয়েকদিন পূর্বে প্রাণকান্তের গৃহিণীর নূতন কর্ণভূষণদ্বয় আমার গৃহিণীকেও স্বকর্ণ অনুরূপভাবে অলঙ্কৃত করিতে প্রবুদ্ধ করে। প্রবুদ্ধ গৃহিণীর বাসনা-পূরণার্থে

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। কারণ যে আদর্শ আমার গৃহিণীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সে আদর্শ প্রাণকান্তের স্ত্রীর কর্ণেই দোদুল্যমান। সুতরাং প্রাণকান্তকেই গহনাটি গড়াইবার ভার দিয়াছিলাম।

এই সামান্য ঘটনাটিই এখন অসামান্যতা লাভ করিল। প্রাণকান্ত বলিতে লাগিল, স্ত্রীকে অলংকার গড়াইয়া দিবার স্বপক্ষে তোমার কি যুক্তি আছে বলিতে পার ? স্ত্রীলোক অলংকার পরিধান করে পুরুষের মনোহরণ করিবার জন্য। আশা করি, তোমার স্ত্রীর সজ্ঞানভাবে অন্য পুরুষের প্রতি লক্ষ্য নাই। ধরিয়া লইতেছি, তুমিই তাহার লক্ষ্যস্থল। তোমার মনোহরণ করার জন্য তোমার স্ত্রীর কি আর অলংকার পরার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে কর ? প্রয়োজন থাকিলেও সে অলংকার তোমাকেই যোগাইতে হইবে, এতদপেক্ষা অধিক হাস্যকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? ইহার সরল অর্থ কি ইহাই দাঁড়ায় না—গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া মনোহরণ করিবার জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি সব আনিয়া দিলাম, মন উন্মুক্ত করিয়া বসিলাম, এইবার নাও, আমার মনটি হরণ কর ? যেন বঁড়শিবিদ্ধ শফরী ছিপধারী মৎস্য -শিকারীকে সটোপ আর একটি বঁড়শি কিনিয়া দিয়া বলিতেছে, এইটিও বাগাইয়া একবার ফেল তো বাপু, গিলিয়া ধন্য হই।

প্রাণকান্ত ক্ষেপিলে প্রাণান্তকর ব্যাপার ঘটে।

ক্ষিপ্ত প্রাণকান্তের সহিত তর্ক করা অপেক্ষা তাহাকে একটা ভোট দেওয়া ঢের সহজ। সুতরাং বলিলাম, যাক, আর কথা বাড়াইয়া দরকার নাই, ভোট তোমাকেই দিব।

তোমার সুমতি দেখিয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভোটিং শেষ হইয়া গিয়াছে, তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না !

সে কি ! পোলিং শুনিয়াছিলাম উনিশে, আজ তো মাত্র পনরই !

তুমি বাংলা তারিখ বলিতেছ, পোলিং হইয়া গিয়াছে গত ইংরাজী মাসের উনিশে।

আকাশ হইতে পড়িলাম।

ফলাফল কি হইল ?

হারিয়াছি, এক ভোটের জন্য।

আমার কাছে একটা লোক পাঠাইলেই পারিতে।

আমি কাহারও কাছে লোক পাঠাই নাই। ভোটে হারিয়াছি বটে, কিন্তু বাজি জিতিয়াছি। হরেনের সহিত বাজি রাখিয়া আমি ভোট-যুদ্ধে নামিয়াছিলাম। হরেন বলিয়াছিল, আমি জিতিবই ; আমি বলিয়াছিলাম, হারিবই। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে হরেনই আমার হইয়া ক্যান্‌ভাসিং করিয়াছে, আমি কিছুই করি নাই। যখন পোলিং হইতেছিল, তখন আমি চকদিঘিতে মাছ ধরিতেছিলাম। সেই বাজির টাকা দিয়াই তোমার গৃহিণীকে দুলজোড়া গড়াইয়া দিলাম। তোমাকে ইহার মূল্য দিতে হইবে না। এখন দেখ, দুলজোড়া শ্রীমতীর পছন্দ হইবে কি না !

খুলিয়া দেখিলাম। অপরূপ !

আবার আকাশে ফিরিয়া গেলাম।

শিশু

শিশুকে এত ভাল লাগে কেন ?

আমার নবাগত দৌহিত্রটি সম্প্রতি আমার মনে এই চিন্তাটি উদ্রিক্ত করিয়াছে। পাঁচ বৎসরের শিশু, কিন্তু তাহাকে লইয়াই সমস্ত দিন মাতিয়া আছি ; অন্য কিছু করিবার আর অবসর নাই। কখনও তাহাকে কাগজের নৌকা বানাইয়া দিতেছি, কখনও জাহাজ, কখনও দোয়াত, কখনও ঘুড়ি। শুধু তাই নয়, তাহাকে আমার গৃহিণীর কল্পিত প্রণয়ী ধরিয়া লইয়া তাহার সহিত নানারূপ ছদ্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বালকটি শিষ্ট নহে, শান্ত তো নহেই।

ইতিমধ্যেই সে আমার হুঁকা উল্টাইয়াছে, কলিকা ভাঙিয়াছে, চশমার খাপটি বারম্বার খুলিয়া চশমাটি অধিকার করিতে চাহিতেছে। ধূলিধূসরিত দেহ লইয়া ক্রমাগত আমার ঘাড়ে পিঠে পড়িতেছে। বালাপোশখানার দফা রফা হইয়া গেল।

তথাপি কিছুতেই তাহার উপর চটিতে পারিতেছি না। মাঝে মাঝে দুই-একবার ধমক দিতেছি বটে, কিন্তু সে ধমকের অন্তঃসার-শূন্যতা অবিলম্বেই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। দুষ্টটা হাসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসিতেছি।

খবরের কাগজটা আসিবামাত্রই সে দখল করিয়াছে, খানিকটা ছিঁড়িয়াছে এবং খবরের কাগজের প্রত্যেক ছবিটির বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে যাহা হউক একটা উত্তর দিয়া স্তোক দিতেছি বটে, কিন্তু নিজের অজ্ঞতায় ও অক্ষমতায় মনে মনে লজ্জিত হইতেছি। ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন, সরল শিশুর সরল প্রশ্নগুলি কি ভীষণ সরল !

দাদু, খবরের কাগজে কি লেখা থাকে ?

খবর।

খবর কি ?

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইল। সুতরাং বলিলাম, নানা দেশের সব গল্প লেখা আছে ওতে। দাও, রেখে দিই, নষ্ট করতে নেই।

গল্প বল না দাদু, একটা ওর থেকে। দেখ, দেখ, ওটা কি দেখ !

দেখিলাম একটা টিকটিকি একটা পতঙ্গকে ধরিয়াছে।

মুমূর্ষু পতঙ্গটা ছটফট করিতেছে।

উত্তেজিত বালক খবরের কাগজ ফেলিয়া বালিশটার উপর দাঁড়াইয়া উঠিল।

বলিলাম, টিকটিকি ফড়িং ধরে খাচ্ছে।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে শিশু কিছুক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, টিকটিকি দুধ খায় না বুঝি ?

না।

ভাত ?

না। ভাত কে রেঁধে দেবে বল ওকে ?

ওর বুঝি মা নেই ?

বিপদ আসন্ন বুঝিয়া কৌশলে বিষয়ান্তরে উপনীত হইলাম।

বালিশ থেকে নেমে দাঁড়াও, তোমার মা দেখতে পেলে বকবে।

বালিশে দাঁড়ালে মা বকে কেন দাদু, তুমি তো বকো না ?

এই উক্তির পর বালিশ পদদলিত করার জন্য তিরস্কারবাণী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তাহার জননীর অযৌক্তিক ক্রোধের দোহাই দিয়াই বালিশটি রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলাম।

তোমার মা যে ভয়ঙ্কর রাগী। দেখতে পেলে তোমাকেও বকবে, আমাকেও বকবে। বালিশ থেকে নাব।

মা তো এখন রান্নাঘরে।—এই বলিয়া দুর্বৃত্তটা একটি পদ বালিশে রাখিয়া অন্য পদটি টেবিলে স্থাপন করিল। উদ্দেশ্য—টিকটিকিকে পর্যবেক্ষণ করা।

বুঝিলাম, টেবিলস্থিত দোয়াতের অবস্থা আশংকাজনক। কালি তো পড়িবেই, দোয়াতটাও না ভাঙে !

সুতরাং ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের গল্প ফাঁদিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইলাম।

এই ভাবে সমস্ত দিন চলিতেছে।

কিছুতেই ছোকরাকে বাগাইতে পারিতেছি না, এবং পারিতেছি না বলিয়া মনে কোন প্রকার ক্ষোভও হইতেছে না। উপরন্তু খুশিই হইতেছি।

কিন্তু, কেন ?

একা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি।

বাহিরের ঘরটাতে আমি একাই শয়ন করি। এতক্ষণ সে আমার কাছেই ছিল, এইমাত্র তাহার মা আসিয়া খাইবার জন্য তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। সে যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, সে রাত্রে আমার নিকটেই শয়ন করিবে এবং ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের উপাখ্যানটি শেষ পর্যন্ত শুনিবে। বলা বাহুল্য, আমার ইহাতে আপত্তি নাই ! কিন্তু তাহার মায়ের দেখিলাম ঘোরতর আপত্তি রহিয়াছে। আসলে ছেলেটিকে কাছে না লইয়া শুইলে তাহার ঘুম হয় না, কিন্তু সে কারণ দর্শাইল অন্যরূপ। বলিল, বালকটি ঘুমের ঘোরে এমন ঘুরপাক খায় যে, তাহাকে কাছে লইয়া শুইলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

আমি কুম্ভকর্ণ নহি, তথাপি কিন্তু ভীত হইলাম না। নাতিও আমার কানে কানে চুপি চুপি বলিয়া গেল যে সে ঠিক আসিবে, আমি যেন কপাটটা খুলিয়া রাখি।

খুলিয়া রাখিয়াছি, এবং শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছি, শিশুকে এত ভাল লাগে কেন ?

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিতে বাধ্য যে, শিশুমাত্রেই বর্বর—অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু। আমরা অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু-প্রকৃতির প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে তো সহ্য করি না। শুধু যে সহ্য করি না তাহা নয়, এই সকল অমার্জিত অসভ্য নগ্ন পশু-প্রকৃতিকে দমন করিবার জন্য আমরা অর্থাৎ সুসভ্য মানবসমাজ যুগে যুগে নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। আইন, আদালত, জেলখানা, ফাঁসিকাঠ, শাস্ত্র, বচন, উপদেশ, নীতিকথা, নরক-ভীতি ইহাদের প্রত্যেকটিই পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে এই পশু-প্রকৃতি দমনার্থেই ব্যবহৃত হইতেছে। মানব-মনের ও

মানব-সভ্যতার একটা প্রধান দিকই এই সব লইয়া ব্যাপৃত। অথচ শিশুর মধ্যে সেই বর্বরতাই আমাদিগকে আনন্দ দান করে।

কেন ?

লেপটা মুড়ি দিয়া তামাক টানিতে টানিতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম তাহা এই যে, শিশুরা অসহায় বলিয়াই বোধ হয় তাহাদের প্রতি সভ্য মানবমাত্রেরই একটা সহজ অনুকম্পা আছে এবং এই অনুকম্পাই ক্রমশ অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। শুধু শিশুকে নয়, আমরা নারীকেও যে ভালবাসি এবং তাহাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি, তাহারও মূল কারণ বোধ হয় তাহাদের অসহায় অবস্থা। অসহায় এবং অক্ষমকে ভালবাসিয়া, রক্ষা করিয়া, সম্মান করিয়া সভ্য পুরুষ নিজের পৌরুষকেই সার্থক করে। শিশু ও নারী যদি দুর্বল না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাদের নানাবিধ অযৌক্তিক অত্যাচার সহ্য করিতাম না। নারী পুরুষ হইলে, শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে আর আমাদের মনোহরণ করিতে পারে না। তাহাদের অক্ষমতাই তাহাদের অস্ত্র।

সুতরাং বিশ্লেষণ করিলে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, অসহায় বলিয়াই আমরা তাহাদের সহায় এবং অসহায়ের প্রতি স্নেহশীল হওয়াটা সমর্থ পুরুষের অপরিহার্য মনোবৃত্তি।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি মনে নাই।

রাত্রে মনে হইল, আমার দৌহিত্রপ্রবর আসিয়া ঢুকিয়াছেন। পাশ-বালিশটার ও-ধারে গুটি মারিয়া চুপ করিয়া শুইয়া আছেন এবং সম্ভবত মায়ের ভয়েই নীরব আছেন। মা টের পাইলে এখনই তুলিয়া লইয়া যাইবে। আমারও ঘুম ধরিয়াছিল, আমিও আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করিলাম না। লেপটা ও-ধারে আর একটু প্রসারিত করিয়া দিলাম।

ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

ভাবিলাম, দস্যুটাকে এইবার জাগানো যাক। ভ্রমরবেশী রাজপুত্রের গল্পটাও এই অবসরে শেষ করিয়া ফেলি। তাহা না হইলে সমস্ত দিন আমার পরিত্রাণ নাই।

বলিলাম, ওঠ হে! ভ্রমরবেশী রাজপুত্র টুকটুকে লাল ডালিম ফুলে ফুলে গুনগুন ক'রে বেড়াচ্ছে যে! ভোর হ'ল—

ভায়ার সাড়া-শব্দ নাই।

কই হে, সাড়া-শব্দ নেই যে!

ভায়া নীরব।

ভাবিলাম, লেপটা তুলিয়া দিয়া একটু স্থূলগোছের রসিকতা না করিলে ভায়ার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না।

লেপটা তুলিয়া দিলাম।

লেপ তুলিয়াই কিন্তু খড়ম তুলিতে হইল।

নাতি নয়, একটা লোম-ওঠা কুকুর। সমস্ত রাত এক লেপের তলায় আমার সঙ্গে শুইয়া ছিল!

কপাট খোলা ছিল, চুপচাপ কখন ঢুকিয়াছে।

* * *

খড়মটা বোধ হয় জোরেই লাগিয়াছিল।

কুকুরটা বাহিরে একটানা চিৎকার করিয়া চলিয়াছে— অসহায় আর্ত ক্রন্দন।

মনে হইল, যেন আমার গত রাত্রির থিয়োরিটাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দুর্গা, শ্রীহরি!

একটু পরেই বন্ধু ত্রিপুরাচরণ আসিয়া দর্শন দিলেন।

ত্রিপুরাচরণ মুসোলিনি-ভক্ত। সুতরাং দুই-চারি কথার পর আস্ফালন-সহকারে তিনি মুসোলিনির গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে লাগিলেন। শুনিয়া যাইতে লাগিলাম—বস্তুত না শুনিয়া উপায় ছিল না। মুসোলিনির চরিত্র-বলিষ্ঠতার ও বীরত্বের নানা কাহিনী শেষ করিয়া ত্রিপুরাচরণ বিদায় লইলে আমার মনে এই প্রশ্নের আর একটা দিক প্রকট হইল। মনে হইল, এই সব প্রবল প্রতাপশালী ডিক্টেটরগণও তো এক হিসাবে কম বর্বর নহেন, ইহাদিগকে অসহায়ও বলা চলে না। অথচ সভ্য সমাজ তো ইহাদের স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতেছে। শুধু সহ্য করিতেছে নয়, সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় গলিয়া পড়িতেছে।

কেন?

প্রকৃষ্টরূপে চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে শেষে উপনীত হইতে বাধ্য হইলাম : যে যে কারণে আমরা প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়কে সহ্য করি, মৃত্যুকে সহ্য করি—শুধু সহ্য করি নয়, তাহাদের কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কবিত্ব করি এবং তাহাদের আবির্ভাবের হেতু ও যৌক্তিকতার মূল কারণ নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া অবশেষে অজ্ঞাত ভগবৎ শক্তির আশ্রয় লই, ঠিক সেই কারণেই আমরা শিশু, নারী ও মুসোলিনিকে সহ্য করি এবং উহাদের লীলা দেখিয়া আনন্দিত হই।

অর্থাৎ গত্যন্তর নাই।

উহারা অসহায় নহে—আমরাই অসহায়। উহাদের স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্রাণশক্তিকে রোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই এবং নাই বলিয়াই উহাদের নানা উপদ্রবের মধ্যে একটা সৌন্দর্য, একটা লীলা আবিষ্কার করিয়া আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজেদের অক্ষমতা-জনিত লজ্জাকে চাপা দিয়া জ্ঞাতসারে পুলকিত হইয়া উঠি। অমোঘ অদম্য শক্তির নিকট নতি-স্বীকার-জনিত গ্লানিকে আমরা লীলাদর্শনের আনন্দে মুছিয়া ফেলিতে চাই।

লোম-ওঠা কুকুরকে খড়ম মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু শিশুকে—বিশেষ করিয়া দৌহিত্রকে, প্রেয়সীকে অথবা ডিক্টেটরগণকে অত সহজে বিদায় করা চলে না। বস্তুত, তাহা অসম্ভব—আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং তাহাদের আমরা স্নেহ করি, ভালবাসি, পূজা করি।

তুমি কেন কাল আমাকে নিয়ে শোও নি?

এক পা ধুলো লইয়া ও হাতে গুড় মাখিয়া দৌহিত্র আসিয়া বিছানায় উঠিল।

সহাস্য মুখে তাহাকে সম্বর্ধনা করিলাম।

দামোদর

কয়েক দিন অত্যন্ত সশঙ্কিত অবস্থায় কাটিয়াছে।

এখন শঙ্কা অপনোদিত হইয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা দার্শনিক চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে। ঘটিয়া যাইবার পর অধিকাংশ ভয়ংকর ব্যাপারই দার্শনিকতার খোরাক যোগাইয়া থাকে, সেদিন যেমন ঘটিল। নিতাইবাবু ধার-কর্জ করিয়া অনেক কষ্টে

ছেলেটিকে মানুষ করিতেছিলেন। ছেলেটিও ভাল—যেমন দেখিতে, তেমনই পড়াশোনায়। বলা নাই, কহা নাই, অকস্মাৎ ছেলেটির হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া গেল এবং ছেলেটি মারা গেল। আমরা ইহা লইয়া সকলেই পরিতাপ করিতেছিলাম, এমন সময় নিতাইবাবু নিজেই আসিয়া আমাদের প্রবোধ দিলেন। বলিলেন যে, ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা; করুণাময় ভগবান একে একে তাঁহার বন্ধনগুলি মোচন করিতেছেন ; ইহাতে বিচলিত হইলে চলিবে কেন ? গত বৎসর স্ত্রী গিয়াছে, এ বৎসর ছেলেটি গেল। বাকি আছে ছোট একটা মেয়ে ; কিন্তু তাহারও শরীরের যা অবস্থা—প্রত্যহই জ্বর হইতেছে, সুতরাং হয়তো শীঘ্রই তাহাকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত হইতে হইবে।

এই বলিয়া নিতাইবাবু একটু হাসিলেন। যদিও তাঁহার এই মলিন হাসিটুকু ক্রন্দন অপেক্ষাও অধিক মর্মান্তিক, তথাপি ইহা বেশ প্রতীয়মান হইল যে, একটা দার্শনিক প্রশান্তি আসিয়া তাঁহার শোককে স্নিগ্ধ করিয়াছে। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, দার্শনিক চিন্তা শুধু যে আমাদের জীবনে অনিবার্য তাহা নয়, ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট। সংসারটাকে যদি মরুভূমির সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দার্শনিক চিন্তাগুলিকে 'ওয়েসিস' বলিতে হয়। কারণ দেখিতেছি, এই সংসারে উহাদেরই আশ্রয়ে খানিকটা শান্তিলাভ করা সম্ভব। এই মরুভূমিতে উহাদেরই উদ্দেশ্যে মানুষ, উট—সকলেই ছুটিতেছে। জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনারই একটা না একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা খাড়া না করিলে আমাদের যেন নিদ্রাই হয় না।

এইবার যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

আসল কথাটা বলিতে গিয়া অনেক অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু অবান্তর-কথা-প্রসংগে আর একটি অবান্তর কথা লেখনীমুখে আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা এই যে, শাখা-প্রশাখা না থাকিলে বৃক্ষ নদী (বা সম্মিলন) যেমন সার্থকতা লাভ করে না, প্রসংগত কয়েকটি অবান্তর কথার উল্লেখ না করিলেও তেমনিই কোন প্রসংগই জমে না। প্রজাবৃদ্ধি ব্যাপারে ঢাক ঢোল শানাই পুরোহিত কতকগুলি মন্ত্র (অর্থাৎ বিবাহ অনুষ্ঠানটাই) অবান্তর এবং বিবাহ ব্যাপারেও বরযাত্রী-কন্যাযাত্রীর দল নিরর্থক। কিন্তু মানুষের স্বভাবই এই যে, প্রজা-বৃদ্ধিমানসে সে ঢাক ঢোল সানাই বাজাইয়া বিবাহ করিবে, এবং বিবাহ করিতে গিয়া একদল বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী জুটাইবে ; অবান্তর হইলেও এ সব অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

আর নয়, এইবার আসল প্রসংগে আসা যাক।

কয়েক দিন অত্যন্ত সশংকিত অবস্থায় ছিলাম। এই জাতীয় শংকা বাল্যকালের পরীক্ষার পূর্বে অনুভব করিতাম। মনে হইত, কাল প্রশ্নপত্রে কি বিভীষিকাই না জানি দেখিব! পরীক্ষাসাগরে অনেক নাকানি-চুবানি খাইয়া তরী বহুকাল পূর্বে তীরে ভিড়াইয়াছি, পরীক্ষিত বিষয়গুলির একটি বর্ণও এখন আর মনে নাই ; কিন্তু পরীক্ষাটা যে সত্য সত্যই পরীক্ষা ছিল তাহা এখনও মনে রীতিমত জাগরূক আছে। সে ভীতি বিস্মৃতির তলায় এখনও তলাইয়া যায় নাই। সেদিনও তৎসম ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, যখন ডাকযোগে একখানি পত্র আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিয়া গেল যে, দামোদরবাবু আসিতেছেন।

সর্বনাশ!

স্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া গেটে থামিল।

কৃষ্ণকায়, বেঁটে, মোটা, ঘাড়ে-গর্দানে এক ব্যক্তি গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন দেখিলাম। টাক ও টিকি রহিয়াছে; সুতরাং উনিই নিঃসন্দেহে দামোদরবাবু। ভদ্রলোকের রক্তাভ চক্ষু দুইটি এত বড় যে, মনে হয় যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। মুখখানি গোলাকার, রোমহীন। কাঁচাপাকা একজোড়া পুষ্ট ভ্রূ আছে। গলাবন্ধ জিনের কোট পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। কণ্ঠলগ্ন তুলসীর মালাটিও দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সম্বন্ধে এতকাল যাহা শুনিয়াছি তাহার সমলকত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই।

তিনি নিকটে আসিতেই আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তাঁহার প্যানেলা জুতা হইতে কিঞ্চিৎ ধূলি লইয়া শিরোধার্য করিয়া ফেলিলাম।

গুরুজন!

বয়সে কিন্তু আমার অপেক্ষা প্রবীণতর বলিয়া তাঁহাকে মনে হইল না। দামোদরবাবু সস্মিত মুখে বলিলেন, থাক্ থাক্, বড় আনন্দিত হলাম বাবা, তোমাদের সব দেখে। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও সব। নিজেদের লোক, অথচ চাক্ষুষ পরিচয় নেই। কার্য-কারণের যোগাযোগ না ঘটলে হয়তো দেখাই হ'ত না। ব'স ব'স, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'স।

অনুমতি পাইয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

দামোদরবাবুও বসিলেন।

দুই-চারি কথার পর তিনি বলিলেন, আমায় নিরিবিলি দেখে একটা ঘর দিতে হবে বাবা, বাইরের দিকে হ'লেই ভাল হয়, পুজো-আচ্চা সাধন-ভাজন নিয়ে থাকি আমি—

সৌভাগ্যক্রমে বাহিরের দিকে একটি ঘর খালি ছিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই তিনি নিজের জিনিসপত্রসহ সেই ঘরেই গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমি সম্ভ্রমসহকারে সমস্ত দিনটা দূরে দূরেই কাটাইলাম।

ভদ্রতা রক্ষার নিমিত্ত একবার তাঁহার ঘরটিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দামোদরবাবু বলিলেন (এবং তাঁহার ঢুলু ঢুলু চক্ষু দুইটি দেখিয়া বুঝিলাম), ট্রেনে সমস্ত রাত চোখের পাতা এক করতে পারি নি। চারটি খেয়ে ঘুমুতে হবে, স্নানটা সেরে ফেলা যাক; সন্ধ্যাবেলা সব কথা হবে।

স্নানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

শুনিলাম, স্নানান্তে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া আহ্নিকাদি করিয়াছেন। এই বার্তায় গৃহিণী গদগদ হইয়া গঙ্গাজলে তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি পাক করাইলেন, এবং সিন্দুক খুলিয়া শ্বেত পাথরের থালা বাটি গ্লাস বাহির করিয়া গঙ্গোদকে সেগুলিকে পরিমার্জিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, আমাদের ম্লেচ্ছস্পর্শদুষ্ট তৈজসপত্রে দামোদরবাবুর মত নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণকে খাইতে দিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আমিও সে কথার সমর্থন করিলাম।

গৃহিণীর ধর্মানুমোদিত ব্যবস্থায় ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বাবধানে আহারাদিও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দামোদরবাবু আতপ-তণ্ডুল, গব্য-ঘৃত এবং নিরামিষ আহার করিয়া হরীতকী চিবাইতে চিবাইতে নির্দিষ্ট বাহিরের ঘরটিতে চলিয়া গেলেন এবং সমস্ত দিন আপন মহিমা লইয়া উক্ত ঘরটিতেই নিবন্ধ রহিলেন।

অর্থাৎ দিনটা একরূপ ভালয় ভালয় কাটিল !

সন্ধ্যা হইল ।

পৌত্রের নিকট খবর পাইলাম, দামোদরবাবু নাকি মহাসমারোহে সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। ভৃত্য ভুতনাথ জলখাবার লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পূজারত দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ।

দারুণ ব্যাপার !

আর একটু পরে খবর লইয়া জানিলাম, তিনি সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়াছেন। কি কথা বলিবার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাহার কোন আভাস তো এখনও পাইলাম না। ভাবিলাম, যাই, নিজেই গিয়া একবার খোঁজ-খবরটা লইয়া আসি ।

গিয়া দেখিলাম, কপাট বন্ধ ।

অত্যন্ত সমীহভরে একবার গলা-খাঁকারি দিলাম ।

কোনও শব্দ নাই ।

দ্বার অর্গলবন্ধ নাকি ?

ঠেলিয়া দেখিতে গিয়া কপাটটা খুলিয়া গেল এবং চোখে পড়িল, তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া মুছিয়া দামোদরবাবু কাচের গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখিতেছেন। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি সস্মিত মুখে সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন, এস, দাদা, এস ।

এরূপ সম্পর্কবিরুদ্ধ সম্বোধনে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম ।

সকালে 'বাবা' ছিলাম, সন্ধ্যাবেলায় কি করিয়া 'দাদা' হইয়া গেলাম—চিন্তা করিতে গিয়া নিকটেই টুলের উপর ছোট বোতলটি নজরে পড়িল এবং অচিরাৎ চিন্তামুক্ত হইলাম ।

ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল যেন ।

আরও আনন্দিত হইলাম এই দেখিয়া যে, তিনি সেই সনাতন অজুহাতটির দোহাই দিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন ।

ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশন অনুসারেই খেতে হচ্ছে ভায়া এই অখাদ্যগুলো। উপায় কি !

সত্যই উপায় নাই। আমরাও এককালে বলিতাম। ঠিক মিলিয়া যাইতেছে ।

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, যাক্, স্ব-গোত্রই তাহা হইলে এবং প্রকৃতই আত্মীয় ।

অনর্থক এতক্ষণ ঘামিয়া মরিতেছিলাম !

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরাদস্তুর জমিয়া উঠিল ।

এমন কি, গোপনে তাঁহার জন্য পেঁয়াজি-বড়া, কাটলেট প্রভৃতিও আনাইয়া দিতে হইল, এবং বহুকাল পরে দুই-চারি ঢোক পান করিয়া আমিও বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ডাক্তারী ব্যবস্থার গুণে দামোদরবাবু অন্তরের সমস্ত দ্বারগুলি একে একে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন ।

দেখিলাম, হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। আমার সহিত দামোদরবাবুর কোন তফাতই নাই ।

অকস্মাৎ দামোদরবাবু আমার হাত দুইটি ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন যে, ঋণে তাঁহার মাথার চুল পর্যন্ত বিকাইয়া গিয়াছে এবং এখনও বিবাহযোগ্যা

দুইটি অনূঢ়া কন্যা তাঁহার মাথার উপর খড়্গের মত ঝুলিতেছে। আমার নিকট তিনি আসিয়াছেন কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য। যদি আমি দয়া করিয়া—

আর তিনি বলিতে পারিলেন না।

আমার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কাল দামোদরবাবু চলিয়া গিয়াছেন।

অত্যন্ত বেদনাভরে তাঁহার কথা একান্তে বসিয়া স্মরণ করিতেছি। দামোদরবাবু যদি কোন যুবতী হইতেন, তাহা হইলে মর্মদর্শী কবিগণ হয়তো আমার এ বেদনাকে বিরহ-বেদনা নামে অভিহিত করিতেন। সত্যই দামোদরবাবুর বিরহে নিদারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি। সত্যই তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য হইয়া মনকে প্রশ্ন করিতেছি, কেন?

যতক্ষণ তাঁহাকে নির্মলচরিত্র নিষ্ঠাবান নিখুঁত ব্যক্তি বলিয়া জানিয়াছিলাম ততক্ষণ সভয়ে তাহার সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতেছিলাম ; কিন্তু যেই তাঁহাকে নেশাখোর ও দেনাগ্রস্ত বলিয়া জানিতে পারিলাম, অমনই তাঁহাকে ভাল লাগিয়া গেল। আশ্চর্য তো! নৈতিক আদর্শের দিক হইতে এরূপ মনোবৃত্তি মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে।

মন উত্তর দিতেছে—কিন্তু ইহাই সনাতন মনোবৃত্তি। আমরা মহৎকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভালবাসি তাহাকেই যাহার শত দোষ সম্বন্ধে আমরা সচেতন। যে কারণে স্ত্রীকে, পুত্রকে এবং নিজেকেও বহু-দোষ সত্ত্বেও ভালবাসি, ঠিক সেই একই কারণে দামোদরকেও ভালবাসিয়াছি। দোষ আছে বলিয়াই দামোদরের সহিত নিজের একত্ব ও আত্মীয়তা এত সত্যভাবে অনুভব করিতেছি। একই আমরা! নানা দোষে দুষ্ট—নির্মম প্রকৃতির তাড়নায় অসহায়—দুর্বার জীবন-স্রোতে বিপর্যস্ত। উভয়েই অসহায় বলিয়া পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই। বিগত ভূমিকম্পের সময়ে ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য, অত্যন্ত অসহায়ভাবে কয়েক দিনের জন্য নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া যে কারণে একাত্মতা অনুভব করিয়াছিলাম, ঠিক সেই একই কারণে মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত আমি, মদ্যপায়ী দেনাগ্রস্ত দামোদরের জন্য ব্যাকুল হইতেছি। এখন তাহার সত্যমূর্তি দেখিতে পাইয়াছি। মিথ্যা জনশ্রুতির কুজ্ঝটিকা যেন চিরপরিচিত বটগাছটাকে কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যে পরিণত করিয়াছিল। কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে, বটগাছটার সনাতন রূপ দর্শন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছি। দামোদর এতদিন নামেই আত্মীয় ছিল, এইবার সত্য সত্যই তাহার আত্মার আভাস পাইয়াছি।

মনের যুক্তির উত্তরে কি বলিব মাথায় আসিল না।

এখন ভাবিতেছি, দামোদরকে কি উপায়ে কিছু অর্থ-সাহায্য করা যায়! তাহাকে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া বিদায় করিয়াছি। ভাগ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ, ছুটি ছিল। তাহাকে বলিয়াছি যে, ব্যাংক খুলিলেই টাকা বাহির করিয়া কিছু তাহাকে পাঠাইয়া দিব।

হায়, দামোদর আমার ব্যাংক-ব্যালান্সের খবর যদি রাখিত! অকপটে তাহার নিকট স্বীকার করিলেই চুকিয়া যাইত। কিন্তু কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল—পারিলাম না। আহা, বেচারী এত আশা করিয়া আসিয়াছে! ধার করিয়াও দিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রেস্টিজ! প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া দেখিতেছি উপায় নাই। সে সম্প্রতি প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে

পারে। কিন্তু সরল সত্য কথাটি বলিলে সে এক পয়সাও দিবে না। তাহাকে তো চিনি!

কি জাতীয় মিথ্যা গল্প রচনা করিলে প্রাণকান্তের মন বিগলিত করিতে পারিব—ব্যাকুল অন্তরে তাহাই চিন্তা করিতেছি। দামোদরের অশ্রুভারাক্রান্ত ড্যাবডেবে চোখ দুইটা বারম্বার মনে পড়িতেছে।

শরীর, মন ও মানুষ

কান কটকট করিতেছে।

মনে হইতেছে, গত রাত্রির দুষ্কৃতির জন্য কোন অদৃশ্য গুরুমহাশয় যেন নির্মমভাবে কানটিকে মলিয়া দিতেছে। অন্তরাত্মা অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। গত রাত্রের দুষ্কৃতিটি কি, তাহা বলিতেছি। বেশ বুঝিতে পারিতেছি, বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অভিমত প্রকাশ করিবেন যে—আমার দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল, যে শাস্তি আমি ভোগ করিতেছি তাহা ন্যায্য এবং অপরাধের উপযুক্ত। এইটুকু শুধু আশা যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞ নহেন। অভিজ্ঞগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং সহানুভূতি মিলিলেও মিলিতে পারে।

গতকল্য সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গ্রামপ্রান্তের নদীতীরে গিয়া উপবেশন করিয়াছিলাম। অনেক দিন বাড়ি হইতে বাহির হই নাই—নদীতীর বড় ভাল লাগিল। আবাল্য-পরিচিত এই নদীই মনে অবর্ণনীয় মোহ-সঞ্চার করিয়া বসিল। অনেকক্ষণ নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। অস্তমান সূর্য, উদীয়মান চন্দ্র, শুভ্র বালুকাময় তটভূমি, শীর্ণকায়া নদীটির স্বচ্ছ তরল তরঙ্গ-ভঙ্গিমা, ঘনায়মান অন্ধকার—সকলে যেন আমাকে পাইয়া বসিল, উঠিতে দিল না। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কেন বসিয়া রহিলাম, কি লাভ হইল—এ সব লইয়া বাগ্‌বিন্যাস করা বৃথা। আসল কথা, মন বলিল—বসিয়া থাক, আমিও বাধ্য বালকের মত সশরীরে বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল।

জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা নজরে পড়িল জ্যোৎস্নামণ্ডিত নদীস্রোতে একটি শ্বেতকমল ভাসিয়া আসিতেছে। সুন্দর ফুলটি। জলের কাছেই বসিয়াছিলাম। লাঠিটা বাড়াইয়া ফুলটিকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। হঠাৎ কেমন যেন ঝোঁক চাপিয়া গেল, ফুলটাকে লইতে হইবে। জুতা খুলিয়া জলে নামিলাম, হাঁটু-জল পর্যন্ত আগাইয়া গেলাম, ফুল তবু কিন্তু নাগালের মধ্যে আসিল না। আরও খানিকটা গিয়া লাঠিটা বাড়াইলাম। ঠিক কি ঘটিল জানি না, সম্ভবত শরীরের ভারকেন্দ্রেই কোন প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকিবে, টাল সামলাইতে পারিলাম না, পড়িয়া গেলাম। কাপড়-জামা তো ভিজিলই, কর্ণকুহরেও জলবিন্দু প্রবেশ করিল। সেই বিন্দু এখন সিন্ধুপ্রমাণ হইয়া আমার সমস্ত সত্তাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

বলা বাহুল্য, গৃহিণীর নিকট সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত চাপিয়া গিয়াছি। নদীতীর হইতে সিধা প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের বাড়ীতে গিয়া পরিচ্ছদাদি পরিবর্তন করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছি। প্রাণকান্ত ব্যাপারটা জানে।

যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে এখন চিন্তা করিতেছি যে, এই অশক্ত শরীরের সঙ্গে

অত্যুৎসাহী বালক-স্বভাব মনের এই সংযোগ কেন ? এ সংযোগ না ঘটিলে তো এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না !

শরীরের সহিত মনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই ঘনিষ্ঠতা বিস্ময়কর। উভয়ের মধ্যে মিল তো কিছুই নাই, বরং অমিলই বেশি ! একের ধর্ম রুচি আচরণ অপরের ধর্ম রুচি ও আচরণের বিপরীত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

দেহ জড়ধর্মী। তামসিক প্রকৃতি তাহার মজ্জাগত। মনের আধ্যাত্মিক বিলাসের কথা দূরে থাক, রাজসিক বিলাসও শরীর বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। যে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মন ইন্দ্রিয়াতীত লোকে বিহার করিতে চায়, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রধান বাধা। দেহ বস্তুসর্বস্ব স্থূল, সুতরাং ক্ষণভঙ্গুর। মন সূক্ষ্মমর্মী, অতীন্দ্রিয়বিলাসী, অমৃতকামী। স্বপ্ন-সরণির পথিক সে। অতি-বাস্তব এই দেহটা সে পথে তাহার সঙ্গী হইতে পারে না। কানে এক ফোঁটা জল ঢুকিলেই সে কাবু হইয়া পড়ে। মনের বিলাস-প্রেরণার সহিত পাল্লা দিবার ক্ষমতা দেহের নাই। চির-উৎসুক চির- কৌতূহলী চির-ঊর্ধ্বগ মনের সহিত মাধ্যাকর্ষণ-ক্লিষ্ট স্থূল স্থবির দেহটা কিছুতেই নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে না। শরীর ও মনের এই শোচনীয় দ্বন্দ্বের নিদর্শন আমরা হিমালয়-অভিযানে, উত্তরমেরু-আবিষ্কারে, বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে, ভগ্নস্বাস্থ্য লেখকের সকরুণ মুখচ্ছবিতে দেখিতে পাই। অর্থাৎ দেখিতে পাই যে, কল্পনাবিলাসী মন আপন আদর্শের যূপকাষ্ঠে দেহটাকে বলিদান দিতেছে।

মানুষের মন কবে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া বসিয়া আছে, দেহটা আজও সেখানে পেঁাছিতে পারিল না। যদি কোন দিন পেঁাছিতেও পারে, গিয়া দেখিবে—মন সেখানে নাই, সে ঊর্ধ্বতর কোন লোকে গিয়া বসিয়া আছে। গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় নিহারিকা-মণ্ডলীর অজ্ঞাত জ্যোতির্বাষ্পে অসীম ঔৎসুক্যভরে মন সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মনের এই অনন্ত পর্যটনের সঙ্গী হওয়া দেহের পক্ষে অসম্ভব।

কারণ উভয়ে ভিন্নধর্মী।

সহজভাবেই দেখুন না, দেহের পুষ্টির জন্য প্রয়োজন খাদ্য। কিন্তু মনের পুষ্টির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অখাদ্য, অর্থাৎ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান—চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় কোন পর্যায়েই পড়ে না। শরীরের পক্ষে উপযোগী টাটকা জিনিস, কিন্তু মনের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। বরং বিপরীত নিয়মটাই মনের পক্ষে প্রযোজ্য। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব যত বাসী অর্থাৎ পুরাতন হইবে ততই তাহা মনের পক্ষে উপকারী। কালের কষ্টিপাথরে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত অধিকাংশ জিনিসই মনের পথ্য হয় না। এ বিষয়ে মন কুম্ভীর-প্রকৃতির—প্রাচীন পচা জিনিসেই তাহার পুষ্টি ও তৃপ্তি। টাটকা তত্ত্ব বা তথ্য সে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখে বটে, কিন্তু সে নির্ভর করে পুরাতনের উপর। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহা সত্য। বন্ধুত্ব বলুন, প্রেম বলুন, যত বাসী হইবে ততই মূল্যবান। 'ভালবাসি' কথাটাই হয়তো মনের এই বাসী-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনের সহিত শরীরের অমিল যথেষ্ট। অথচ এই দুই অসদৃশ বস্তু (মনকে বস্তু বলা যায় কি না জানি না) পরস্পর নির্ভরশীল।

চমকাইয়া উঠিলাম।

মস্তকে কে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল।

গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা! গৃহিণী তাঁহার দৈনন্দিন পূজা সমাধা করিয়া চতুর্দিকে গঙ্গাজল ছিটাইতেছেন। রসিকতা করিয়া কিছু বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—

গেল—গেল—গেল—হুস-উ-স—বড়িগুলোতে মুখ দিলে কাগে আঃ, মুখপোড়া কাগের জ্বালায় পাগল হলাম যে গা! ভুতো, তুই কি চোখের মাথা খেয়েছিস না কি?—চাবি আন্দোলিত করিয়া বায়সের উদ্দেশ্যে গৃহিণী প্রধাবিত হইলেন। আমি মাথাটা কোঁচার খুঁটে মুছিয়া ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার ন্যায় সংশয়ী, দার্শনিকতাপ্রবণ ব্যক্তিটির সহিত যে বিধাতা এই মেদবহুলা, ভক্তিমতী বড়িপরায়ণা রমণীটির মিলন সংঘটিত করিয়াছেন, জড়ধর্মী শরীরের মধ্যে প্রেরণাধর্মী মনঃসংযোগ সম্ভবতঃ তাঁহারই কীর্তি।

নাতিনী আসিয়া দেখা দিলেন।

দাদামশাই, দেখুন, কেমন সুন্দর ফুলটি!

দেখিলাম। দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম, হয়তো কোন বিলাতী মরসুমী ফুল। কিন্তু কি চমৎকার! কালোর উপর সাদা সাদা ফোঁটা—অপরূপ!

বলিলাম, খাসা ফুল তো! এস, খোঁপায় গুঁজে দি তোমার।

খোঁপায় ফুল গুঁজিয়া নাতিনী চলিয়া গেলেন।

আমার মনে নূতন আলোকপাত হইল।

সর্ববিষয়েই দেখিতেছি, পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তুর সংযোগ সাধন করাই যেন বিধাতার লক্ষ্য। ভাব ও ভাষা, কবিতা ও ছন্দ, জীবন ও মৃত্যু, জল ও স্থল প্রভৃতি বহু বিপরীতধর্মী জিনিসকে একত্রে গ্রথিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, উভয়ের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

এরূপ না করিলে হয়তো সৃষ্টির সমতা রক্ষা হইত না—হ্রস্ব-দীর্ঘের সুনিপুণ সম্মিলন না ঘটাইলে হয়তো তাঁহার এই মহাকাব্যের ছন্দ-পতন হইত। যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই স্পষ্টতর হইতে লাগিল, পরস্পরবিরোধী শক্তির মিলনই সম্মিলন—সার্থক মিলন।

এই মিলনের ফলেই জড়তা চাঞ্চল্য অনুভব করে এবং অতিচঞ্চল প্রশমিত হয়। সংসার-বিরাগী শিবকে বন্দী করে উমার বাহুপাশ, এবং মায়াময়ী উমাকে ভুমা-উন্মুখ করেন শ্মশানবিলাসী শিব। সহসা যেন বুঝিতে পারিলাম, পরস্পরবিরোধী শক্তির মিলনই সৌন্দর্যের উৎস। আলোক অন্ধকারের মিলন-মহিমাই সন্ধ্যা-উষার বর্ণ-বৈচিত্র্য, বায়বীয় পুষ্পসুরভি বৃন্ত-বন্দিনী পুষ্পকলিকার মর্মবাণী, বিপরীতধর্মী দুই বিদ্যুৎ-প্রবাহের সমন্বয়ই বিদ্যুৎলীলা। শরীর ও মন, স্বামী-স্ত্রী…

চিন্তাস্রোত পুনরায় ব্যাহত হইল।

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আসিয়াই তিনি অতিশয় বস্তুতান্ত্রিক একটি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, ওহে, তোমার নাতির বিয়ে কি বুড়ির সঙ্গেই দেবে না কি? মেয়েটি কিন্তু কুচকুচে কালো—একেবারে ইথিওপ, তা ব'লে রাখছি।

অবিচলিতকণ্ঠে বলিলাম, কালো ব'লেই দেব।

মানে ?

মানে, নাতি আমার ফরসা—রাধাকৃষ্ণের মিলনই আদর্শ মিলন।

বিপরীতধর্মী দুই বস্তুর মিলন যে কিরূপ হৃদয়গ্রাহী এবং কিরূপে তাহা সৃষ্টির সংগতি রক্ষা করিয়া বিধাতার অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়া তুলিতেছে, ওজস্বিনী ভাষায় তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, আমার বিশ্বাস, কান দিয়া জল তোমার মস্তকের ভিতরেও ঢুকিয়াছে। তাহা না হইলে ইহা বোঝা তোমার পক্ষে মোটেই শক্ত হইত না যে, বিধাতার অভিপ্রায় অনুসারে না চলাই মনুষ্যত্ব। মৃত্যু বিধাতার বিধান, মানুষ অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে। বিধাতা মানুষকে ডানা দেন নাই, মানুষ আকাশে উড়িতেছে। বিধাতা মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেন দিয়াছেন তিনিই জানেন, কিন্তু মানুষ তাঁহার সে নির্দেশকে অগ্রাহ্য করিয়া টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, রেডিও বানাইয়া বসিয়াছে। নারীমাত্রেরই গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবার ক্ষমতা ও প্রবণতা পুরুষমাত্রকেই দিয়াছেন, কিন্তু সে ইচ্ছা যাহারা চরিতার্থ করিতে চায়, আমরা তাহাদের মানুষ বলি না—জানোয়ার বলি। বিধাতার বিধানের বিপরীত বিধানই মানুষের পক্ষে শোভন ; সুতরাং তোমার যুক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিলে তোমার নাতির জন্য ফরসা মেয়েই দেখিতে হয়। বুড়ি অবশ্য আমার ভাইঝি এবং আমাকেই তাহার বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তোমার একটা বাজে যুক্তি আমি সমর্থন করিতে পারি না।

ব্যথিত কর্ণমূলে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, প্রাণকান্তও বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি।

বঙ্কিম শতবার্ষিকী

গভীর অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিতেছিলাম।

সাহিত্য-চর্চা যখন করি, তখন বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে চিন্তিত না হইয়া উপায় নাই। সুতরাং চিন্তা করিতেছিলাম। চিন্তা করিতেছিলাম, প্রবন্ধ না লিখিয়া বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব কি অন্য কোন সদুপায়ে সুসম্পন্ন করা যায় না ? বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া বাগ্‌বিস্তার করিতেই হইবে ? ভাগীরথীর সলিল বিশ্লেষণ করিয়া ভগীরথের মাহাত্ম্য-কীর্তন !—কেমন যেন মনঃপূত হইতেছে না। বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখিয়া লাভ কি ? যাঁহারা সাহিত্য-রসিক তাঁহারা বঙ্কিম-সাহিত্যরস পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন অথবা হইবেন। প্রবন্ধ-রূপ ফিডিং-বটলের তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। আর যাঁহারা সাহিত্য-রসিক নহেন, সত্যকার রসবোধ যাঁহাদের নাই, প্রবন্ধ গিলাইয়া তাঁহাদের সুরসিক করিয়া তোলা অসম্ভব। অন্ধকে হাত ধরিয়া মনুমেন্টের উপর চড়াইয়া দিলেই তাহার দৃষ্টি দিগন্তপ্রসারী হইয়া উঠে না। অরসিক পাঠক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ

গলাধঃকরণ করিয়া সাধারণ দর্শকের মনে আতঙ্ক অথবা বিস্ময় সঞ্চার করিতে পারে বটে, কিন্তু দ্রষ্টাকে প্রতারিত করিতে পারেন না, কিন্তু বিব্রত করিতে পারেন। চতুর্দিকে পাণ্ডিত্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। সাহিত্য-কানন ইডেন গার্ডেন না হইয়া কিচেন-গার্ডেন হইয়া উঠিয়াছে। রসিকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতিথি-উৎসবে আর লাউ, কচু, কুমড়া, কদলী আমদানি করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।

প্রতিভাবান প্রবন্ধ-লেখককে ভয় করি না। ভয় করি প্রবন্ধ আস্ফালককে। কোন মনীষী-ময়ূরের পক্ষে দুই-চারিটি প্রবন্ধ-পালক ত্যাগ করা অসম্ভব অথবা অবাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু পুরাতন সেই গল্পটি মনে উদিত হইলে স্বতই বলিতে ইচ্ছা করে—হে ময়ূরগণ, ভগবৎপ্রসাদে তোমরা নয়নরঞ্জন পালকের অধিকারী হইয়াছ স্বীকার করি, এবং ইহাও স্বীকার করি যে, তোমরা ইচ্ছা করিলেই দুই-চারিটি পালক ছাড়িতেও পার; কিন্তু দোহাই তোমাদের, যেখানে-সেখানে এবং যখন-তখন পালক মোচন করিও না; কারণ পৃথিবীতে দাঁড়কাক আছে!

আর একটা কথাও বিবেচ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ-বাজি অথবা গলা-বাজি করিলে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা নিজেকেই কি বেশি জাহির করা হয় না? যেমন দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রতি বৎসর হারু পোদ্দার কাড়া-নাকাড়া-দামামা পিটাইয়া আত্মঘোষণা করেন, দেশসেবা উপলক্ষ্যে যেমন খ্যাত অখ্যাত খদ্দরধারী কত আত্ম-প্রচারক নানা মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া সনির্ঘোষে নিজেদের ও দেশসুদ্ধ লোককে ঘর্মাক্ত করিয়া তোলেন, ক-বাবুর ছেলের বিবাহ উপলক্ষ্যে অথবা খ-বাবুর পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে খাইতে গিয়া গ-বাবুর পত্নী অথবা ঘ-বাবুর কন্যা যেমন নিজেদের বস্ত্র অলঙ্কার রূপ বিজ্ঞাপিত করিয়া বেড়ান—আমরাও কি সেইরূপ বঙ্কিমের জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজেদের নিজেদের বিদ্যা-আস্ফালন করিতে থাকিব?

অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, থাকিব—আলবৎ থাকিব। সাহিত্য-চর্চা করি বলিয়া আমরা মনুষ্যধর্মচ্যুত হই নাই। মনুষ্যোচিত সমস্ত দুর্বলতা আমাদের আছে এবং আমরা এ সুযোগ কিছুতেই উপেক্ষা করিব না। করিবার হেতু কি থাকিতে পারে? মন কিন্তু বলিতে লাগিল, আর যাই কর, প্রবন্ধ লিখিও না। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-নিশীথে ছাদের উপর বসিয়া নানা রঙের বড় বড় ফানুস ছাড়। অন্ধকার মহাশূন্যে লাল, নীল, পীত, হরিৎ—নানা বর্ণের একশত ফানুস সারি সারি উড়াইয়া দাও। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া অন্ধকারের বক্ষে আলোর আলপনা আঁকো। আলো কিছুক্ষণ পরে নিবিয়া যাইবে। তোমার প্রবন্ধই কি চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে? আজিকার দিন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার দিন নয়, সকলে মিলিয়া আনন্দ-প্রকাশ কর। রোমে যেমন কার্নিভাল উৎসব হইত, তেমনি একটা উৎসবের অনুষ্ঠান কর না কেন? বহুবর্ণ বিচিত্রিত পরিচ্ছদে মাংসময় দেহটাকে আবৃত করিয়া কৃত্রিম ছদ্মবেশে নিজেদের কৃত্রিমতার ঝুটা ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া আজ রাজপথে বাহির হইয়া পড়। সমস্ত বন্ধন খসিয়া পড়ুক, সমস্ত বাধা সরিয়া যাক। মহানন্দে আজ সকলে উৎসবে মাতিয়া উঠ। হেদুয়া পুষ্করিণীর জল তুলিয়া ফেলিয়া রক্তের মত গাঢ় লাল রঙে তাহা পরিপূর্ণ কর। এমন দিনে আষাঢ় মাসে হোলি খেলিলেও অশোভন হইবে না। গোলদীঘিতেই বা জল থাকিবার প্রয়োজন কি? উৎকৃষ্ট সুরায় তাহা কানায় কানায় ভরিয়া দাও। পার্কে পার্কে

রূপের হাট বসিয়া যাক, মাঠ ঘাট বাট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক। গড়ের মাঠে সমবেত হইয়া, বক্তৃতা নয়—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন কর। দেশের সমস্ত আবর্জনা স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দাও। লকলকায়িত অনলশিখা গগনস্পর্শী হইয়া উঠুক। তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ। প্রবন্ধ লিখিয়া কি হইবে ?

উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পড়িল।

দ্বারপ্রান্তে একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা দিল। শীর্ণকান্তি প্রৌঢ় একটি ব্রাহ্মণ। পরিধানে অর্ধমলিন বস্ত্র, পায়ে ধূলিধূসরিত চটি, হস্তে থেলো হুঁকা। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীত গুচ্ছ শোভা পাইতেছে। কোটরগত চক্ষু দুইটি উন্মীলিত, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন নহে। কেমন যেন তন্দ্রাতুর—স্বপ্নাচ্ছন্ন।

যদি অনুমতি করেন প্রবেশ করি।

আসুন আসুন, বসুন। কি চান আপনি ?

ব্রাহ্মণ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, দেখুন, চাহিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সরলভাবে আজকাল কেহ কিছু চাহে না, সরলভাবে কেহ কিছু দেয়ও না। বর্তমান কালে প্রার্থী মানেই ভেকধারী, দাতা মানেই নির্বোধ। দাতা-গ্রহীতার মধুর সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সে দিন আর নাই, যখন দাতা দান করিয়া ধন্য হইত এবং গ্রহীতা দান গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত এবং উভয়েই তাহা সরলভাবে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং আজকাল প্রকৃত প্রয়োজন থাকিলেও চাহিতে ভরসা হয় না।

সংকোচভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো—

মানুষমাত্রেরই প্রয়োজন থাকে। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই পরের প্রয়োজন মিটাইবার সামর্থ্য, সুযোগ অথবা সহৃদয়তা থাকে না। বর্তমানে আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা আধ্যাত্মিক নহে, নিতান্তই আধিভৌতিক। সেই জন্য ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেছি অর্থাৎ আমি কিছু অর্থ-সংগ্রহের জন্য বাহির হইয়াছি।

ব্রাহ্মণ বলিয়া চলিলেন, আপনার আচরণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, আপনি হয়তো আমাকে সাহায্য করিলেও করিতে পারেন। প্রথমেই আপনাকে জানাইয়া দিতেছি যে, আমি নিজের জন্য কখনও কাহারও নিকট অর্থভিক্ষা করি নাই, আজও করিতেছি না। আজ আপনারা বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসব করিতেছেন। আমিও আজ সেই উৎসব করিব। কিন্তু আমি নিজের মত করিয়া করিব।

উৎসাহিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি রকম ?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই উৎসব উপলক্ষ্যে একটি বিবাহ ও একটি ভোজ আমি দিতে চাই। আপনারা যেভাবে উৎসব করিতেছেন, তাহা আমার মনঃপূত হইতেছে না। কিন্তু আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমার কল্পনা আছে, অর্থ নাই। আপনারা যদি সাহায্য করেন, আমার কল্পনাকে রূপ দিতে পারি।

লোকটা পাগল নয় তো।

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, বিবাহ ? কাহার বিবাহ ?

ফুলের বিবাহ। সত্য সত্যই আজ মহাসমারোহে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। আপনারা কি দেখিতে পান না—আজকাল শত শত মল্লিকা ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, শত শত গোলাপ বিশুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে ? তাহাদের বিবাহ

আজকাল আর হয় না। হইবার উপায় নাই। বঙ্কিমের জন্মতিথি-উৎসবে আমি মহাসমারোহে একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। কিন্তু তজ্জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেকালে মল্লিকার সহিত গোলাপের বিবাহ দিতে গেলে বিশেষ কিছু খরচ হইত না। ভ্রমর ঘটকালি করিত, উচ্চিংড়া নহবত বাজাইত, মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইত, খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিত, আকাশে তারাবাজি হইত, কোকিল আগে আগে ফুকরাইত। সর্বশেষে একখানি কোমল হস্ত তাহাদের তুলিয়া লইয়া এক সূত্রে এক মালায় গাঁথিয়া দিত। কিন্তু এখন সে সব দিন আর নাই। ভ্রমর, উচ্চিংড়া, মৌমাছি, খদ্যোত, কোকিলরা মাথা গুঁজিবার ঠাঁই পায় না। চারিদিকে পাকা বাড়ি, পাকা রাস্তা, চতুর্দিক প্রস্তরময়। সব শান-বাঁধানো—এতটুকু ঘাস গজাইবার উপায় নাই। সমগ্র সভ্যসমাজ মৃত্তিকাহীন। মল্লিকা ও গোলাপ বহু স্থানে টব আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া আছে। আজিকার দিনে মল্লিকার সহিত তাই গোলাপের বিবাহ দিতে চাই। তাহাদের বড় দুঃখ। উৎসবের দিনে দুঃখীরাই যদি সুখ না পাইল, তবে কিসের উৎসব? শহরের যত আলো ও যত বাজনা আছে, সমস্ত একদিনের জন্য ভাড়া করিয়া একটি মল্লিকার সহিত একটি গোলাপের বিবাহ দিয়া আজিকার উৎসব সার্থক করিতে চাই। কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন?

আমার মুখে কথা সরিতেছিল না।

পরস্পরের দিকে চাহিয়া উভয়েই কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলাম। বাক্যস্ফূর্তি হইলে প্রশ্ন করিলাম, ভোজ দিবেন কি বিবাহ উপলক্ষ্যেই?

ব্রাহ্মণ বলিলেন, না। বিড়াল-ভোজন করাইব।

বিড়াল-ভোজন!

হাঁ, বিড়াল-ভোজন। "বিড়ালদেরও আজকাল বড় দুঃখের দিন আসিয়াছে। তাহাদের সকরুণ মেও-মেও ধ্বনি কি শুনিতে পান না? শুনিতে পান না কি—তাহারা দিবারাত্রি বলিতেছে, আমাদের দশা দেখ! আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে, জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও—মেও। খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্যে মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও-মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যে দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেননা, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।" বুভুক্ষু বিড়ালদের এ ক্রন্দন শুনিতে পান না কি? দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট বিড়ালদের সংখ্যা আজকাল খুব বাড়িয়াছে। আজিকার এই উৎসবের দিনে—অন্তত একটা দিনের জন্যও—প্রাণ ভরিয়া তাহাদের খাওয়াইতে চাই। কিন্তু আমি নিঃস্ব ব্রাহ্মণ। আপনারা যদি অর্থ সাহায্য করেন, তবেই আমার বাসনা চরিতার্থ হয়। আজ আপনারা সকলে হুজুগে মাতিয়াছেন, সেই জন্য ভরসা হইতেছে যে উপযুক্ত স্থানে নিবেদন করিলে হয়তো আমার আশা ফলবতী হইতে পারে। কারণ হুজুকে না মাতিলে বাঙালী কিছুই করে না। আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। কিছু সাহায্য করিবেন কি?

বলিলাম, আপনার প্রস্তাব খুবই উত্তম। কিন্তু আমার একার সাধ্যে কুলাইবে না। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি সংগ্রহ করিতে পারি।

ব্রাহ্মণ উঠিয়া পড়িলেন।

ভাল কথা, আমিও আরও কয়েক স্থানে চেষ্টা করিয়া দেখি।—এই বলিয়া তিনি গমনোন্মুখ হইলেন।

প্রশ্ন না করিয়া পারিলাম না, আপনার নামটা জানিতে পারি কি ?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী।

পর-মুহূর্তেই দ্বারপথে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আমি বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

দড়াম করিয়া শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম।

জানালাটা সশব্দে খুলিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে দেখিলাম, আষাঢ়-গগনে মহিমময় মেঘসমারোহ। বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। খরবেগে বাতাস বহিতেছে। ঠিক এক শত বৎসর পূর্বে আষাঢ় মাসের এমনই এক রজনীতে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতকার লিখিতেছেন—সেদিন আকাশ নির্মল ছিল। ছিল কি ?

ডাক্তার আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আমার যে কলিক হইয়াছিল তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম।

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেওয়ার পর ঘুম হয়েছিল ?

না, ঘুম হয়নি। তবে ব্যথাটা আর নেই।

মর্ফিয়া নিয়েও ঘুম হ'ল না আপনার ? আশ্চর্য তো! আচ্ছা, এই ওষুধটা খাবেন তা হ লে।

প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মর্ফিয়া!

তীক্ষ্ন সূচিমুখে কমলাকান্তের প্রেতাত্মা শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন বুঝিলাম।

একটু পরে নাতি আসিলেন।

খান-দুই বাঁধানো বই আমার হস্তে দিয়া বলিলেন, এখানকার লাইব্রেরিতে বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী সব নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে এইগুলো পেলুম। প্রবন্ধগুলো একেবারে নেই।

আমি এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত পুস্তকই খরিদ করিয়াছিলাম। কে কোথায় লইয়া গিয়াছে, বাড়িতে এখন একখানাও নাই। নাতিকে সেজন্য স্থানীয় পাঠাগারে পাঠাইয়াছিলাম।

নাতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভুতে বিশ্বাস করিস ?

হঠাৎ ভুতের কথা কেন ?

বল্ না, করিস কি না ?

নিশ্চয়ই না।

সেইজন্যেই তোদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

একটু হাসিয়া নাতি ভিতরে চলিয়া গেল।

বসুমতী-সংস্করণের কীটদষ্ট পীতাভ পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য, মাত্র এক শত বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ—

শুইয়া শুইয়া 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতেছিলাম।

"সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলংকার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল, গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্ধব্যক্ত কেকার অপরার্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্য-বীথিকায় দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময় শঙ্খ বাজিল না: পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রাম-শিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশংকা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনা রোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক ব্যাপিল। আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেব-মন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার…"

পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে আবার কমলাকান্ত আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। বলিলেন, আমার অত টাকার আর প্রয়োজন নাই। কোন রকমে গয়ার ভাড়াটা যোগাড় করিয়া দিতে পারেন?

কেন?

পিণ্ড দিব।

সে কি। কাহার?

সকলের। খোঁজ করিয়া দেখিলাম, কেহ বাঁচিয়া নাই।

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, ঘনকৃষ্ণ মেঘের স্তর ভেদ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উদিত হইতেছেন। আর্দ্র-ধরণী জ্যোৎস্না-সম্পাতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পত্রে পত্রে, তৃণে তৃণে, তরঙ্গে তরঙ্গে, সৌধশীর্ষে, কুঠীর-প্রাঙ্গণে আলোকের জয়ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

"আমি আছি। সমস্ত মেঘ সত্ত্বেও আমি আছি।"

কে এ কথা বলিল?

আকাশবিহারী বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, নিঃশব্দে অট্টহাস্য করিতেছেন।

অদ্ভুত অট্টহাস্য!

দেখিলাম, নিরুদ্ধ হাস্যবেগে তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। দেখিতে দেখিতে রজতসন্নিভ ধবলকান্তি রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তূপে আগুন লাগিয়াছে।

সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, এ তো চন্দ্র নহে—এ যে সূর্য!

অন্ধকার সরিয়া যাইতেছে।

সভয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলাম—

ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

* * * * *

ঠিক করিয়াছি, আফিম ধরিব।

বিবেক

॥ এক ॥

দেখিতেছি এবং শুনিতেছি। চক্ষু কর্ণ এখনও বিকল হয় নাই। সুতরাং অনেক রকম দেখিতে ও শুনিতে হইতেছে। এই সকল দর্শন-শ্রবণের ফলে যাহা ঘটিতেছে, তাহাকে অঘটন আখ্যা দেওয়াই সংগত। অঘটন ঘটিতেছে, কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ নহে, রসনা এবং দক্ষিণ হস্তখানিও এখনও সক্রিয় আছে। কিন্তু রসনা ও দক্ষিণ হস্তের উত্তেজনামূলক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ শুধু চক্ষু কর্ণ রসনা এবং হস্ত নহে, বিবেক নামক বস্তুটিও এখনও রীতিমত জাগ্রত রহিয়াছে। মুশকিলে পড়িয়াছি।

সেদিন চক্ষু বলিল, দেখ দেখ, রামের গাছ হইতে শ্যাম জোর করিয়া আম পাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়িতেছে।

কর্ণ বলিল, শুধু তাহাই নহে, ওই শুন শ্যাম নিজেকেই সুদক্ষ বীর বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং শ্যাম বড়লোক বলিয়া সকলে তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া জয়ধ্বনি দিতেছে।

রসনা চুলবুল এবং হাত নিশপিশ করিয়া উঠিল।

তর্জনী আস্ফালন করিয়া বিবেক কহিল, খবরদার, কিছু বলিও না বা করিও না। কেবল নীরবে দেখিয়া যাও এবং শুনিয়া যাও।

সবিনয়ে প্রশ্ন করিলাম, নিরপেক্ষ মতামত ব্যক্ত করিতে ক্ষতি কি ?

বিবেক উত্তর দিল, মতামত কখনও নিরপেক্ষ হয় না। তোমার মতামত তোমার কাছে অথবা তোমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছে মূল্যবান হইতে পারে। কিন্তু পৃথিবী বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীতে বিভিন্ন মতের এবং বিভিন্ন আদর্শের লোকের অসম্ভাব নাই। তোমার মতামতের মানদণ্ডটি সাড়ম্বরে আস্ফালন করিলে তুমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষচারী কতকগুলি শত্রু সৃজন করিবে মাত্র। পৃথিবীতে শত্রু সৃজন করা লাভজনক নহে। সুতরাং রসনা ও হস্ত সংযত করিয়া কেবল দেখিয়া ও শুনিয়া যাও। ইহাই হিতবাক্য।

বলিলাম, বহির্জগতের উত্তেজনা অথবা অবসাদে উত্তেজিত অথবা অবসন্ন হওয়া জীবমাত্রেরই প্রাণধর্ম।

বিস্মৃত হইও না, তুমি সাধারণ জীব নহ—তুমি মনুষ্য।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ বাহ্যিক আন্দোলনে খামকা বিচলিত হওয়া প্রকৃত মনুষ্যের পক্ষে অকর্তব্য।

অবিচলিত পাষাণই কি তাহা হইলে মনুষ্যত্বের আদর্শ ?

কে বলিল, পাষাণ বিচলিত হয় না? যে গাণিতিক নিয়মানুসারে পাষাণের আপাতস্থৈর্য দৃষ্টিগোচর করিতেছ, সেই গাণিতিক নিয়মানুসারেই পাষাণকেই অস্থির করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। পাষাণের উপর ক্রিয়াশীল শক্তির তারতম্যের উপর তাহা নির্ভর করে। পাষাণ মনুষ্যত্বের আদর্শ নহে। স্বকীয় শক্তিবলে বিক্ষোভকারী শক্তির প্রতিরোধ করিয়া নির্বাক থাকাই বুদ্ধিমান মনুষ্যের কর্তব্য।

নির্বিকার থাকিয়া লাভ কি?

লাভ? আধিভৌতিক লাভ কিছু নাই। শান্তি পাইবে। মনুষ্যত্ববিশিষ্ট মনুষ্যের পক্ষে তাহাই পরম কাম্য।

আধিভৌতিক শরীর ধারণ করিয়া আধিভৌতিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করি। সুতরাং আধিভৌতিক লাভ ক্ষতি কি নিতান্ত অবহেলার বস্তু?

অবহেলার বস্তু নহে, অশান্তিজনক। সেই জন্যই পরিত্যাজ্য।

পরিত্যাজ্য বস্তুমাত্রেই পরিত্যাগ করা সহজ নহে। আধিভৌতিক জগতের উত্তাপ ও শৈত্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে অনুক্ষণ অভিভূত করিতেছে। সুতরাং বরফ এবং অগ্নির সাহায্য না লইলে চলিবে কেন?

সাহায্য লও, কিন্তু প্রয়োজনমত এবং নির্বিকারে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ বরফ অথবা অগ্নি লইয়া আতিশয্য করিও না। সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হইয়া প্রয়োজনমত তাহাদের সাহায্য লও। তাহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিবার আবশ্যকতা নাই।

রামের প্রতি শ্যামের এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে উচিত কি অনুচিত তাহা সরল বাংলায় ব্যক্ত কর।

চলিত বাংলায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, চাপিয়া যাও।

কেন?

রামের পক্ষ লইয়া শ্যামের বিরাগভাজন হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

আমি ন্যায়ের পক্ষ লইতে চাই।

ন্যায়শাস্ত্র ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে হৃদয়ঙ্গম করিবে, ন্যায়-অন্যায়ের স্বরূপ সম্যক নির্ধারণ করা স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে অসম্ভব। উহা লইয়া অনর্থক মস্তিষ্ক আলোড়িত করিও না। স্বকীয় চরকায় নির্বিকারভাবে তৈলনিষেক করত শান্তিতে থাকিবার চেষ্টা কর। রাম-শ্যামের মামলার নিষ্পত্তি তাহারা নিজেরাই করুক। ইহা লইয়া তোমার উত্তেজিত হইবার প্রয়োজন দেখি না।

প্রয়োজন নাই বুঝিলাম। কিন্তু আমি যে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। এখন উপায় কি?

প্রশমিত হও।

বেখাপ্পা বিবেকের সহিত আর বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এই জন্যই বোধ হয় সাধারণ মানুষ একা থাকিতে পারে না। একা থাকিলেই বিবেকের সহিত মুখামুখি হইতে হয় এবং তাহা প্রায়ই সাংঘাতিক ব্যাপার। কারণ সংসারী পাপী তাপী মানুষের বিবেক দংশনোন্মুখ, এবং তাহার দংষ্ট্রা বড় তীক্ষ্ণ। এই জন্যই বোধ হয় অধিকাংশ লোক কাজে কর্মে আড্ডায় গল্পে গুজবে

নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া নিজের বিবেকের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করে। একা থাকিলে বিবেক খুন করিয়া ফেলিবে।

রাম-শ্যাম-ঘটিত গল্পটি নিম্নলিখিত প্রকার।

রামবাবু আমাদের পাড়ার লোক। বেচারী ছাপোষা গরিব গৃহস্থ। কিন্তু তাঁহার আমগাছটির এ অঞ্চলে নাম আছে। বড় বড় আম, সুমিষ্ট, আঁশ নাই, অথচ পেট ভার করে না। রামবাবু প্রতি বৎসর আমগুলি বিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং প্রতি বৎসর আমিই সেগুলি কিনিয়া থাকি। এবার শ্যামবাবুও ক্রেতারূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্যামবাবুর প্রস্তাবিত মূল্যে কিন্তু রামবাবুর মনঃপূত হইল না এবং তিনি শ্যামবাবুকে আম্র বিক্রয় করিতে অসম্মত হইলেন। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে এ বৎসরও আমি আম্রগুলি পাইতে পারিব। কিন্তু অকস্মাৎ শ্যামবাবু পাঁচ জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিবা-দ্বিপ্রহরে রামবাবুর সমস্ত আমগুলি পাড়াইয়া লইয়া গেলেন। শোনা কথা নয়, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। দরিদ্র রামবাবুর বিপন্ন মুখচ্ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। ভীমদর্শন বরকন্দাজগুলার সগুম্ফ হুমকিও দেখিতে পাইতেছি। নাঃ, ইহার একটা বিহিত করিতেই হইবে।

পথে যাইতে যাইতে প্রবীন দিগম্বর সিংগির সহিত দেখা হইল। তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত খুলিয়া বলিলাম।

শুনিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন, কপালে তর্জনী ঠেকাইলেন এবং সর্বশেষে হাত দুইটা উল্টাইয়া আকাশের দিকে চক্ষু দুইটি তুলিলেন। সিংগি মহাশয় স্বল্পভাষী লোক। তাঁহার বক্তব্য সাধারণত তিনি ইংগিত দ্বারাই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ইংগিতগুলির দ্বারা তিনি ঠিক কি ব্যক্ত করিলেন, তাহা সম্যক প্রকারে না বুঝিলেও রামবাবুর প্রতি তিনি যে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছেন তাহা বুঝিলাম। আর একটু গিয়াই ভট্টাচার্যের দর্শন পাইলাম। ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামের গেজেট। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, শুনেছ ভায়া, মাগী সরেছে। আগেই বলেছিলাম, ও চিঁড়িয়া উড়বে—

প্রশ্ন করিলাম, কোন্ মাগী ?

তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে হে! ওই তোমাদের মিস্ট্রেস—বালিকা-বিদ্যালয়ের বিদ্যেধরী—এখন নো ট্রেস। শাড়ির চটক দেখেই বুঝেছিলাম আগেই—

রাম-শ্যাম-সংবাদটিও ভট্টাচার্যের কর্ণগোচর করিলাম। ভট্টাচার্য বলিলেন, শ্যাম যে ও-রকম করবে তার আর বিচিত্র কি, মুখখানা দেখ নি ওর ? ব্যাটা যেন রাঘব বোয়াল। রামবাবুকে বল, ঠুকে দিক এক নম্বর। হেবোকে বললেই সে সব ঠিক ক'রে দেবে। এ মগের মুলুক নয়, ইংরেজ রাজত্ব, ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না, হেঁ-হেঁ, হেবোকে পাকড়াও গিয়ে।

প্রতিশ্রুতি দিলাম, প্রয়োজন হইলে সদ্য-পাস-করা উকিল ভট্টাচার্য-তনয় হাবুলেরই শরণাপন্ন হইতে রামবাবুকে প্ররোচিত করিব। ভট্টাচার্য উৎসাহ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের পর যথাক্রমে চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার এবং ফড়িং মামার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল এবং সকলের নিকটেই শ্যামবাবুর অমানুষিক অত্যাচারের কথা যথাশক্তি নিবেদন করিলাম। সকলেই নিজস্ব ধরনে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে থানার নিকটবর্তী হইয়াছিলাম। দারোগাবাবুর সহিত স্বল্প

চেনাশোনাও ছিল। কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার সহিতও এ বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, আইন কাহারও খাতির করে না। রামবাবু যদি নালিশ করেন এবং শ্যামবাবু যদি দোষী সাব্যস্ত হন, নিশ্চয়ই তাঁহার সাজা হইয়া যাইবে। ধনী বলিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন না।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

॥ দুই ॥

উপরোক্ত ঘটনার পর এক মাস অতীত হইয়াছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সংবাদগুলি প্রণিধানযোগ্য। বিনা মেঘে বজ্রপাত কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয়।

১। রামবাবুর সহিত শ্যামবাবুর হরিহর-আত্মা-জাতীয় মিলন সংঘটিত হইয়াছে।

২। পাঁচ হাজার টাকার দাবি করিয়া শ্যামবাবু আমার নামে মানহানির মকদ্দমা দায়ের করিবেন বলিয়া উকিলের চিঠি দিয়াছেন। হাবুলই উকিল।

৩। দিগম্বর সিংগ, ভট্টাচার্য মহাশয়, চানি ঘোষাল, সতু ঘোষ, হীরু মিত্তির, বীরু মুখুজ্জে, কাতু সরকার, ফড়িং মামা এবং থানার দারোগা সত্যনিষ্ঠার খাতিরেই সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেন বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। ইঙ্গিতপ্রবণ দিগম্বরই প্রধান সাক্ষী শুনিতেছি। রামবাবুও শুনিলাম বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, তিনি স্বেচ্ছায় সুস্থ-মস্তিষ্কে তাঁহার গাছের আম শ্যামবাবুকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়াছেন এবং রসিদ লিখিয়া দিয়াছেন।

পাঁচ হাজার টাকা আমার নাই। সুতরাং জেল অনিবার্য।

॥ তিন ॥

হিতৈষী প্রতিবেশী চৌধুরী মহাশয় এইমাত্র বলিয়া গেলেন যে, আমি গিয়া শ্যামবাবুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেই সমস্ত ব্যাপার অবিলম্বে মিটিয়া যাইবে। কারণ তাঁহার মতে শ্যামবাবু লোকটি একটু রগ-চটা হইলেও দিল-দরিয়া। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে কঠোরকণ্ঠে বিবেক কহিল, ক্ষমা-প্রার্থনা করিও না।

কেন?

শান্তিই মনুষ্যের কাম্য। এ অবস্থায় জেলের ভিতরেই তুমি অধিক শান্তি পাইবে। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্য কিছুদিন কারাবরণ করিলে তোমার কিছুমাত্র অমর্যাদা হইবে না।

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, এবং কিছু শিক্ষাও হইবে।

এমন সময় আর একটি বজ্র পড়িল। এটিও বিনা মেঘে।

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমার সময় কম, মাছ ধরিতে যাইতেছি। কেবল একটি সুখবর দিতে আসিয়াছি। জজ সাহেব বদলি হইয়াছেন

এবং তাহার স্থানে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার প্রিয়তমা শ্যালিকার পাণিপীড়ক, অর্থাৎ আমার ভায়রাভাই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও বদলি হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানেও সৌভাগ্যক্রমে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমার বাল্যবন্ধু। সুতরাং চল, এই সুযোগে শ্যামবাবুকে একদিন চাবকাইয়া আসা যাক। আমার নিকট খুব ভাল একটা হান্টার আছে।

মুচকি হাসিয়া প্রাণকান্ত চলিয়া গেলেন।

॥ চার ॥

দামী কার্ডখানা হাতে লইয়া বসিয়া আছি। ইহাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে যে, শ্যামসুন্দর দে অত্যন্ত বাধিত হইবেন, যদি আমি অদ্য সন্ধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উদ্যান-উৎসবে যোগদান করি। ইংরেজীটুকুর অনুবাদ করিলে ইহাই অর্থ হয়। যিনি কার্ডটা দিয়া গেলেন, তিনি ইহাও বলিয়া গেলেন যে, নবাগত জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রাণকান্তও।

একটু পরে প্রাণকান্ত আসিলেন। বলিলেন, আর ঝগড়াঝাঁটি করিয়া কাজ নাই। মধুরেণ সমাপয়েৎ করাই ভাল। পরে প্রয়োজন হইলে হান্টার তো আছেই। এখন ভোজটা ছাড়ি কেন?

॥ পাঁচ ॥

ভূরিভোজনের পরে যখন ফিরিলাম, তখন রাত্রি অনেক। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন!

একটা ভীষণদর্শন বলিষ্ঠ লোক কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার হাতে প্রকাণ্ড একটা কলসী। প্রশ্ন করিলাম, কি খুঁজিতেছেন?

আমার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে বলিল, দড়ি।

দড়ি? আপনি কে?

তোমার বিবেক, রাস্কেল!

বিবর্তন

প্রত্যেক জিনিসই তলাইয়া দেখা উচিত—ইহাই জ্ঞানীগণের পরামর্শ। কিন্তু মুশকিল এই যে, প্রত্যেক জিনিসই অতলস্পর্শী। কোন কিছুরই তল খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। সামান্য ধূলিকণারও সম্পূর্ণ রূপ, সম্পূর্ণ ইতিহাস, সম্পূর্ণ রহস্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন সম্পূর্ণ বুদ্ধি আমাদের শিরোভাণ্ডে নাই। যতটুকু আছে ততটুকু লইয়া কেবল দিশাহারা হইয়া পড়া ছাড়া আর কিছুই করা যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যৎসামান্য মস্তিষ্ক না থাকিলেই যেন ভাল হইত। নির্বিকারভাবে খরস্রোতের টানে অনন্তকাল ভাসিয়া যাইতাম, অথবা যেখানে ঠেকিবার ঠেকিয়া

থাকিতাম। অনিবার্য খরস্রোতের টানে ভাসিয়াই তো চলিয়াছি ; এই দুর্নিবার স্রোতের প্রতিরোধ করি, এমন শক্তি তো নাই। কিন্তু কিছুতেই নির্বিকার থাকিতে পারিতেছি না। অত্যল্প বুদ্ধি-প্রভাবে উচ্চিংগড়ার মত ক্রমাগত তড়পাইতেছি। 'এটা কর,' 'ওটা কর,' 'এটা করিলে ভাল হইত,' 'আহা, এ কথাটা যদি আগে ভাবিতাম' প্রভৃতি নানারূপ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিক্ষোভ চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। অনতিদূরপ্রসারী জ্ঞানের প্ররোচনায় পড়িয়া জলকে সোজাসুজি জল ভাবিয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। জলের মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, তাহাদের মধ্যে মলিকিউল অ্যাটম ইলেকট্রন, তন্মধ্যে বৈদ্যুতিক লীলা এবং তাহারও পশ্চাতে একটা অজ্ঞাত শক্তির আভাস পাইয়া বিব্রত হইয়া উঠিতেছি। ইহাই হয়তো বিজ্ঞান এবং সর্পের মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অথবা ব্রহ্মের মধ্যে সর্পের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা, হয়তো সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কিন্তু এই বিজ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি লইয়া আমরা ডুবিতে বসিয়াছি। সত্য-মিথ্যার এমন একটা জট পাকাইয়া গিয়াছে যে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকিবার মত মানসিক শক্তিও তো নাই। সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিবার অদম্য বাসনা এবং নিজের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে অকথ্য অহংকার—এই দুই প্রস্তর-খণ্ড স্কন্ধে বাঁধিয়া আমরা জীবন-প্রবাহে স্বচ্ছন্দে ভাসিতে পারিতেছি না। সহজ গতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিতেও পারিতেছি না, এ ক্ষেত্রে আমার কি বক্তব্য বা কর্তব্য! নরোত্তম নামক যুবকটির সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমাগত পরিবর্তন করিয়াও তো কোন কূল-কিনারা পাইতেছি না। মনে হইতেছে, নরোত্তম নামক যুবকটির আরও না জানি কত প্রচ্ছন্ন রূপ আছে! অপ্রত্যাশিতপূর্ব ইহারই নাম কি বিবর্তন?

নরোত্তমকে হিন্দুবংশাবতংস বলিয়াই জানিতাম।

যখন সে সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল তখন স্বীকার করিতে বাধা রহিল না যে, ছেলেটি বিদ্যানুরাগীও। তাহার বিদ্যাবত্তার পরিচয়ে পুলকিত হইলাম। এবং তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিলাম। দীর্ঘ জীবন হয়তো সে লাভ করিবে, কিন্তু আমার পুলক বেশিক্ষণ টিকিল না। তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণাটি মনে যখন সানন্দে দৃঢ় করিয়া আনিতেছিলাম, তখন সহসা নরোত্তম এমন একটি কাণ্ড করিয়া বসিল যে, তাহার বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে ধারণা এবং তজ্জনিত আনন্দ যুগপৎ আমার মন হইতে বিলুপ্ত হইল। দেখিলাম, নরোত্তম দাস খদ্দর ধারণ করিয়া স্কুল-কলেজ-বর্জন-অভিযানে উদ্যত-প্রহরণ হইয়াছে। প্রহরণটি অবশ্য সাংঘাতিক কিছু নয়, নরোত্তমেরই অহিংস রসনা। কিন্তু তাহার অহিংস রসনাটিতেই এমন সহিংস বাণীমূর্তি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল যে, আমরা অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বিদ্যালয়গমনোন্মুখ বালক-বালিকাদলকে ঘর্মাক্ত-কলেবরে হস্তপদ আস্ফালন করিয়া অহিংসভাবে নরোত্তম ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, বর্তমান অবস্থায় লেখাপড়া শিখিবার প্রয়াস কেবল যে হাস্যকর এবং অনর্থক তাহাই নহে—মহাপাপ। মৃতপ্রায় দেশমাতার কণ্ঠনালীতে যেটুকু প্রাণ ধুকধুক করিতেছে, চরকা না ঘুরাইয়া লেখাপড়া শিখিতে গেলে সেটুকুও অবিলম্বে বাহির হইয়া যাইবে। দলে দলে বালক-বালিকা যুবক-যুবতী স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কাপড় পুড়াইতে ও চরকা ঘুরাইতে প্রবৃত্ত হইল। সকলেই দেখিলাম ধুতখদ্দর গান্ধীটুপি-পরিহিত নরোত্তমের বিশুদ্ধ স্বদেশীয় প্রতিভার

নবারুণচ্ছটায় বিদ্যানুরাগী কোমলস্বভাব নরোত্তমচন্দ্র ম্রিয়মাণ হইয়া লজ্জায় আত্মগোপন করিতেছে। আমিও নরোত্তম সম্বন্ধে আমার ধারণাটি পরিবর্তন করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। কিন্তু বেশি দিন নয়, আবার নিঃশ্বাস টানিয়া রুদ্ধশ্বাস হইতে হইল। বহু বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, নরোত্তম গোপনে মদ্যপান করিতেছে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে পুনরায় ধারণা পরিবর্তন করিবার সঙ্গত কারণ ঘটিল। একদিন সন্দেহ হইল, আমার বোতল হইতেও সে কিঞ্চিৎ সুরা অপহরণ করিয়াছে। অনিবার্যভাবে তাহার সম্বন্ধে ধারণা যদিও পরিবর্তিত হইল, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাহার এই সর্বদিক-রক্ষাকারী প্রতিভার অসামান্যতা মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। নিজের বোতলটি সাবধানে রক্ষা করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। না লক্ষ্য করিলেই ভাল করিতাম। কারণ লক্ষ্য করিতে গিয়া বিস্ময় কাটিয়া গেল এবং মুগ্ধ ভাবটাও টিকিল না। একদিন শুনিলাম, গভীর রাত্রে সকলে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়াছে, মুক্তকচ্ছ হইয়া নর্দমায় নাকি পড়িয়াছিল। মনে ব্যথা পাইলাম, কিন্তু আবার ধারণা পরিবর্তিত করিতে হইল। যাহাকে শ্যাম এবং কুলবজায়কারী নীতিকুশল ভাবিয়াছিলাম, সক্ষোভে স্বীকার করিতেই হইল যে, সে নিতান্ত সাধারণ মদ্যপ। ইহার পর সহসা সে ডুব মারিল। কোথায় এবং কি কারণে, তাহা জানিতে পারিলাম না। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে শেষ ধারণাটাই মনের মধ্যে বনিয়াদী হইতেছিল। এমন সময়ে একদিন প্রাতঃকালে নূর ও ফেজক্যাপ-ধারী নরোত্তম আসিয়া আমাকে আদাব করিল এবং বার দুই পিচ ফেলিয়া বলিল যে, সে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বর্তমানে তাহার নাম নরোত্তম নয়—নূরুদ্দিন। সম্ভবত আমার নয়নের দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই সে একটু মৃদু হাসিল এবং নূরে বার-দুই হাত বুলাইয়া সবিনয়ে বলিল, যদি অনুমতি করেন, সমস্ত খুলিয়া বলি।

অনুমতি করিলাম।

সে বলিতে লাগিল, দেখুন, অনেক চিন্তা করিয়াই আমি এ কার্য করিয়াছি। আমি নিতান্ত মূর্খ নই এবং জীবনের নানাপ্রকার অভিজ্ঞতাও আমার হইয়াছে। সুতরাং যাহা করিয়াছি, তাহা হঠকারিতা নহে—অনেক চিন্তার ফল। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সকল ধর্মই মূলত এক। আমিও তাহা স্বীকার করি এবং আশা করি আপনিও করেন। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে এই জ্ঞানগর্ভ সত্যটি স্বীকৃত হইতেছে না। শুধু তাহাই নয়, বর্তমানে রাজনীতিক্ষেত্রে একটি ধর্মকে প্রশ্রয় দিয়া অন্য এক ধর্মকে নির্যাতিত করাই প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ কথা আশা করি আপনার অবিদিত নাই যে, আজকাল বাঙালী হিন্দু বলিয়াই বিশেষ করিয়া বিপন্ন, সকলেই মুসলমানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। এ অবস্থা যে মোটেই শান্তিজনক নহে, চাকুরির অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি। নরোত্তমরূপে আমার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতেছিল, কিন্তু নূরুদ্দিন হইবামাত্রই আমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। সকল ধর্মই যদি মূলত এক হয়, ধর্মান্তরগ্রহণের কোনরূপ নৈতিক বাধা নাই; অথচ রাজনৈতিক সুবিধা রহিয়াছে। আমার মনে হয়, আর কিছুর জন্য না হউক, রাজনৈতিক চাল হিসাবেই এখন সকলের দলবদ্ধভাবে মুসলমান হইয়া যাওয়া কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা-সমাধানের ইহাই

একমাত্র উপায়। আপনি হয়তো বলিবেন, মুসলমানেরাই হিন্দু হউক না কেন! তদুত্তরে আমি বলিব যে, মুসলমানেরা আমাদের অবুঝ ভাই, তাহারা এ যুক্তি কিছুতেই বুঝিবে না। তাহা ছাড়া, যে পরিমাণ মানসিক বিস্তার থাকিলে অনায়াসে ধর্মান্তর গ্রহণ করা যায়, সে পরিমাণ ঔদার্য, যে কোন কারণেই হউক, মুসলমানদের সম্প্রতি নাই। মুসলমানদের নাই, কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালী হিন্দুদের তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। আমরা সর্বধর্মের মূলমর্ম বিষয়ে সর্বদাই ওয়াকিবহাল। আমাদের দার্শনিকতার জোরে আমরা সমস্ত কিছুই পরিপাক করিতে সক্ষম। মুসলমানই বা হইতে পারিব না কেন? একদিন যে যুক্তিবলে আমরা দলে দলে স্কুল-কলেজ ও চাকরি ছাড়িয়া খদ্দর পরিয়া চরকা ঘুরাইয়াছিলাম, সেই যুক্তিবলেই আমরা এখন দলে দলে মন্দির ছাড়িয়া মসজিদে গিয়া কলমা পড়িতে পারিব না কেন? কিসের বাধা? ইহাতে কত বড় একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান হইয়া যাইবে ভাবিয়া দেখুন দেখি। রসুন পেঁয়াজ মুরগি মুসলমান না হইয়াই তো আমরা স্বচ্ছন্দে হজম করিতেছি, লুঙ্গি পরাটাও আমাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের মন যেরূপ উদার, তাহাতে কোরান অথবা কলমা পড়াও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। অথচ তাহাতে সুবিধা কত! আমাদের জাতীয় জঠরের পরিপাকশক্তি এরূপ প্রবল যে, আমার ধারণা, আমাদের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। ইতিপূর্বে অর্থাৎ কংগ্রেস যখন হয় নাই, তখন আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নব নব আদর্শ অতি সহজেই হজম করিয়াছিলাম এবং সম্ভবত তাহারই উত্তেজনায় কংগ্রেসের জন্মদান করিয়াছিলাম। পুত্রের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত পিতাকে যেমন অনেক সময় প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হইতে হয়, কংগ্রেসের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আমাদের সেইরূপ মুসলমানধর্মের আশ্রয় লইতে হইবে। আমার বিশ্বাস, আমরা তাহা পারিবও। কারণ কবি বলিয়াছেন, "শক হূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।" আমরা তুচ্ছ নহি; প্রয়োজন হইলে আমরা অসাধ্য সাধন করিতে পারি। আমি এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ, আপনার নাতিটি বেকার বসিয়া আছে। সে আমার সহপাঠি ছিল, এবং সে যে তীক্ষ্ণধী এ বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বাঙালী হিন্দু। তাহাকে অনাহারে মরিতে হইবে। সে যদি মুসলমান হইয়া যায়, অবিলম্বেই তাহার চাকুরি জুটিয়া যাইবে! আপনি এ বিষয়ে কি বলেন?

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুতভাবে একটা ঢোক গিলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর বলিলাম, আচ্ছা, ভাবিয়া দেখি।

নুরুদ্দিন চলিয়া গেল।

জ্ঞানীগণের পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত জিনিসটা তলাইয়া দেখিতেছি; কিন্তু মনে হইতেছে, সমস্তই অতল।

দুই বন্ধু

জনৈক বাল্যবন্ধু পত্রযোগে অনুযোগ করিয়াছে, আমি কেন তাহাকে এখনও মনে করিয়া রাখি নাই। শ্লেষও করিয়াছে—এখন বড়লোক হইয়াছি, তাহার মত নগণ্য ব্যক্তিকে মনে রাখিবই বা কেন? আমিও অবাক হইয়া ভাবিতেছি, যাহার একদিনের

অদর্শনে বিশ্বভুবন অন্ধকার যাইয়া যাইত তাহাকে বেশ স্বচ্ছন্দে ভুলিয়াছি তো—বৎসরান্তেও তাহার কথাটা একবার মনে পড়ে না! আমি ইচ্ছা করিয়া, জোর করিয়া অথবা বদমায়েসী করিয়া তাহাকে ভুলিয়া যাই নাই। মন আপনি তাহাকে ভুলিয়া বসিয়া আছে এবং এতদিন পরে তিরস্কৃত হইয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি।

কিন্তু কেন? মনের এরূপ আচরণের কারণটা কি?

চিন্তা করিতে লাগিলাম। সম্যকরূপে চিন্তা করিবার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা বিস্ময়কর। সিদ্ধান্তের জবরদস্তিতে পড়িয়া আমাকে স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, আমি মারা গিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে ভুলিয়াছি। একবার দুইবার নয়, এ জীবনে বহুবার মরিয়াছি এবং বহুবার নবজন্ম লাভ করিয়াছি। পূর্বজীবনের আসবাব-পত্র নবজীবনে অচল। নবলব্ধ জীবনের পারিপার্শ্বিক, দৃষ্টিভঙ্গি, স্বার্থ-সংঘাত, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা পূর্বজীবন হইতে এতই স্বতন্ত্র যে, পূর্বজীবনের কোন কিছু তাহাতে খাপ খায় না এবং খাপ খায় না বলিয়াই ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে হইতে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায়। ঐতিহাসিক অথবা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যেমন সহসা-প্রাপ্ত শিলালিপি, অস্থিখণ্ড অথবা তৈজসাংশ অবলম্বন করিয়া অতীত যুগের প্রাক্তন পৃথিবীর রূপ রস চালচলনের আভাস পান, আমরাও তেমনই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত দুই-একখানা পুরাতন চিঠি, বিবর্ণ ফোটো অথবা ঠাকুমা-মুখ-নিঃসৃত স্মৃতি-কথার প্রভাবে আমাদের বিগত মৃতজীবনের পরিচয় পাইয়া নানাভাবে বিচলিত হইয়া উঠি। বর্তমানে ঝাল-মাংসলোলুপ আমি যে অতীত কালে দুধ-ভাত ছাড়া আর কিছুই পছন্দ করিতাম না, ব্যঞ্জনে সামান্য ঝালরস থাকিলেও যে আমি গলদশ্রু-লোচনে বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতাম—এ কথা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। আমার ভিতর ও বাহিরের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন অস্বীকার করিবার আর উপায় নাই। সেকালের দুধ-ভাতপ্রিয় সাত্ত্বিক বালকটি আজকাল প্রত্যহ কড়মড় করিয়া অস্থি চর্বণ করিতেছে এবং মাংসে ঝাল কিঞ্চিন্মাত্রও কম পড়িলে সগর্জনে পাচকের উপর ঝাল ঝাড়িতেছে। ইহা বিস্ময়কর বটে, কিন্তু সত্য। দুধ-ভাতকে ভুলিয়াছি। এই বিস্মৃতির জন্য সেই দুধভাত অভিমানভরে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। কি করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। অনেক ভাবিয়া শেষে সরল সত্য কথাই লিখিলাম। লিখিলাম, বাল্যকালে দুধ-ভাত আমার প্রিয়বস্তু ছিল, এখন মাংস ধরিয়াছি। বাল্যকালে তোমার সাহিত্যপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করিত, এখন সাহিত্য ছাড়িয়া আমি পাটে মন দিয়াছি। স্নতরাং তোমাকে ভুলিব ইহা বিচিত্র নহে। এতদিন পরে তুমি আমাকে স্মরণ করিলে কেন? ইহাই আমার বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে।

বন্ধুর উত্তর আসিল। লিখিয়াছে, আমরা এই জীবনেই নব নব জন্মলাভ করি—তাহা অতীব সত্য। তোমার দুগ্ধপ্রিয়তা মাংসপ্রিয়তায় এবং মাংসপ্রিয়তাও হয়তো কালক্রমে অবশেষে সাগু অথবা স্নক্তো-প্রিয়তায় পরিণতি লাভ করিয়া বিবর্তনবাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবে, স্বীকার করি। সাহিত্যের নেশা অর্থের নেশায় পর্যবসিত হইয়া শেষ পর্যন্ত যশের নেশায় দিশাহারা হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু, বন্ধু, তুমি তোমার নিজের দিকটাই কেবল দেখিতেছ কেন? আমার দিকটাও দেখ। তুমিই কেবল নব নব জন্ম লাভ করিতেছ, তোমার গুটিপোকাই কেবল প্রজাপতি

হইয়া যাইতেছে, আর আমরা স্থাণুবৎ এক স্থানে অচল হইয়া রহিয়াছি—এ কথা ভাবিলে কিরূপে ? আমিও চুপ করিয়া বসিয়া নাই, আমারও বিবর্তন ঘটিয়াছে। সংক্ষেপে, আমিও পাটের দালালি শুরু করিয়াছি। পরম্পরায় শুনিলাম, তুমিও পাট-জগতে প্রবেশ করিয়াছ, সেইজন্যই পত্র লিখিয়াছিলাম। অকারণে নয়, অতিশয় সকারণে পূর্বপত্রখানি ভূমিকাস্বরূপ ছাড়িয়া ছিলাম। আইস, উভয়ে মিলিয়া ব্যবসায় করি ! তুমি আমার বাল্যবন্ধু এবং··· ইত্যাদি।

অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। শুধু তাহাই নয়, তাহার সহিত ব্যবসায়-বন্ধনে সাগ্রহে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ পত্রও তাহাকে লিখিয়া ফেলিলাম। লক্ষ্মীদুলালকে ব্যবসায়-সঙ্গীরূপে পাইব, ইহা যে স্বপ্নাতীত ব্যাপার ! উৎসুকভাবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কয়েকদিন পরে বন্ধু প্রাণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। প্রাণকান্তের নিকট প্রায় কোন কথাই আমি গোপন রাখি না। এটিও রাখিলাম না। শুনিয়া প্রাণকান্ত অভ্যাসমত খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, লক্ষ্মীদুলাল গুঁই ? তালতলার ? সে তো পয়লা নম্বরের জোচ্চোর। শুনিয়াছি, তিনজন লোকের গলা সে অতিশয় চতুরতার সহিত কাটিয়াছে।

প্রশ্ন করিলাম, চতুরতার সহিত কাটিয়াছে মানে ?

মানে, যখন ছুরি চালাইতেছিল, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। একজন তো ভাবিয়াছিল, তাহার হিতার্থেই অস্ত্রোপচার করা হইতেছে।

লক্ষ্মীদুলালের এবম্বিধ অস্ত্রপটুতার কথা জ্ঞাত ছিলাম না। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ঢোক গিলিলাম।

প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, আমাকে ঘুণাক্ষরে কিছু না জানাইয়া তুমি গলাটা স্বচ্ছন্দে বাড়াইয়া দিলে। বেশ তো !

বলিলাম, বাল্যবন্ধু, অর্থাৎ—

বাল্যবন্ধু হইলেই যুধিষ্ঠির হইতে হইবে, কোন্ আইনে তাহা লেখে ?

আইন কোন নাই, সত্য। কিন্তু যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাকে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে আমার পক্ষে পশ্চাৎপদ হওয়া এখন শক্ত ! এক রকম অসম্ভব—মানে, ইয়ে আর কি ! দেখা যাক না, কি লেখে সে।

প্রাণকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর 'যা খুশি কর' বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

কয়েকদিন অতিশয় ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম। হে ভগবান, হে দয়াময় হরি, লক্ষ্মীদুলালের বুদ্ধিভ্রংশ কর, সে যেন কিছুতে না রাজী হয়। আমার মত ক্ষীণগ্রীব প্রাণীকে বাগে পাইলে সে তো নিমেষে শেষ করিয়া ফেলিবে।

দিন দশেক পরে লক্ষ্মীদুলালের উত্তর আসিল।

অত্যন্ত হর্ষভরে পড়িলাম - ভাই রামরতন, এখন আমি নানা ঝঞ্ঝাটে বিপন্ন, আগামী যুদ্ধেরও কোন স্থিরতা নাই। চেম্বারলেন মন্ত্রী থাকাকালীন নূতন কিছু আরম্ভ করিতে ভরসা পাইতেছি না। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে ব্যবসা ফাঁদিতে দেরি হইবে না, আপাতত উহা স্থগিত থাক্।

দুর্গা শ্রীহরি! ভগবান তাহা হইলে আছেন।

পর-মুহূর্তেই কিন্তু আস্তিক্য-বুদ্ধিতে ঘা লাগিল।

প্রাণকান্ত আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার লক্ষ্মীদুলালের খবর কি হে?

পত্র আসিয়াছে, সে রাজী নয়।

সস্মিতমুখে পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রাণকান্ত বলিলেন, চালটা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিতেছি।

কিসের চাল?

দাবার হে দাবার। দাবা খেলা না জানিলে এ দুনিয়ায় কাহাকেও দাবানো শক্ত। শেখ, দাবা খেলাটা শেখ।

খুলিয়া বল।

বর্তমানে লক্ষ্মীদুলালের যিনি মন্ত্রী, তাঁহার নাম শশী হালদার। সেই শশী হালদারের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ যিনি, তিনি আমারও সুহৃৎ, নাম—জগবন্ধু। সেই জগবন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলাম।

কি লিখিয়াছিলে?

লিখিয়াছিলাম—পরম্পরায় অবগত হইলাম যে, লক্ষ্মীদুলালবাবু নাকি আমাদের রামরতনবাবুর সহিত পার্টনারশিপে ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। রামরতনবাবুকে ভাল করিয়া চিনি বলিয়াই গোপনে তোমাকে জানাইতেছি যে, পার তো লক্ষ্মীদুলাল-বাবুকে সাবধান করিয়া দিও। রামরতনকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, এ দিকে কথায় সে নিরীহতার প্রতিমূর্তি, আসলে কিন্তু সে নর-রূপী এমডেন। বহু জাহাজ ডুবাইয়াছে। লক্ষ্মীদুলালবাবু শুনিয়াছি সজ্জন, তিনি আসিয়া রামরতনের ফাঁদে যেন পদক্ষেপ না করেন।

একটু থামিয়া প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, ফল ফলিয়াছে দেখিতেছি; তাহা ছাড়া তুমি তো চোরই, ফাঁকি দিয়া আমার নিকট হইতে কতকগুলো টাকা ওই মাতাল দামোদরটাকে ধার দিয়াছ। আমি কিছু বুঝি না যেন।

আমার বলিবার কিছু ছিল না, চুপ করিয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল, প্রাণকান্ত লক্ষ্মীদুলালের খবর পাইল কি করিয়া? বলিলাম, লক্ষ্মীদুলাল যে জুয়াচোর—এ সংবাদ তোমাকে দিল কে?

কেহ নয়, আমি জানি।

প্রাণকান্তের চক্ষু দুইটি চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সহসা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রাণকান্ত বলিয়া উঠিলেন, তোমার এ বয়সে পাটের ব্যবসা করার কোন মানে হয়? ঋণে তোমার চুল বিকাইয়া রহিয়াছে, পুনরায় ঋণ করিয়া পাটের ব্যবসা করার অর্থ কি?

লাভ হইলে ঋণ শোধ করিব।

পৃথিবীতে একদল লোক কবিতা লেখে এবং আর একদল লোক তাহা পড়ে। একদল লোক ঋণ করে এবং আর একদল লোক তাহা শোধ করে। তুমি প্রথম দলের লোক, ঋণ শোধ করা তোমার কর্ম নয়। ব্যবসা করা তোমার পক্ষে অব্যাপার।

সোজাসুজি মানা করিলেই পারিতে।

সহজভাবে মানা করিলে কেহই কিছু শুনে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ শুনিতে বাধ্য না করিলে কেহ কিছু শুনে না।

মাথা চুলকাইতে লাগিলাম। সহসা মনে একটা কৌতূহল হইল, প্রাণকান্ত ছেলেবেলায় কেমন ছিল কে জানে!

প্রাণকান্ত, ছেলেবেলায় তোমার জীবনের বিশেষত্বটা কি ছিল বল তো?

হঠাৎ?

বল না।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া প্রাণকান্ত বলিলেন, খুব ছেলেবেলায় অঙ্কে জিরো পাইতাম।

বলিয়া তিনি হাসিলেন, তাঁহার সেই চাপা কৌতুকপূর্ণ হাসি।

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। কারণ প্রাণকান্ত এম.-এ. তে গণিতে প্রথম হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানি।

আত্মদর্শন

॥ এক ॥

যাহার একদিন এত উপকার করিয়াছিলাম, সে-ই কিনা শেষকালে এই করিল—এই জাতীয় খেদ করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য অনেকেরই হইয়াছে। আমার হইয়াছে এবং আমিও হয়তো অনেকের এই জাতীয় খেদের কারণ হইয়াছি। জিনিসটা অভাবনীয় অথবা অচিন্ত্যপূর্ব নয়, এতকাল মানব-সমাজে বাস করিতেছি, মনে কড়া পড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি, এত আঘাত সত্ত্বেও মনের কোমলতা (অথবা অহমিকা) কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। দামোদরের কৃতঘ্নতায় মন বেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। দামোদর আত্মীয় বলিয়া, নানা দোষে দুষ্ট অভাবগ্রস্ত অসহায় বলিয়া একদা তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলাম এবং প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্তের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকাগুলি মিথ্যা চাতুরি দ্বারা সংগ্রহ করিয়া বিপন্ন দামোদরকে দিয়াছিলাম, এবং ইহাও মনে পড়িতেছে, বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। মূঢ়ের মত বিশ্বাস করিয়াছিলাম, দামোদর যথাসময়ে টাকাগুলি প্রত্যর্পণ করিবে এবং আমার সহৃদয়তার জন্য শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসা করিবে। প্রাণকান্ত অবশ্য ব্যাপারটা এখন জানিতে পারিয়াছে এবং ইহা লইয়া যখন-তখন তাহার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণতায় টিপ্পনীও কাটিতেছে। স্থির করিয়াছি, যেমন করিয়া হউক, প্রাণকান্তের টাকাটা পরিশোধ করিয়া দিব। 'যেমন করিয়া হউক' বলিতেছি বটে, কিন্তু উপায় একটিমাত্রই আছে—গৃহিণীর গহনাগুলি। গৃহিণী বৃদ্ধা হইয়াছেন, অলঙ্কারের আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ হয় প্রয়োজন আরও বেশি। গৃহিণীকে কি ভাবে ভুলাইয়া গহনাগুলি হস্তগত করিব, তাহাও একটা সমস্যা বটে। এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহিণীকে সম্মোহিত করিবার দুইটি অস্ত্র বেহাত হইয়া গিয়াছে। যৌবনও নাই, উপার্জনক্ষমতাও নাই। যাক সে কথা, দামোদরের কথা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

বলা বাহুল্য, দামোদর টাকাটা প্রত্যর্পণ করে নাই। শুধু তাহাই নয়, সেই বেঁটে কালো দামোদর নাকি উত্তেজনাভরে পায়ের অঙ্গুলিগুলির উপর দাঁড়াইয়া তর্জনী-

উৎক্ষিপ্ত দক্ষিণহস্ত আস্ফালন-পূর্বক আমার নামে যেখানে-সেখানে অকথ্য ভাষায় নানা মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে। আমি যে নিখুঁত লোক, তাহা বলিতেছি না, আমি দামোদরের আচরণের কথা বলিতেছি। হিসাব-মত ইহার জন্য তাহার গলায় পা দিয়া জিহ্বাটি সজোরে টানিয়া বাহির করা উচিত এবং ভোঁতা ছুরি দ্বারা পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া জিহ্বাটি আমূল কর্তন করিয়া তপ্ত তৈলে সেটি নিক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু দেশের আইন এবং আমার বর্তমান মনোবৃত্তি ইহার অনুকূল নহে। বার্ধক্যের জন্যই হউক, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই হউক, যে সকল ঘটনা প্রতিহিংসা অথবা রোষবহ্নির ইন্ধন যোগাইত, বর্তমানে সেই সকল ঘটনাই দার্শনিকতার খোরাক যোগাইতেছে। দামোদরের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার অসদাচরণ আমার নিবন্ধটির মাল-মসলা সরবরাহ করিতেছে বলিয়া তাহার প্রতি একরূপ অদ্ভুত কৃতজ্ঞতাও অনুভব করিতেছি।

বিচিত্র মানুষের মন !

॥ দুই ॥

ভাবিতেছি, মানুষ এমন করে কেন ? যাহার উপকার করিলাম, সে-ই এমন বদ্ধপরিকর কৃতঘ্ন হইয়া উঠে মনস্তত্ত্বের কোন্ নিগূঢ় নিয়ম অনুসারে ? অথচ সংগে সংগে ইহাও মনে পড়িতেছে যে, সকলে তো এমন করে না। হিরু জেলেকে কবে এক ফোঁটা হোমিও-প্যাথি ঔষধ দিয়াছিলাম, এবং ইহাও নিশ্চিত জানি যে, আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে নহে, নিতান্তই দৈবক্রমে তাহার কলিক বেদনাটি সারিয়া গিয়াছিল। হিরু কিন্তু আজও কৃতজ্ঞ। সেদিনও কুমড়ো-পাতায় মুড়িয়া কিছু মৌরলা মাছ সসংকোচে উপহার দিয়া প্রণাম করিয়া গেল। মৌরলা মাছ অবশ্য অল্পই, কিন্তু তাহার কৃতজ্ঞতার গভীরতা তো অল্প নয়।

আরও একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। বহুকাল পূর্বের ঘটনা। একবার একটা ডাক-বাংলোয় অবস্থান করিতেছিলাম। শীতকাল। সন্ধ্যার সময় বেশ একটু বর্ষা নামিয়া শীতটাকে জাঁকাইয়া তুলিয়াছিল। এমন শীতের সন্ধ্যায় যাহা প্রয়োজন, আমার বেতের বাক্সটিতে প্রায় তাহার সমস্ত আয়োজন ছিল। ধাপে ধাপে শুরু করিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম ধাপেই থামিয়া যাইতে হইল। স্টোভ জ্বালাইয়া এক পেয়ালা কড়া কফি প্রস্তুত করাইয়া মহানন্দে পান করিতেছি, এমন সময় মসমস করিয়া এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সিক্ত সাহেব আসিয়াই ডাক-বাংলোর চাপরাসীকে চায়ের ফরমাস করিলেন। চাপরাসী করজোড়ে নিবেদন করিল যে, এই অসময়ে গ্রামের সমস্ত দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চায়ের সরঞ্জামই সে সংগ্রহ করিতে পারিবে না। শুনিলাম, সাহেব যে-সে সাহেব নহেন, স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। মোটর-যোগে সফর করিতেছিলেন, প্রায় মাইলখানেক দূরে মোটর বিগড়াইয়াছে। তিনি পদব্রজে আসিয়া ডাক-বাংলোর আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার জিনিসপত্র সব মোটরে এবং তাঁহার আরদালীগণ সকলেই বানচাল মোটরের পরিচর্যায় নিযুক্ত। আমার ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। সাহেবের সহিত আলাপ করিলাম এবং সবিনয়ে বলিলাম, তিনি যদি আমার এক কাপ কফি পান করেন,

আমি অত্যন্ত বাধিত হইব। ধন্যবাদ-জ্ঞাপনান্তে সাহেব বলিলেন, থাক্, কফির প্রয়োজন নাই। আমি ছাড়িলাম না, অনেক বলিয়া-কহিয়া সাহেবকে এক পাত্র কফি পান করাইলাম এবং উগ্রতর পানীয়েরও আভাস দিলাম। সাহেব একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, তিনি ওসব চাহেন না। আমিও আর সে রাত্রে ওদিকে গেলাম না। সেই সাহেব কিন্তু এখনও ভোলেন নাই। যত দিন ভারতে ছিলেন, নানারূপে আমার প্রত্যুপকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছেন, এখন মাঝে মাঝে পত্র লিখেন এবং প্রতিবার নববৎসরে শুভেচ্ছাজ্ঞাপক কার্ড পাঠাইয়া থাকেন। এক কাপ কফির বিনিময়ে সাহেবের সৌহার্দ্য লাভ করিয়াছিলাম।

ভাবিতেছি, দামোদরেরাই এমন করে কেন?

বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

॥ তিন ॥

অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া এবং অনেক মস্তক-কণ্ডূয়ন করিয়া যে কথাটি আমার মনে উদিত হইতেছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সংকুচিত হইতেছি। একটি সংস্কৃত কথা শুনিয়াছিলাম—শতং বদ, মা লিখ। সংস্কৃতটা নির্ভুল কিনা জানি না, উক্তিটি কিন্তু অভিজ্ঞতাপূর্ণ। যাহা লিখিব, তাহা আমার বিপক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ কোথাও না কোথাও হয়তো টিকিয়া থাকিবে এবং ভবিষ্যৎ যুগের কোন দামোদর হয়তো ইহারই উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যৎ যুগের কুৎসাকামী শ্রোতাদের মনোরঞ্জন বিধান করিবে। এই লেখারই নজির দেখাইয়া বলিবে, দেখিতেছ, লোকটার বুদ্ধির দৌড়! বুঝিবে না যে, একটি লেখা কথা বা আচরণের দ্বারা মানুষের বিচার করিতে যাওয়া অদূরদর্শিতার পরিচায়ক; নির্বুদ্ধিতা কথাটা আর ব্যবহার করিলাম না। মানুষ মেঘের মত ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। তাহার পরিবর্তনশীল রূপের সমন্বয়ই সে; কোন একটা বিশেষ রূপ লইয়া বিচার করিলে ভুল হইবে।

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল দেখুন। এই তো আমাদের মহদ্দোষ। টু দি পয়েন্ট অর্থাৎ নিক্তির ওজনে আমরা কিছুই করিতে পারি না। ছুঁচা মারতেও পায়তাড়া কষি এবং মশা মারিবার জন্য কামান দাগি।

যাক, আর ভণিতা করিব না, আসল কথাটা ব্যক্ত করিয়া ফেলি। চিন্তা করিয়া দেখিলাম, দামোদর-জাতীয় লোকের উপকার করিতে গিয়া আসলে আমরা অজ্ঞাতসারে তাহাদের অপমান করি এবং তাহাদের আহত আত্মাভিমান সুযোগ পাইলেই ফোঁস করিয়া উঠে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার বোধ হয়। দামোদর এবং আমি সমশ্রেণীর লোক। ঘটনাচক্রের সামান্য ইতরবিশেষের জন্য দামোদর ভিক্ষুক এবং রামতারণ (আমি) দাতা হইয়াছি। ঘটনাচক্রের অন্যরকম ইতরবিশেষে ইহার বিপরীতটাও সম্ভব হইতে পারিত। ভিক্ষুক রামতারণের দাতা দামোদরের দ্বারস্থ হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব হইত না। কিন্তু ঘটনাচক্রের যোগাযোগে, গ্রহের চক্রান্তে অথবা পূর্বজন্মের কোন হেরফেরে, যে কোনো কারণেই হউক, একদা দামোদরকে ভিক্ষুকবেশে রামতারণের কৃপাভিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং রামতারণও বেশ আড়ম্বরসহকারেই (অর্থাৎ পরের নিকট

হইতে ঋণ করিয়াও) সেই ভিক্ষুকের প্রসারিত ভিক্ষাপাত্রে কিছু ভিক্ষা দান করিয়াছিল। কিন্তু আসলে সে কি করিয়াছিল? আসলে সে সেই ভিক্ষুকটার আত্মসম্মানের মুখে সজোরে পদাঘাত করিয়াছিল। কথায় না বলিলেও কার্যত বলিয়াছিল—ওরে অধম ভিক্ষুক, আহা তুই কষ্টে পড়িয়াছিস, তুই আত্মীয়, আয়, তোকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেছি, ভিক্ষাপাত্রটা ভাল করিয়া তুলিয়া ধর্। ভিক্ষুক তখন একটা ছদ্ম-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দন্তসার হাসি হাসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্নিবাসী মনুষ্যটি উপকার-কশাঘাতের জ্বালায় ছটফট করিয়া উঠিয়াছিল। আজ সে তাহারই প্রতিশোধ লইতেছে। উপকার তাহার নিকট কশাঘাতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, তাহার কারণ সে ও রামতারণ সমশ্রেণীর। সেও রামতারণ হইতে পারিত কিন্তু হইতে পারে নাই। ইহাই তো যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ। ইহার উপর আবার সেই রামতারণটার দ্বারেই ভিক্ষুকবেশে আসিতে হইল, এবং সে তাহাকে হাসিমুখে ভিক্ষাও দিল! এ অপমানের কি শেষ আছে, না, ইহা ভুলিবার? পরীক্ষায়-ফেল-করা ছেলে পরীক্ষায়-পাস-করা ছেলের সম্বন্ধে কোনদিনই আন্তরিক প্রেম পোষণ করে না; যে চাকরি পায় নাই সে, যে চাকরি পাইয়াছে তাহার উপর অজ্ঞাতসারেই বীতশ্রদ্ধ। বিজয়ী ও পরাজিতের সম্পর্ক কখনও মধুর হইতে পারে না। এই একই কারণে পোষ্য-আত্মীয় পোষক-আত্মীয়ের নিন্দা করিয়া সুখ পায়। অসমর্থ ভ্রাতা সমর্থ ভ্রাতার সাহায্য লাভ করিয়াও অসন্তুষ্ট থাকে এবং দোষ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া পড়ে। যে ঘটনাচক্রে অবনত, সে ঘটনাচক্রে উন্নত সমশ্রেণীর ব্যক্তিকে কখনও ভাল চক্ষে দেখে না এবং তাহার নিকট কৃপাপ্রার্থী হইতে বাধ্য হইলে মরমে মরিয়া যায়। আসলে মর্ম কিন্তু মরে না, ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে, এবং সেই অন্তর্নিরুদ্ধ জ্বালা মধ্যে মধ্যে কুৎসা-উদ্গিরণ করিয়া মর্মান্তিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যাহারা উহার মধ্যে একটু ভদ্র অর্থাৎ পালিশ-করা, তাহারা কুৎসাটা প্রকাশ্যত হয়তো উদ্গিরণ করে না, কিন্তু মনে মনে বিষাইয়া থাকে। তাহাদের বক্র হাসি, বক্র কথাবার্তা, বক্র ব্যবহার তাহাদের বিষ-বক্র অন্তরের পরিচয় বহন করে। সুতরাং সমশ্রেণীর লোকের যদি উপকার করিতেই হয়, প্রকাশ্যত করিতে নাই। গোপনে করাই শ্রেয়ঃ। ডান হাতের দান বাঁ হাতও যেন না জানিতে পারে। জানিতে পারিলেই উপকৃত ব্যক্তি তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। হতবুদ্ধি তুমি ভাবিতে থাকিবে, যাহার এত উপকার করিলাম, সে-ই কিনা শেষটা এমন করিল! তলাইয়া দেখিবে না যে, প্রত্যক্ষ উপকার করিয়াছিলে বলিয়াই এই প্রত্যক্ষ পরিণতি হইয়াছে, এবং ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি।

হিরু জেলে আমার সমশ্রেণীর লোক নহে। সে যে শ্রেণীতে বাস করে, তাহা বহুকাল হইতে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত এবং সেজন্য তাহার মনে ক্ষোভও বোধ হয় নাই। সুতরাং সে আমার নিকট হইতে যে উপকার পাইয়াছে, তাহা সকৃতজ্ঞ প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করিয়াছে। শিশু যেমন বয়স্কদের নিকট হইতে সানন্দে উপহার গ্রহণ করে এবং তদ্দ্বারা যেমন তাহার আত্মাভিমান একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, হিরুরও আত্মাভিমান তেমনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হিরু আমার সমকক্ষ নহে, সমকক্ষ হইবার কল্পনাও করে না। যে দিন করিবে, সেই দিনই এই সমস্যার উদ্ভব হইবে। সে দিনও বোধ হয় আসন্ন। হরিজনগণ ইতিমধ্যেই আমাদের সমপদবাচ্য হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে রক্ত ও সংস্কৃতির সম্পর্ক ঘটিয়া সত্য সত্যই হয়তো সমতাপ্রাপ্ত হইবেন। হিরু জেলেকে তখন অসঙ্কোচে দয়া করা চলিবে না।

সেই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সে দিন শীতসন্ধ্যায় আমার নিকট হইতে এক পেয়ালা কফি পান করা সত্ত্বেও কেন কৃতঘ্ন হইয়া উঠিলেন না তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতেছি যে, সেদিন কফি পান করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যতটা না কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাঁহাকে কফি পান করাইয়া আমি ততোধিক কৃতার্থ হইয়াছিলাম ! অর্থাৎ সে দিন দয়ার্দ্র ভদ্র আমি শীতপীড়িত একজন মনুষ্যকে কফি পান করাই নাই, গদগদ দাসমনোভাব-সম্পন্ন আমি একজন সাহেবকে কফি পান করাইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। কই, শীতার্ত চাপরাসীটার কথা তো আমার মনে পড়ে নাই। সুতরাং সাহেবকে আমি কৃপা করি নাই, সাহেবই আমাকে কৃপা করিয়াছিল। কৃতঘ্ন হইতে হইলে আমারই হওয়া উচিত, এবং চিন্তা করিয়া সলজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি যে, কৃতঘ্ন হইয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে সেই সাহেবটার উপর নয়, সমস্ত সাহেব জাতটার উপর মনে মনে চটিয়া আছি। তাহারা দয়া করিয়া আমাদের কাপে আমাদের প্রদত্ত কফি পান করিতেছে, বিনিময়ে পিঠ চাপড়াইয়া ধন্যবাদ দিতেছে, নানা রকমে উপকার করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং আমাদের এই জাতিগত দুর্বলতাজনিত অস্বস্তি নানা ভাবে আমরা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছি। আমাদের তথাকথিত স্বদেশপ্রেমের মূল কথা বোধ হয় ইহাই। অর্থাৎ ইংরেজ সম্পর্কে সকলেই আমরা দামোদর। হয়তো—

চিন্তাস্রোত ভিন্নমুখী হইল।

একটি ছোট মাটির ভাঁড় হস্তে প্রাণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং চেয়ার টানিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

॥ চার ॥

ভাঁড়টি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাড়িতে পুরাতন চাউলের জ্বালা আছে ?

থাকা সম্ভব। কেন বল তো ?

তাহা হইলে তাহার ভিতর এই কাগজটি সযত্নে রাখিয়া দাও। চালের ভিতর বেশ করিয়া ঢুকাইয়া রাখিও।—বলিয়া একটি কাগজ তিনি পকেট হইতে বাহির করিলেন।

কি ওটা ?

হ্যাণ্ডনোট। পড়িয়া দেখ।

দেখিলাম, লেখা আছে—দামোদর চৌধুরী প্রাণকান্ত বিশ্বাসের নিকট হইতে শতকরা ছয় টাকা হার সুদে দেড় হাজার টাকা কর্জ করিতেছে। বিস্মিত হইলাম, ব্যাপার কি ?

নির্বিকার প্রাণকান্ত বলিলেন, হ্যাণ্ডনোটটি জাল। দামোদরের নিকট হইতে টাকাটা আদায় করিতে হইবে তো। হ্যাণ্ডনোটের জালরূপ লোপ করিবার জন্য পুরাতন চাউলের মধ্যে ওটিকে কিছুকাল রাখিতে হইবে—অভিজ্ঞদের ইহাই মত।

চিন্তিতকণ্ঠে বলিলাম, জাল ?

সইটা জাল নয়। দামোদরেরই স্বহস্তের সহি। কোন চতুর ব্যক্তির সহায়তায় মাতালটাকে মদ খাওয়াইয়া সাদা কাগজে সহি করাইয়া লইয়াছি। উপরের অংশটুকু অপরের লেখা।

চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রাণকান্ত পুনরায় বলিলেন, দুই মাস পরে নালিশ করিব। ইতিমধ্যে টাকার জন্য তাহাকে তাগাদা কর।

আমাকে নির্বাক দেখিয়া প্রাণকান্ত একটু উষ্মাভরেই বলিলেন, দেখ, তোমার ওসব ফিলজফি-টফি ছাড়। ঐ করিয়াই তুমি নিজে ডুবিয়াছ, আমাকেও ডুবাইতেছ। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—এটাও কিছু তুচ্ছ করিবার মত ফিলজফি নহে। চাণক্য লোকটা নিতান্ত বোকা ছিলেন না। সাপের মাথায় লগুড়াঘাত করাই সনাতন পদ্ধতি। লগুড় লইয়া মাথা ঘামাইতে গেলে সর্পাঘাতে মৃত্যু অবধারিত। এখনই গিয়া চালের জালার মধ্যে কাগজটি পুরিয়া ফেল। দামোদর-ভুজঙ্গকে বশে আনিবার উহাই একমাত্র মন্ত্র।

হঠাৎ নজরে পড়িল, মাটির ছোট ভাঁড়টি হইতে কতকগুলি কেঁচো বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রাণকান্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া কেঁচোগুলিকে ভাণ্ডস্থ করিতে করিতে হাসিয়া বলিলেন, দেখ, কেঁচো নিরীহ, জলের মধ্যে মাছও নিরীহ। কিন্তু যিনি কেঁচো ও মাছ সৃজন করিয়াছেন, তিনিই, কি উদ্দেশ্যে জানি না, আমার মধ্যেও মৎস্য-লোলুপতা ও বুদ্ধির সমাবেশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি নিরুপায়। বঁড়শিবিদ্ধ নিরীহ কেঁচোর টোপ ফেলিয়া প্রলুব্ধ নিরীহ মৎস্যকে গাঁথিয়া ডাঙায় আমাকে তুলিতেই হইবে। তোমার দামোদরটি কিন্তু গভীর জলের মৎস্য, সাধারণ টোপ সে গিলিবে না, তাই জালের ব্যবস্থা করিয়াছি। ওটাকে আজই জালায় পুরিয়া ফেল।

বলিলাম, তোমার বাড়িতে চালের জালা নাই ?

আছে। কিন্তু জালার সন্নিকটে গৃহিণীও আছেন। গৃহিণীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া জালার নিকট যাওয়া হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতে যাওয়ার অপেক্ষাও শক্ত। তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিবারও উপায় নাই, তিনি ধর্মপ্রাণা রমণী, অনর্থক একটা হৈ-চৈ বাধাইয়া বসিবেন। যাঁহার সহিত এতকাল বাস করিয়াছি এবং বাকী জীবনটাও বাস করিতে হইবে, তাঁহার সহিত চটাচটি করিয়া সুখ নাই। তাহা ছাড়া, তাঁহার জ্ঞাতসারে এমন কার্য করাও ঠিক নহে, যাহাতে আমার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা লাঘব হইবার সম্ভাবনা। তুমিই এটুকু কর ভাই।—বলিয়া প্রাণকান্ত উঠিলেন।

কোথায় যাইতেছ ?

আঢ্যদের শ্যাম-সায়রে। শুনিয়াছি, সেখানকার রোহিতমৎস্যগুলি সত্যই নাকি অপরূপ। একদিনের জন্য ছিপ ফেলিবার অনুমতি পাইয়াছি।

এমন সময় দেখা গেল, আমার গৃহিণী সদলবলে অর্থাৎ পুত্রবধূ-নাতি-নাতনী সমভিব্যাহারে খিড়কি-দরজা দিয়া নির্গত হইলেন। নাতনির বগলে পানের বাটা দেখিয়া বুঝিলাম, পাড়ায় কোন বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আসর বসিবে।

প্রাণকান্ত বলিলেন, এইবার যাই, দেরি করা ঠিক হইতেছে না। তুমি এমন সুযোগ নষ্ট করিও না।

মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম এবং পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। শেষকালে জালিয়াতির সহায়তা করিব ? দামোদর টাকা লইয়াছে তাহা ঠিকই, কিন্তু এই দলিলখানা তো মিথ্যা। দেড় হাজার টাকাটাই কি বেশি ! মাত্র দেড় হাজার টাকার জন্য সত্য-পথভ্রষ্ট হইব ? সত্যনিষ্ঠার স্বপক্ষে বিবেক অনেক যুক্তি যোগাইতে লাগিল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেলাম।

চেতনা হইলে দেখিলাম, জালার ভিতর হাত পুরিয়া কাগজখানা চাউলের তলায় রাখিতেছি। দেড় হাজার টাকার জন্য নয়, দামোদর আমার নামে কুৎসা প্রচার করিতেছে বলিয়াই তাহার শাস্তি হওয়া উচিত !

আত্মদর্শন করিয়া চমকিত হইলাম।

চিরন্তনী

সকাল হইতে লক্ষ্য করিতেছি, প্রিয়া-মুখচন্দ্র আবৃত করিয়া মেঘসঞ্চার হইয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। গর্জন-বর্ষণ আশঙ্কা করিতেছি এবং ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছি। পূর্বে উতলা হইতাম, আজকাল গৃহিণীর ভাবান্তরে শঙ্কিত হইয়া পড়ি ! বিষণ্ন অন্তরে চিন্তা করিতেছি, এই ভাবান্তরের কারণ আমিই কি না, তাহাই সর্বাগ্রে জ্ঞাতব্য। এই বয়সে গৃহিণীর বিরাগভাজন হইবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং জ্ঞাতসারে এমন কিছু করি না, যাহা মেঘজনক। কিন্তু 'অজ্ঞাতসারে' বলিয়াও তো একটা কথা আছে, এবং এ সংসারে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া এই সার-তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছি যে, অপরাধ এড়াইবার সাধ্য মানুষের নাই। কায়, মন অথবা বাক্য দ্বারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সর্বদাই কাহারও না কাহারও নিকট অপরাধী হইয়া পড়িতেছি। মানব-মনে ক্ষমা নামক সদ্‌গুণটির অস্তিত্ব না থাকিলে জীবনযাপন করা দুরূহ হইয়া উঠিত। বস্তুত গৃহিণীর নিকট জীবনে বহু প্রকারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া এই ধারণাই আমার মনে বন্ধমূল হইয়াছে যে, তাঁহাকে বিবাহ করাটাই আমার পক্ষে অপ্রতিষেধ্য গুরুতম অপরাধ এবং আজীবন ক্ষমাভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। তাহাই করিয়া চলিয়াছি। আজিকার এই ভাবান্তর কি জাতীয় এবং কি ভাবে অগ্রসর হইলে সুরাহা হইবে তাহাই ভাবিতেছিলাম, এমন সময় রঙ্গমঞ্চে বেণী দোলাইয়া 'গেজেট' অবতীর্ণা হইলেন। শুধু অবতীর্ণা হইলেন নয়, সমস্যাটির উপর আলোকপাতও করিলেন। আমার নয় বৎসরের দৌহিত্রীপ্রবরা পাড়ার সকলের হাঁড়ির খবর রাখেন, সুতরাং এ খবরটি যে রাখিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! চোখ মুখ রহস্যময় করিয়া ক্ষণ-কুহরের নিকট মুখখানি রাখিয়া বলিলেন, জান দাদু, মামা মামীকে এত্ত ভালবাসে !

উহার মামা মানে আমার পুত্র। সে একদিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছিল। আজ চলিয়া গিয়াছে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সে ভাগিনেয়ীর নিকট তাহার পত্নী-প্রেমের পরিচয় কি করিয়া রাখিয়া গেল, জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলাম।

বলিলাম, যাঃ, বাজে কথা ! কক্ষণও হতে পারে না।

নিশ্চয় বাসে। তা না হলে অমন একটা কাপড় আনলে কেন ?

কি কাপড় ?

ও, তা জান না বুঝি ! মামা মামীমার জন্যে এমন একটা শাড়ি এনেছে এত্ত সুন্দর ; যেমন পাড়, তেমনই রঙ—জান দাদু, লুকিয়ে এনে দিয়েছিল, আজ হঠাৎ মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

যেন ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এমনই মুখভাব করিয়া বলিলাম, বটে! তারপর?

তারপর সব জানাজানি হয়ে গেছে এখন। মামীর সে কি লজ্জা! মামীর ভয় হয়েছিল, দিদি বুঝি বকবে। দিদি বকতে যাবে কেন শুধু শুধু? এতে কেউ কখনও বকে, তুমিই বল না দাদু? সত্যি দিদি কিছু বকলে না, খালি বললে—বেশ তো।

এমন সময় লক্ষ্য করিলাম, দ্বারপ্রান্তে চাটুজ্জে-বাড়ির মন্টু চট করিয়া উঁকি মারিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মন্টু আমার নাতিনীর সমবয়সী। এই উঁকির মধ্যে কি ইশারা ছিল বলিতে পারি না, নাতিনীও একছুটে বাহির হইয়া গেল। খানিকক্ষণ তাহার অপেক্ষায় রহিলাম। সে ফিরিল না, সম্ভবত মন্টুর সংগে খেলায় মাতিয়াছে। আমিও চিন্তার খেলায় মাতিলাম। নাতিনী উপরোক্ত সমস্যাটির উপর আলোকপাত করিয়া গিয়াছিল। অন্তত সে আলোক এত যথেষ্ট যে, তাহা লইয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বেশ খানিকক্ষণ মাথা চুলকানো চলে।

॥ দুই ॥

অর্থশাস্ত্রের দিক দিয়া চিন্তা করিলে পুত্রের এবম্বিধ অপব্যয়-প্রবণতার নিন্দা করিতে হয়। বধূমাতার শাড়ির অভাব নাই, আবার শাড়ি কেন? অপব্যয়-প্রবণতা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়, কিন্তু আমার গৃহিণীর মন-খারাপের অর্থ অর্থশাস্ত্রে নিহিত আছে—এ কথা স্বীকার করিতে মন ইতস্তত করিতেছে। এই রমণীটির সহিত বিগত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করিতেছি। ইহার চরিত্রে অন্যান্য নানা সদ্‌গুণ অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু অর্থশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়াছি বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। বরং যতদূর মনে পরিতেছে, আমরা উভয়েই অর্থশাস্ত্র নয়, অনর্থ-শাস্ত্রের চর্চাতেই জীবনপাত করিয়াছি। অর্থশাস্ত্রের সাধারণ বিধানগুলিকে বারম্বার অমান্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আমাদের। আজ সহসা অর্থশাস্ত্রের যাথার্থ্য হৃদয়ংগম করিবার মত মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ কথা মনে করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে মন-খারাপের কারণ কি? অর্থশাস্ত্র ছাড়িয়া ন্যায়শাস্ত্রের দিক দিয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলাম। পত্নীকে শাড়ি কিনিয়া দেওয়া কি অন্যায়? নিরপেক্ষভাবে উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, না। প্রাক্‌জীবনে নিজেও বহুবার এ কার্য করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা গৃহিণীর বিরাগ নয়—অনুরাগই উৎপাদন করিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে। বস্তুত পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা কোন উপহার দিয়াছে—এই অতিশয় ন্যায়সংগত কার্যকে গৃহিণী দূরের কথা, কোন তীক্ষ্ণতম ন্যায়চঞ্চুও বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ করি।

তাহা হইলে—! সহসা লক্ষ্য করিলাম, অতিশয় ভুল পথে চলিতেছি। এ পথে চলিলে একটা নৈতিক তর্কজালে বিজড়িত হইয়া পড়িব মাত্র, আর কোন লাভ হইবে না। আসল কথা হইতেছে, মন-খারাপ হয় কিসে? যাহা অন্যায় এবং অসংগত, তাহা দেখিয়াই যে আমরা সকল সময় বিরক্ত হই, তাহা তো নয়। আমাদের ভাল-লাগা মন্দ-লাগার নিক্তিতে ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা সব সময়ে চলে না। গ্রীষ্মকালে উত্তাপাধিক্য এবং

বর্ষাকালে সলিল-বহুলতা ন্যায়সংগত বলিয়াই আনন্দজনক নহে। বরং ইহাই সত্য কথা, যাহা বিরক্তিকর তাহা ন্যায়সংগত হইলে আরও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। তাহাকে গালি দিবার অথবা প্রতিরোধ করিবার ন্যায্য উপায় না থাকায় তুংগী ক্রোধ নিরুদ্ধ আক্রোশে গুমরাইয়া মরে। হয়তো পুত্রের এই কার্য অতিশয় ন্যায়সংগত বলিয়াই গৃহিণীর মনোকষ্টের কারণ হইয়াছে। ইহা যদি আইন-অনুযায়ী প্রতিবাদযোগ্য হইত, তাহা হইলে হয়তো এ অশান্তি হইত না ; এমন কি পুত্রের এই অন্যায় অন্যায়ভাবে ক্ষমা করিয়াই গৃহিণী সুখী হইতেন। কিন্তু মনোকষ্ট হইল কেন ? হেতুটা কি ?

সহসা মনে হইল, ভুতোর সাহায্য ব্যতিরেকে এই অন্ধকারে কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাইব না। অবিলম্বে তাহাকে ডাকিলাম এবং তামাক দিতে বলিলাম।

॥ তিন ॥

তাম্রকূটের বুদ্ধি-বিকাশিনী শক্তি আছে কি না জানি না, অন্তত সে সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক মন্তব্য করিতে আমি অপারগ। কিন্তু ইহা ঠিক যে, উপর্যুপরি দুই ছিলিম শেষ করিয়া তৃতীয় ছিলিমের প্রারম্ভে মনে হইল, অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অকস্মাৎ মুদিত নয়নের সম্মুখে একটি ষোড়শী তন্বী মূর্তিপরিগ্রহ করিল। নবযৌবনের যাদুমন্ত্রে লাবণ্যময়ী মোহিনী মূর্তি, কিন্তু চোখে জল। গভীর নিশীথে একা বসিয়া কাঁদিতেছে। সম্মুখে ভাত ঢাকা রহিয়াছে। একটু পরে এবং একটু অপ্রস্তুতভাবে তাহার স্বামী আসিয়া প্রবেশ করিল এবং গলা খাঁকারি দিয়া সসংকোচে বলিল, মানে, একটু রাত হয়ে গেল।

তন্বী নীরব।

যুবক আড়চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া সম্ভবত কৈফিয়ৎস্বরূপ বলিল, কমলদার ওখানে, মানে—ও কি, তুমি কাঁদছ নাকি ?

ন্যায়সংগত মীমাংসার অবকাশ না দিয়া মেয়েটি বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং পাশ-বালিশ আঁকড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া যুবকটিও বিছানায় বসিল এবং আকুলভাবে যে সব কাণ্ড করিতে লাগিল, তাহার বর্ণনা করিতে পারিব না। কারণ সেগুলি বর্ণনীয় নহে, অনুমেয়। মোট কথা, যুবকটির বাহাদুরি আছে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, মিনিট দশেকের মধ্যেই সে পত্নীর মুখে হাসি ফুটাইয়া ছাড়িল। ঢাকা-দেওয়া-ভাত আহারান্তে পান চিবাইতে চিবাইতে যুবকটি যখন শয়ন করিল, তখন পত্নী পতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বহুবারপৃষ্ট সেই প্রশ্নটি পুনরায় করিল, বল, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না ? কক্ষণও বাসবে না ? কক্ষণও না ?

অবিচলিত-কণ্ঠে যুবক বহুবার-প্রদত্ত সেই উত্তরটি পুনরায় দিল, পাগল

তোমার কমলদাকে বেশি ভালবাস, না, আমাকে ?

তোমাকে।

সত্যি বলছ ?

সত্যি।

॥ চার ॥

বাড়ির ভিতর গেলাম। শুনিলাম, গৃহিণী ঠাকুর-ঘরে। ধীর পদসঞ্চারে গিয়া দেখিলাম, ঠাকুরের সম্মুখে পট্টবস্ত্র-পরিহিতা নারী উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। পাথরের ঠাকুরকে ঘিরিয়া নানা উপচার—থরে থরে ফুল ফল নৈবেদ্য, ধূপধূনা নীরবে পুড়িতেছে, ঘৃত-প্রদীপের অকম্পিতা শিখা ঊর্ধ্বমুখিনী। নারী-হৃদয় একা থাকিতে পারে না। অবলম্বন চাই, আঁকড়াইয়া ধরিবার মত কিছু একটা চাই,—এমন একটা কিছু, যাহা চিরকাল তাহারই থাকিবে, অপর কাহারও হইবে না। রক্তমাংসে-গড়া নির্মম মানুষ থাকে না, চলিয়া যায়। সে চিরপরিবর্তনশীল, নিত্য নূতন নিগড় পরিতেছে ও ভাঙিতেছে। পাথরের দেবতা অনড়, অচল, অবিচলিত।

চিরন্তন প্রস্তর-দেবতার পদপ্রান্তে চিরন্তনী নারীকে অবনমিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মানসপটে আবার সেই পুরাতন দৃশ্যটি ফুটিয়া উঠিল। তন্বী ষোড়শী স্বামীর গলা জড়াইয়া বলিতেছে—বল, তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাস না? কক্ষণও বাসবে না? কক্ষণও না?

নিবিড় পরিচয়

॥ এক ॥

যুগলবাবু লোকটিকে আগে অবশ্য চিনিতাম, অল্প দিন হইতে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। কিছুকাল পূর্বে ভদ্রলোক সুগন্ধি কেশতৈলের ব্যবসায় করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখনও সে প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু অধুনা গোপনে গোপনে (কেন যে গোপন করিতেছেন, জানি না) তিনি কেরোসিন তেলের ব্যবসাতেও লিপ্ত হইয়াছেন শুনিতেছি। চোরাবাজারেও যাতায়াত আছে। রাই কুড়াইয়া একটি নয়, কয়েকটি বেলই তিনি বানাইয়াছেন—এইরূপ জনশ্রুতি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অর্থবান বলিয়া ভদ্রলোকের এতটুকু অহমিকা নাই, তাঁহার নিজের হৃদয় তো সর্বদাই গলি-গলি করিতেছে, তাঁহার সংস্রবে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও নিস্তার পান নাই—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

আসিয়াই বলিলেন, একটা সিগারেট দিন।

দিলাম। সিগারেট ধরাইয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে একতাড়া নানা রঙের খামের চিঠি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, পঁচিশ জনের চিঠি; বাড়িতে আরও অনেক আছে।

উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সহসা বক্তৃতা দিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এই বাই আমার আছে এবং একবার চাগিলে রোধ করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সোৎসাহে বলিলাম, একটি বক্তৃতা দিব শুনিবেন কি?

সিগারেটে টান মারিয়া যুগলবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। বলুন বলুন, আপনার কথা শুনিতে আমার বেশ লাগে।

হাঁটু দোলাইতে লাগিলেন। আমিও গলা-খাঁকারি দিয়া শুরু করিলাম, দেখুন, পুরাকালে ফুলবাগানের শখ ছিল। শখ ছিল, কিন্তু সুবিধা ছিল না। যে বস্তু থাকিলে

মানবের অধিকাংশ আধিভৌতিক অসুবিধাই বিদূরিত হয়, সেই বস্তুটিরই অভাব ছিল—টাকা ছিল না। অল্প মাহিনায় সর্বদিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে যে সকল কলাকৌশল ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্ব সরলতা-কপটতার চর্চা করিতে হয়, আমাকেও সে সকল করিতে হইয়াছিল। দারুণ দুর্যোগের মধ্যে ফুটা সংসার-তরণীটাকে ময়ূরপঙ্খীর মত সাজাইয়া সগৌরবে যে বিদ্যার জোরে সেটি তীরস্থ করিয়াছি, তাহাকে ভোজবিদ্যা আখ্যা দিলে অসঙ্গত হইবে না। বাকচতুর বাজিকর অন্যমনস্ক দর্শকের মূঢ়তার সুযোগ লইয়া যেভাবে অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়া দেখায়, অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত আমিও সম্ভবত ভোজবিদ্যাবলে বলীয়ান হইয়াই সেই ভাবে বাহিরের ভড়ং বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই জাতীয় কোন একটা অঘটন-পটিয়সী নিপুণতা না থাকিলে আমার অল্প আয় সত্ত্বেও শোভনতার মর্যাদা রক্ষা করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ কোন নিমন্ত্রণ বাড়িতে অথবা থিয়েটার-সিনেমায় গৃহিণীকে বেশবাস-অলংকার-দৈন্যে কখনও বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইতে হয় নাই, বাড়ির ভোজ-কাজে শাকভাজা চচ্চড়ি হইতে শুরু করিয়া লুচি, পোলাও, দইমাছ, মাছের কালিয়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মাংসের কোর্মা, কাটলেট, চপ, দ্বিবিধ ডাল, চাটনি, দই, পায়েস, রসগোল্লা, সন্দেশ, বুঁদিয়া, জিলাপি, পুডিং, কাস্টার্ড প্রভৃতি শালপাতার উপর থরে থরে সাজাইয়া হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীস্টান তিনটি সভ্যতারই মান-রক্ষা করিয়াছি, নিজের দরিদ্র আত্মীয় অথবা আত্মীয়াকে অকারণে কখনও কিছু কিনিয়া দিবার সামর্থ্য হয় নাই বটে, কিন্তু লৌকিকতা-ব্যাপারে ছোট নজরের পরিচয় দিয়াছি—অতি বড় শত্রুও এ কথা বলিতে দ্বিধা করিবে। সংক্ষেপে চিঠির ভাষা ও ভাব যেমনই হউক না কেন (তাহা লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না), চিঠির কাগজ, বিশেষত চিঠির লেফাফা দ্বারা সকলকে সম্মোহিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি। এই অসাধ্যসাধনের ইতিহাস একাধিক কুসীদজীবী মহাজনের খাতায় কড়ায় ক্রান্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়া আছে।

অভিভূত যুগলবাবুর হাঁটু-নাচানো বহুক্ষণ পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সুযোগ পাইয়া তিনি কণ্ঠাগত প্রশ্নটিকে বাঙ্ময় করিলেন, "সবই বুঝিলাম, কিন্তু যাহা বলিলেন তাহার সহিত আমার এই চিঠিগুলির সম্পর্ক কি?"

সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই। বক্তৃতা দিতে হইলে অবান্তর কথা দুই-চারিটা অনিবার্য-ভাবেই আসিবে, উহাতে কিছু মনে করিবেন না। আসল কথা, ফুলবাগানের শখ ছিল। কিন্তু তখন সমাজের যে স্তরে বিরাজ করিতাম, সে স্তরে এ শখের মূল্য কেহ দিত না; সুতরাং ইহার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। দামী জুতা, শাল, গহনা অথবা শাড়ির জন্য অর্থ জুটাইতে হইত, কারণ সেগুলি প্রতিবেশীগণের অন্তরে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এবং হিংসার উদ্রেক করিয়া বিচিত্র পদ্ধতিতে আমাদের সুখোৎপাদন করিত। সংক্ষেপে ফুলবাগানের জন্য উদ্বৃত্ত বিশেষ কিছুই থাকিত না, এবং উঠানের এক কোণে অপরের নিকট হইতে চাহিয়া-আনা কয়েকটি ফুলগাছ পুঁতিয়া সসংকোচে মনের শখ মিটাইতাম। আমার সেই নগণ্য বাগান কোন লোকের প্রশংসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই বটে, কিন্তু সে যুগের আমার লেফাফা-লাঞ্ছিত জীবনে উঠানের সেই ছোট বাগানটুকুই আমার প্রাণের সত্যকার আশ্রয় ছিল। ওইটুকুর মধ্যেই কোন লেফাফা ছিল না। বস্তুত সেই ছোট বাগানটিকে আজও আমি ভুলি নাই। সর্বসমেত বোধ হয় গুটি দশেক গাছ ছিল, কিন্তু প্রত্যেক গাছের প্রত্যেক পাতাটি আমি চিনিতাম। প্রতি গাছের প্রতি ফুলটির

উন্মেষ হইতে অবসান পর্যন্ত লক্ষ্য করিতাম। কোন্ গাছে কখন কুঁড়ি হইল, কুঁড়িটি কতদিনে ফুটিয়া ফুল হইল এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িল—কিছুই আমার দৃষ্টি এড়াইত না। প্রত্যেক গাছের প্রতিটি আচরণ সাগ্রহে দেখিতাম। মনে হইত, উহাদের ভাষা যেন আমি বুঝি। প্রথম যেদিন গোলাপ গাছটায় কুঁড়ি হইল, সেদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে। মনে হইয়াছিল, গোলাপ গাছটার ডালে ডালে পাতায় পাতায় বেশ যেন একটু অহংকার ফুটিয়া উঠিয়াছে, বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া যেন বলিতেছে—কেমন কুঁড়ি হইয়াছে, দেখিতেছ তো!

সেই ফুল ফুটিয়া যখন ঝরিয়া গেল, তখন তাহার নীরব শোকও আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। তাহার পর দ্বিতীয় ফুলটি যখন ফুটিল, তখন তাহারও মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু তাহা বিষন্ন সশঙ্ক। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে। প্রতিদিন দুই-একটি ফুল ফুটিত, দুই-একটি ঝরিত। প্রতি গাছটির হাসি-কান্না আমি শুনিতে পাইতাম। আমার বাগান নগণ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহাতেই আমি তন্ময় হইয়া থাকিতাম।

যুগলবাবু ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত করিয়া একবার আমার প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া আমি পুনরায় শুরু করিলাম, তাহার পর অনেক দিন কাটিয়া গিয়াছে। আমার প্রথম জীবনের অর্থকৃচ্ছ্রতা আর নাই। বাগান বড় করিবার মত আর্থিক সংগতি হইয়াছে এবং সত্য সত্যই বাগানকে বিস্তৃত করিয়াছি। এখন আমার বাগানখানা ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে অন্ততপক্ষে এক বেলা কাটিয়া যায়। অনেকখানি জমি, অনেক রকম যন্ত্র, অনেক রকম গাছ, অনেকগুলি মালী জুটাইয়া বাগানের খ্যাতি বাড়াইয়াছে। আভিজাত্য-গর্বিত বহু দুর্লভ ফুল আমার বাগান আলো করিতেছে; কিন্তু আমার সেকালের সেই ছোট বাগানের শীর্ণ গাঁদা, কীটদষ্ট গোলাপ, অপরিপুষ্ট মল্লিকা, আলোক-বঞ্চিত রজনীগন্ধাকে আজিও ভুলি নাই। তাহাদের যত ভালবাসিতাম, ইহাদের তত ভালবাসি না। ইহাদের আমি চিনিই না। এই ভিড়ের সহিত আমার প্রাণের পরিচয় নাই। সহস্র সহস্র ফুল রোজ ফুটিতেছে ও ঝরিতেছে—খবর রাখা আর সম্ভবপর নহে। ইহাদের সকলের কুল, গোত্র, বংশপরিচয়, বৈশিষ্ট্য অবশ্য অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি। আপনিও পারিবেন, কারণ যে কোন ভাল ক্যাটালগে তাহা আছে। শুধু ফুল কেন, বইয়ের কথাই ধরুন না। সেকালে যখন বই কিনিবার ক্ষমতা ছিল না, অপরের বই চাহিয়া অথবা চুরি করিয়া যখন পড়িতে হইত, তখন কি আগ্রহেই না পড়িতাম! প্রত্যেকটি পুস্তকের সহিত, প্রতি পুস্তকের প্রতি পাতাটির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। এখন নিজের লাইব্রেরি প্রকাণ্ড, প্রতিমাসে নানা দেশের বিখ্যাত লেখকদের বই কেনা হইতেছে, কিন্তু সে আগ্রহ তো আর নাই। আলমারিতে সারি সারি বই জমিতেছে, অধিকাংশ পুস্তকেরই বাহিরের সৌষ্ঠব দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছি, হয়তো দুই-একখানা খুলিয়া দুই-চারি-পাতা উল্টাইতেছি, উহাদের সম্বন্ধে দুই-চারিটা ধার-করা জ্ঞানগর্ভ বুলিও হয়তো আওড়াইতে পারি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না। যাহাদের চিনি, বহুপূর্বেই তাহাদের চিনিয়াছি। নূতন করিয়া চিনিবার আগ্রহ আর নাই। এখন যাহা আছে, তাহা সংগ্রহ করিবার আগ্রহ।

যুগলবাবু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, এ চিঠিগুলার সম্বন্ধে কি বলিতে চান?

বলিতে চাই, আপনার বাগান অথবা লাইব্রেরিটি মন্দ নয়। ইংরেজী ভাষায় যাহাকে বলে, এ গুড কালেকশন্। শত বাধাসত্ত্বেও কখনও লুকাইয়া কাহাকেও যদি ভালবাসিয়া থাকেন (বাসিয়াছেন কি না জানি না), তাহা হইলে সেই একমাত্র ভালবাসা যাহা সত্য, এবং তাহাকে যদি আপনি সত্য-মর্যাদা না দিয়া থাকেন ঠকিয়া গিয়াছেন।

বাকিগুলি ?

বাকিগুলি আপনার অর্থ, খ্যাতি অথবা রূপের টানে স্বতই জুটিয়াছে অথবা আপনি জুটাইয়াছেন। বলিলাম তো, গুড কালেক্শন। কিন্তু উহারা আমার বর্তমান বাগানের ফুলের মত। আয়ত্তের মধ্যে থাকিয়াও অনায়ত্ত।

কেন ?

আসল কথা কি জানেন ? আমরা যতই বড়াই করি না কেন, আমাদের প্রাণ সত্যই এত বড় অথবা মজবুত নহে যে, একাধিক নিবিড় পরিচয়ের ধাক্কা সামলাইতে পারে। সত্যকার প্রেম বড় সঙ্গীন বস্তু। অধিকাংশ লোকের জীবনে তাহা আসেই না। কিন্তু মজা এই যে, অধিকাংশ লোকই একাধিক রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া মনে করেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই আদি-অন্ত তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছেন। আসলে আমরা প্রায় সকলেই দরিদ্র দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, পিটুলি-গোলা পান করিয়া উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিতেছি।

এই পর্যন্ত বলিয়া সহসা অত্যন্ত দমিয়া গেলাম। সহসা মনে পড়িয়া গেল, প্রাণকান্তের নির্বন্ধাতিশয্যে সন্ধ্যাবেলায় এক গ্লাস সিদ্ধি পান করিয়াছি। বিবেকের ধমকে কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। বার দুই ঢোক গিলিলাম। যুগলবাবু বলিলেন, দিন মশাই, আর একটা সিগারেট দিন।

দিলাম।

যুগলবাবু সিগারেটটি ধরাইয়া সন্দিগ্ধভাবে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। আমার মনে হইতে লাগিল, আহা, লোকটি মানুষ না হইয়া যদি গাছ হইত, বাগানে পুঁতিয়া রাখিতাম।

অবচেতনা

॥ এক ॥

বহুকাল পরে একটি বাল্যবন্ধুর সহিত দেখা হইল এবং বহুকাল পরে প্রাণ ভরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়া ভারি আরাম বোধ করিলাম। কিন্তু সেই আরামজনক কথাগুলি যদি আপনাদের বলি, আপনারা কেহ হয়তো বিস্মিত হইবেন, কেহ বিস্মিত হইবার ভান করিবেন, কাহারও নাসা হয়তো কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে। হওয়াই উচিত ; কারণ যে আলাপগুলি করিলাম, তাহা ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান অথবা সমাজনীতি-বিষয়ক তো নহেই, উপরন্তু দুর্নীতিমূলক—সামাজিক কর্ণগোচরযোগ্য নহে। আমার পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয় কেহ এরূপ আলোচনা করুক, তাহা আমি চাহি না। নিজে কিন্তু করিয়া ভারি তৃপ্তি পাইলাম। অনেকদিন পরে মনটা যেন খোলসা হইয়া গেল।

সকলের নাসাই যে কুঞ্চনপ্রবণ নহে, তাহা জানি ; আমি বাল্যবন্ধুটির সহিত কি আলোচনা করিলাম, তাহা জানিবার জন্য অনেকেই হয়তো উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্তু কি করিব, উপায় নাই । সংস্কারে বাধিতেছে । এখনও জামা-কাপড় পরিয়া রাস্তায় বাহির হই, নুটবিহারী-মুখনিঃসৃত অশ্লীল বচনগুলি অনাবৃতভাবে লিখিয়া ফেলিবার মত সৎসাহস সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। লেখা দূরে থাকুক, সকলের নিকট সে কথাগুলি বলিতেও বাধিবে। ইহা কিন্তু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, সকলের কাছে বলিতে না পারিলেও কথাগুলি শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি। পুলকিত হইয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি না এই কারণে যে, আমি জানি, অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট অশ্লীল কথা বলিয়া অথবা শুনিয়া (অথবা দুইই করিয়া) যাঁহারা পুলকিত হন, তাঁহারা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? আমরা যাহাদের সহিত অশ্লীল প্রসঙ্গ করিতে পারি, তাহারা আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ। অতিশয় শ্লীল ভদ্রব্যবহার ও সম্ভ্রমপূর্ণ শিষ্টাচার-সংগত যাঁহারা, তাঁহাদের কিন্তু আমরা বৈঠকখানা হইতেই বিদায় করি। অন্তরলোকে স্থান দিই তাহাদের, যাহাদের নিকট আমরা আবরণ উন্মোচন করিতে পারি। অধিকাংশ লোকের নিকট মন এবং মুখ খোলা চলে না তাহা সত্য ; কিন্তু যাহাদের নিকট খোলা চলে, তাহারা অন্তরঙ্গ এ কথাও সত্য। সমাজে উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করা সুরুচির পরিচয় নহে তাহা ঠিক ; কিন্তু যে স্থানে আমরা অসংকোচে উলঙ্গ হইতে পারি (যথা, বাথরুম) তাহা যে আমাদের অতিশয় প্রিয় স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। 'প্রিয় স্থান' বলিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, 'প্রয়োজনীয় স্থান' বলিলে আশা করি তিনি প্রতিবাদ সম্বরণ করিবেন। যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই প্রিয় কি না, অনায়াসেই এ বিষয়ে খানিকক্ষণ বাগ্‌বিস্তার করা চলে —সুযোগও আসিয়াছে, তথাপি কিন্তু নিরস্ত হইলাম। আপনাদের প্রতি অনুকম্পাবশত নহে, বর্তমান বিষয়টিই বর্তমানে আমার মস্তিষ্ককে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। যাহাদের সহিত অশ্লীল আলোচনা করি, তাহারা আমাদের প্রিয় কেন—এই চিন্তাই এখন চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে। ভাবিতেছি, নুটবিহারীর আর তো কোন গুণ নাই, গুণের মধ্যে সে অনর্গল খারাপ কথা বলিয়া যাইতে পারে। শুধু তাহাই নয় , এমনই তাহার শক্তি যে, খানিকক্ষণ তাহার সহচর্যে থাকিলে অন্তর্নিহিত অশ্লীলতাকে সে টানিয়া বাহির করিয়া আনে, এবং কিছুক্ষণ পরে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি, আমিও নিখাদ বৈদিক ভাষা পুরোদমে ব্যবহার করিতেছি। ভারি ভাল লাগে। কিন্তু কেন ?

॥ দুই ॥

সভ্যতার ভাঁওতায় একটা কথা আমরা অহরহ ভুলিয়া যাই যে, আমরা পশু। যে কোন পশুর মতই আমাদের পাশবিক প্রয়োজন আছে অর্থাৎ যে কোন পশুর মতই আহার-নিদ্রা-মৈথুন-প্রবৃত্তি মর্মান্তিকভাবে আমাদের মজ্জাগত। ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই প্রবৃত্তিত্রয়কে নানাভাবে প্রশমিত করিবার প্রচেষ্টাই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা। বর্তমান সভ্যতার উজ্জ্বল শিখা যে প্রবৃত্তির তৈলেই জ্বলিতেছে, তাহা মনে রাখিলে অনেক অকারণ ক্ষোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আদিম অসভ্য

মানুষ সমাজসৃষ্টিও করিয়াছিল এই প্রবৃত্তিরই বশে। পরস্পর মারামারি কাটাকাটি না করিয়া যাহাতে মনুষ্যনামধেয় পশুগুলি সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলির চর্চা করিতে পারে, অন্যান্য প্রাণী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নিছক প্রাণী হিসাবেই যাহাতে তাহারা বাঁচিতে পারে, সমাজ এবং সমাজনীতি সৃষ্টি করিয়া মানুষ সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যবস্থার মধ্যেই সেই ব্যবস্থাকে অব্যবস্থিত করিবার বীজ নিহিত থাকে। সামাজিক নীতির মধ্যেই সামাজিক দুর্নীতির বীজও নিহিত ছিল। সামাজিক নিয়ম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত সামাজিক বিধানগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, এবং সেই জন্যই ব্যক্তির বিকাশের অথবা আনন্দের পক্ষে সকল সময় অনুকূল নহে। আরও মুশকিল এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রবৃত্তি মূলত এক হইলেও একেবারে এক নহে। আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে প্রত্যেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তিও যত, বৈশিষ্ট্যও তত। কোন একটা নিয়মে তাহাদের স্ফূর্তি না হইলে সমাজে নিত্যনূতন সমস্যার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মানুষ আহার-নিদ্রা-মৈথুন বিষয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবার জন্য সততই উন্মুখ; বস্তুত উহা রক্ষা করিতে না পারিলে সে সুখী হয় না, এবং ঐ সুখটুকু লাভ করিবার জন্য সে সমাজের প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে দ্বিধা করে না। আসলে সে নিজেকেই মানে, নিয়মকে নয়। অসুখের সময় নিষিদ্ধ আহারের জন্য মন প্রলুব্ধ হইয়া উঠে, ট্রেনে ভিড় হইলে বেশি করিয়া ঘুম পায়, চুরি করিয়া খাইতে অথবা অভদ্রতা করিয়া ঘুমাইতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করি না। আহার এবং নিদ্রার কথায় একটা কথা মনে হইতেছে। আহার এবং নিদ্রা বিষয়ে সমাজ যতটা উদার, মৈথুন বিষয়ে ততটা নয়। যাহা খুশি আহার করিয়া যেখানে খুশি নিদ্রা দিলে আজকাল খুব একটা গুরুতর অপরাধ হয় না। মৈথুন বিষয়ে 'যাহা খুশি' প্রবৃত্তিটা আছে, কিন্তু 'যাহা খুশি' স্বাধীনতাটা নাই। স্বাধীনতা না থাকিবার আরও একটা সঙ্গত কারণ আছে। আহার এবং নিদ্রার উপকরণ মানুষ নহে কিন্তু মৈথুনের উপকরণ মানুষ। সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিবেচনা-বিশিষ্ট একটা মানুষকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং উদারতম সমাজেও এ ব্যাপারে কিছু না কিছু বিঘ্ন চিরকালই থাকিবে—'যা খুশি' চলিবে না, কারণ অপর পক্ষেরও 'যা খুশি' আছে। সেটা না মানিয়া উপায় নাই। স্বপ্ন এবং নুটবিহারী সুতরাং অনিবার্য। পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সম্বন্ধে চিরকালই গোপনে অনিবার্যভাবে আলোচনা করিবে এবং সব সময় তাহা যে শ্লীলতার সীমা মানিয়া চলিবে, তাহা বলিবার মত মিথ্যা-পটুতা আমার নাই। যাহারা এই সীমা লঙ্ঘনের সঙ্গী, তাহাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা স্বাভাবিক, কারণ অমোঘ প্রবৃত্তির সূত্রই তাহাদের বন্ধন। সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রচলিত বিধান অমান্য করিতেছে বলিয়া এই বন্ধন আরও দৃঢ় এবং মধুর। বাল্যকালে নিস্তব্ধ দুপুরে গুরুজনদের নিদ্রার সুযোগে চুপি চুপি আচার চুরি করিয়া যাহার সহিত চাখিয়া চাখিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতাম, যে নিয়ম অনুসারে সে আমার অন্তরঙ্গ ছিল, নুটবিহারীও সেই নিয়ম অনুসারে আমার অন্তরঙ্গ। যাহারা প্রতিভাবান এবং প্রবল, তাহারা স্বকীয় শক্তিবলে সমাজের বুকের উপর বসিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া সগর্বে খোলাখুলিভাবে ব্যক্তিত্ব-বিরোধী সামাজিক আইনকে অমান্য করে, আমাদের মত দুর্বলেরা করে লুকাইয়া। আমরা আলেক্‌জাণ্ডারের দলে নই, রবারের দলে। কিন্তু আইন অমান্য আমরা সবাই করি, করিয়া

সুখ পাই বলিয়াই করি। নিরঙ্কুশভাবে পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমাজের যেমন প্রয়োজন, অচরিতার্থ ব্যক্তিগত পশুপ্রবৃত্তিকে ভাষা দিবার জন্য নুটবিহারীরও তেমনই প্রয়োজন। বিশ্বের অন্যান্য প্রাণীগণের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমরা দলবদ্ধ হইয়া যেমন সমাজ গড়িয়াছি, তেমনই সমাজের প্রকোপ হইতে নিজেকে মুক্তি দিবার জন্য নুটবিহারীকে আবিষ্কার করিয়াছি। অর্থাৎ যেখানে মানুষ পশু, সেখানেই তাহার দল চাই, সংগী চাই, সমাজ চাই, নুটবিহারী চাই। যেখানে সে পশুত্বকে অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে সে একক।

আর কতটা বাকি?

প্রিয়বন্ধু প্রাণকান্ত নিঃশব্দে কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বুঝিতে পারি নাই। দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু দুইটি কৌতুকে নাচিতেছে। লজ্জিতমুখে লেখনী সম্বরণ করিয়া বলিলাম, ব'স।

উপবেশনান্তে প্রাণকান্ত বলিলেন, দেখি।

খাতাখানা দিলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। উপরোক্ত প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া স্মিতমুখে তিনি মন্তব্য করিলেন, বেশ কায়দা করিয়া ভিন্ন পথ ধরিয়াছ দেখিতেছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, নৃত্যের উপকারিতা বা চমৎকারিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছ বুঝি।

মানে?

প্রাণকান্ত বলিলেন, কাল রাত্রে নাচ দেখিবার পরই যে তোমার অবচেতন মন নুটবিহারীকে খাড়া করিয়াছে, তাহা তো পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে। নটীর নৃত্যঘটিত আঙ্গিক অশ্লীলতাকে তুমি নুটবিহারীর চিত্তঘটিত বাচনিক অশ্লীলতায় রূপান্তরিত করিয়াছ। মন্দ হয় নাই।

আরে, না না, কি যে বল তুমি!

প্রাণকান্ত নীরবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, মেয়েগুলি নাচে ভালই। আমি তো ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া আসিলাম, তুমি কতক্ষণ ছিলে?

শেষ পর্যন্ত।

প্রাণকান্ত আর একটু হাসিলেন।

অতি-আধুনিকতা

॥ এক ॥

সম্মুখের বৃদ্ধ বটগাছটায় নব পত্রোদ্গম হইয়াছে। কচি কচি সবুজ পাতায় সমস্ত গাছটা ভরা। বৃদ্ধ গাছের শাখায় শাখায় অতি-আধুনিকতার বিজয়-নিশান উড়িতেছে। একটুও বিসদৃশ মনে হইতেছে না, বরং ভালই লাগিতেছে। মানুষের অতি-আধুনিকতায় কেমন যেন একটা ডেঁপোমির গন্ধ থাকে, গাছের অতি-আধুনিকতায় তাহা নাই। অনাবশ্যক আতিশয্যে তাহা ভারাক্রান্ত নহে, সহজ সরল সুস্থ অভিব্যক্তি। অতি-আধুনিক মানব-মানবী কিম্ভূতকিমাকার জীব। অদ্ভুত ধরনের কাছা কোঁচা, শাড়ি পাজামা, বিচিত্র

ঢঙের শেমিজ কামিজ ব্লাউজ পাঞ্জাবি, নানা ছাটের গোঁফ দাড়ি চুল ভাষা ভঙ্গি—অভূতপূর্ব একটা জগা-খিচুড়ি। স্বাতন্ত্র্য-প্রকাশের এই গা-জ্বালানো জবরদস্তি চুলে হেঁচকা টান মারিয়া চোখে খোঁচা দিয়া যেন বলে—দেখ না বাপু, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখ। সমস্ত চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে ভালও যদি কিছু থাকে, তাহাও স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই। এই বুড়ো গাছটা কচি কচি সবুজ পাতায় সাজিয়াছে, একটুও তো খারাপ লাগিতেছে না, বরং উহার স্নিগ্ধশ্যামল রূপ দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভাবিতেছি, কেন এমন হয়? গাছের অতি-আধুনিকতা এত সুশ্রী, মানুষের অতি-আধুনিকতা এত বিশ্রী কেন? গাছের মত মানুষও তো প্রাণের তাগিদেই নিজেকে প্রকাশ করে। মানুষের প্রকাশ এমন শ্রীহীন হয় কেন?

॥ দুই ॥

চিন্তা করিতে গিয়া প্রথমেই একটা সমস্যায় পড়িয়াছি। আরও মুশকিল এই যে, সমস্যার সমাধান সহজ বলিয়া মনে হইতেছে না। কোন বিষয়ে সম্যকরূপে চিন্তা করিতে গেলে এমন মুশকিলে পড়িতে হয়! গাছের অতি-আধুনিকতা কেন সুন্দর তাহা চিন্তা করিতে বসিয়া হঠাৎ মনে হইতেছে, আমরা তো অপরের সব কিছুই সুন্দর দেখি। পরের স্ত্রী, পরের বাড়ি, পরের গাড়ি, পরের চেহারা, পরের সভ্যতা, পরের সব কিছুই আমাদের চোখে নিজের সব কিছুর অপেক্ষা সুন্দরতর। সমস্ত মানবজাতিটাই প্রলুব্ধ নয়নে পরের দিকে চাহিয়া আছে। গাছ, পাখী, প্রজাপতি—অর্থাৎ যে সব জিনিস লইয়া আমরা কবিত্ব করি—তাহারা একেবারে অন্য পর্যায়ের জীব—চরম পর। সেই জন্যই কি ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের মোহ এত প্রবল? একটা গাছ আর একটা গাছ সম্বন্ধে হয়তো ততটা উচ্ছ্বসিত নহে, তাহারা হয়তো নিজেদের অতি-আধুনিকতা লইয়া মর্মর-ভাষায় পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং আমাদের ছাঁটা গোঁফ, লম্বা জুলফি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। কে জানে! পাখীরাও হয়তো তাই।

হয়তো-মূলক এই সম্ভাবনাটা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু ইহাও ঠিক, কেবল এইটাকে আঁকড়াইয়াই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিব না। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে হয়তো-সৃষ্ট একটা প্রকাণ্ড স্বপ্নলোক আছে, কিন্তু আমরা সে স্বপ্নলোকে বেশিক্ষণ থাকিতে পারি না; কল্পনা-কুহেলিকায় মন দিশাহারা হইয়া পড়ে। আমরা 'নয়তো' বলিয়া সেখান হইতে পলাইয়া আসি এবং বাস্তবলোকের কঠিন ভূমিতে দাঁড়াইয়া একটা স্পষ্ট কিছুকে আশ্রয় করিতে চাই।

এ সম্বন্ধে সুতরাং একটা 'নয়তো' খাড়া করা দরকার।

॥ তিন ॥

চিন্তা করিতেছিলাম।

দৌহিত্র আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বক্র কটাক্ষে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, দাদু, আবার তুমি বালিশটাকে কনুই দিয়ে অমন করে ঠেসছ! ফের ফেটে যাবে। কালই তো দিদি সেলাই করে দিলে।

অপ্রস্তুত মুখে উঠিয়া বসিলাম।

এই ছোকরাই কয়েক বৎসর পূর্বে আমার তাকিয়ার উপর উলঙ্গ হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিত এবং তাকিয়া সামলাইতে আমাকেই গলদঘর্ম হইতে হইত। সে-ই এখন আমাকে তাকিয়া সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ধমকাইতেছে। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে—

তাকিয়া-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বাটারফ্লাই গোঁফের দিকে চাহিয়া বলিলাম, অমন সুন্দর গোঁফ জোড়াকে বেঁড়ে করেছিস কেন বল্ তো?

এই তো সুন্দর।

সুন্দর! কিসে সুন্দর?

ঝোলে না। তোমাদের গোঁফ তো দিনরাত ঝুলেই আছে।

কুকুরের লেজ কাটলে কুকুর তেজী হয় শুনেছি, গোঁফও হয় নাকি?

মুচকি হাসিয়া দৌহিত্র চলিয়া গেলেন।

ঝোলে না! গোঁফটাকে অহরহ সমুদ্যত রাখাই হয়তো পৌরুষের লক্ষণ, কিন্তু বাহিরের গোঁফ উচাইয়া রাখিলে কি হইবে, মনের গোঁফ যে বারংবার ঝুলিয়া পড়িতেছে! ভায়া বোধ হয় সে খবর এখনও পান নাই। মনের গোঁফ এখনও উঠে নাই সম্ভবত। যতদিন না উঠে, ততদিনই ভাল। ও-বাড়ির টুনটুনির সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর হইতেই ভায়ার প্রসাধনের নানা বৈচিত্র্য দেখিতে পাইতেছি। ওই তো রোগা লিকলিকে চেহারা, কেবল গোঁফ ছাঁটিয়াই যদি কেল্লা ফতে করিতে পারে, তাহা হইলে আজকাল ব্যাপার সহজ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে যৌবনের (এমন কি বার্ধক্যেরও) সমস্ত সাজ-সজ্জার মূলে আছে যৌন-প্রবৃত্তি। পুরুষেরা নারীদের এবং নারীরা পুরুষদের প্রলুব্ধ করিবার জন্য দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধোপা, নাপিত, দরজী এবং মনিহারি দোকানের শরণাপন্ন হইতেছে। ধোপা, নাপিত, দরজী এবং মনিহারি দোকান পরিবর্তনশীল কালের সহিত তাল রাখিয়া মাল সরবরাহ করিতেছে। সেকালের রুচি একালের রুচি এক নয়। পূর্বে আলতা, ঘোমটা, মল, নোলক আমাদের কল্পনাকে আবিষ্ট করিত, আজকাল হাই-হীল জুতা, স্কন্ধ-কাটা জামা, চুনকাম-করা মুখ, হলব করা শাড়ি না দেখিলে কল্পনা ভিজিতে রাজী হয় না। শ্রোণীভারাদলসগমনা আজকাল আমাদের আদর্শ নয়, আজকাল চাই স্মার্ট—তন্বী। স্কিপিং রোপ কিনিয়া ঘরে-বাহিরে তাই লাফালাফি শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে সকলে চলিতেছে।

চাহিদার নিত্যনূতন রূপ এবং তাহাই অতি-আধুনিকতার জনক কিংবা জননী (ব্যাকরণটা ঠিক করিতে পারিতেছি না)।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, চাহিদা বদলায় কেন? জীব-জগতের অন্য কোথাও তো চাহিদা বদলায় নাই। আজও ময়ূর ঠিক তেমনই ভাবে পেখম মেলিয়া ময়ূরীকে মুগ্ধ করিতেছে, যেমন সে আগে করিত। পেখম ছাঁটিবার অথবা পেখমের উপর নূতন রকম রঙ ফলাইবার তো তাহার দরকার হয় নাই। সনাতন পেখম মেলিয়া সনাতন পদ্ধতিতেই সে ময়ূরীকে মুগ্ধ করিতেছে। মানুষের বেলাতেই নিত্যনূতন ভজকট কেন?

॥ চার ॥

প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করার পর মনে হইতেছে, ভজকট না হইলে বিস্ময়কর হইত। যে নিঃস্ব, যে দেউলিয়া, সে বিপন্ন হইবে না তো কে হইবে? আমাদের তো কিছুই নাই। একদা আমাদেরও একটা নিজস্ব পেখম ছিল বটে, কিন্তু তাহা তো বহুকাল পূর্বেই আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের সে স্বাভাবিক সুস্থ রূপ আর নাই। বর্তমানে মোটা রোগা নানাভাবে বিকৃত কদর্য যে জীবগুলি মনুষ্য নামে পরিচিত, তাহাদের বহিরাবরণ না হইলে চলিবে কেন? নিজেদের যে কিছু নাই। এই বীভৎস নগ্নতাকে কোন একটা কিছু দিয়া আবৃত করা আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। উলঙ্গ নিরাভরণ হইয়া কিছুক্ষণ আমরা যদি পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকি, মুগ্ধ হওয়া দূরে থাক্, খুন চাপিয়া যাইবে, উন্মত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে খুন করিয়া ফেলিব। প্রকৃতিদত্ত সুন্দর পেখম হারাইয়া ফেলিয়া ঝুটা পেখমের সন্ধানে তাই আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কারণ, পেখমবিহীন জীবন অসম্ভব। সুতরাং বাজারে যখন যেটা পাওয়া যায় ধার করিয়া, ভিক্ষা করিয়া, চুরি করিয়া, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাই আমরা কিনিতেছি। তাই পেখমের এত বৈচিত্র্য, আজিকার পেখম কাল অচল। বাজারে এক জিনিস চিরকাল চলে না। বুদ্ধিই পেখম কিনিবার পরামর্শ দিতেছে, বুদ্ধিই পেখমের কারখানা খুলিয়াছে, এই বুদ্ধি-মহাজনের পদপ্রান্তে আমরা দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছি।

ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ এই গ্রামে চিন্তা করিলে কি হইত বলা যায় না। হঠাৎ শ্যামবাবুর নূতন মোটরখানা সবেগে ধূলা উড়াইয়া চলিয়া যাওয়াতে চিন্তা ভিন্ন পথ ধরিল। শ্যামবাবু মোটরখানা অল্প কয়েকদিন হইল কিনিয়াছেন। পিছন দিকটা একটু বোঁচা-গোছের, কিন্তু নূতন মডেল। আগেকার গাড়িটা ঠিকই ছিল, কিন্তু নূতন মডেলের লোভ সম্বরণ করা শ্যামবাবুর পক্ষে শক্ত। শ্যামবাবু লোকটি হালে বড়লোক হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই সম্ভবত হালে পানি পাইতেছেন না। কি করিলে যে আত্ম-প্রচারটা সর্বতোমুখী হইবে, কিছুতেই যেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। সর্বদাই অপ্রকৃতিস্থ। নিত্যনূতন মোটর, নিত্যনূতন রেডিও, নিত্যনূতন পোশাক, নিত্যনূতন বাড়ি, নিত্যনূতন নারী, নিত্যনূতন মদ, নিত্যনূতন ব্যাধি, প্রতিদিন নিত্যনূতন প্রকাশ। আমাদের নিবারণবাবুরাও বড়লোক কিন্তু বনিয়াদী ঘর, বাড়াবাড়ি নাই। সাবেক কালের ল্যান্ডোতে চড়িয়াই বেড়াইয়া থাকেন, বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসের বন্দোবস্ত, পুরাতন চক-মিলানো বাড়ির সাবেক মূর্তি, দরজা-জানালাগুলি পর্যন্ত সেকেলে। আচার-ব্যবহার-চালচলন কোন কিছুতেই আধুনিকতার ছাপ পড়ে নাই। সহসা মনে হইল, জীব-জগতে মানুষও তো সেদিন মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বটগাছের মত সে তো বনিয়াদী নয়। বটগাছ প্রতি বৎসর একই ধরনের সনাতন সবুজ পাতায় সাজিতে ইতস্তত করে না, তাহার সাবেক চাল অব্যাহত আছে, কারণ তাহার ঐশ্বর্য বনিয়াদী। তাহার তুলনায় মানুষ তো সত্যই অতি-আধুনিক। ভুঁইফোড় শ্যামবাবুর মত নিত্যনূতন দামামা বাজাইয়া সে নিজেকে হাজির করিবে না তো কে করিবে? ইহাই যে তাহার স্বধর্ম। কিংবা হয়তো—। দূর

ছাই, আর ভাবিতে পারি না। 'হয়তো' আর 'নয়তোর' দ্বন্দ্ব মিটানো আমার কর্ম নয়। ভুতোকে তামাক দিতে বলিলাম।

দৌহিত্র পুনঃপ্রবেশ করিলেন ও বলিলেন, ত্রিপুরাবাবু মারা গেলেন। আমার সেই মুসোলিনি-ভক্ত বন্ধুটি কিছুদিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইলাম। ত্রিপুরাচরণ চিন্তায় কর্মে অতি-আধুনিক ছিলেন। সনাতন মৃত্যুর হাত কিন্তু এড়াইতে পারিলেন না! ভুতো তামাক দিয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একটা সুদীর্ঘ দার্শনিক টান দিলাম।

কবচ

আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে।

কিসে বিগলিত হইতেছে, কেন বিগলিত হইতেছে, কে বিগলিত করিতেছে, তাহা আমি বলিব না। বলিতে পারিব না। বলিতে গেলে আমার হৃদয় আরও বিগলিত হইয়া যাইবে, তখন আর আমি নিজেকে সামলাইতে পারিব না, সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া সব কথা বলিয়া ফেলিব। আমার অবচেতন মনের অন্তরালে যে সকল নিগূঢ় বাণী নিগূঢ়ভাবে চাপা আছে, তাহাদের নিরুদ্ধ উত্তাপ হৃদয়কে বিগলিত করিতে পারে কি পারে না, সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ—

বাতাসা—দুই আনার   পোস্ত—আধ পোয়া
পাঁচ ফোড়ন—এক আনার   জৈত্রি—দুই পয়সার

॥ দুই ॥

আকাশ দেখিয়াছেন?

যে আকাশ দেখা যায়, যে আকাশ নীল, সে আকাশ নয়। যে আকাশ দেখা যায় না, যাহার বর্ণ অবর্ণনীয়, যাহা কোন স্থানবিশেষের বিস্তৃতি নয়, সেই আকাশ। দেখিয়াছেন? আমার বিশ্বাস, আপনি দেখেন নাই। আমি একদিন দেখিয়াছি, এক মুহূর্তের জন্য অকস্মাৎ দেখিয়াছি। চোখ খুলিয়া নয়, চোখ বুজিয়া দেখিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। আপনার প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে, সে আকাশ কেমন, কোথায়······না না, পারিব না, বলিতে পারিব না।

এলাচ—এক কাঁচ্চা   ঝোলা গুড়—দুই সের
কুলি বেগুন—আধ সের   সৈন্ধব লবণ—আধ সের
টমাটো—দুই সের   জিরা মরিচ—আধ পোয়া
তেঁতুল—এক সের

॥ তিন ॥

কাঁদিয়াছেন কখনও ?

ভেউভেউ করিয়া নয়, হু-হু করিয়া নয়, ফোঁসফোঁস করিয়া নয়, গুমরিয়া গুমরিয়া। সে ক্রন্দনে অশ্রু নাই, স্বার্থ নাই, এমন কি বেদনাবোধও নাই। তাহা শুধু নিছক ক্রন্দন, তাহা কোন বাহ্যিক আঘাতের ফল নয়, তাহা স্বতঃ-উৎসারিত। সমুদ্রের গভীরতার অন্তস্তলে সে ক্রন্দন স্তব্ধ হইয়া আছে, তাহা হাসিরই নামান্তর, তাহা অনাদি রহস্যের অনন্ত আক্ষেপের মতো···ও কি !·· কিসের ডানা হাওয়ায় উড়িতেছে ?...প্রজাপতির ? ···কিন্তু···না,—

আলু—দুই সের
চাল—আধ মণ
মসুর ডাল—আড়াই সের
দারুচিনি—এক পয়সার
পেঁয়াজ—আধ সের
যব—আধ সের
তিসি—এক সের

॥ চার ॥

আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে। ও ঘুড়ি নয়, মানুষের মন।—

চিনাবাদাম—দুই পয়সার
নারিকেল—একটা
সরিষার তৈল—আধ পোয়া
স্টোভের পোকার—একটা
ছাঁকনি—একটা

॥ পাঁচ ॥

মন আকাশে ওড়ে।

কিন্তু উড্ডীয়মান মনের সূত্র লাটাইয়ের পাকে পাকে জড়ানো। লাটাই ওড়ে না, সে মুক্তিকার, সে সূত্রধারক, সে ওড়ায়। দার্শনিকতার অবতারণা করিতেছি না ; কথাটা মনে হইল, তাই বলিলাম। যাহা মনে হয়, তাহা বলার নামই দার্শনিকতা নয়। বস্তুত, যাহা সহজে মনে হয় না, তাহাই মনে পড়াইয়া দেওয়ার নাম দার্শনিকতা। যাহা বহুর মধ্যে এক-আধজন দেখে তাহাই দর্শন, বহুজন যাহাকে দেখে তাহাও একপ্রকার দর্শন, কিন্তু তাহা মহাত্মা-দর্শন—বড় জোর দেব-দর্শন, তত্ত্ব-দর্শন নয়। বিচিত্র ! তত্ত্বটা আছে, কিন্তু সকলে দেখিতে পায় না, দেখিতে পাইলেও তদনুসারে চলিতে পারে না। সংসারে ঝঞ্ঝাট অনেক, এ কথা অনেকেই বোঝেন, কিন্তু বুদ্ধ বা চৈতন্যের মতো কয়জন পলাইতে পারিলেন ? অনেক দূরে···বনে···পর্বতে···সুদূর দ্বীপে···সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া প্রবাল-তটে লাগিতেছে—ছলাৎ-ছলাৎ-ছলাৎ···কোথাও যেন বাঁশী বাজিতেছে···না না, পারিব না, পারিব না—

ছোলা—এক সের
আদা—এক পোয়া
নিমের দাঁতন—এক পয়সার
মকর্টো—এক বাক্স
শালগম—আধ সের
বাঁধাকপি—একটা

॥ ছয় ॥

বলিতেছিলাম, আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে। কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ ভুল। যাহার কাঠিন্য আছে, তাহাই বিগলিত হয়। আমি কোন দিনই কঠিনহৃদয় ছিলাম না। আমি চিরদিনই তরলমতি। যাহা তরল, তাহা আবার বিগলিত হইবে কি প্রকারে? তরল পদার্থ উত্তাপ সংযোগে বাষ্পে পরিণত হয় শুনিয়াছি। তবে কি তাহাই হইল? হৃদয় কি ক্রমশ বাষ্পে পরিণত হইতেছে? বাষ্পে?···বাষ্পের জোরে বেলুন উড়ে, এঞ্জিন ছোটে, জাহাজ চলে। বস্তুত, সমগ্র সভ্যতার মূলে বাষ্প আছে। আমার হৃদয় সেই বাষ্পে পরিণত হইয়াছে? কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তরল পদার্থে উত্তাপ দিলে বাষ্পই হয়। বাষ্পের স্বপ্ন দেখিব? বাষ্পীভুত হৃদয়ের ইলেক্ট্রন, প্রোটন, পজিট্রন, নিউট্রন! বিচিত্র কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান লক্ষ কামনার বায়বীয় রূপ!···না না, পারিব না, পারিব না, পারিব না—

খেঁসারির ডাল—আধ সের
ঝিঙে—আধ সের
কুঁচো চিংড়ি—এক পোয়া
বরবটি—এক পোয়া
পুঁইশাক—এক পয়সার
মুড়কি—দুই পয়সার

॥ সাত ॥

শিশু হাসে।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার হাসিটি সুমিষ্ট, তাহাও স্বীকার করিব। একদা তাহার হাসির সহিত ‘বাঁশী’, ‘ভালবাসি’, ‘সুধারাশি’ প্রভৃতি মিলাইয়া আমি কবিতা লিখিয়াছি ; লিখিয়া সুখও পাইয়াছি। কিন্তু শিশুর সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বক্তব্য আছে, যাহা সকলে জানেন, কিন্তু বলেন না। একটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। শিশু কাঁদে। ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদে, অসুখের যন্ত্রণায় কাঁদে, গ্রীষ্মের প্রকোপে কাঁদে, শীতের আধিক্যে কাঁদে, সকারণে কাঁদে, অকারণে কাঁদে। ভয়ানক কাঁদে, অনেক সময় সে কান্না থামানো যায় না। অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। অনেক শিশু জীবনে হাসিবার সুযোগই পায় না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া যায়। পাড়া ঠাণ্ডা হয়।

ঠাণ্ডা! আমরা ঠাণ্ডা প্রকৃতির, উত্তাপ চাই না, উত্তেজনা চাই না, ঠাণ্ডা চাই।··· ঠাণ্ডা ও শিশু···একটি স্মৃতি মনে জাগিতেছে। ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে, ঠাণ্ডা গঙ্গাজলে নামিয়া একটি মৃত শিশুকে একদা বিসর্জন দিয়াছিলাম। ছেলেটা বড় কাঁদুনে ছিল, আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিত। সে কান্না···

ঘুঁটে—চার পয়সার
পটল—এক পোয়া
ধূপ—এক বাণ্ডিল
বড়ি—চার পয়সার
লাউ—একটা
মাছ-ধোয়া চুপড়ি—একটা
তামাক-পাতা—এক পোয়া
তেজপাতা—এক পয়সার
ধনে—এক আনার

॥ আট ॥

অনেকে বলেন, কোন কিছুই হারানো ভাল নয়, এমন কি আত্মহারা হওয়াও অশোভন। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? যদি মানুষ আত্মহারা হইতে না পারিত, তাহা হইলে সে কিছুই করিতে পারিত না। আত্ম কথাটার সহিত স্বার্থ কথাটা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইলেও কথা দুইটি একার্থক নয়। আত্মহারা হওয়া মানে স্বার্থহারা হওয়া—ইহা মানিতে গেলে গোলমালে পড়িতে হইবে। আমরা আত্মহারা হই স্বার্থেরই প্রেরণায়। প্রেমে আত্মহারা হই, অধ্যয়নে আত্মহারা হই, ক্রোধে আত্মহারা হই, বিস্ময়ে আত্মহারা হই, হিংসায় আত্মহারা হই। সকলেরই মূলে একটা না একটা স্বার্থ প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন আছে। যাঁহারা আত্মহারা হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, শুনিয়াছি, তাঁহাদের লক্ষ্য মোক্ষলাভ। যাঁহারা আত্মহারা হইয়া সংসার আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কি লক্ষ্য, বস্তুত কোন লক্ষ্যকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা সংসার পাতিয়াছেন কি না, তাহা সহজে জানিবার উপায় নাই। আমার সন্দেহ হয়, অধিকাংশ লোক গতানুগতিকতার স্রোতে ভাসিয়া সংসারধর্ম করেন, আত্মহারা হইয়া নয়। আমার মত আত্মহারা হইয়া যদি সংসার করিতে হইত, তাহা হইলে একটা লক্ষ্য ঠিক থাকিত এবং অধিকাংশ লোকেই শেষ পর্যন্ত বুঝিতে পারিত যে, যাঁহারা বলেন—কোন কিছুই হারানো ভাল নয়, এমন কি আত্মহারা হওয়াও অশোভন, তাঁহাদের কথা একেবারে মূল্যহীন নয়। আমিও তাঁহাদের এই উক্তিটিকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করি; তথাপি কিন্তু বারংবার মনে হয়, আত্মহারা না হইলে মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকিত কি? প্রথম যৌবনে আত্মহারা হইয়া যখন নীলিমাকে ভালবাসিয়াছিলাম, তখন… …

কেরোসিন তেল—এক টিন
ব্লাউজের ছিট—তিন গজ
কুমড়োর ফালি একটা
ঢ্যাঁড়স—এক পোয়া
শাড়ি—দুই জোড়া
টুথব্রাশ—একটা
কাঁকরোল—এক পয়সার
হলুদ—আড়াই পোয়া
লংকা—এক পোয়া

॥ নয় ॥

অবচেতন মনের স্তরে স্তরে অনেক কামনা সুপ্ত আছে। তাহাদের মাঝে মাঝে নিদ্রাভঙ্গ হয়, আমার চলনে বলনে হাসিতে কাশিতে তখন তাহারা আত্মপ্রকাশ করিতে চায়, আপনারা সকলে উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখেন। আপনাদের এই উৎসুক চাহনি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু জানিয়া রাখুন, আমি ধরা দিব না। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে স্বপ্নগুলি গুটি বাঁধিয়া আছে, যেই তাহারা গুটি কাটিয়া প্রজাপতির আকারে বাহির হইয়া আসিতে চায়, আমি অমনিই তারস্বরে সেই নামগুলি আবৃত্তি করিতে থাকি, যাহারা আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে—বাতাসা, পোস্ত, পাঁচ ফোড়ন, জৈত্রি, ঝোলা গুড়, এলাচ, কুলি বেগুন, কুঁচো চিংড়ি, চাল, ডাল, শাড়ি,

সাবান। আবৃত্তি করিবামাত্র সমস্ত প্রজাপতি আবার গুটি হইয়া যায়। কবচ আবিষ্কার করিয়াছি।

আমার মনের খবর জানিতে পারিবেন না।

পাকা রুই

স্টেশনের পান্থশালায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। লোকটিকে দেখিলে শ্রদ্ধা হয়। পরনে খদ্দরের মোটা কাপড়, গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর, একমুখ দাড়ি, একবুক চুল। খালি পা। কথায় কথায় ভণ্ডামির কথা উঠিল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়, ভণ্ডামিতেই তো সেরেছে। পরশুরাম বিরিঞ্চি-বাবা এঁকেছেন, ওই হ'ল ভণ্ডামির পার্ফেক্ট টাইপ। কিন্তু একটা কথা কি জানেন, ভণ্ডামি বেশি দিন টেঁকে না। আসলে মানুষটাকে শেষ পর্যন্ত ধরা দিতেই হয়।

কি রকম ?

ভদ্রলোক ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, একটা গল্প বলি তা হ'লে, শুনুন।

বলুন।

নীলমাধব ব'লে একজন লোক ছিল। অসাধারণ ব্যক্তি। অর্থাৎ বাইরের নীলমাধবকে দেখে ভেতরের নীলমাধবকে চেনবার উপায় ছিল না। বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে ছেলেবেলায় পিতৃমাতৃহীন হয়ে দূর-সম্পর্কের পিসীর বাড়িতে মানুষ হয়েছিল; বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে আই. এ. ফেল; বোঝবার উপায় ছিল না যে, সে বেকার; বোঝবার উপায় ছিল না যে, ওই পিসের গলগ্রহ থেকেও সে একটা যক্ষ্মাগ্রস্ত মেয়েকে বিয়ে ক'রে তার গর্ভে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে উৎপাদন করেছে। কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। লোকের কাছে ধার করবার অসাধারণ শক্তি ছিল তার। সবাই তাকে ধার দিত। নিখুঁত লেফাপার জোরে রঙিন রবারের বেলুনের মতো সে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে উড়ে বেড়াত। রবারের বেলুনের সঙ্গে উপমা দিচ্ছি বটে, কিন্তু রবারের বেলুনের সঙ্গে তার প্রকাণ্ড একটা অমিল ছিল। রবারের বেলুন বেশিক্ষণ নিজের ফুটানি বজায় রাখতে পারে না। সামান্য একটু খোঁচা খেলেই চুপসে যায়। বহু খোঁচা খেলেও নীলমাধব কিন্তু সুডোল ছিল। সর্বদাই অনিন্দনীয় চেহারা, অনিন্দনীয় কথাবার্তা, অনিন্দনীয় পরিচ্ছদ, এবং সমস্ত ধারের ওপর। সুতরাং যা অনিবার্য, তাই একদিন ঘটল—প্রেম। নীলমাধব ও কিসমিসকুমারী। একটি রঙিন লেফাপা আর একটি রঙিন লেফাপাকে দেখে উতলা হয়ে উঠল। পিসেমশায়ের বাসায় যক্ষ্মাগ্রস্ত স্ত্রী কাঁদে আর কাশে। রোগা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে দুটো রাস্তায় রাস্তায় ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়। ছেলেটা একদিন মোটর চাপা প'ড়ে ম'রেই গেল। নীলমাধব তিন দিন পরে বাড়ি ফিরে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনলে। বিশেষ বিচলিত হ'ল না। পিসেমশায় অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করতে এসে স'রে পড়লেন। নির্বাক নীলমাধবের নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকবার মতো বীর্য তাঁর ছিল না।

সবাই জানে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে নীলমাধব অহোরাত্র চাকরি খুঁজছে। কখনও বাড়ি আসে—কখনও আসে না। যেদিন নীলমাধবের স্ত্রী ম'ল, সেদিনও নীলমাধব বাড়ি নেই। উঠানে পিসেমশায় ও পাড়ার কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরের ভেতরে বস্ত্রাচ্ছাদিত শব নীলমাধবের জন্যে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ আলু-থালু বেশে উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি নীলমাধব এসে হাজির। সকলে পথ ছেড়ে দিলেন। নীলমাধব সোজা গিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মৃতদেহের কাছে ক্রন্দনাকুল মেয়েটি এবং পিসীমা ব'সে ছিলেন। নীলমাধব তাদের ঘর থেকে বের ক'রে দিলে, ভাবটা—শেষবিদায় নেবার বেলায় সে একাই থাকতে চায়। মেয়ে এবং পিসী ত্রস্তভাবে বেরিয়ে গেল। নীলমাধব ঘরের কপাট ভেজিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা কেটে গেল—নীলমাধব বেরোয় না। অনেকক্ষণ ইতস্তত ক'রে পিসেমশায় অবশেষে কপাটে ছোট্ট টোকা দিলেন। কপাট খুলে গেল—ঘরে নীলমাধব নেই, বস্ত্রাচ্ছাদিত শব বস্ত্রাচ্ছাদিতই রয়েছে। ঘরের অপর দরজাটি দিয়ে নীলমাধব নীরবে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছে।

কিসমিসকুমারী বড় আর্টিস্ট ছিলেন না, তাঁর রঙিন লেফাপা ছিঁড়ে গণিকা বেরিয়ে পড়েছিল। নীলমাধবের লেফাপা কিন্তু অত অপলকা নয়—সে যে নিঃস্ব বেকার, এ কথা ঘুণাক্ষরে সে প্রকাশ করলে না। স্ত্রীটি ম'রে সুবিধেই হ'ল তার। সে নির্বিকার চিত্তে মৃতা স্ত্রীর গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নিয়ে গেল। স্ত্রীর গায়ে তার বাপের দেওয়া যা দু-চারখানা গয়না ছিল, তা বিক্রি ক'রেই নগদ আটশো টাকা হ'ল। পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা ভাল নেক্‌লেস কিনে সে কিসমিসকে উপহার দিলে। এমন অভিজাত-সুলভ ঔদাসীন্যভরে দিলে যে, কিসমিসকুমারী আত্মহারা হয়ে গেলেন। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, নীলমাধব প্রকৃতই তাঁর জীবনসর্বস্ব। অতিশয় দ্রুতবেগে অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বেশি দিন নয়, মাস তিনেকের মধ্যেই কিসমিসকুমারীকে পুনরায় নতুন ধরনে আত্মহারা হতে হ'ল। ঘুম ভেঙে একদিন রাত্রে তিনি দেখলেন—শয্যা শূন্য, নীলমাধব নেই। খানিকক্ষণ পরে দেখলেন—দেরাজও শূন্য, গয়নার বাক্স নেই। জীবনসর্বস্ব তাঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে সরেছে। গয়নার বাক্সে দশটি হাজার টাকার গয়না ছিল।

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর ?

তারপর বছর কয়েক পরে নিখুঁত স্যুট ও নিখুঁত ডিগ্রী ধারণ ক'রে নীলমাধব পুনরায় যখন কলকাতায় পদার্পণ করলে, তখন সে আয়ত্তাতীত। বিলেত থেকেই একটা বড় চাকরি নিয়ে সে এসেছে। খোঁজ ক'রে জানলে যে, পিসেমশায় তার মেয়েটিকে পাত্রস্থ ক'রে নিজে স্বর্গারোহণ করেছেন। অরক্ষিত কিসমিসটিও সাধারণ নিয়ম অনুসারে পিপীলিকাভুক্ত হয়েছে।—ভদ্রলোক পুনরায় চুপ করিলেন।

তারপর ?

এত কাণ্ড করলে তো, ভেতরের মানুষ কিন্তু চাপা পড়ল না। সমস্ত ভণ্ডামির আবরণ ভেদ ক'রে, সমস্ত ঐশ্বর্যের বন্ধনমুক্ত হয়ে, চাকরির সমস্ত মোহ ত্যাগ ক'রে তাকে বেরিয়ে আসতেই হ'ল দেশের ডাকে—

কি রকম ? কি চাকরি করতেন তিনি ?

ভদ্রলোক স্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার নামটা কি ?

একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনি আমাকেই নীলমাধব ভেবেছেন নিশ্চয়। আমার নাম ননী দাস—খুব ডিস্যাপয়েণ্টেড হলেন, নয় ? আমি সামান্য ব্যক্তি—

ননীবাবুর ট্রেন আসিল, তিনি চলিয়া গেলেন। আমি আমার ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ কানে আসিল, দূরে একটি বেঞে বসিয়া একটি যুবক আর একজনকে বলিতেছে, নীলমাধববাবু ব'লে একটি অদ্ভুত লোক আজ এসেছিলেন, চ'লে গেলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কার—

আমি সবিস্ময়ে আগাইয়া গিয়া বলিলাম, উনি তো ননী দাস।

যুবকটি হাসিয়া বলিল, ও, আপনাকে উনি ননী দাসের গল্পটা বলেছেন বোধ হয়। আমরাও প্রথমে ও'কে ভেবেছিলাম ননী দাস। কিন্তু ও'কে জিজ্ঞেস করতে উনি বললেন যে, ও'র নাম নীলমাধব।

আমি নির্বাক হইয়া রহিলাম। পরে জানিয়াছি, উহার আসল নাম—যাক, নামটা আর করিব না, বিখ্যাত লোককে খেলো করিয়া গৌরব বাড়িবে না।

নাথুনির মা

Fixity of Purpose-এর বাংলা কি ?

উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ?

যাহাই হোক, ইহার সুন্দর একটি উদাহরণ সেদিন দেখিয়াছিলাম। গল্পটি বলিবার পূর্বে "লক জ" কাহাকে বলে, তাহাও বুঝানো দরকার। "লক জ" (Lock Jaw) তাহাকেই বলে, যাহা হইলে ব্যায়ত আনন আর বন্ধ হয় না, ব্যায়তই থাকে। হাই তুলিতে গিয়া অনেক সময় এই বিপদ ঘটে। মুখ কিছুতেই বোজে না, হাঁ করিয়াই থাকিতে হয় যতক্ষণ না কোন ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসাইয়া দেন। ইহার ঠিক ডাক্তারি নাম ডিস্‌লোকেশন অব ম্যাণ্ডিবুল্‌ (dislocation of mandible),—একবার হইয়া পড়িলে সঙিন "পরিস্থিতি"।

একটি রোগীকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিতে হইয়াছিল। সকালে চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতেছিল না। গৃহিণীর বারম্বার তাগাদা সত্ত্বেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলাম।

'কড়কড়' শব্দে—বাজ পড়িল না, দুয়ারের কড়া নড়িল।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি আধ-ঘোমটা-দেওয়া কম-বয়সী মেয়ে একটি বুড়ীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিনিতে পারিলাম—নাথুনির স্ত্রী ও মা। ইহাদের বাড়িতে ইতিপূর্বে চিকিৎসা করিয়াছি। নাথুনি স্থানীয় ময়দার কলে চাকরি করে।

কি হ'ল ?

বুড়ী নীরব।

নাথুনির বউ বলিল, মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বুজছে না।—বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

তাই নাকি ? দেখি—

দেখিলাম, ঠিকই তাই—বুড়ির ‘জ’ স্থানচ্যুত হইয়াছে।

নাথুনি কোথায়?

নাইট-ডিউটি থেকে ফেরে নি এখনও।

এ রকম হ’ল কি ক’রে? হাই তুলতে গিয়ে?

বধূই উত্তর দিল (বুড়ীর পক্ষে কথা বলা অসম্ভব), না, হাই তুলতে গিয়ে নয়।

তবে?

এমনই।

এমনই কি ক’রে হবে, কিসের জন্যে হাঁ করেছিল?

বধূটি তখন ঈষৎ হাসিয়া অবনত মস্তকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সসংকোচে বলিল, মা আমাকে গাল দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ গাল দেবার পর যেই ‘পোড়ারমুখী’ বলতে গেছেন, অমনই ‘পোড়ার’ পর্যন্ত বলেই—

মুখে আঁচল দিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে হাস্য গোপন করিল। বুড়ীর চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ হয়েছে?

আধ ঘণ্টা হবে।

আচ্ছা, ব’স তোমরা, এখুনি ঠিক ক’রে দিচ্ছি আমি।

ভাবিলাম, মুখরা বুড়ীটা আর একটু শাস্তি-ভোগ করুক, আমি ততক্ষণ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া লই।

রোগী দেখিবার ঘরটায় তাহাদের বসাইয়া আমি ভিতরে চলিয়া গেলাম।

ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

আসিয়া বিধিমত দুই হাতের দুইটা বুড়া আঙুল বুড়ীর মুখগহ্বরে পুরিয়া নীচের চোয়ালের হাড়টায় বেশ জোরে চাপ দিয়া টান দিলাম। খুট করিয়া হাড় যথাস্থানে বসিয়া গেল।

মুখ হইতে বুড়া আঙুল দুইটি বাহির করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী বলিল, মুখী!

গদ্য-কবিতা

প্রকাণ্ড বাড়ি রাস্তার ধারে। গিজগিজ করছে লোকজন। আলো, বাজনা, কলরব—বিয়েবাড়ি। রাস্তার ধারের ঘরটিতে ব’সে আছেস নিমন্ত্রিতেরা, নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের। ঘরের বাইরে তাঁদের জুতোর সারি, তাও নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের। শানাই বাজছে। “তপসে মাছ, চাই তপসে মাছ—” হেঁকে গেল ফেরিওয়ালা। কেষ্টবাবু মুখবিকৃতি-সহকারে দেশলাইয়ের কাঠি চালালেন কর্ণকুহরে।

পড় ময়না, পড়, রাধাকৃষ্ণ—

ফুটপাথের এক ধারে ব’সে পাখী পড়াচ্ছে কে একজন।

বিশাল খাঁচাটা তার বেশ পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা, বাইরের গোলমালে ময়নার তপোভঙ্গ হবার সুযোগ নেই কোনও। নিশ্ছিদ্র আবরণ।

উলুধ্বনি উঠল অন্তঃপুর থেকে। শাঁখ বাজল।

ঘরের ভেতর মৈত্র মশায় বললেন, বেজায় গরম পড়েছে হে, উঃ!

মুখুজ্যে মশায় হাসলেন, কাশলেন বোস মশায়। শুরু থেকেই যেমন করছিল কোণের দিকের অল্পবয়স্ক ছোকরাগুলি, ফুসফুস গুজগুজ ক'রে হাসাহাসি করতে লাগল তেমনই ভাবেই।

ময়না, ময়না, পড় বাবা—

ঘোলের শরবত নিয়ে প্রবেশ করলেন একজন। টিনের ট্রের ওপর সারিবন্ধ কাচের গ্লাসে গোলাপী রঙের পানীয়।

আমাকে এক টুকরো বরফ দিতে পারেন?—অনুরোধ করলেন মৈত্র মশায়। বরফ দেওয়া হ'ল। তিনি হেঁট হ'য়ে সেটা ঘষতে লাগলেন ঘাড়ের ঘামাচিতে।

বেলফুল চাই, বেলফুল!—একটা কাঠিতে বেলফুলের মালা দুলিয়ে জানলার কাছে খানিকক্ষণ ঘোরা-ফেরা ক'রে চ'লে গেল একটা লোক। বেরিয়ে এলেন ক্রুদ্ধ কর্তা একটা চাকরকে গাল দিতে দিতে। চটা মেজাজের লোক, গলা ভেঙেছে। এসেই আবার ঢুকে গেলেন।

পড় ময়না, রাধাকৃষ্ণ, রাধা-আ-কৃষণ—

অক্লান্তভাবে পড়িয়ে চলেছে লোকটি।

বৃষ্টির নাম নেই, ছি ছি!—মৈত্র মশায় বললেন।

আজকের দিনটা না হয় যেন, কাজকর্মের বাড়ি।—টিপ্পনী কেটে হাসলেন মুখুজ্যে মশায়। মুখের সামনে হাতটা মুঠো ক'রে বোস মশায় আস্তে কাশলেন। দৃষ্টিপাত করলেন একবার সন্তর্পণে ঘুমন্ত নাতিটির প্রতি। ভারি বায়নাদার ছেলে, ঘুমিয়ে রেহাই দিয়েছে তাঁকে।

চোর, চোর, চোর—

সচকিত হয়ে উঠল সবাই। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে গেল একটা লোক। পিছু পিছু ছুটল জনকয়েক। আশান্বিত হ'ল সবাই। ছোকরার দল বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল সোৎসাহে। একটু পরেই কিন্তু তাদের ফিরতে হ'ল ঘরের ভেতর হতাশ্বাসে। চোর পালিয়েছে। অনুসরণকারীরা ফিরে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে।

ময়না, ময়না, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ—

আবেগভরে পড়াচ্ছে লোকটি।

ভেতর থেকে খাবার ডাক এল। প্রায়-উন্মাদ কর্তা বেরিয়ে এসে করজোড়ে ভগ্ন কণ্ঠে আহ্বান করলেন সকলকে। সদলবলে উঠলেন সবাই, বায়নাদার নাতিটিও উঠল। তেতলার ছাতে জায়গা হয়েছে। শালপাতা, মাটির খুরি, মাটির গেলাস যদিও, আহার্য কিন্তু উঁচুদরের। চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়। ছ্যাঁচড়াটি তো নিখুঁত। ভোজনপটুতা দেখালেন অনেকেই। কোমরে গামছা-বাঁধা ঘর্মাক্ত-কলেবর পরিবেশকের দল সুযোগ পেলেন নিজ নিজ মেরুদণ্ডের শক্তি পরীক্ষা করবার। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটল। আরও কিছুক্ষণ কাটল মুখপ্রক্ষালনপর্বে। অবশেষে বাঁ হাতে পান এবং ডান হাতে খড়কে নিয়ে বাইরে এলেন সবাই। এসেই একটা হর্ষ-বিষাদ। মুখুজ্যে, মৈত্র এবং বোস মশায়ের জুতো নেই।

রাধাকৃষ্ণ, পড় ময়না—

পক্ষী-শিক্ষক উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সবাই গিয়ে প্রশ্ন করলে তাকেই। ঘিরে দাঁড়াল।

ওহে, এঁদের জুতো কোথা গেল ?

জুতো ! কার জুতো ?

বিস্মিত হ'ল সে।

এঁদের ?

সে আমি কি জানি মোসাই ?

এদিকে কাউকে আসতে দেখেছ ?

আমি কিছুই দেখিনি মোসাই, আমি এক মনে আমার পাখী পড়াচ্ছি।

নিরস্ত হলেই সবাই।

চুমকুড়ি দিয়ে সে আবার শুরু করলে, পড়, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ, রাধা-আ-কৃষণ—

মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে সবাই ভাবলে, সেই পলাতক চোরটাই বুঝি তা হ'লে আবার—। মুখুজ্যে রসিকতা করলেন, ব্যাটার রস-বোধ আছে হে, সেরা তিনটি জোড়া বেছে নিয়েছে ! আশ্চর্য ব্যাপার, মৈত্র ঘাড় চুলকে স্থির করলেন, এই তুচ্ছ ব্যাপারটা বাড়ির কর্তাকে না বলাটাই সমীচীন হবে বোধ হয়। বোস মশায় ভাবছিলেন, এত রাত্রে রিক্‌শা মিলবে কি না !

ময়না, ময়না, পড় বেটা—

দাদু আমি ময়না দেখব।

নাকি সুরে আবদার শুরু করলে নাতিটি। নাতির দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে মুখের সামনে হাত মুঠো ক'রে কাশলেন একটু বোস মশায়।

দাদু আমি ময়না দেখব।

রাধাকৃষ্ণ, পড় বেটা, রাধাকৃষ্ণ –

ওর সম্বন্ধেও আলোচনা হ'ল একটু। কেষ্টবাবু বললেন, সেদিন গ্রে স্ট্রীটে একটা বাড়ির সামনে তিনি একেই দেখেছিলেন, ঠিক এমনই ভাবে ব'সে পাখী পড়াচ্ছিল।

যতীনবাবুও দেখেছিলেন বললেন স্কিয়া স্ট্রীটে।

দাদু, আমি ময়না দেখব।

নন্দন পদ বিপন্ন বোস মশায় কিংকর্তব্য ভাবছিলেন।

ও দাদু, ময়না দেখব আমি।

এমন সময় রাগী কর্তাটি বেরিয়ে এলেন।

ও দাদু, ময়না দেখব আমি।

কান্না শুরু করলে।

কি চাই খোকা তোমার ?

ময়না দেখব।

কই ময়না ?

ওই যে।

এগিয়ে গেলেন কর্তা খাঁচার কাছে।

এতে ময়না আছে ?

হাঁ, কর্তা।—পাখী-ওলা বললে।

খোকাকে দেখাও একবার।

পাখী আমি কাউকে দেখাই না।

একবার দেখাতে ক্ষতি কি ?

না।

এর মানে কি ?

আমার খুশি।

খুশি ! তার মানে ?—উদ্দীপ্ত হলেন কর্তা।

আমি দেখাব না।

স'রে পড়বার উপক্রম করলে লোকটি। রোক চ'ড়ে উঠল কর্তার।

দেখাতেই হবে তোমাকে।

জোর ক'রে খুলে ফেললেন খাঁচার আবরণ। দেখা গেল, শুধু মৈত্র, মুখুজ্যে এবং বোস মশায়েরই নয়, প্রকাণ্ড খাঁচাটি ভাল ভাল জুতোয় পরিপূর্ণ। ময়না নেই।

কাকের কাণ্ড

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঘরের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া বলিলেন, হুস—

কাকটা উড়িয়া গিয়া রান্নাঘরের ছাতে বসিল। জগত্তারিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কয়দিন হইতে কোমরে এমন একটা ব্যথা হইয়াছে ! কোমরের অপরাধ নাই, বয়সও তো পঁয়ষট্টি পার হইতে চলিল। ঘরে ঢুকিয়া মুখবিকৃতি-সহকারে তিনি উপবেশন করিলেন এবং কাঁথা সেলাইয়ে মন দিলেন। লতিকার ছেলে হইয়াছে, তাহাকে পাঠাইতে হইবে।

কা—কা – কা—কা—

অমঙ্গল-আশংকায় জগত্তারিণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। হাবু, গবু, দেবু, নিপু চার ছেলেই বিদেশে, কোলের ছেলে টিপু যদিও বাড়িতে আছে ; কিন্তু তাহারও শরীরটা ভাল নাই, এম. এ. পরীক্ষার খাটুনিতে ছেলের শরীরটা রোগা হইয়া গিয়াছে। সে উপরে তেতলার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ছোট নাতি টুকু পাটনা গিয়াছে ফুটবল ম্যাচ খেলিতে —যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে, কখন যে কি করিয়া বসে ঠিক নাই। ইভা, নিভা—মেয়ে দুইজন শ্বশুর-বাড়িতে। তাহাদেরও অনেকদিন চিঠি-পত্র আসে নাই। ছোট বউ মুখুজ্যেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। নীচে কেহ নাই। নির্জন দ্বিপ্রহর।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে পড়িল, কর্তা যে অসুখে মারা যান, সেই অসুখটি হইবার পূর্বে ঠিক এমনই ভাবে কাক ডাকিয়াছিল। কি অলুক্ষণে ডাক !

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আবার কষ্ট করিয়া উঠিলেন।

হু-উ-স—

কাক উড়িয়া কদম গাছের ডালটায় বসিল।

কা—কা—কা—কা—

হুস—হুস—

কাক উড়িল না, কিন্তু নীরব হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া জগত্তারিণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জগত্তারিণী স্বগতোক্তি করিলেন, নবান্নের দিন যখন পেসাদ খেতে দেওয়া হয়, সেদিন পাত্তা থাকে না কারও—এখন এসেছেন জ্বালাতে।

জগত্তারিণী ঘরের মধ্যে গেলেন, মুখবিকৃতিসহকারে পুনরায় বসিলেন এবং চশমাটি ঠিক করিয়া লইয়া সেলাইয়ে মন দিলেন।

কা—কা—কা—

জ্বালিয়ে খেলে তো মুখপোড়া!

কা—কা—কা—কা—

আবার উঠিতে হইল।

হুস—হুস—যা—যা—

কাক বলিতে লাগিল, কক্—কক্—কক্—

ভারি ত্যাঁদড় তো মুখপোড়া!

কক্—

দেখবি তবে?

হস্ত উত্তোলন করিয়া জগত্তারিণী একটা কিছু ছুঁড়িয়া মারিবার ভান করিলেন। কাক ভান বোঝে। সে এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া বসিল এবং জগত্তারিণীকে রাগাইয়া দিবার জন্যই যেন তাহার দিকে গলা বাড়াইয়া বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল, ক্র—ক্র—ক্র—

হুস—

কাক চুপ করিল এবং মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সামনের ডালটার উপর ঠোঁট শানাইতে লাগিল।

জগত্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, পাজি কোথাকার। ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। পুনরায় অতি কষ্টে বসিয়া প্রসারিত কাঁথাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মিনিট খানেক বেশ নিবিষ্ট মনেই সেলাই করিতে পারিলেন। কিন্তু আবার—

কাঙাক্—কাঙাক্—কাঙাক্—

অনুনাসিক কণ্ঠে ডাকিতেছে।

জগত্তারিণী ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। ডাকুক। বার বার আর কোমরের ব্যথা লইয়া উঠিতে পারেন না তিনি। ছোট বউ সেই যে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে, এখনও পর্যন্ত ফিরিবার নাম নাই। এমন আড্ডাবাজ হইয়াছে আজকালকার মেয়েরা!

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—

আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে হইল যেন বলিতেছে, খা—খা—খা—! অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

খাটের রেলিঙে ভর দিয়া আবার উঠিতে হইল তাঁহাকে।

জ্বালাতন!

কা—কা—কোয়্যাক্—

দূর হ—

কা—কা—কা—কা—

দূর দূর—দূর হ—

কা-আ—কা-আ—কা-আ—

তবে রে মুখপোড়া—

জগত্তারিণী কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানে নামিলেন, আরও কষ্ট করিয়া একটি ছোট ঢিল কুড়াইয়া সক্রোধে সেটি কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেলেন। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে উঠানটা পিছল হইয়াছিল।

একজন সাব্‌ডিভিশনাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া, একজন মুন্সেফকে অনেকগুলি দরকারী মকদ্দমার শুনানি মুলতুবি রাখিয়া, একজন হাই-স্কুলের হেডমাস্টারকে বহুবিধ কর্তব্য স্থগিত করিয়া এবং একজন ডাক্তারকে অনেকগুলি শক্ত রোগী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। সকলকেই সপরিবারে। নিভা দানাপুর হইতে এবং ইভা কলিকাতা হইতে সংসার ফেলিয়া সপুত্রকন্যা আসিয়া হাজির হইলেন। পৌত্রী লতিকাও তাহার কচি ছেলেটিকে লইয়া আসিয়া পড়িল। টুকুদের ফুটবল-ম্যাচ 'ড্র' হইয়াছিল, টুকুই দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ, কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সমস্ত দলটিকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দিয়া সেও চলিয়া আসিল।

টিপু চতুর্দিকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিল—Mother seriously ill ; come immediately.

এখন দেখা যাইতেছে, তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই, কোমরে একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র। পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বলিতেছেন, তাহা দুর্বলতার জন্য। ঠিক আগের দিনই নির্জলা একাদশী ছিল। বহুকাল পরে পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রীদের একত্রিত দেখিয়া জগত্তারিণীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কোমরের ব্যথা যেন অর্ধেক সারিয়া গেল। তিনি বালিশে ভর দিয়া সকলের বারণ সত্ত্বেও ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন এবং স্নেহ-সজল কণ্ঠে বলিলেন, তোদের সবাইকে রেখে এখন ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি আমি।

টিপু বলিল, ভাগ্যে আমি ঠিক সেই সময়ে ওপর থেকে নেবে এসেছিলুম, তা না হ'লে কি কাণ্ডই যে হ'ত!

বড় ছেলে—যিনি এস. ডি. ও.—তিনি বলিলেন, তখনই আমি বলেছিলাম, উঠোনটাও পাকা হয়ে যাক, কিন্তু তোমরা সবাই আপত্তি করলে।

মেজ ছেলে গবু—যিনি মুন্সেফ—তিনি বলিলেন, আজই হরেন ওভারশিয়ারকে ডাকিয়ে উঠোনটা বাঁধাবার ব্যবস্থা কর, তবে খুব বেশি পালিশ যেন না করে।

সেজ ছেলে দেবু—হেডমাস্টার—বলিলেন, তা ঠিক।

ন ছেলে নিপু—ডাক্তার—তিনি ব্লাড-প্রেশার মাপিবার যন্ত্রটা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, ব্লাড-প্রেশারটা আর একবার মাপা দরকার।

বাহিরের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা কলরব করিতেছিল। সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল লতিকার ছেলের গলা।

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন, ওলো লতি, খুব উঁচুদরের গলা হয়েছে যে তোর ব্যাটার। নিয়ে আয় ওকে আমার কাছে।

সমস্ত ঘটনার মূল সেই কাকটা পাশের বাড়ির চিলে-কোঠার ছাতে বসিয়া নানা ভঙ্গীতে ডাকিতেছিল, ক—কক্—কর্‌র্; কিন্তু গোলমালে তাহা আর জগত্তারিণীর কানে গেল না।

খেলা

বিড়ালের নাম।

যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন সে নিজের পুচ্ছটিতে থাবা মারিয়া মারিয়া খেলা করিত বলিয়া গৃহিণী তাহার নাম রাখিলেন—খেলা। এখন কিন্তু খেলা প্রবীণ। তাহার চপলতা যে কোন কালে ছিল, তাহা যাঁহারা তাহাকে শিশুকালে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। এখন খেলার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। ঘাড়ে-গর্দানে মোটা-সোটা চেহারা, ক্বচিৎ চোখ খোলে। চোখ বুজিয়া থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে তো আছেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্য তপস্বী যেন।

কিন্তু ভয়ানক চোর।

কে কোথায় কখন-দুধের ঢাকাটা খুলিয়া রাখিতেছে, বাজার হইতে আনা মাছটা বারান্দা হইতে সঙ্গে সঙ্গে তোলা হইতেছে কি না, ছেলেমানুষ বউটি কখন অন্যমনস্ক হইতেছে—সমস্ত তাহার নখদর্পণে। অথচ কখন চুরি করে, ধরা যায় না। যখনই দেখ, হয় তুলসীতলার পাশে, না হয় গৃহিণীর পূজার ঘরের কোণে চোখ বুজিয়া ধ্যানগম্ভীর মূর্তি বসিয়া আছে। যদি গালাগালি দাও, আস্তে আস্তে উঠিয়া নির্জন স্থানে গিয়া বসিবে। বাড়ির কে কি চরিত্রের লোক, তাহা তাহার অবিদিত নাই।

ছোট ছোট ছেলেরা যখন খাইতে বসে, তখন খেলার আর এক মূর্তি। তখন চোর নয়, ডাকাত। সোজা পাত হইতে মাছটি তুলিয়া লইয়া সামনেই বসিয়া খায়। মারিলেও নড়ে না। কেবল চোখ মুখ কুঁচকাইয়া ঘাড়টি পিছনের দিকে ঈষৎ সরাইয়া চোখ বুজিয়া থাকে, দেহ সরায় না। মার বন্ধ হইলে পুনরায় খায়। ছোট ছেলেরা কত জোরেই বা মারিতে পারে! চেঁচামেচি করিলে গৃহিণী আসিয়া পড়েন এবং খেলাকে ছোট্ট একটা চাপড় মারিয়া বলেন, পোড়ারমুখো মাছটা নিলে বুঝি পাত থেকে, কাঁদিস না, এনে দিচ্ছি আর একখানা। ক্ষতিগ্রস্ত বালকটিকে আর এক টুকরা মাছ আনিয়া শান্ত করেন এবং যতক্ষণ না তাহাদের খাওয়া শেষ হয়, সম্মুখে বসিয়া থাকেন। খেলা অপহৃত মৎস্যটি নীরবে ভক্ষণ করিয়া একটু দূরে গুটিসুটি হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। আহত

আত্মসম্মানের মূর্ত ছবিটি যেন। জানে, গৃহিণী থাকিলে সুবিধা হইবে না। উঁহাকে চটাইয়াও লাভ নাই, উঁহারই কৃপা আছে বলিয়া তাহার সাতখুন মাপ।

গৃহিণী তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলেন, খেয়ে খেয়ে মুখপোড়ার গতর হয়েছে দেখ না! খেলার মুদিত চক্ষু মিটিমিটি করিতে থাকে।

ধুমসো কোথাকার!

খেলা উত্তর দেয়, ম্যা-অ্যা-অ্যা-অ্যা-ও—

খুব আস্তে আস্তে; এত আস্তে যে, শোনা যায় না প্রায়। আন্দাজ করিয়া লইতে হয়।

বাড়িতে প্রচুর ইঁদুর। কিন্তু খেলার সেদিকে ঝোঁক নাই। থাকিবেই বা কেন! বাড়িতে অনায়াসলভ্য এত পুষ্টিকর খাদ্য থাকিতে সে আয়াস করিতে যাইবে কোন্ দুঃখে! মাঝে মাঝে তাহাকে অবশ্য গর্তের কাছে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা ঠিক একাগ্র উন্মুখ ওত পাতিয়া বসা নয়। তাহা অনেকটা যেন নধরকান্তি জমিদারবাবুর শখ করিয়া মাছ ধরিতে বসার মতো। বাড়ির বড় ছেলে নৃপেন কিছুদিন হইল ডাক্তার হইয়াছে, তাহার ধারণা, পরীক্ষা করিলে খেলার ইউরিনে সুগার পাওয়া যাইবে।

খেলার অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছে বাড়ির বধূটি—নৃপেনের বউ। অল্প বয়স, হুঁশ কম, সব সময়ে দুধে ঢাকা দিতে মনে থাকে না, রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিতে ভুলিয়া যায়, মাছের অম্বলটা সময়মত শিকায় তুলিয়া রাখা হয় না। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর বকুনি খাইতে খাইতে বেচারী হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। অথচ খেলাকে কিছু বলিবার উপায় নাই, গৃহিণীর প্রিয় বিড়াল। তাঁহার ধারণা, গৃহস্থকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান কাক বিড়াল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা গৃহস্থের হিতৈষী। তবু একদিন বধূটি বিরক্ত হইয়া খেলাকে লক্ষ্য করিয়া একটা চেলাকাঠ ছুঁড়িয়াছিল। চেলাকাঠ খেলাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, লাভের মধ্যে কুঁজাটা চুরমার হইয়া গেল।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক হইল একাদশীর দিন। শ্বশুর সেদিন দিবসে লুচি এবং রাত্রে ফলাহার করেন। আম সাজাইয়া শাশুড়ী অপেক্ষা করিতেছেন।

বউমা, ক্ষীরটা দিয়ে যাও।

ক্ষীর আনিতে গিয়া বউমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বাটিটি কেহ যেন ধুইয়া পুঁছিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে নৃপেনেরও চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইল।

মীট্‌সেফ! মীট্‌সেফ কোথা পাব হঠাৎ?

কিনে আন একটা।

সে যে প্রায় দশ-বারো টাকার ধাক্কা, বেশিও হতে পারে। তা ছাড়া—

তা হোক, তবু কিনে আন তুমি, খেলা আমাকে পাগল করবার যোগাড় করেছে। সকলের বকুনি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেলাম আমি।—বধূর আবদারমাখা কণ্ঠস্বর ও বিপন্ন মুখচ্ছবি নৃপেনকে বিব্রত করিল। প্রথমত হাতে টাকা নাই, এই তো সবে প্র্যাক্‌টিস শুরু করিয়াছে, দ্বিতীয়ত ধারেও যদি সে মীট্‌সেফ কিনিয়া আনে, বাবা কি বলিবেন! অর্থাভাবে কত প্রয়োজনীয় কর্তব্য অকৃত রহিয়াছে, হঠাৎ একটা মীট্‌সেফ—!

নৃপেন মাথা চুলকাইতে লাগিল।

পরদিন কিন্তু দুইটি কুলিবাহিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড মীট্‌সেফ আসিয়া পড়িল। কুলির হাতে পিতার নামে নৃপেনের একটি চিঠিও। নৃপেন ডিস্‌পেন্সারি হইতে লিখিতেছে—

একটি মীট্‌সেফ পাঠাইতেছি। ইহা একজন রোগী আমাকে উপহার দিয়াছে।

খেলা মীট্‌সেফটির দিকে একবার চাহিল, বধূটির দিকে একবার চাহিল, তাহার পর সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া হাই তুলিল এবং ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কয়েকদিন কাটিয়াছে।

পুনরায় একাদশী রজনী সমুপস্থিত। কর্তা ফলাহার করিতে বসিয়াছেন। গৃহিণী আমের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বউমা, ক্ষীরটা দিয়ে যাও।

বউমা মীট্‌সেফ খুলিয়া অবাক। মীট্‌সেফের কপাটটা ভাল করিয়া খুলিতেই খেলা গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল, ক্ষীরের বাটি খালি।

মীট্‌সেফের ছিটকিনিটা লাগাইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

কোষ্ঠী গল্প

॥ এক ॥

শুনিয়া রামলোচন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ইহাই এই আখ্যানটির শেষ ঘটনা। ইহার পূর্ববর্তী যে সকল ঘটনাপরম্পরা এই শেষ ঘটনাটিকে সম্ভবপর করিয়াছে, তাহার ইতিহাস রামলোচনের জীবনব্যাপী ইতিহাস। তাহার পুংখানুপুংখ বর্ণনা ক্লান্তিজনক তো বটেই, বর্তমান আখ্যায়িকার পক্ষে অবান্তরও। সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বলিব।

রামলোচন মিত্র আজ যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য যে, এককালে তাঁহার যৌবন ছিল। শুধু ছিল নয়, বেশ প্রবলভাবেই ছিল। যৌবনকালে নানাবিধ শৌখিন কল্পনা তাঁহার মস্তকে পুষ্পিত হইয়া তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। সংগীত, চিত্রকলা, কবিতা, ভোজনবিলাস, পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রত্যেক জিনিসটিকেই তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তদনুযায়ী চলিতেন। যাঁহারা রামলোচনবাবুকে চেনেন, তাঁহারা হয়তো আমার কথা শুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিতেছেন। মাথায় কোঁকড়ানো বাবরি-চুলসমন্বিত ছিমছাম যে যুবকটি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে বন্ধুগণের সহিত ঠুংরি গান, র‍্যাফেলের চিত্র, কাশ্মীরী পোলাও অথবা মস্‌লিনের সূক্ষ্মতার আলোচনায় মশগুল থাকিতেন, সেই যুবকটিই যে বর্তমানের টাক-মাথা, ন-হাতি-কাপড়-পরা, শীর্ণকান্তি, জরাজীর্ণ রামলোচনবাবুতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা সত্যই শক্ত। যাঁহারা হাসিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমি দোষ দিব না। আমি শুধু তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিব যে, বর্তমানের

কুদর্শন কটুভাষী রামলোচন সত্যই একদা সুদর্শন ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। বর্তমানের পেচকপ্রকৃতির ব্যক্তিটি সত্যই এককালে বসন্তকালের কোকিলের সঙ্গে উপমিত হইতে পারিতেন।

॥ দুই ॥

সেকালের যুবক রামলোচন মিত্র প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন যে, তিনি এমন একটি বালিকাকে বিবাহ করিবেন, যে বালিকা তাঁহার শিল্পীমনকে তৃপ্ত করিতে পারে। সংক্ষেপে, মেয়েটি রাঁধিতে পারিবে, ছবি আঁকিতে পারিবে এবং সুন্দরী হইবে। নাচটা সেকালে প্রচলিত ছিল না। থাকিলে রামলোচন পত্নীর গুণাবলীর মধ্যে নৃত্যকুশলতাও নিঃসন্দেহে কামনা করিতেন। এ কথাও অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, করিলে তাঁহার কামনা নিষ্ফল হইত। কারণ ভাবী পত্নীর মধ্যে তিনি যাহা যাহা কামনা করিতেছিলেন, তাহাই জোটানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। একাধারে সঙ্গীতজ্ঞা, চিত্রবিদ্যাপারদর্শিনী, রন্ধননিপুণা, রূপবতী কিশোরী সেকালে বেশি ছিল না। থাকিলেও হয়তো রামলোচন তাঁহাদের নাগাল পাইতেছিলেন না, কিংবা তাঁহারা রামলোচনকে ধরিতে পারিতেছিলেন না। মোট কথা, আকাঙ্ক্ষিত যোগাযোগ ঘটিয়া উঠিতেছিল না। কিছুদিন কাটিবার পর নিরুপায় রামলোচন বাধ্য হইয়া আদর্শ খর্ব করিলেন। তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, ভাল রান্না করিতে পারে এরূপ একটি সুশ্রী মেয়ে মিলিলেই তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। ছবি আঁকিতে না হয় না-ই জানিল ; পরে শিখাইয়া লইলেই চলিবে। কিন্তু হায়, দুঃখের বিষয় হইলেও সত্যের খাতিরে ইহা ব্যক্ত করিতেই হইবে যে, এরূপ কন্যাও সুলভ হইল না। অনেক অনুসন্ধানের পর অবশেষে ক্ষেমংকরীর সন্ধান পাওয়া গেল। শোনা গেল, বালিকাটি হারমোনিয়াম-সহযোগে থিয়েটার-সঙ্গীত গাহিতে পারে এবং রন্ধন-ব্যাপারেও নাকি সুনিপুণা। ক্ষেমংকরীর আত্মীয়-স্বজন, চেনাশুনা সকলেই সমস্বরে ইহা বলিতে লাগিলেন। রামলোচনও একদিন গিয়া বালিকাটির গান শুনিয়া এবং রান্না খাইয়া আসিয়া তাহা সমর্থন করিলেন। মেয়েটি কিন্তু সুশ্রী নহে। রামলোচন পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে বিবাহ করা চলে না। কিন্তু তাহা যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন ইহাকেই কণ্ঠলগ্ন করত ঝুলিয়া পড়া উচিত। পড়িলেনও।

॥ তিন ॥

বিবাহের পরেই ঠিক কয়েক বৎসর রামলোচন ও তৎপত্নী ক্ষেমংকরী কি ভাবে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাহা আমার সঠিক জানা নাই। অনেকদিন পরে যখন রামলোচনের খবর লইবার সুযোগ পাইলাম, তখন দেখিলাম, তাঁহাদের জীবন নিষ্ফল হয় নাই। ছয়টি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা রামলোচনের গৃহ অলঙ্কৃত এবং ক্ষেমংকরীর কোমর বাতগ্রস্ত করিয়াছে। রামলোচন একদিন সক্ষোভে বলিলেন যে, তাঁহার যৌবনের

বাতিকগ‌ুলি বাতাহত। বিবাহের পরই রামলোচন লক্ষ্য করিলেন যে, ক্ষেমঙ্করীর দেহ-গ্রন্থিগ‌ুলি কেমন যেন অমজব‌ুত ধরনের। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা পরিশ্রম করিলে গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয়—শয্যাগত হইয়া পড়েন। ইহার জন্য প্রথম প্রথম তিনি অদ‌ৃষ্টকেই দায়ী করিতেন। কিন্তু ক্রমাগত সন্তান প্রসব করিয়া ক্ষেমঙ্করী যখন জখম হইয়া পড়িলেন, তখন কারণ আর অদ‌ৃষ্ট রহিল না—দ‌ৃষ্ট হইয়া পড়িল। ডাক্তারদের নির্দেশ অন‌ুযায়ী তিনি নিজেকেই ইহার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং ক্ষেমঙ্করীর সহিত অন‌ুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ক্ষেমঙ্করী-সন্নিধানে যতক্ষণ তিনি থাকিতেন, চলিত বাংলায় বলিতে গেলে, গর‌ু-চোরের ন্যায় সশঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। এতাদ‌ৃশ বিপর্যয়ের মধ্যে ক্ষেমঙ্করীর সংগীতকলার সম্যক পরিচয় পাইবার সুযোগ তো রামলোচনের ঘটিলই না, উপরন্তু রামলোচন পাচক-সমস্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। বস্তুত ইহাই এখন তাঁহার জীবনের প্রধান সমস্যা। ক্ষেমঙ্করী পঙ্গ‌ু হইলেও রন্ধন-শিল্পী। সুতরাং যা-তা ঠাকুর তাঁহার পছন্দ হয় না। রামলোচন অনেক কষ্টে একটি ঠাকুর যোগাড় করিয়া আনেন; দ‌ুই-চারি দিনেই তাহার নানা দোষ ক্ষেমঙ্করীর নিকট প্রকট হইয়া পড়ে। রামলোচনকেও সে সকল দোষের অমার্জনীয়তা স্বীকার করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ছাড়াইয়া দিতে হয় এবং ন‌ূতন পাচকের সন্ধানে বাহির হইতে হয়। যৌবনকালে পত্নী-অন‌ুসন্ধানকালে যে সত্য তিনি আভাসে অন‌ুভব করিয়াছিলেন, সারা জীবন ধরিয়া পাচক-অন‌ুসন্ধান করিতে করিতে তাহা সম্প‌ূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন—এ দেশে নিখ‌ুঁত কিছ‌ু পাওয়া অসম্ভব।

॥ চার ॥

ন‌ূতনতম যে পাচকটি সেদিন আসিয়াছিল, সেটি মিথিলার অধিবাসী। পরিধানে পীতাম্বর, ললাটে সচন্দন সিন্দ‌ুর, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম, গৌর বর্ণ, আকর্ণবিশ্রান্ত পদ্মপলাশ নয়ন। র‌ূপ দেখিলে চক্ষ‌ু জ‌ুড়াইয়া যায়। কিন্তু চক্ষ‌ু জ‌ুড়াইবার জন্য কেহ পাচক নিয‌ুক্ত করে না। যে জন্য করে, সে বিষয়ে এই কমনীয়-কান্তি মৈথিলটির তুলনা মেলা ভার। সেদিন ক্ষ‌ুধার্ত রামলোচন খাইতে বসিয়া দেখিলেন, ভাতগ‌ুলি পিণ্ডের মত, তরকারিগ‌ুলি অখাদ্য—একটি আগ‌ুনে প‌ুড়িয়াছে, আর একটি ন‌ুনে প‌ুড়িয়াছে এবং তৃতীয়টি কাঁচা আছে। অত্যন্ত ক্ষ‌ুধার্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় রামলোচন দ‌ুই-চারি গ্রাস আহার করিয়া ক্ষ‌ুন্নিব‌ৃত্তি করিলেন। মৈথিলকে কিছ‌ু বলিলেন না। নানার‌ূপ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া রামলোচন ইহাই সার ব‌ুঝিয়াছিলেন যে, আত্মসংযম হারাইলে তিনি অক‌ুল পাথারে পড়িবেন। খ‌ুব সংযতভাবেই তিনি উঠিয়া গেলেন এবং ক্ষেমঙ্করীর নিকট গিয়া খ‌ুব সংযত কণ্ঠেই বলিলেন, এ বাম‌ুনটা তেমন সুবিধার নয়, ব‌ুঝলে? কিছ‌ুই জানে না রাঁধতে। সংগীতচর্চা করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবত ক্ষেমঙ্করী বিনা ঝঙ্কারে কিছ‌ু বলিতেন না। তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, রোজ রোজ বাম‌ুন পাবেই বা কোথা? ওকেই কোন রকমে চালিয়ে নাও। আর যাই হোক, নোংরা নয়। এর আগে যেটা এসেছিল, সেটা ইল্লতের ধাড়ি! এটা তব‌ু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আছে।

ও, তাই নাকি ? তবে থাক্।—ত্রস্ত রামলোচন বাহিরে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘোর দুশ্চিন্তা হইল। এই মৈথিল পাচকের হাত হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

॥ পাঁচ ॥

নিদ্রাভঙ্গ হইতেই রামলোচন পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্ণে অতি মধুর একটি সুর ভাসিয়া আসিল। অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে গুনগুন করিয়া কে যেন ভৈরবী আলাপ করিতেছে! সুন্দর তো! রামলোচনবাবুর জরাজীর্ণ বক্ষের মধ্যে যৌবনের সংগীতপিপাসু মনেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিল এবং রামলোচনকে শয্যাত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। রামলোচন উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, নবনিযুক্ত মৈথিল ঠাকুরটিই ওদিকের দাওয়ায় বসিয়া তন্ময় চিত্তে ভৈরবী আলাপ করিতেছে। রামলোচনবাবু হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন ও অবিলম্বে তাহাকে ডাকিয়া অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহার সংগে আলাপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পাচক সংগীতানুরাগী তো বটেই, যত্ন করিয়া শিক্ষাও করিয়াছে। রামলোচন বলিলেন, বেশ বেশ। তুমি থাক আমার কাছে। ভাবিলেন, রান্না যতই খারাপ করুক, গান শুনিয়া তৃপ্ত হইবে। তিনি ব্রাহ্মণকে উৎসাহিত করিলেন।

॥ ছয় ॥

পরদিন ক্ষেমংকরী স-ঝংকারে বলিলেন, ও ঠাকুরকে আজই বিদেয় কর। ওর দ্বারা চলবে না।

থতমত খাইয়া রামলোচন বলিলেন, কেন ?

রাঁধতে তো জানেই না—রান্নাঘরে ব'সে ব'সে পোড়ারমুখো রাগিণী ভাঁজছে। দূর কর ওকে—আজই তাড়াও।

রামলোচন কোন দিনই ক্ষেমংকরীর বিরুদ্ধাচরণ করেন না। আজও করিলেন না।

কেবল তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

॥ সাত ॥

গল্প পাঠ শেষ করিয়া গল্পলেখক সস্মিত মুখে স্ত্রীর পানে চাহিলেন। স্ত্রীর চক্ষু দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল। বলিল, বাবা বাবা! তবু যদি তোমাকে একটি দিনের জন্যেও ঠাকুরের রান্না খেতে হ'ত। মাংসের কোর্মাটা ভাল হয় নি বুঝি আজ ?

স্বামী হাসিয়া বলিলেন, মানুষ তা-ই কল্পনা করে, যা তার নেই। উল্টো অবস্থাটা ভেবে দেখতে বেশ লাগে। তুমি বেহাগের নতুন যে গতটা শিখেছ, বাজাও না—শুনি।

আজ থাক্, রাত হয়ে গেছে।—এই বলিয়া হঠাৎ সে বাতিটা নিবাইয়া দিল।

সংক্ষেপে উপন্যাস

॥ এক ॥

সেদিন মাঘের রাত্রি ছিল। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—অসম্ভব শীত। সঞ্জয় অন্যমনস্ক হইয়াই গলিটাতে ঢুকিয়াছিল। প্রায় জনশূন্য গলি—রাত্রি অনেক হইয়াছে। হনহন করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সঞ্জয়ের সহসা চোখে পড়িল, একটা খোলার ঘরের সম্মুখে রঙিন-কাপড়-পরা একটা মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ভীরু উৎসুক দৃষ্টি। সঞ্জয় দাঁড়াইয়া পড়িল।

॥ দুই ॥

এক বৎসর পরে।

সঞ্জয়ের অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল। ছি—ছি—ছি—নিজেকে সে কোথায় নামাইয়াছে! তাহাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিল! না হয় সে মদ খাইয়া গিয়াছিল! তাহাতে হইয়াছে কি? মদ খাইয়া হল্লা করিবার জন্যই তো ওখানে যাওয়া। মানস-নেত্রে ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। শ্যামকান্তি তন্বী যুবতী—নূপুরে দুলে ওড়নায়, পেশোয়াজে চুমকিতে জরিতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সম্রাজ্ঞীর মতো লীলায়িত ভঙ্গীতে কমনীয় বাহুটি তুলিয়া দ্বারদেশ দেখাইয়া আদেশ করিতেছে, অমন মাতলামি করেন তো বেরিয়ে যান এখান থেকে। স্বর্ণকঙ্কণের ঝনৎকার আবার যেন সে শুনিতে পাইল, লোহিত রেশম-গুচ্ছ-বিলম্বিত বাজুবন্ধের দোলকটি আবার যেন চোখের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল।

পরদিন অতিশয় সংযত কঠিন মূর্তি লইয়া সঞ্জয় গেল। নির্জন দ্বিপ্রহর। ঘরে আর কেহ ছিল না। সঞ্জয় দেখিল, সম্রাজ্ঞীরও রূপ বদলাইয়াছে। তবু কিন্তু অপরূপ। অতি সাধারণ একখানি নীলাম্বরী, ছোট একটি কাঁচপোকার টিপ, তাম্বূলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুইটিতে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি, দীর্ঘ আঁখিপল্লবে সহৃদয় স্নেহচ্ছায়া। সঞ্জয়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আসুন, আসুন। ভাবলাম, বুঝি রাগ ক'রে আসবেনই না। বসুন।

সঞ্জয় নীরবে আসন পরিগ্রহ করিল। কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। সঞ্জয় বসিতেই সে হাসিমুখে উঠিয়া গিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া সম্মুখের তেপায়ার উপর রাখিল এবং বলিল, নিন, খান।

সঞ্জয়ের অধর দুইটি নড়িয়া উঠিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সে হাসিয়া অনুযোগভরে বলিল, ছি, ও-রকম মাতলামি করতে আছে? মদ খেলে ভদ্রলোকের মতো খেতে হয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিজেই সে মদ ঢালিতে লাগিল।

বাসন্তী রঙের স্বচ্ছ সফেন সুরা।

নিন।

সঞ্জয়ের রগের শিরাগুলো দপদপ করিতেছিল।

সে হাত বাড়াইয়া গ্লাসটা লইল এবং পিকদানিতে সেটা উপুড় করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

পিছন ফিরিয়া চাহিল না।

॥ তিন ॥

কয়েকদিন পরে একখানি পত্র।

তাহারই পত্র।

রাগ ক'রো না, ফিরে এস।

সঞ্জয় মুখ টিপিয়া একটা তিক্ত হাসি হাসিল। ঠিক করিল, যাইবে না। ও পাপকুণ্ড হইতে সরিয়া থাকাই ভাল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না। গেল।

গিয়া শুনিল, এইমাত্র সে বাহির হইয়া গিয়াছে। জনৈক বড়লোকের বাগান-বাড়িতে জলসা আছে।

॥ চার ॥

পরদিন গেল।

সেদিনও দেখা পাইল না।

তাহার পরদিনও সে যাইত, কিন্তু একটা টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। বাবা মারা গিয়াছেন।

দুই মাসের পূর্বে ফিরিতে পারিল না। ফিরিয়া আসিয়াই কিন্তু আবার গেল। গিয়া শুনিল, সে অন্য ঠিকানায় উঠিয়া গিয়াছে।

ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না।

॥ পাঁচ ॥

সহসা একদিন ঠিকানা মিলিল।

প্রকাণ্ড বাড়ি।

প্রকাণ্ড গেট।

সঞ্জয় ঢুকিতে গেল, পারিল না।

দারোয়ান বলিল, হুকুম নেহি হ্যায়।

॥ ছয় ॥

দুই বৎসর পরে।

ত্রিশ টাকা বেতনের দীন কেরানী সঞ্জয় আপিস হইতে বাহির হইয়া সহসা একদিন দেখিল—দেওয়ালে দেওয়ালে, কাগজে তাহার ছবি।

সিনেমা-হাউসের সম্মুখে অসম্ভব ভিড়।

লোকে লোকারণ্য।

সঞ্জয় অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু টিকিট পাইল না। তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

বিসর্পিত রেখায় নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নদীর পরপার ঘন বন-সমাচ্ছন্ন, এপারে রুক্ষ পর্বতমালা। একটি গুহামুখ দেখা যাইতেছে। পরপারবর্তী ঘন অরণ্যের শাখা-পত্র-জটিল, নিবিড়তা দৃষ্টি-দুর্ভেদ্য। অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, একটি বিরাট পাইথন একটি বিরাট বৃক্ষশাখা হইতে স্থিরভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে শিকারের প্রত্যাশায়। অরণ্যের ওপার হইতে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। তীক্ষ্ণনখচঞ্চু মাছরাঙা একটা জলের উপর ছোঁ মারিয়া মারিয়া উড়িতেছে।

নদীতীরবর্তী প্রান্তরে অরুণ, অশোক, বীরেন, চঞ্চল, নিমাই, নগেন, নটবর, কার্তিক একটি অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে উবু হইয়া বসিয়া আছে। সকলেই উলঙ্গ, সকলেই কর্কশ-রোম, সকলেই শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত, সকলেরই শিরে অযত্নবিন্যস্ত কেশভার—কাহারও কর্পিশ, কাহারও পিঙ্গল, কাহারও কৃষ্ণবর্ণ। অদূরে ভুপাল বালুকা খনন করিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতেছে। নরেশও অগ্নিকুণ্ডের নিকট নাই, সে-ও নদীর ধারে ধারে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে।

নিপু, কানু, চম্পা, টুকু, বুদি প্রভৃতি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা ইতস্তত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কানুর হস্তে একখণ্ড ভাঙা মৌচাক, তাহা হইতে মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে, তাহার ভিতরে কীটাকৃতি মৌমাছি-শাবকেরা কিলবিল করিতেছে। কানু নির্বিকার চিত্তে সবসুদ্ধ কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতেছে, চম্পা লুব্ধ নয়নে চাহিয়া আছে। বুদির হাতে একটা জীবন্ত শামুক, সে সেটাকে একটা পাথরে ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙিতেছে, আহত শামুকটার লালা-পিচ্ছিল সর্বাঙ্গ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রতিবাদ করিতেছে। তাহার কিন্তু নিস্তার নাই। বুদির মুষ্টি কঠোর, দন্ত তীক্ষ্ণ। নিপু একটা পলাতক কীটের গর্ত-সমীপে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে। রুগ্ন টুকু নাকী সুরে কাঁদিতেছে।

আরও কিছু দূরে রেবা, নিভা, মায়া, বেলা, শেফালি, মালবিকা, ক্ষমা, স্নেহলতা, মাধবী প্রভৃতি নানা বয়সের নারীগণ নানা কার্যে ব্যাপৃত। মালবিকা রেবার নিকট মাথা পাতিয়া বসিয়া আছে, রেবা উকুন বাছিতেছে। ক্ষমা কণ্ঠলগ্ন শাবকটিকে স্তন্যপান

করাইতেছে। মায়া আহারে ব্যস্ত, তাহার হাতে কন্দ-জাতীয় কি যেন একটা আহার্য। নিভা কিছু করিতেছে না, সে অদূরে অবস্থিত পুরুষ-মণ্ডলীর দিকে মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছে। তাহার ভ্রূ, অধরোষ্ঠ, স্তনযুগল মাঝে মাঝে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। বেলা, শেফালি, স্নেহলতা, মাধবী কতকগুলি কাঁচা চামড়া হইতে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা মাংস কুরিয়া কুরিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ইহারাও সকলেই উলঙ্গ। ইহাদের নিকটও একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে।

আর একটু দূরে বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আর একটি ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ডকে ঘষিয়া ঘষিয়া তীক্ষ্ণতর করিবার প্রয়াস পাইতেছে। বৈদ্যনাথও উলঙ্গ।

নিকটে কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দিকে দুর্গন্ধ।

চারিদিকে চামড়া।

অনতিদূরে একটা মৃত ভল্লুক পচিতেছে।

একটি অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ইন্দুরও পুড়িতেছে।

॥ দুই ॥

বৃদ্ধ দলপতি বৈদ্যনাথ প্রস্তর ঘষিতেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। চাহনি লালসাময়। মায়া বৈদ্যনাথেরই কন্যা বটে, কিন্তু নবোদ্ভিন্নযৌবনা! তাহার অনাবৃত শরীরে যৌবন যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। ভ্রাতা নটবরও মাঝে মাঝে ভগ্নী মায়াকে দেখিতেছে। তাহারও দৃষ্টিতে ক্ষুধা।

রুগ্ন টুকু একটানা কাঁদিয়া চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথের মুখমণ্ডল সহসা কঠিন হইয়া উঠিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সে আবার পাথর ঘষিতে লাগিল।

অরুণ সহসা মুখ তুলিয়া নিভার দিকে চাহিল।

নিভা হাসিল। শ্বা-দন্তগুলি চকমক করিয়া উঠিল।

নটবরের চোখে নিষ্করুণ দৃষ্টি।

নদীতীরে সঞ্চরমান অষ্টাদশ-বর্ষীয় যুবক পুত্র নরেশ চর্মোপরি অবনমিতা জননী শেফালির নগ্ন দেহটার পানে চাহিয়া ঈষৎ বিচলিত হইল। শেফালি প্রৌঢ়া। বৃদ্ধা স্নেহলতার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সে আপন মনে কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহার চামড়াটা প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিল। পলিতকেশিনী স্নেহলতা।

চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা বৃহৎ শকুনি মৃত ভল্লুকটার নিকটে উপবেশন করিয়াই উড়িয়া গেল। নগেন তাহাকে তাড়াইয়া ভালুকটাকে টানিয়া নিকটে আনিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ, অশোক, কার্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল। ওপারে ঘন বনান্তরাল হইতে দ্বি-খড়্গ-সমন্বিত রোমশ একটা গণ্ডার ভীষণদর্শন মুণ্ডটা বাহির করিয়া ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে।

সকলেই চীৎকার করিতে করিতে এক এক খণ্ড প্রস্তর তুলিয়া তদভিমুখে ধাবমান হইল।

॥ তিন ॥

খানিকক্ষণ পরে।

গণ্ডার অন্তর্হিত হইয়াছে। উত্তেজনা-অবসানে সকলেই পুনরায় স্ব স্ব স্থানে বসিয়াছে। বৈদ্যনাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘর্ষিত প্রস্তরের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিতেছে। না, এখনও ঠিক মনোমত হয় নাই। আবার সে ঘষিতে শুরু করিল। একটা ভোঁতা স্থান কিছুতেই তীক্ষ্ণ হইতেছে না। ঘষিতে ঘষিতে সে মুখ তুলিয়া আর একবার মায়ার দিকে চাহিল। কন্দচর্বণনিরতা মায়াও চাহিল। নবোদ্ভিন্নযৌবনা মায়া, মুখে মৃদু হাসি।

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহের সমস্ত পেশী শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্বাসের গতি-বেগ বাড়িয়া গিয়াছে। না, আর নয়। অনেকদিন সহ্য করিয়াছে সে। ওই বৃদ্ধটার আধিপত্য আর সহ্য করা যায় না। তাহার অন্তর মথিত করিয়া একটা কষ্ট ক্ষোভ তর্জন করিয়া উঠিল। তর্জন-শব্দে মায়া ফিরিয়া চাহিল, দন্তবিকাশ করিয়া অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গী করিল। তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া নটবর তাহাকে ধরিল। দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সবলে তাহাকে আকর্ষণ করিল। মায়া ফোঁস করিয়া উঠিল—ছদ্ম কোপে। অর্ধভুক্ত কন্দটা মাটিতে পড়িয়া গেল। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া মায়া কন্দটা আবার তুলিয়া লইল। তাহার ভ্রূভঙ্গী, তাহার মুচকি হাসি, তাহার আহ্বানময় প্রত্যাখ্যান অপরূপ! নটবর পাগল হইয়া উঠিল। নটবর—। সহসা কঠিন প্রস্তরাঘাতে সচকিত হইয়া নটবর ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল; বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—ঘূর্ণিত-লোচন, হিংস্র-দংষ্ট্রা। নটবর ছুটিয়া গিয়া বৈদ্যনাথকে আক্রমণ করিল। পিতা-পুত্রে ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বৈদ্যনাথ যুবক নটবরকে বিধ্বস্ত করিতে পারিল না। নটবরের দেহে অসুরের শক্তি। সে বৈদ্যনাথকে ভূশায়ী করিয়া মায়াকে তাড়া করিল। মায়া ছুটিল, নটবরও ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে উভয়ে পর্বতগুহামুখে অদৃশ্য হইয়া গেল!

কেহ বিশেষ বিচলত হইল না।

প্রৌঢ়া জননী শেফালির নগ্নমূর্তি যুবক পুত্র নরেশকে বিচলিত করিতেছিল বটে, কিন্তু অধিকতর উত্তেজনাজনক আর একটা ঘটনা ঘটিল। স্বচ্ছ নদীজলে একটা মৎস্য দেখিতে পাইয়া নরেশ জলে নামিয়া পড়িল, ডুব-সাঁতার কাটিয়া মাছটাকে ধরিতে হইবে। প্রকাণ্ড মাছ।

ভূপাল বালুকা খনন করিয়া কতকগুলি কচ্ছপের ডিম আবিষ্কার করিয়াছিল, সেগুলি আহরণ করিয়া অগ্নিকুণ্ড-সমীপে আসিয়া উপবেশন করিল এবং মনোনিবেশ-সহকারে সেগুলি আহার করিতে লাগিল। অশোক কয়েকটি কাড়িয়া লইল। একটু কলহ হইল। ধীরেন অগ্নিকুণ্ডে দহমান মূষিকগুলিকে আর একবার উলটাইয়া দিল।

অরুণ ও নিতার আর একবার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। স্নেহলতা একটি চামড়া শেষ করিয়া আর একটি শুরু করিল।

সকলেই স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত রহিল। বিধ্বস্ত বৈদ্যনাথ অথবা গুহান্তরালে অন্তর্হিত মায়া-নটবরকে লইয়া কেহই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। রুগ্ন টুকুর একটানা কান্নাতেও এতটুকু ছেদ পড়িল না।

॥ চার ॥

একটু পরে বৈদ্যনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

মায়া নটবর এখনও নিরুদ্দিষ্ট।

চতুর্দিকে কোন শব্দ নাই।

কেবল টুকুটা কাঁদিতেছে। একটানা কান্না।

বৈদ্যনাথের দেহের সমস্ত পেশী আবার শক্ত হইয়া উঠিল। সে সহসা ছুটিয়া গিয়া টুকুকে তুলিয়া তাহার দুই পা ধরিয়া কঠিন পাথরটার উপর সজোরে আছাড় মারিল। টুকুর মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, রক্তাক্ত মস্তিষ্কটা ছ্যাতরাইয়া পাথরটার চতুর্দিকে ছিটকাইয়া পড়িল। মৃতদেহটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বৈদ্যনাথ হাঁপাইতে লাগিল। ইহাতেও বিশেষ কেহ বিচলিত হইল না।

টুকুর মা থাকিলে হয়তো হইত। কিছুদিন পূর্বে সে মারা গিয়াছে।

নিমাই উঠিয়া গিয়া টুকুর মৃতদেহটা আনিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডে গুঁজিয়া দিল। এতখানি মাংস নষ্ট করিয়া কি হইবে!

অরুণ উঠিয়া নিভার কাছে গেল।

সিক্তদেহ নরেশ নদী হইতে উঠিল। মাছ ধরিয়াছে, প্রকাণ্ড মাছ।

তীরে উঠিয়াই সে মাছটাকে এক আছাড় দিল, তাহার পর তুলিয়া তাহার টুঁটিটা কামড়াইয়া ধরিল। মাছটা তবু ছটফট করিতেছে। নরেশ মাছটা খাইতে খাইতে একবার শেফালির দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর তাহার কাছে গিয়া বসিল। একেবারে গা ঘেঁষিয়া বসিল।

নদীর পরবর্তী অরণ্যে কলরব উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে লাগিল।

শেফালি নরেশের দিকে চাহিয়া হাসিল।

বাড়াবাড়ি ঠেকিতেছে?

ঠেকিবারই কথা। নামগুলা মুছিয়া দিয়া সময়টাকে আর একটু পিছাইয়া দিন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। নদী-পরপারবর্তী বনে যে কলরব-কোলাহল উঠিতেছে, তাহা আর কিছু নয়, আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা বন্য ম্যামথ শিকার করিতেছে।

কাল-চক্র ঘুরিতেছে।

ক খ গ

[জ্যামিতিক গল্প]

॥ এক ॥

ক ও খ অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

শুধু তাহাই নহে, উভয়েরই জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার। ধার করে, ধার করিয়া ধার শোধ করে, আবার ধার করে। জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার হইলেও ইহাদের সান্ধ্যগতিপথ সরলরেখাকৃতি। সন্ধ্যার সময় উভয়েই সোজা এক স্থানে গমন করে এবং সমস্ত রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিয়া সকালে আবার ফিরিয়া আসে। রাত্রেই যেদিন ফিরিতে হয়, সেদিন অবশ্য গতিপথটা সরল থাকে না, একটু এঁকা-বেঁকা হইয়া যায়।

ধার বাড়ে।

জীবন অর্থহীন হইয়া পড়িতে চায়। আবার নূতন অর্থ মেলে।

ক বস্তুতান্ত্রিক।

খ ভাবতান্ত্রিক।

খ পরিচিত-মহলে কখনও বক্তৃতা দিয়া, কখনও কাঁদিয়া-কাটিয়া, কখনও অভিনয় করিয়া কাজ হাসিল করে। সোজা চাহিয়া না পাইলে ক পকেট মারে। বস্তুতান্ত্রিক ক।

॥ দুই ॥

গ।

ষোড়শী গ। কয়ের কন্যা। মাতৃহীনা একমাত্র কন্যা। তবু অনূঢ়া। তাহার অন্তরের কামনা সর্বাঙ্গে প্রকট।

বস্তুতান্ত্রিক ক দেখে, বোঝে, কিন্তু কিছু করিতে পারে না। এত লম্বা পকেট বঙ্গদেশে কাহারও নাই, যাহা মারিয়া পণের টাকা সংগ্রহ করা যায়।

ক ও গ দুইজনের নিশ্বাস পড়ে।

খ আসে।

ক খ গ ত্রিভুজ নয়,—পিতা, পিতৃবন্ধু ও কন্যা।

ক খ বাহির হইয়া পড়ে, সোজা সরলরেখায় সেই স্থানে যায়, যেখানে গেলে চতুর্ভুজ হওয়া সম্ভব।

॥ তিন ॥

ভাবতান্ত্রিক খ।

মনে ভাব জাগে, ভাষা মেলে না।

কবিতা লিখিতে চায়, মিল জোটে না।

গোলাপের সহিত জোলাপ ছাড়া অন্য মিল আসে না।

না—না—না। সমস্ত জীবনটাই না।

তবু—আকাশে রামধনু উঠে—সাতটা নয়, সাতশো রঙ।

খয়ের অন্তর খলখল করে।

দিন কাটে।

॥ চার ॥

দুই মাস কাটিয়া গেল।

সানাই বাজিতেছে। করুণ পূরবী সন্ধ্যার আকাশে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। পাড়ায় মিত্রদের মেয়ের বিবাহ।

নিজের বাসায় ক বসিয়া আছে—বস্তুতান্ত্রিক ক—খয়ের অপেক্ষায়। পূরবী তাহাকে মুগ্ধ করিতেছে না, বিলম্ব তাহাকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। খ এত দেরি করিতেছে কেন? দেরি হইলে আবার—

আধ ঘণ্টা কাটিল, এক ঘণ্টা কাটিল।

শালা—

ক্ষুব্ধ ক উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ একাই যাইবে সে।

পূরবী বাজিতেছে।

গয়ের বুক ভাঙিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

॥ পাঁচ ॥

ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল।

খুব বিরক্ত হইয়া ফিরিল, বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। সেখানে দ্বার বন্ধ। আসিয়া আরও বিরক্ত হইল। বিস্মিতও হইল। এখানেও ঘরে খিল কেন?

ধাক্কা দিল।

একবার, দুইবার, তিনবার।

লজ্জিতা গ খিল খুলিয়া দিল।

বিছানায় খ বসিয়া আছে।

ক ও খ নির্নিমেষে পরস্পরের প্রতি মুহূর্তকাল চাহিয়া রহিল—মুহূর্তকাল মাত্র।

তারপর সহসা ক বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় শিকল তুলিয়া তালা দিয়া গেল। ভীতা গ খকে বলিল, তুমি জানলা দিয়ে পালাও।

লোহার গরাদ আছে যে!

আরও ঘণ্টাখানেক পরে ক ফিরিল—বস্তুতান্ত্রিক ক।

সঙ্গে পুরুত।

কর্ শালা, বিয়ে কর্।

খ রাজি হইয়া গেল।

সানাই তখন ইমন ধরিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তিটি নিঃশব্দ-নিপুণতা-সহকারে বাতায়নপথে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ দেহ, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, ঘনকৃষ্ণ চাপ-দাড়ি। চপলা নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল। লোকটি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চপলা, আমি এসেছি।

চপলা চীৎকার করিতে গিয়া থামিয়া গেল। সে হঠাৎ তপনকে চিনিতে পারিল।

তপন! তুমি! এতদিন পরে!

হ্যাঁ, দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টা আজ সফল হয়েছে, আজই জেল থেকে পালিয়েছি। আর দেরি ক'রো না, চল শিগ্‌গির।

কোথায়?

প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলেছি। প্রথম চাটগাঁ, তারপর রেঙ্গুন, তারপর পাহাড় পেরিয়ে—

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

তপন হাসিল।

তোমার সিঁদুরটা দেখতে পেয়েছি। জেলে ব'সেই খবর পেয়েছিলাম। তুমি বীরের গলায় মালা দেবে বলেছিলে না? অবশ্য তোমার স্বামীও কম বীর নন; রায়সাহেব হওয়া সোজা কথা নয়।

তুমি অমন ক'রে ঠাট্টা ক'রো না। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকব, সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

তপন সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল। ইহারই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, ইহারই চক্ষে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশের কাজে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল! চপলার বয়স সহসা যেন দশ বছর কমিয়া গেল, অতীত-যৌবনের অবলুপ্ত উন্মাদনা আবার অকস্মাৎ যেন তাহার দেহে মনে ফিরিয়া আসিল।

আমি যদি যাই, আমাকে নিয়ে যাবে?

সেইজন্যেই তো এসেছি। কিন্তু রায়সাহেবটি?

ওঁর অবশ্য কষ্ট হবে খুব। আর তা ছাড়া—

সহসা চপলা থামিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, সব উনি জানেন।

কি ক'রে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চপলা বলিল, তুমি জেল থেকে পালিয়েছ, আমিও যদি পালাই, উনি সব বুঝতে পারবেন, আর তা হ'লে হয়তো—

চপলা কথাটা শেষ করিল না।

তপন বলিল, তা হ'লে হয়তো ওঁর চেষ্টায় অবিলম্বে ধরা প'ড়ে যাব আমরা। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে, সে বিষয়ে নিষ্কণ্টক এখনই হতে পারি। পকেট হইতে রিভলভারটা টানিয়া সে দেখাইল। তোমার স্বামী ক্লাব থেকে কোন্ পথে ফিরবেন তা জানি।

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

বল, রাজি আছ?

চপলা নির্নিমেষে তপনের মুখের পানে চাহিয়া ছিল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছি।

এতদিন যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে বাস করলে, তাকে এত সহজে ছেড়ে যাবে? যেতে পারবে?

চপলা তাহার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তপন এ কি বলিতেছে? সে কি জানে, তাহার জন্য কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে? সে কি বুঝিতে পারিবে, কিসের তাড়নায়, কিসের জ্বালায় সমাজের নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে সে বিবাহ করিয়াছে? নারীর ব্যথা, নারীর দুর্বলতা, নারীর সমস্যা, নারীহৃদয়ের দুর্বোধ্য জটিলতার কতটুকু জানে সে? কতটুকু বোঝে? বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তপন পর হইয়া যাইবে? তপনই তো তাহার স্বামী, তপনই তো তাহার আরাধ্য দেবতা। সে স্বয়ং আসিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবে?

তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল, যেতে পারবে?

পারব।

চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

রায়সাহেবকে শেষ ক'রে আসছি তা হ'লে।

তপন চলিয়া গেল।

এক ঘণ্টা পরে দ্বারপথে শব্দ হইল।

তড়িৎস্পৃষ্টবৎ চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার ঠেলিয়া রায়সাহেব প্রবেশ করিলেন, তপন নয়। তপন আর ফিরিল না।

করুণা-ভাজন

॥ এক ॥

চৈত্র মাস। রৌদ্রের তেজ বেশ বাড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরে উত্তর দিকের বারান্দার কোণটা শীতল। ভুরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি। হস্তে খবরের কাগজ আছে, তন্দ্রাবিষ্ট নয়নে মনুষ্যজাতির পাশবিকতার কথা পাঠ করিয়া বর্তমান সভ্যতার ভব্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি, মনে হইতেছে, আমরা ভারতবাসীরা কোন কারণেই বোধ হয় এমন নৃশংস বর্বর হইয়া উঠিতে পারিব না, যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়—। হঠাৎ [illegible] হাত

হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঢুল ধরিয়াছিল। উঠিয়া বসিতেই নজর পড়িল, সম্মুখের তপ্ত পথ দিয়া জীর্ণমলিনবসনপরিহিত একজন পথিক একটা প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া পথ অতিবাহন করিতেছে। দুঃখ হইল। এই দারুণ রৌদ্র, মাথায় অত বড় বস্তা! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আমার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আর পারিল না, বস্তাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অদ্ভুত চেহারা! মাথায় রুক্ষ চুল, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, খালি পা।

হঠাৎ—এ কি! খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলাম। শেষটা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। বস্তাটা নড়িতেছে! বেশ নড়িতেছে। গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কাছে গিয়াও দেখিলাম, সত্যই নড়িতেছে। বস্তার মুখ কষিয়া বাঁধা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

কি আছে ওর ভিতরে?

কুকুরবাচ্চা।

কুকুরবাচ্চা?

হ্যাঁ। কুড়িটা কুকুরবাচ্চা।

বেশ নির্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বস্তায় কুকুরবাচ্চা পুরেছ কেন?

রাত্রে ঘুমুতে দেয় না, বড় বিরক্ত করে। গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

বল কি?

বস্তাটা আর একবার নড়িয়া উঠিল।

পাগল নাকি তুমি? খুলে দাও।

বড্ড বিরক্ত করে বাবু।

বস্তাটা আবার নড়িল।

দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাবে যে এই গরমে! খুলে দাও শিগ্‌গির।

নিজেই হেঁট হইয়া বস্তার মুখটা খুলিতে লাগিলাম। লোকটা বাধা দিল না। কোমরে হাত দিয়া ঘাড়টা একটু কাত করিয়া স্মিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। দুই-একজন বলিল, লোকটা সত্যিই পাগল। ভিন্ন গ্রামে থাকে।

॥ দুই ॥

কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—

কুড়িটা কুক্কুরশাবকের আর্তকণ্ঠ নৈশ অন্ধকারকে বিক্ষুব্ধ করিতেছে। প্রত্যেক শাবকটিই সবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমিতে নিপতিত হইতেছে। নিপতিত করিতেছি আমিই। শুইতে গিয়া দেখি, কুড়িটাই আমার বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। কি আপদ!

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী—সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিস-সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নীচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিস-সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিস প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিস-সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে, মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। উর্ধ্বশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পেঁৗছিলেন, ; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল্ হইয়া গিয়াছে।

ছোটলোক

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরে নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই, পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসংকুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট-নীতি-অনুসরণকারী অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিক্‌শাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিক্‌শা চাই বাবু, রিক্‌শা ?

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়—ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিক্‌শা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ডিভিশন্‌ অব লেবার, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি, অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট! হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিক্‌শাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই। কোথায় যাবেন ?

ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি ?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্‌শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই ?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন ?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন।

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইতিহাস

অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা এই। গল্পাকারে বলিতেছি।

একদা জনৈক সর্বহারা নিষাদ ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে তমসা-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এই নিষাদ এখন যদিও সর্বহারা, কিন্তু একদিন তাঁহার সব ছিল। বহু পত্নী, বহু গাভী, বহু বৃষ, বহু মেঢ্র, বহু কুক্কুর, বহু আরণ্য-সম্পত্তি, কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। বস্তুত ইনিই একদা তরক্ষু-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্বহারা—ধনুর্বাণ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সহসা মনে হইতে পারে যে, অত্যাচারী আর্যগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াই বুঝি ইনি দুর্দশা-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন। তৎকালে আর্যগণ অনার্যগণকে লাঞ্ছিত করিয়া হর্ষবোধ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নিষাদ ভদ্রলোকের সহিত তাহাদের সম্ভাব ছিল। এমন কি, এইজন্যই অন্যান্য নিষাদগণ তাঁহাকে আর্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এইজন্যই সম্ভবত তাঁহার পত্নী গদ্‌গদা শবররাজ কিংকুর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। গদ্‌গদা এবং কিংকু উভয়েরই স্বজাতিপ্রীতি অসাধারণ ছিল।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, গদ্‌গদা এবং কিংকুর ষড়যন্ত্রেই তরক্ষুরাজ বিপন্ন হইলেন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ধনুর্বাণ মাত্র সম্বল করিয়া তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিতে হইল। চিরাচরিত প্রথানুসারে তরক্ষুরাজ শ্মশানচারী যাদুকর চেম্বার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চেম্বার অভিমত, বুদ্ধিভ্রংশই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। পুনরায় বুদ্ধিমান হইবার উপায়ও চেম্বা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটি কিছুতেই

মিলিতেছে না। এতদিন কত কান্তারে, কাননে, প্রান্তরে, নদীতটে তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কই! সহসা নিষাদের চক্ষুদ্বয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ওই তো এক জোড়া কামক্রীড়াপরায়ণ কোঁচ-বক?

তৎক্ষণাৎ নিষাদ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ধনুতে শরযোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়-দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন। বকী উড়িয়া গেল।

চেম্বার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

রতিক্রীড়াপরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতাপশালী আর্যগণের দ্বারস্থ হইলেন। আর্যগণ চিরকাল আশ্রিতবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাঁহারা শবররাজের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

ভয়ানক যুদ্ধ হইল। শতযোজন ব্যাপিয়া দিবারাত্রি যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে কেবল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ভেরীর শব্দ; চতুর্দিকে ছিন্ন মুণ্ড, কর্তিত হস্ত, বিচ্ছিন্ন পদ, বিদীর্ণ উদর, বিকৃত কবন্ধের স্তূপ; গ্রামে গ্রামে প্রজ্বলিত গৃহ, পথে-বিপথে পলায়নপর নরনারী, ধাবমান সৈন্যসামন্ত, ক্রন্দনে কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।

তরক্ষুরাজ-কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য দান করিলেন।

রণক্ষেত্রে কিংকুর চক্ষু উৎপাটন ও হৃদয় বিদারণ করিয়া নিষাদের প্রতিহিংসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। গদ্‌গদার ব্যবস্থা গৃহে হইবে। রথারোহী হইয়া তিনি নিষ্কণ্টক রাজ্যে সদম্ভে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—রথের পশ্চাতে গদ্‌গদার চুলের ঝুঁটি বাঁধা। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া তরক্ষুরাজ গদ্‌গদাকে একটি ন্যগ্রোধবৃক্ষের কাণ্ডে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে তাহার অনাবৃত দেহে শঙ্কর-মৎস্যোৎপন্ন কশাদ্বারা অবিরাম আঘাত করিতে লাগিলেন। শাসন সমাপ্ত হইলে নদীজলে কয়েকবার চুবাইয়া তৎপর তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন।

এই ব্যাপার হইতেই সতীত্ব জিনিসটির উদ্ভব এবং ইহার পর হইতেই আর্যসভ্যতার বিস্তার। তরক্ষুরাজের সহায়তা ভিন্ন আর্যসাম্রাজ্যের এত দ্রুত বিস্তার হইত না।

সংক্ষেপে ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইতিহাসে ইহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। এ সম্পর্কে ইতিহাসে যেটুকু উল্লেখ আছে, তাহা সামান্য এবং ইতিহাসের দিক দিয়া অতিশয় হাস্যকর। শরাহত পুংবককে দেখিয়া বাল্মীকি নামক জনৈক বুড়া ব্রাহ্মণ নাকি দুই ছত্র সংস্কৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন!

আশ্চর্য!

গণেশ

গল্পটি আপনার মনে হাস্য অথবা করুণ, কি রস উদ্রিক্ত করিবে, তাহা আপনার মনের উপর নির্ভর করে। গল্পটি এই—

গণেশের গল্প। গণেশ নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাহার সামান্য যাহা বিশেষত্ব, তাহা তাহার চেহারায়। রগের শিরাগুলি স্ফীত, চক্ষু দুইটি বহির্মুখী, দেখিলেই মনে হয়, লোকটা যেন দম বন্ধ করিয়া রহিয়াছে। গ্রীবা বলিয়া কোন অঙ্গই নাই যেন, ধড়ের উপর প্রকাণ্ড মাথাটি বসানো। এই গণেশ একবার অসুখে পড়িয়াছিল। জ্বর নয়, হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। দশ ক্রোশ দূরবর্তী শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছিলেন এবং যন্ত্রের সাহায্যে গণেশের রক্তের চাপ পরীক্ষা করিয়া চমকিত হইয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, এত অল্প বয়সে এত বেশী ব্লাড-প্রেসার তিনি আর কখনও দেখেন নাই। বহুদর্শী ডাক্তারবাবুর উপদেশ অনুসারে নানারূপ ঔষধ-পথ্য সেবন করিয়া গণেশ সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু জেরবার হইয়া গেল। তরুণী ভার্যা বিভাবতীর বালা জোড়াটি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল।

এইখানেই গল্পের শুরু।

সুস্থ হইয়াও গণেশ কেমন যেন অসুস্থ বোধ করিতে লাগিল। ঔষধ-পথ্যের গুণে সাময়িকভাবে রক্তের চাপ কিছু কমিয়া থাকে, কিন্তু বিভাবতীর হাতের পানে চাহিলে তাহার বুকের ভিতরটা হু-হু করিয়া উঠে, রক্তের চাপও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যায়। গরিব গণেশের পক্ষে মূল্যবান ডাক্তারবাবুর পুনরায় নাগাল পাওয়া অথবা তাঁহার মূল্যবান উপদেশ বরাবর অনুসরণ করা কোনটাই সম্ভবপর নয়, সুতরাং বর্ধিত রক্ত-চাপ অবস্থাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল।

এইভাবেই চলিতেছিল।

এমন সময় একদিন একটা কাণ্ড হইয়া গেল। কাণ্ড এমন কিছু নয়, কিন্তু গণেশের তাহা শুধু কাণ্ড নয়, প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হইল। গণেশ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাজে বাহির হইয়া যায়। পাশের গ্রামে আঢ্যিদের কাপড়ের দোকানে সে কাজ করে। ফেরে রাত্রি দশটা-এগারোটায়। বিভাবতী বাড়িতে একাই থাকে। কারণ গণেশের তিন কুলে কেহ নাই।

একদিন রাত্রে গণেশকে ভাত দিতে দিতে বিভাবতী বলিল, আজ দাদা এসেছিল।

ও, তাই নাকি? ধ'রে রাখলে না কেন, আমার সঙ্গে দেখাটা হ'ত।

বললাম তো কত ক'রে, রইল না কিছুতে, জরুরী কাজ আছে নাকি একটা, তাই চ'লে গেল।

গণেশ নীরবে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে পুরিল।

কি কি গল্প হ'ল?

এই সব আর কি।

একটু থামিয়া মুচকি হাসিয়া বিভাবতী বলিল, আমার বালা জোড়ার কথা জিজ্ঞেস করছিল।

গণেশের চোখ দুইটা যেন আরও খানিকটা বাহির হইয়া আসিল।

কি জিজ্ঞেস করছিল?

বলছিল, হাত খালি কেন, বালা জোড়া কি হ'ল?

কি বললে তুমি?

বললাম, ভেঙে আবার গড়াতে দিয়েছি নতুন প্যাটার্নের।

ভাতের গ্রাসটা মুখে পুরিয়া গণেশ চিবাইতে লাগিল। তাহার রগের শিরাগুলো আরও যেন ফুলিয়া উঠিল।

মিছে কথা বলতে গেলে কেন, সত্যি কথা বললেই পারতে।

আমার লজ্জা করল।

একটু থামিয়া বিভাবতী আবার বলিল, বাপের বাড়িতে ছোট হতে যাব কেন, গড়িয়ে নিলেই হবে'খন পরে।

গণেশ নীরব।

মুচকি হাসিয়া বিভাবতী বলিল, আর একটু ডাল দিই ?

দাও।

ষোড়শী পত্নী বিভাবতীর পানে চাহিয়া গণেশের মনে সহসা কেমন যেন একটা মাধুর্য সঞ্চার হইল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, চচ্চড়িও দাও একটু, বেশ হয়েছে চচ্চড়িটা।

বিভাবতী চচ্চড়ি দিল। গণেশ নীরবে ডাঁটাগুলি চিবাইতে লাগিল।

আর ভাত দেব ?

না।

দুধটা গরম ক'রে আনি।

বিভাবতী পাশের ঘরে গেল। ঘরের গরুটি আছে, তাই গণেশ দুধটুকু খাইতে পায়, দুধ কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য তাহার নাই। খানিকক্ষণ পরে বিভাবতী দুধের বাটি লইয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই গণেশ বলিল, তা ঠিকই করেছ তুমি, গড়িয়ে নিলেই হবে'খন পরে। তাহার পর হাত চাটিতে চাটিতে বলিল, ওদের কাছে ছোট হতে যাব কেন, ঠিক। তাহার পর বিভাবতীর খালি হাতের পানে আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিয়া জলের গ্লাসটা তুলিয়া ঢকঢক করিয়া সমস্ত জলটা খাইয়া ফেলিল।

মাসখানেক কাটিল।

সেদিন কৃষ্ণপক্ষ। একটু রাত করিয়াই চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্বদিগন্তে একটা নীরব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। যে মেঘগুলি এতক্ষণ অন্ধকারে অদৃশ্য ছিল, জ্যোৎস্নালোকে তাহারা অপরূপ-দৃশ্য হইয়া উঠিতেছে। বকুলগাছের ফাঁক দিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না গণেশের বিছানাতেও আসিয়া পড়িয়াছে। বিভাবতী ও গণেশ পাশাপাশি শুইয়া গল্প করিতেছে। তুচ্ছ গল্প, পাড়ার এর ওর তার কথা। হঠাৎ বিভাবতী বলিল, মিত্তিরদের বউ নতুন বালা গড়িয়েছে। আজ দেখতে গেসলাম, কি চমৎকার গড়েছে বিধু স্যাকরা, যেমন পালিশ তেমনই গড়ন, চোখ ঝলসে যায় একেবারে !

তাই নাকি ?

গণেশের রগের শিরাগুলি ক্রমশ ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

হ্যাঁ, শিমুলকাঁটা প্যাটার্ন।

সে আবার কি রকম ?

সে চমৎকার ! শিমুলকাঁটার মত কাঁটা কাঁটা দেওয়া।

ও।

পালিশ চমৎকার খোলে।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরে বিভাবতী বলিল, একটা বিপদও আছে কিন্তু বাপু, কাঁটাগুলোর যা ধার, কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে যেতে পারে।

গণেশ এবারও কিছু বলিল না। একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া বকুলফুলের গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া দিয়া গেল।

ঘুমুলে নাকি ?

হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে।

গণেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, কিন্তু ঘুমাইল না। নীরবে চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল, স্বপ্ন দেখিল, যেন সে বিভাবতীকে শিমুলকাটা বালা গড়াইয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, তাহাকে লইয়া সে যেন শ্বশুর-বাড়ি গিয়াছে, বিভাবতী তাহার দাদাকে যেন বালা দেখাইয়া বলিতেছে—দেখ তো দাদা, এ প্যাটার্নটা সুন্দর নয় ?

পরদিন সে বিধু স্যাকরার সহিত দেখা করিল।

শিমুলকাটা বালা গড়াতে কত পড়বে হে বিধু ?

কত ভরির হবে ?

যাতে ভাল হয়।

ভাল ক'রে করতে গেলে শ দুই টাকা পড়বে।

দুশো !

গণেশের রগের শিরাগুলি দপদপ করিয়া উঠিল।

কয়েকদিন কাটিল।

অবশেষে অনেক ইতস্তত করিয়া মনিব দিগম্বর আঢ্যের নিকট সে কথাটা পাড়িল।

আমাকে শ দুই টাকা ধার দিতে হবে।

টাক-মাথা বেঁটে দিগম্বর আঢ্য কথাটা শুনিয়াই—যেমন তাঁহার অভ্যাস—চোখ হইতে চশমা খুলিয়া ফেলিলেন এবং ঘাড় হেঁট করিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া কাচগুলি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। গণেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চশমা পরিধান করিয়া দিগম্বর গণেশের মুখের দিকে তাকাইলেন।

ধার ! তোমাকে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি করবে অত টাকা দিয়ে ?

জরুরী দরকার আছে একটা।

তা না হয় আছে বুঝলাম, কিন্তু শুধবে কী ক'রে ?

মাইনে থেকে প্রতি মাসে কাটিয়ে দেব।

মাইনে তো পাও দশটি টাকা, তার থেকে আর কত কাটাবে তুমি ? পাগলা, না ক্ষ্যাপা !

ইহা সত্য কথা। গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

গয়না-টয়না যদি বন্ধক রাখতে পার কিছু, দিতে পারি।

খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া গণেশ কাজে চলিয়া গেল।

পুনরায় একদিন বিভাবতীর দাদা আসিয়া উপস্থিত। গণেশ তখন বাড়িতে ছিল।

নেমন্তন্ন করতে এলুম। সুবির বিয়ে।

কবে ?

মাঝে আর দশটা দিন আছে।

সুবি বিভাবতীর ছোট বোন।

যেও কিন্তু, না গেলে মা দ‌ুঃখিত হবে বড্ড, গাড়ি একটা ভাড়া ক'রে যেও, সেখান থেকে পাঠানোর বড় হাঙ্গামা, ভাড়া দিয়ে দেব আমি।

আচ্ছা।

খানিকক্ষণ বসিয়া, তামাক খাইয়া এবং বিবাহ বিষয়ে গল্পসল্প করিয়া বিভাবতীর দাদা চলিয়া গেল। থাকিতে পারিল না, কারণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাহাকে আরও কয়েক স্থানে যাইতে হইবে।

বিভাবতী বলিল, আমি যাব না। গেলেই মা বালার কথা জিজ্ঞেস করবেন।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল।

যথাসময়ে বিবাহের দিন আসিল। অস‌ুখের ছ‌ুতা করিয়া বিভাবতী গেল না।

মাসখানেক পরে হঠাৎ বিভাবতী একদিন রাত্রে বলিল, একটা জিনিস দেখবে?

কি?

বিভাবতী এক জোড়া বালা বাহির করিয়া দেখাইল—এক জোড়া শিম‌ুলকাঁটা বালা।

কোথা পেলে তুমি?

যেখানেই পাই না, কেমন, দেখতে ভাল নয়?

চমৎকার! মিত্তিরদের ব‌ুঝি?

হ্যাঁ, তোমাকে দেখাতে এনেছি। আমাদের দ‌ুজনের হাতের মাপও এক, এই দেখ, আশ্চর্য কিন্তু। বিভাবতী বালা দ‌ুইটি হাতে পরিয়া হাত ঘ‌ুরাইয়া ঘ‌ুরাইয়া দেখাইতে লাগিল, বিস্ফারিতচক্ষ‌ু গণেশ দেখিতে লাগিল।

কাঁটাগ‌ুলো বড্ড ধার, নয়?

চমৎকার!

তাহার পরদিন গণেশ দোকানে কাজ করিতেছিল, এমন সময় বিধ‌ু স্যাকরা আসিয়া উপস্থিত। দিগম্বর আঢ্যের প‌ুত্রবধ‌ুর জন্য একজোড়া শিম‌ুলকাঁটা বালা গড়িতে হইবে, তাহারই বায়না লইতে আসিয়াছে। দিগম্বর আঢ্যের প‌ুত্রবধ‌ুর গহনার অভাব নাই, দ‌ুই সেট গহনা তো বিবাহের সময় দিগম্বর আঢ্যই দিয়াছেন। এই বিধ‌ুই গড়িয়াছে এবং গণেশ টাকা গনিয়া দিয়াছে।

দিগম্বর গদিতেই ছিলেন, বিধ‌ু স্যাকরাকে দেখিবামাত্র চশমা খ‌ুলিয়া ম‌ুছিয়া এবং প‌ুনরায় পরিধান করিয়া বলিলেন, বিধ‌ু এসেছ, শোন, বউমা ঝোঁক ধরেছেন, নতুন ফেসিয়ানের কি বালা বেরিয়েছে আজকাল, শিম‌ুলকাঁটা না কি, তাই একজোড়া গড়িয়ে দিতে হবে। দিতেই যখন হবে, তখন ভাল ক'রে দেখে শ‌ুনে নাও সব। দেখো, আবার যেন প্যাটার্নের গোলমাল না হয়ে যায়। যাও, ভেতরে যাও তুমি, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।

বিধ‌ু ভিতরে চলিয়া গেল।

আরও কিছ‌ুদিন কাটিল।

সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। বিভাবতী রান্নাঘরে পোস্ত বাটিতেছিল, হঠাৎ গণেশ আসিয়া উপস্থিত। রগের শিরাগ‌ুলি খ‌ুব ফ‌ুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষ‌ু দ‌ুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। বিভাবতী বিস্মিত হইল।

এ কি! আজ এত সকাল সকাল যে?

শোন।

কি ?

বালা গড়িয়ে আনলুম। দেখ তো।

গণেশের গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। বিস্মিত বিভাবতী দেখিল, সত্য সত্যই একজোড়া শিমুলকাঁটা বালা বেগুনী রঙের কাগজে মোড়া রহিয়াছে।

আমাকে বল নি তো কিচ্ছু ! টাকা কোথায় পেলে ?

পেলাম যেমন ক'রে হোক। প'রে দেখ তুমি।

হাতটা ধুয়ে আসি।

না, আগে পর।

জোর করিয়া পরাইয়া দিল। বাঃ, চমৎকার মানাইয়াছে ! গণেশের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিল।

ওটা কি ?

ল্যাভেণ্ডার।

ল্যাভেণ্ডার কি হবে ?

ছেটাব চারদিকে, চল না।

বিস্মিত বিভাবতীকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া গণেশ ঘরে ঢুকিল।

বকুলগাছের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার ফালি বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে। বকুলফুল ও ল্যাভেণ্ডারের উগ্র গন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত। গণেশ ও বিভাবতী পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইতেছে। বিভাবতীর হাতে শিমুলকাঁটা বালা পরা।

উঃ ! উঃ !

গণেশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বিভাবতীরও ঘুম ভাঙিয়া গেল।

কি হ'ল ?

রগের কাছে লাগল খুব, তোমার বালার কাঁটায় বোধ হয়। এ কি, রক্ত পড়ছে যে ! উঃ, খুব রক্ত পড়ছে, আলোটা জ্বাল তো।

বিভাবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল। দেখিল, ফিনিক দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। বালার কাঁটায় রগের স্ফীত শিরা একটা কাটিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি ন্যাকড়া বাঁধিয়া দিল, ন্যাকড়া দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া গেল। উঠান হইতে দুর্বাঘাস আনিয়া চিবাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইল, ন্যাকড়ায় রেড়ির তেল ভিজাইয়া পুরু করিয়া পটি দিল, আঙুল দিয়া টিপিয়া ধরিয়া রাখিল খানিকক্ষণ, খয়ের গুলিয়া দিল,—কোন ফল হইল না। রক্ত সমানে পড়িতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দিগম্বর আঢ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে বিধু স্যাকরা এবং লাল-পাগড়ি পুলিশ। গণেশের মাথাতেও একটা লাল পাগড়ি ছিল, কিন্তু অত টকটকে লাল নয়, একটু কালচে-গোছের লাল। শিয়রে বসিয়া বিভাবতী হাওয়া করিতেছিল।

বিধু বলিল, এই যে, এই বালা—আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এল আপনার নাম ক'রে। আমিও দিয়ে দিলাম, এতদিনের পুরনো চাকর আপনার, ভাবতেই পারি নি।

চোরাই মাল পাওয়া গেল, চোরকে কিন্তু ধরা গেল না। কয়েক মিনিট পূর্বেই গণেশ মারা গিয়াছিল। বিভাবতী বুঝিতে পারে নাই, সে মৃত স্বামীকেই বসিয়া হাওয়া করিতেছিল।

দোলের দিনে

॥ এক ॥

সত্যই তো, দোলের দিন। অখিলবাবুরা যে পাড়ায় বাস করেন, সে পাড়ায় সুজাতা দেবীর স্বস্তি না পাবারই কথা। আশেপাশে যত কুলি মজুর মুটে মিস্ত্রী মারোয়াড়ী। ছোটলোকের পাড়া। অখিলবাবুরা এসে পর্যন্ত খুঁতখুঁত করছেন সবাই। অখিলবাবুর দুই মেয়ে অণিমা তনিমা তো বটেই, ছোট খোকা ওস্তাদ পর্যন্ত। সুজাতা দেবীর তো কথাই নেই। তিনি বিলেত-ফেরত ঘরের মেয়ে। ফিরপো, লেড্ল, হ্যামিল্টন, আর্মি নেভির আবহাওয়ায় মানুষ। অখিলবাবুর হাতে প'ড়ে তাঁর অধঃপতনই হয়েছে—এ কথা তিনি এবং তাঁর স্বজনবর্গ সবাই জানেন, বলেনও। কিন্তু নিয়তির ওপর তো আর কথা চলে না। অখিলবাবু সাব-ডেপুটি। সম্প্রতি এই শহরে বদলি হয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুর ওপর বাড়ি ভাড়া করবার ভার ছিল। জিতেনবাবু অখিলবাবুর অধস্তন কর্মচারী। তিনি আলো হাওয়া সস্তা এই সব দেখে, বাড়িটা পছন্দ করেছিলেন, পাড়াটাও খুব খারাপ ব'লে তাঁর মনে হয় নি। কিন্তু তাঁর মন আর সুজাতার মন আকাশ-পাতাল তফাত যে! সে কথা সুজাতা মুখ ফুটে ব'লেও দিয়েছেন তাঁকে একদিন। জিতেনবাবু ভদ্রতর পাড়ায় একটা বাড়ি খুঁজে বার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। চাকরি বজায় রাখতে গেলে এসব করতেই হবে। উপায় কি!

কোনক্রমে তবু চলছিল, দোল এসে পড়াতে ব্যাপারটা কিন্তু জটিলতর হয়ে উঠল। অণিমা-তনিমার বয়স হয়েছে, তাদের নিয়েই আরও বেশি মুশকিল হ'ল। পাড়ায় যত সব অসভ্য লোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কাঁহাতক চলতে পারে মানুষ! দোলের হিড়িকে আরও বেয়াদব হয়ে উঠেছে যেন সবাই। শুক্লপক্ষ যেদিন থেকে পড়েছে, সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছে। বাড়ির পাশে খানিকটা মাঠ আছে। সন্ধের পর সেখানে এসে লোকগুলো গান-বাজনার নামে যে হল্লা হৈ-হৈটা করছে এ কদিন, তা বলবার নয়। গান-বাজনারই বা কি বাহার—খচখচ খচখচ, আর তার সঙ্গে বেসুরো চীৎকার তাড়ির ভাঁড় সামনে রেখে। এ কদিন এতটুকু স্বস্তি ছিল না বাড়িতে। অণিমা সন্ধের পর সেতার বাজায়, তনিমা স্বরলিপি দেখে গান শেখে, কিন্তু কানের কাছে এই তাণ্ডব হতে থাকলে কি আর কিছু করা যায়! ওস্তাদের পড়াও শিকেয় উঠেছে। পাড়ার যত অসভ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশে এরই মধ্যে দুটো-একটা খারাপ কথা শিখেছেন ছেলে। এ পাড়ায় থাকলে জংলী বুনো হয়ে যাবে ও। অখিলবাবু সকালে খেয়ে কোর্টে বেরিয়ে যান, ফেরেন পাঁচটায়। জলখাবার খেয়েই আবার ক্লাবে যান, ফেরেন রাত দশটায়। যত ঝঞ্ঝাট সুজাতাকেই পোয়াতে হয়। এ রকম অসভ্য পাড়ায় সুজাতা আর কখনও থাকেন

নি। জানলা খুলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধবার জো নেই—হাঁ ক'রে চেয়ে দেখবে। আবার এখানে এসে কপালগুণে যে চাকর বামুন আর দাই জুটেছে, তারা এমন আনাড়ী যে, তাদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতেও সুজাতার প্রাণ অন্ত হবার যোগাড় হয়েছে। বোনপোর জন্যে যে শোয়েটারটা বুনতে শুরু করেছিলেন এবার শীতে, সেটা শেষই করতে পারলেন না।

ছ্যা-রা-রা-রা—

ওই আসছে। এখনই এক দল গেল, আবার আসছে আর এক দল। উঃ, কাল থেকে কি কাণ্ডই যে হচ্ছে! কাল "ধুর-খেল" ছিল। সে কি কাণ্ড! ছেলে বুড়ো সবাই আপাদ-মস্তক ধুলো-কাদা মেখে ভূতের মতন ঘুরে বেড়িয়েছে রাস্তায় দল বেঁধে। সামনে কাউকে পেলেই হ'ল, অমনই সমস্বরে চীৎকার ক'রে তাকে ঘিরে ধরেছে, আর তার গায়ে মুখে মাথায় ধুলো-কাদা মাখিয়ে তাকেও ভূত বানিয়ে নাস্তানাবুদ ক'রে তবে ছেড়েছে। নর্দমা থেকে পাঁক তুলে ছোঁড়াছুঁড়ি করতেও বাধছিল না লোকগুলোর। হি হি ক'রে হাসতে হাসতে দুহাত তুলে নাচছিল আবার। মানুষ, না ভূত-প্রেত! ছি ছি ছি ছি!

ছ্যা-রা-রা-রা-রা—

অণিমা, স'রে আয় ওখান থেকে।

কিন্তু ওরা বোধ হয় অণিমাকে দেখতে পেয়ে গেল। হৈ-হৈ ক'রে উঠল সমস্বরে। গলির দিকে জানালাটা খোলা ছিল। সুজাতা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, এক দল ফাগ-মাখা ছোঁড়া ঢোল আর খঞ্জনি বাজিয়ে মহানন্দে নৃত্য করছে। দড়াম ক'রে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি।

ছ্যা-রা-রা-রা-রা—

মুখে মুখে তৈরি ক'রে একটা অশ্লীল ছড়া তারস্বরে গেয়ে দিলে একজন। অণিমার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল! বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। সুজাতা গুম হয়ে ব'সে রইলেন। লোকগুলো যাবার নাম করে না। সুজাতার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটতে লাগল। উনিও আজ সকাল থেকেই বেরিয়েছেন। এমন এক লক্ষ্মীছাড়া এস. ডি. ও. জুটেছে যে, ছুটির দিনেও রেহাই দেবে না। খানিকক্ষণ ব'সে থেকে সুজাতা হঠাৎ ছাতে উঠে গেলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নীচে ব'সে থাকা নিরাপদ মনে হ'ল না। কিন্তু ছাতেও বিপদ ছিল। যেতে না যেতেই কোথা থেকে এক পিচকিরি রঙ এসে লাগল তাঁর শাড়িতে। কে দিলে দেখতে পেলেন না। আশেপাশে সব ছাত, আলসের পাশে কে কোথা লুকিয়ে আছে দেখা যায় না। রাগে বিরক্তিতে সমস্ত মনটা ভ'রে উঠল তাঁর। এত বড় স্পর্ধা! নীচে নেমে এলেন দুমদুম ক'রে।

রামশরণ!—রুদ্ধকণ্ঠে চাকরকে ডাকলেন। সাড়া পাওয়া গেল না।

দুবেজি!

ঠাকুরেরও সাড়া নেই। খিড়কি খুলে দুজনেই বেরিয়ে গেছে। অল্পবয়সী দাইটা উঠানে বাসন মাজছিল। সে আজ ছুটি চেয়েছিল, কিন্তু সুজাতা ছুটি দেন নি। তার হলদে রঙে ছোপানো আড়ময়লা শাড়িতেও এক পিচকিরি রঙ কে যেন দিয়েছে। বাঁদর সব! বুনো! জংলী!

উলোগকো বোলাও, আর কেবাড়ি লাগা দেও।

সুজাতার ভয় হতে লাগল, ওই ভিড়টা যদি উঠানে ঢুকে পড়ে, তা হ'লেই তো সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি মেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন তিনি।

খিড়কি-দরজা দিয়ে দাই মুখ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত ক'রে হর্ষধ্বনি উঠল।

ছ্যা-রা-রা-রা-রা—

সুজাতা বাথ-রুমে ঢুকে রঙ-দেওয়া কাপড়টা ছেড়ে তখনই রঙটা ভাল ক'রে ধুয়ে ফেললেন। ভিজিয়ে দিলেন কাপড়টা।

ক্রমশ বাইরে হল্লাটা ক'মে গেল, মনে হ'ল, তারা চ'লে যাচ্ছে। খিড়কি-বন্ধ করার শব্দও পাওয়া গেল। সুজাতা বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, দাইটাকে লাল রঙে চুবিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা একেবারে, ভিজে কাপড় গায়ে সেঁটে গেছে। বেহায়া মেয়েটা মুচকে মুচকে হাসছে তবু। রামশরণ এবং দুবেজিরও আপাদমস্তক রঞ্জিত এবং তারাও আনন্দে গদগদ।

কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

উনি এলেন বোধ হয়!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সুজাতা তাড়াতাড়ি কপাটটা খুলেই ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেলেন।

জিতেনবাবুর এ কি অদ্ভুত চেহারা! ভদ্রলোকের মাথায় মুখে কামিজে কাপড়ে লাল নীল সবুজ হলুদ বেগুনী—কোনও রঙ আর বাকি নেই।

এ কি কাণ্ড!

অপ্রস্তুত মুখে জিতেনবাবু বললেন, একটা ভাল বাড়ির খবর পেয়েছি, তাই ভাবলাম, খবরটা ব'লে যাই।

কোথায়?

জিতেনবাবু যে পাড়ার নাম করলেন, সেটা এখানকার নামজাদা পাড়া। সাহেব-সুবো অফিসারদের পাড়া। সুজাতা অকূলে কূল পেলেন যেন।

কবে খালি হবে?

কাল খালি হয়েছে।

ও, যে বাড়িতে ডি. এস. পি. ছিলেন?

হ্যাঁ, সেইটেই।

সে তো চমৎকার বাড়ি। এখনই যাওয়া যায়?

এখনই?

এখনই যাব তা হ'লে। এখানে চতুর্দিকে যা কাণ্ড ঘটছে!

কেন, কি হ'ল?

কপাট বন্ধ ক'রে ব'সে আছি সকাল থেকে।

জিতেনবাবু সুজাতা দেবীর শুভ্র কাপড়খানার দিকে চেয়ে দেখলেন। সুতির হ'লেও দামী কাপড়। রঙ লেগে নষ্ট হয়ে গেলে সত্যিই কষ্টের কারণ ঘটবে।

আচ্ছা, দেখি তা হ'লে।

জিতেনবাবু চ'লে গেলেন।

সুজাতা দেবী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলেন। একটু পরে এক

ছ্যাকড়া-গাড়িতে চেপে অখিলবাবু এলেন। গাড়োয়ান লালে লাল, ঘোড়া দুটোর গায়েও রঙ। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, অখিলবাবুও নিস্তার পান নি।

রাস্তায় দিলে বুঝি কেউ ?

না, রাস্তায় দেয় নি। দিলেন স্বয়ং এস. ডি. ও.। ভদ্রলোক সেকেলে গোঁড়া লোক, কি আর করি বল ?

সোফাটায় ব'সো না যেন ধপ ক'রে। কাপড়-চোপড় ছাড় আগে। ছি ছি, পাঞ্জাবিটা নষ্ট ক'রে দিয়েছে একেবারে, এমন দামী সিল্কটা—

॥ দুই ॥

সন্ধ্যা আসন্ন।

উন্মত্ত জনতা আনন্দে অধীর হয়ে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। তাদের আনন্দ-কলরব এখনও থামে নি। আম্রমুকুলের গন্ধে আকাশ-বাতাস মদির হয়ে উঠেছে, অশোক পলাশ কিংশুকের পল্লবে পল্লবে জীবনবহ্নি লক্ষ লক্ষ অগ্নিশিখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে যেন, স্বর্ণকান্তি কর্ণিকার পুষ্পভারে শাখা-প্রশাখা অবনত, শুভ্র কুন্দকুসুমগুচ্ছ ঠিক তেমনই ভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রিয়াদন্ত-পংক্তিশোভা, কালিদাসের কালে যেমন দিত। কোকিল ডাকছে, ভ্রমরগুঞ্জন-মুখরিত হয়ে উঠেছে কানন-কান্তার, প্রাকৃত জনতা সমস্ত লজ্জা সমস্ত ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে রঙে-রসে আনন্দে-নেশায় বিভোর হয়ে উন্মত্তের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনও।

ছ্যাকড়া-গাড়ির দরজা-জানলা এঁটে বন্ধ ক'রে সুজাতা দেবী চলেছেন সভ্য পাড়ায়।

নাম

আমাদের পাড়ায় নবাগত যতীনবাবু লোকটিকে এক হিসাবে অভদ্রই বলা চলে। সমাজের সাধারণ আইনকানুন মেনে কিছুতেই চলবেন না ভদ্রলোক। কোথাও নিমন্ত্রণ করলে যান না, পাড়ার কারও খবর নেন না, বাড়িতে কেউ গেলে আপ্যায়িত হবার ভাব দেখান না, বরং ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করেন, যেন একটু বিরক্তই হয়েছেন। তবু আমরা প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁর বাড়িতে যাই এসব সত্ত্বেও এবং নিয়মিতভাবে চা পান ক'রে থাকি। যতীনবাবুর চরিত্রে যতই খুঁত থাক্, তাঁর বাড়ির চা-টি একেবারে নিখুঁত। সেদিন বিকেলে আমরা যখন গেলাম—আমরা মানে, আমি, মাধববাবু আর পুণ্ডরীকাক্ষবাবু—তখন তিনি আর একজন কার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হ'ল না। যতীনবাবুর যা স্বভাব, আমাদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন মাত্র, কিন্তু মুখের ফাঁকে যে একবার 'আসুন' বা 'বসুন' বলা, তা একবারও বললেন না, গল্পই ক'রে যেতে লাগলেন। তবু আমরা বসলাম।

যতীনবাবু বলছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। পাণ্ডাগিরি ক'রে বেড়াত ইস্কুলে, আর সেই সময়েই মদ খেতে শেখে বোধহয়।

পুণ্ডরীকাক্ষবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

আমাদের হেমবাবুর ছেলে ফট্‌কের কথা বলছ বুঝি?

যতীনবাবু এ কথার কোন জবাব দিলেন না, একটু হেসে সেই লোকটির দিকে চেয়ে ব'লে যেতে লাগলেন, তারপর তার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অবশ্য ঠিক যে কেন ছাড়িয়ে নিলে তা বলা শক্ত, কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে, ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলে বেহারের এক শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, ইতিমধ্যে ছোকরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল।

মাধববাবু পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বললেন, আমাদের জগার কথা বলছেন, বুঝছ না? বার দুই আই. এ. ফেল ক'রে আমাদের তপোনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদীশ পরের পয়সায় মদ এবং সিনেমার কাগজে প্রেমের পদ্য লিখতে শুরু করেছিল, সম্প্রতি সে ছাপরায় গেছে মামার বাড়িতে। সুতরাং মাধববাবুর অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। যতীনবাবু কিন্তু সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করলেন না।

ব'লে যেতে লাগলেন—

বেহারে গিয়ে তার কাব্যরোগ হু-হু ক'রে বেড়ে গেল। বেহারে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছিল আত্মীয়ের কাছে থেকে সেই আত্মীয়েরই কারবারে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে। ছোকরা কারবারের ধার দিয়েও গেল না, লম্বা লম্বা কবিতা লিখে মাসিকে আর সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগল আর বাকি সময়টা ঘরের কোণে ব'সে কাটাতে লাগল যত সব বাজে বই প'ড়ে।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, বাজে বই মানে, কি বই?

দর্শন, কাব্য, সাহিত্য—এই সব আর কি, অর্থাৎ ইন্‌ডিগো সম্বন্ধে কোন বই নয়।

ইন্‌ডিগো সম্বন্ধে বই মানে?

অর্থাৎ যে বই পড়লে ব্যবসার উপকার হ'ত। সেই আত্মীয় ভদ্রলোকের নীলের কারবার ছিল।

তারপর?

তারপর আর কি, উত্যক্ত হয়ে উঠলেন আত্মীয়টি ক্রমশ—

চা এসে পড়ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিঙের কৌটো বার করলেন। ইন্‌ডিগো শুনেই আমরা বুঝেছিলাম, এ জগা নয়, আর কেউ। মাধব ভাবছিলেন, কে হতে পারে?

যতীনবাবু বললেন, তারপর হ'ল এক কাণ্ড। কলকাতার এক সম্পাদক ডেকে পাঠালে ছোকরাকে, বললে, তোমার প্রতিভায় আমি মুগ্ধ, তুমি এসে আমার কাগজের সহকারী সম্পাদক হ'ও আর তোমার কবিতাগুলো ছাপিয়ে ফেল। ছুটল ছোকরা কলকাতায় আর জুটল গিয়ে সাহিত্যিক-মহলে। অহিফেনের বটিকাটি গলাধঃকরণ ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন, আমাদের ক্ষীরোদচন্দ্র আর কি!

ক্ষীরোদের সঙ্গে এই ছোকরার একটু মিল ছিল অবশ্য, ক্ষীরোদও একটা কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল কিছুদিন।

যতীনবাবু বলতে লাগলেন, ছোকরা কিন্তু জমিয়ে ফেললে কলকাতায়—

যদিও যতীনবাবু পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরেও চান নি, তবু পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন, তাই নাকি ?

খুব জমিয়ে ফেললে, সাহিত্যিক-মহলে নাম তো হ'লই, অসাহিত্যিকরাও বলাবলি করতে লাগল তার বিষয়ে, ফলে একটা চাকরি জুটে গেল।

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, কি চাকরি ?

ইস্কুল-মাস্টারি।

তারপর ?

দিন কতক খুব নামডাকও হ'ল—খুব ভাল মাস্টার, খুব ভাল মাস্টার ; কিন্তু অতিরিক্ত রকম বাহাদুরি করতে গিয়েই ম'ল ছোকরা—

কি রকম ?

ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশি রকম মাখামাখি শুরু ক'রে দিলে, ছাত্ররা হয়ে উঠল তার ইয়ার—

মাধববাবু চা-পানান্তে ময়লা রুমাল দিয়ে ঝোলা গোঁফ-জোড়া মুছছিলেন, তিনি এই কথায় একটু টিপ্পনী করলেন, আজকাল ছেলেদের ধরন-ধারণই এই রকম। বুঝতে পেরেছি, আমাদের আশু মাস্টারের কথা বলছেন আপনি, ওর হিস্ট্রি জানেন নাকি ?

যতীনবাবু একটু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। আমাদের এখানকার স্কুলের নবাগত শিক্ষকটির বদনাম রটেছিল, তিনি ছেলেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মেশেন নাকি।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, তারপর ?

তারপর আর কি, চাকরিটি গেল। নানা রকম বদনাম রটতে লাগল, গার্জেনরা ভয় পেলেন, ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে, কমিটি তাড়িয়ে দিলে—মানে দিতে বাধ্য হ'ল।

ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে ! কেন ?

ও ছেলেদের সঙ্গে মদ খেত, বলত ধর্মটর্ম সেকেলে বন-মানুষের কাণ্ড-কারখানা, এ যুগে ওসব অচল। বলত, কুসংস্কার তুলে দাও—ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের গল্প করত, বেন্থাম মিল আওড়াত।

তারপর ?

এ দেশে আর কত 'তারপর' থাকবে, দিন কতক ভ্যারেণ্ডা ভেজে ভেজে ঘুরে বেড়ালে, বুড়োদের উপদেশ আর গালাগালি শুনলে, তারপর পট ক'রে একদিন ম'রে গেল।

ম'রে গেল ! কেন, কি হ'ল ?

কলেরা।

মাধববাবু বললেন, বুঝেছি, নিপুর ভাগ্নের কথা বলছেন, সেও কলকাতায় মাস্টারি করছিল, একটু বখাটে-গোছেরই ছিল, বছরখানেক হ'ল মারা গেছে। নিপুর ভাগ্নের কথাই বলছেন, নয় ?

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিবাদ করলেন, নিপুর ভাগ্নে মদ খেত না। মদ খেত আমাদের ছিরে, মাস্টারিও করত, কিন্তু সে মারা গেছে টাইফয়েডে, আপনি বোধহয় ভুল খবর শুনেছেন যতীনবাবু।

যতীনবাবু আবার একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। এমন অভদ্রলোক কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে যতীনবাবু বললেন, শ্রদ্ধা হয় লোকটার ওপর ?

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, এই আপনার গ্রেট ম্যানের গল্প ?

নামটা চেপে রেখেছি ব'লে গ্রেট ব'লে মনে হচ্ছে না. নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেট্‌নেস দেখতে পেতে ! I hate you, I hate you all.

নামটা কি, শুনিই না ?

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

তিলোত্তমা

॥ এক ॥

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ পর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সেও বিয়ে পাস করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, শখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারেণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনই আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি-ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে কোন কালে গোকুলকে উদরান্নের জন্য চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাঁহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কুষ্ঠি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন, তাহার ডাকনাম তিলু, ভাল নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

॥ দুই ॥

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে। তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশধ্বনি, নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পাণিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটা হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে, অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচ শত টাকা পণ কম দিয়াছে, বলিতেছে, এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি টাকা পরে পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলীর রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, এখনও আসিয়া পেঁছায় নাই। আংটিটা সোনার কি না কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মত। তিনি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? তখন তিনি যাহা যাহা দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা তাহাতেই রাজি হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশিই করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিৎ হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি? সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো! কিন্তু এ কি কাণ্ড? ওই অতি বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল? বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে, নকুলের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে? ছি ছি ছি ছি! নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ, গোল গোল গড়ন। চোর—চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।' সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমন কি গোকুল পর্যন্ত।

॥ তিন ॥

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বৈকি। একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভালমানুষ। মুক্তোকেশী বেগুনের মত তাহার মুখখানিতে ভালমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়াই থাকে, ইহাতে আশ্চর্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যা ভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু সে করিল না। সসংকোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি? সে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকারী হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ-কোলাহল তুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো। হিন্দুর ঘরে হয় তো অমন।

তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল, হ'লেও, তোমার যদি তাতে সুখ হয়, সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

॥ চার ॥

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

তিলুর সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানে লেখাপড়া. না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেন না, সে বাহিরের কাজকর্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি না, বকুল-বনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

॥ পাঁচ ॥

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও আণ্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতা যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমন কি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রুপার কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিত মুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে একে সবই ছাড়তে হ'ল। এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা।

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিক ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ীনক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল। কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করবে বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?

এখনও হয় নি।

আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, দেখ বাবা, তা হ'লে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে আছে, ওই মেয়েটি হবার পরই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মত একটি পাত্র আমি খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পাল্‌টি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল, তা হ'লে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

ঊষাকে আগে দেখ তুমি। তোমার যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে—

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার একটি স্ত্রী বর্তমান আছে, সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে ঊষা! তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া গান-বাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মত অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তা ছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

তা হ'লে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

॥ ছয় ॥

ঊষা, ঊষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌড়সারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কূল হারাইল।

॥ সাত ॥

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। ঊষাকে লইয়া ঊষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কথাবার্তা চালু করিয়া দিলেন। ঊষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়—আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। ঊষার মায়ের নামে একটি কলঙ্ক নাকি আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। ঊষা একটি শর্ত করিল এবং সে শর্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজি হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

॥ আট ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই ঊষার মা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না! এত কাণ্ড হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। গোকুল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়াই শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জনে দেখা হয় নাই, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বইকি। গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কি?

আজ আশীর্বাদ, মনে আছে তো?

আছে।

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া ক'রে, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

॥ নয় ॥

আশীর্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম। প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে, এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন, শাঁখটা বাজায় কে, আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ হয়েছে আবার। ও বউমা, কোথা গেলে তুমি ? শাঁখটা বাজাও।

শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ

॥ এক ॥

ট্রেন চলিতেছে।

কামরার মধ্যে চন্দ্রবাবু একা। আপাত-দৃষ্টিতে দ্বিতীয় লোক না থাকিলেও চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের মনের কথা স্তূপীকৃত। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গীতে বিভিন্ন কালিতে বিভিন্ন কাগজে নিবন্ধ অজস্র লোকের সহস্র প্রকার মনোভাব। নীরব অথচ মুখর। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে……অন্ধকার গভীর রাত্রি…স্বপ্নলোকে বিচরণ করিবার এই তো উপযুক্ত সময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে চন্দ্রবাবু এক খিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন। জরদার কৌটাটি ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিয়া ঢাকনির উপর বার দুই তর্জনী-আঘাত করিয়া খুলিলেন, বেশ খানিকটা জরদা তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে ধীরে ধীরে তাহা ব্যায়ত-আননে নিক্ষেপ করিলেন। জানালা খুলিয়া পিক ফেলিলেন। জানালাটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিতে হইল—বেশ জোরে একটা হাওয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নাবিষ্ট চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রবাবু ধীর প্রকৃতির মানুষ। তড়বড় করিয়া এটা উলটাইয়া ওটা ভাঙিয়া ছটফট করিয়া বেড়ানো তাঁহার স্বভাব নয়। যাহা করেন, ধীরে সুস্থে করেন। পাঁচখানি চিঠি বাছিয়াই রাখিয়াছিলেন। সব

চিঠি পড়িবার সময় নাই · চাকরি করিতে হইবে তো। সময় থাকিলে চন্দ্রবাবু সব না হোক আরও অনেক চিঠি নিশ্চয়ই পড়িতেন। এ সব বিষয়ে তাঁহার কৌতূহলী মন কখনও ক্লান্তি-বোধ করে না। খামের চিঠি খুলিবার বিবিধ কৌশল তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। ইহার জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন তাহা তাঁহার সঙ্গেই থাকে।

খামগুলি চন্দ্রবাবু একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর নিবিষ্টচিত্তে শুরু করিলেন।

॥ দুই ॥

চন্দ্রবাবু যুবক নন, স্থবির বৃদ্ধও নন। বস্তুত বাহির হইতে দেখিতে তাঁহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ঠিক কোন্ স্থানে তিনি অবস্থিত তাহা বলা কঠিন। চাকরির খাতা অনুসারে তাঁহার বয়স আটচল্লিশ—কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। কয় বৎসর যে তিনি কমাইয়াছেন তাহা জানাও শক্ত, কারণ সে খবর যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। মুখ দেখিয়াও সঠিক কিছু বলা যায় না। দাড়ি-গোঁফ-জুলফিতে পাক ধরিবামাত্রই তিনি ক্ষুর ও কলপের সাহায্য লইয়াছেন। তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা মাধুরীর নিকট অপ্রতিভ হইবার লোক তিনি নন। কিন্তু বয়স যাহাই হউক চন্দ্রবাবু রসিক ব্যক্তি। ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁস-জল আছে। তাঁহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয় তাহা স্বপ্নালুতরাই ছদ্মবেশ। আ-কৈশোর রসাপপাসু তিনি। ছন্দ মিলাইয়া কবিতা অবশ্য কখনও লেখেন নাই—ও সব তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও তৃপ্ত হয় না তাঁহার। কবিতা লিখিয়া কি হইবে? কবিতা করা কিংবা কবিতা অনুভব করা—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে তাহার রসাস্বাদন করাই তো আসল কথা। তাহা তিনি বহুবার করিয়াছেন। মাসতুতো ভাই তেনা বাঁচিয়া থাকিলে বলিতে পারিত যে, কি আগ্রহভরে এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি বাসর ঘরে, অথবা নবদম্পতির শয়ন-কক্ষে কৈশোরকালে আড়ি পাতিতেন। চোরের মতো চুপিচুপি উঠিয়া গিয়া কত বাতায়নতলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন, কত ছিদ্রপথে যে চোখ রাখিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যৌবনকালেও কবিতা করিয়াছেন অনেক। তাহার ইতিহাস তৎকালীন পরিচিত ডাক্তারেরা এবং তাঁহার বিগত দুই পত্নী জানিতেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতী তাদৃশী। ভগবান চাকরিটিও জুটাইয়া দিয়াছেন চমৎকার। আর. এম. এস-এর সর্টার তিনি।

বহু কবিতা অনুভব করিবার সুযোগ মিলিয়াছে এবং মিলিবে।

চিঠির ভিতর কত জিনিসই যে দেখিয়াছেন! কত অদ্ভুত রকম মজা! চিঠির কাগজে প্রকাণ্ড ডিগ্রীওলা নাম ছাপা—মহা বিদ্বান লোক কিন্তু স্ত্রীকে (অবশ্য স্ত্রী কিনা ভগবানই জানেন!) এমন অশ্লীল ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন যে, তাহা উচ্চারণ করা যায় না। পড়িতে কিন্তু বেশ লাগে।

আগে আগে চন্দ্রবাবু মেয়েলী হাতের লেখা দেখিয়া পত্র খুলিতেন—এখনও দুই একটা খোলেন—কিন্তু এখন চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, মেয়েরা তেমন রসাল চিঠি লিখিতে পারে না। প্রায়ই 'আমি ভালো আছি', 'তুমি কেমন আছ' জাতীয়

কথায় ভরতি। বড় জোর 'তোমার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে—তুমি কবে আসিবে' —আর শেষে সেই এক কথা বাঁধা গৎ 'চিঠির উত্তর দিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো' —অজস্র বানান ভুল। 'চুমু নাও' মাঝে মাঝে পাইয়াছেন অবশ্য, কিন্তু অধিকাংশই বাজে। কখনও কোন রসবতীর দেখা যে পান নাই তাহা অবশ্য সত্য নহে—সেই লোভেই এখনও দুই-একটা মেয়েলী হাতের লেখা খোলেন—কিন্তু কদাচিৎ সে রকম রসিকার দেখা পাওয়া যায়। অধিকাংশই বাজে। কী কী জিনিস কিনিয়া আনিতে হইবে তাহারই লম্বা ফর্দ সেদিন পাইয়াছিলেন একটা। চিঠি নামমাত্র—সবই ফর্দ। স্বামীকে নয়, যেন বাজার সরকারকে পত্র লিখিতেছে! মেয়েরা মজাদার চিঠি লিখিতে পারে না ইহাই চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা।

খামের উপর পুরুষ-হস্তে মেয়ের ঠিকানা-লেখা দেখিলে চন্দ্রবাবু পুলকিত হইয়া ওঠেন। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই বস্তু থাকে। এ বিষয়েও অবশ্য চন্দ্রবাবুকে হতাশ হইতে হইয়াছে—বাংলা ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা তাঁহার জানা নাই। পুরুষের লেখা মেয়েলী নামের চিঠি খুলিয়া হয়তো দেখিলেন হিন্দী কিংবা অন্য কোন ভাষা। কিংবা হয়তো কোন পিতা কন্যাকে পত্র লিখিতেছেন কিংবা পুত্র মাতাকে। আর এক জাতীয় বিশেষত্বহীন চিঠিও তিনি মাঝে মাঝে খুলিয়া ফেলেন, যাহাতে বোঝাই যায় না যে, লেখকের সহিত উদ্দিষ্ট রমণীর ঠিক সম্পর্ক কি। কিন্তু এসব কথা বাদ দিলেও মোটের উপর পুরুষদের লেখা চিঠিতেই চন্দ্রবাবু বেশী মজা পাইয়াছেন। ভালো ভালো চিঠির অংশ বিশেষ টুকিয়াও রাখিয়াছেন। পুরুষরা নির্লজ্জ—তাহারাই কলম ছুটাইতে জানে! তাছাড়া তাহারা বেপরোয়া। পুরুষদের লেখা চিঠির ভিতরেই তিনি একবার একশত টাকার নোট একখানা পাইয়াছিলেন। কে যেন লুকাইয়া প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইতেছিল। নোট অবশ্য ওই একবারই পাইয়াছেন কিন্তু ছবি পাইয়াছেন বহু। তাঁহার একটা অ্যালবামই ভরিয়া গিয়াছে। ফরাসী, জার্মানী, ইহুদী, ইংরেজ, জাপানী, বাঙালী, উড়িয়া—কত জাতের কত ঢঙের কী ছবি সব। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই যে প্রকৃত রসের সম্ভাবনা এ বিষয়ে চন্দ্রবাবু নিঃসন্দেহ। মেয়েলী হাতের লেখা চিঠিও মাঝে মাঝে তাক লাগাইয়া দেয় অবশ্য। একবার একটা চিঠিতে ঠোঁটের ছাপ ছিল। রসের কথাও থাকে মাঝে মাঝে। তবু পুরুষের লেখা চিঠির দিকেই চন্দ্রবাবুর ঝোঁক বেশী।

॥ তিন ॥

মেয়েলী হাতের লেখা প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া চন্দ্রবাবু হতাশ হইলেন। তবু পড়িতেছিলেন।

দিদি,

তোমার রিপ্লাই কার্ড গতকাল পাইলাম। তুমি আমাদের রিপ্লাই কার্ড লেখ ইহা তোমার পক্ষে লজ্জাকর না হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমাদের লজ্জা হয়। তোমার বোঝা উচিৎ যে, এখানে এখন সব দিক সামলাইবার মতো লোক এক আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাবা কিছুই দেখেন না। সমস্ত হাঙ্গামা আমাকে একা পোহাইতে হয়। তা ছাড়া আমার চাকরি আছে। এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় পাই না। তবু তোমার চিঠি

পাওয়ার দুই দিন আগেই গদাধরকে স্যাকরার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার গহনা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। সাত দিন পূর্বে যখন গিয়াছিলাম তখন মাত্র কান-পাশাটা হইয়াছিল। শনিবার আমার নিজে গিয়া পুনরায় দেখিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার মোটে অবসর নাই—স্কুলের প্রাইজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছি—গার্লস গাইডের সমস্ত ভার আমার উপর। তোমার রসিদটা আমি আজই তালুকদার মহাশয়কে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি তাঁহাকেই চিঠি লিখিয়া গহনা ডেলিভারি লইবার ব্যবস্থা কর। কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে। অন্যগুলির কথা বলিতে পারিলাম না। দেখিবার সময় নাই। তোমাকে মিনতি করিতেছি এরকম কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া আমার মন খারাপ করিয়া দিও না।

ইতি—নমিতা

চন্দ্রবাবু চিঠিখানা একবার শুঁকিলেন। মৃদু আতরের গন্ধ আছে একটা। চক্ষু বুজিলেন। কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতাধরা রুষ্টা তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মানস-পটে অনিবার্যভাবে যে ছবিটি বারংবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল তাহা তাঁহার পরিচিত একটি শিক্ষয়িত্রীর—গলার সাঁকি বাহির করা—শাকচুন্নি মার্কা সুঁটকো কালো মূর্তি - গলার এবং গালের হাড় উঁচু—খাঁড়ার মতো নাক—

"মরুক গে—"

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন।

সাবিত্রীসমাপেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যদি একটু বুঝিয়া সমঝিয়া না চল তাহা হইলে এ বাজারে তো আমি গেলাম। চাউলের মণ চল্লিশের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে. ডাইলও অগ্নিমূল্য, তরিতরকারি কয়লা সমস্তই তদ্রূপ। সোপস্টোন-মিশ্রিত আটার দাম নীলাম্বর বলিল বারো আনা সের। সরিষার তেল দুই টাকা—ঘৃতের দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই হয় নাই। অতি সাধারণ কাপড় দশ টাকা জোড়া। তবু মাসের খরচ যথাসাধ্য কিনিয়াছি। সব নগদ দিতে পারিলাম না, নীলাম্বরের দোকানে অনেক ধার রহিয়া গেল। ধার না করিয়া উপায় কি, নবীনকে কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইল। আমি একা আর কত পারি বল। এমন দুঃসময়ে সায়া কি না পরিলেই নয়? হটাস্ করিয়া একটাকা গজ মার্কিন ধারে কিনিয়া বসিলে! আমাকে তুমি নবাব খাঞ্জা খাঁ মনে কর নাকি। প্রত্যহ জুতার চোটে চাঁদির চটা উঠাইয়া মনিব আমাকে পাঁচ শতও নয়, হাজারও নয়, মাত্র পঁচাত্তরটি টাকা দেয় এ কথা তোমাদের কত মনে করাইয়া দিব। আমার হাড়-মাস কালি হইয়া গেল যে। অত দাম দিয়া জরদা কিনিবারই বা কি দরকার। বাড়ির পাশে প্রফুল্লর দোকান হইয়া আমাকে ডুবাইবে দেখিতেছি—

"কি আপদ—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রবাবু পত্রটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। পুরা চার পৃষ্ঠা ধরিয়া ক্ষুদি-ক্ষুদি অক্ষরে কেবল ওই এক কথাই লিখিয়াছে লোকটা।

তৃতীয় পত্রটিও পুরুষের হস্তাক্ষর।

ঠিকানায় নাম নীলিমা বসু। খামের রঙ গোলাপী। এ পত্রটিও চন্দ্রবাবুকে হতাশ করিল। নীলিমা পুরুষের নাম!

নীলিমাবাবু,

আপনি যাইবার সময় দুইটি জিনিস ফেলিয়া গিয়াছেন—হকি স্টিক এবং সিগার

কেস। আপনার ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট আজ আসিল—এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। চার পার্সেন্ট সুগার আছে—কি সর্বনাশ!

“কচু খেলে যা—”

বাজে চিঠি পড়িবার সময় নাই চন্দ্রবাবুর।

চতুর্থ পত্রটি খুলিলেন। এটি বেশ মোটা চিঠি। পুরুষের হস্তাক্ষর। খাম খুলিতেই একটা ছবি বাহির হইল। অদ্ভুত ছবি! নানা রকম পোস্ট কার্ডে নানা রকম ছবি তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু ঠিক এরকমটি কখনও আর চোখে পড়ে নাই। বাঃ! মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নিষ্প্রভ দৃষ্টি সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল। ছবি রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্রটি পড়িতে লাগিলেন। বাঃ বাঃ চমৎকার। এতক্ষণে শ্রম সার্থক হইল। এই তো চিঠির মতো চিঠি। বাহাদুর বটে ছোকরা। বাৎস্যায়ন, হাভেলক এলিস, ফ্রয়েড কিছু আর বাকি রাখে নাই। কী ভাষা, কী বর্ণনা! চন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তবু তৃপ্তি হইল না। একবার ইচ্ছা হইল চিঠিখানি রাখিয়া দেন—কিন্তু তখনই আবার মনে হইল—না সেটা অধর্ম হইবে। রাখিবার দরকার কি, ভালো জায়গাটা টুকিয়া লইলেই হইল। এসব জিনিস টুকিতেও সুখ। মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মাধুরীর সঙ্গে অবশ্য তিন দিনের আগে দেখা হইবে না—কিন্তু তিন দিন পরে তো হইবে। ইতিপূর্বে অনেকবার তিনি এই ধরনের চিঠি টুকিয়া মাধুরীকে শুনাইয়াছেন। সহসা মাধুরীর মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল। মাধুরীটা কেমন যেন! কিছুতেই যেন খুশী হয় না, কাছে গেলে প্যাঁচার মতো মুখ করিয়া বসিয়া থাকে! অথচ কী সুন্দর মুখখানি, হাসিলে গালে টোল পড়ে—কিন্তু কিছুতেই হাসিবে না। যাই হোক এই চিঠির খানিকটা মাধুরীকে শুনাইতেই হইবে—দেখি হাসে কি না এবার।

সাগ্রহে টুকিতে লাগিলেন।

টোকা হইয়া গেলে আদ্যোপান্ত পত্রটি আর একবার পড়িয়া চন্দ্রবাবু সেটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। ছবিটি অবশ্য বাহিরে রহিল।

এইবার পঞ্চম চিঠি।

ঠিকানাটা ইংরাজীতে টাইপ করা। নীল খাম।

এ ধরনের চিঠিতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত রকম মজা পাওয়া যায়। অনেক স্বামী টাইপ করা খাম স্ত্রীকে দিয়া আসেন। টাইপিস্ট ছুঁড়ীগুলোও তাহাদের প্রেমাস্পদকে মাঝে মাঝে চমৎকার চিঠি লেখে টাইপ-করা ঠিকানায়। অনেক ভালো জিনিস মিলিয়াছে অনেকবার।

চন্দ্রবাবু আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখবিবরে প্রেরণ করিয়া অর্ধাস্তমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন। লালারসে মুখ ভরিয়া উঠিল। জানালা খুলিয়া আর একবার পিক ফেলিলেন। বাস রে কী ভীষণ বিদ্যুৎ হানিতেছে। জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ চিঠিটা যেন নেশার মতো তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কী সাংঘাতিক বর্ণনা। ইহা পড়িলে মাধুরী এবার নিশ্চয়—

পঞ্চম চিঠিটা খুলিলেন।

অনঙ্গ,

তুমি আসবে শুনে খুব সুখী হলাম। তোমারই আশায় পথ চেয়ে আছি। আমি আর

পারছি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যেখানে হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেমন ভাবে রাখবে সেখানেই তেমনি ভাবে থাকব আমি। কেবল এ নরক থেকে উদ্ধার কর আমাকে। তুমি দেরি কোরো না। বুড়োটা কাল সকালে ডিউটিতে বেরুবে—তিন দিন পরেই ফিরবে আবার। আশা করি কাল বিকেলে কিংবা সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরী থাকব। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও। ইতি—

তোমারই মাধুরী।

প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বজ্র পড়িল।

চিত্রচতুষ্টয়

॥ এক ॥

সকাল সাতটা। বেচুবাবু ত্বরিতপদে পথ অতিবাহন করিতেছেন। অনেক দূর তাঁহাকে যাইতে হইবে। শুধু যাইতে হইবে নয়—ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং আহারাদি করিয়া অফিসের জন্য নটার মধ্যে প্রস্তুত হইতে হইবে। বেচুবাবুর পরণে ফতুয়া এবং থান। পায়ে মলিন কেড্স্। মুখে কাঁচা-পাকা গোঁফ। চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা—তাহার একটি ডাঁটি শ্লথ হইয়া যাওয়াতে সুতা দিয়া বাঁধা। হস্তে একটি ছোট থলি। কৃশ দেহটা একটু কুব্জভাবে সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই নাতিসমর্থ শরীর লইয়াও বেচুবাবু বেশ হাঁটিতে পারেন। দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। উদ্দেশ্য বাজার করা। পাড়ার নিকটে যে বাজার আছে সেখানে তিনি যাইতেছেন না। তিনি একটু দূরের বাজারে চলিয়াছেন। কাল অফিসে শুনিয়াছেন সেখানে নাকি আলুর দাম সের পিছু দুই পয়সা করিয়া কম। বেচুবাবুর প্রত্যহ আধ সের করিয়া আলু খরচ। আলুর জন্য প্রত্যহ এক পয়সা অধিক ব্যয় করা বেচুবাবুর পকেটের পক্ষে অসম্ভব নহে—মনের পক্ষে অসম্ভব। সস্তায় জিনিস কেনা বেচুবাবুর ব্যসন—উহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র গর্বের বস্তু। আপনি যে জিনিস চার আনায় খরিদ করিবেন—বেচুবাবু যেমন করিয়া হোক তাহা সাড়ে তিন আনায় অথবা খুব বেশী হইলে পোনে চার আনায় কিনিয়া আনিবেনই। ইহার জন্য তাঁহাকে যদি সমস্ত কলিকাতা শহরটা চষিয়া ফেলিতে হয় তাহাতেও তিনি প্রস্তুত।

॥ দুই ॥

সতীশবাবুও চলিয়াছেন। তাঁহারও গতি বেশ দ্রুত। বগলে একখানি খাতা, লংক্লথের পাঞ্জাবীর বুক পকেটে ফাউণ্টেন পেন গোঁজা। বেশবাসে অসাধারণত্ব কিছু নাই। চকিতে একবার হাত ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলেন—সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। সতীশবাবুর গতি-বেগ আর একটু বাড়িল। ঠিক সাতটার সময় অখিলবাবুর সহিত তাঁহার এনগেজমেণ্ট আছে। ভদ্রলোক বাহির হইয়া না যান। সতীশবাবু বাঁদিকের

একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। সে গলিটা ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হইয়া আর একটা গলিতে ঢুকিলেন। অখিলবাবুকে যেমন করিয়া হোক ধরিয়া আজই বইখানা হস্তগত করিতে হইবে।

সতীশবাবু ইতিহাসের গবেষক। অখিলবাবুর নিকট একটি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন। এই বইখানি পাইলে গবেষণা-ঘটিত গুরুতর সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। তারিখ লইয়াই যত গোলমাল। তারিখ নির্ভুল হওয়া চায়।

তীরবেগে সতীশবাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

॥ তিন ॥

গভীর নাসারন্ধ্রে প্রচুর নস্য প্রবেশ করাইয়া আরক্ত সজল নয়ন দুইটি তুলিয়া যোগীনবাবু পাশের দোকানের দেওয়াল-ঘড়িটির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সওয়া সাতটা।

সুতরাং আর দেরী করা অনুচিত।

স্থূল বপুটিকে সঞ্চালিত করিয়া তিনি থপ্ থপ্ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অনেক দূর যাইতে হইবে। হাঁটিয়াই যাইতে হইবে। ট্রামে অথবা বাসে যাইবার মতো পয়সা সঙ্গে নাই। যোগীনবাবুর দেহটি যদিও অত্যন্ত স্থূল—মন কিন্তু সূক্ষ্মমর্মী। অত্যন্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতির লোক তিনি। নিরামিষাশী। প্রত্যহ বহু স্তোত্র ও বহু মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তবে জলগ্রহণ করেন। হিমালয় হইতে জনৈক ত্রিকালদর্শী সন্ন্যাসী কলিকাতা শহরে কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারই সন্দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় যোগীনবাবু চলিয়াছেন। প্রত্যহ সকাল সাতটা হইতে আটটা পর্যন্ত তিনি দর্শন দিয়া থাকেন। কাল যোগীনবাবু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন। আজও বোধহয় হতাশ হইতে হইবে। সওয়া সাতটা ত বাজিয়া গিয়াছে। গোয়াবাগান কি এখানে।

যোগীনবাবুর সূক্ষ্মমর্মী মন আড়াই মণ ওজনের মেদস্তূপটাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া গোয়াবাগানের উদ্দেশ্যে লইয়া চলিল।

॥ চার ॥

"দূশ্শালা তোর জন্যেই ত দেরী হ'ল।"

শ্যালক দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিলেন।

দুইজনেই অবিবাহিত।

শ্যালক বলিলেন—"রাগ করিসনি ভাই অতুল, বৌদির কাছ থেকে পয়সা বার করা কি সোজা কথা! তুই ভাই কিনে রাখিস—আমি ঠিক পাঁচটার সময় তোর বাড়ী যাব। কেমন? আমাকে আজ আবার বাজার করতে হবে—ঝি মাগী আসেনি।" অতুলের হস্তে একটি টাকা দিয়া শ্যালক একটি গলিতে অন্তর্হিত হইল। অতুল পাশের পানের দোকানটায় দেখিল—প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। এতক্ষণ হয়ত ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

অতুলও দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। পরণে হাফ প্যান্ট—গায়ে গেঞ্জি—পায়ে কিছু নাই।

সিনেমার টিকিট কিনিতেই হইবে।

যে অভিনেত্রীর অর্ধনগ্নরূপ এক মাস ধরিয়া দেওয়ালে দেওয়ালে কাগজে কাগজে আবির্ভূত হইয়া অতুলকে উন্মাদপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে—তিনি আজ ছায়ালোকে অবতীর্ণ হইবেন।

ক্ষিপ্রপদে অতুল চলিয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

বেচুবাবু, সতীশবাবু যোগীনবাবু এবং অতুল—কয়েক মিনিট আগে পরে একই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন।

শুধু তাহাই নহে—ইঁহারা সহোদর।

একই মাতৃদুগ্ধে পুষ্ট।

* * * * *

পিতা হরিচরণ বাবু চিত্রকর ছিলেন।

বাঘা

॥ এক ॥

বাঘা তেঁতুল নয়, কুকুর। নিতান্তই দেশী কুকুর। নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কর্ণ, রোম বা পুচ্ছে বৈদেশিক কোন প্রকার ভব্যতা বা বৈচিত্র্য নাই। সাধারণ দেশী কুকুর—তবে চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পর্যাপ্ত আহার-পুষ্ট বাঘাকে সহসা দেখিলে অপরিচিত কোন ব্যক্তির মনে ত্রাস সঞ্চার হয়ত হইতে পারে, কিন্তু যে বাঘার একবার পরিচয় পাইয়াছে সে বাঘাকে দেখিয়া বিচলিত হইবে না। কারণ বাঘার মত অমন একটি ভীতু কুকুর সচরাচর দেখা যায় না। পট্‌কা ছুঁড়িলে বাঘা হুড়মুড় করিয়া তক্তাপোষের তলায় ঢুকিয়া পড়ে—মাথা চুলকাইলে ছুটিয়া পলায়, ভাবে ঢিল ছুঁড়িল বুঝি। কারণে অকারণে তাহার লাঙ্গুলটি সর্বদাই প্রায় পিছনের পদদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। আপাত দৃষ্টিতে ইহাই বাঘার পরিচয়। বেচারা বাঘা নিজের নাম সার্থক করিতে পারে নাই।

কিন্তু শিরোমণির মত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও জ্ঞান থাকিলে অনা পরিচয় পাওয়াও সম্ভব। শিরোমণি মহাশয়ের মারফত তারিণীচরণ সে পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে চলিতেছিলেন। তারিণীচরণই বাঘার মনিব। মনিব না বলিয়া ভৃত্য বলাই অবশ্য সঙ্গত। কারণ ভৃত্যের মতই তিনি বাঘার সেবাপরায়ণ ছিলেন। আমি ছুটিতে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলাম। শিরোমণি প্রমুখাৎ আমিও বাঘার সত্য পরিচয়টি জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

॥ দুই ॥

ঘটনাটি এই।

বাঘা যখন শিশু তখন তাহার গোল-গাল নাদুস-নুদুস চেহারাটি দেখিয়াই সম্ভবত তারিণীচরণ তাহাকে পুষিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। অধিকাংশ দেশী জিনিসের মত শৈশবে বাঘারও বেশ একটা জৌলুষ ছিল। তারিণীচরণ মুগ্ধ হইলেন এবং বাঘাকে আনিয়া গৃহে স্থান দিলেন। কুকুরছানা পুষিলেই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা সকলেরই মনে বোধহয় জাগরূক হয়। তারিণীচরণেরও হইয়াছিল। একটি পাতলা শিকল সহযোগে তারিণীচরণ বাঘাকে উঠানে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাঘা তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। এমন সময় শিরোমণি আসিয়া দেখা দিলেন। যথাবিধি খানিকক্ষণ বসিলেন, তামাক খাইলেন এবং রুদ্যমান কুকুরশাবকের প্রতি দুই একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেলেন। সেদিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু তার পরদিন ভোরে আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন তাহতে তারিণীচরণকে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হইল। প্রথমে আসিয়াই শিরোমণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুক্কুর-শাবকটিকে বেশ খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর তারিণীচরণকে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, সরোজের মৃত্যু একবছর হ'ল হয়েছে, না?" তারিণীচরণের অগ্রজ সরোজকুমার এক বৎসর পূর্বেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন তা সত্য কথা।

সুতরাং তারিণী বলিলেন—"হ্যাঁ, তা হবে বৈকি। কেন বলুন ত?"

"সরোজের কুষ্ঠি আছে? সেখানা দিতে পার একবার আমাকে?"

"কেন বলুন ত?"

"কুষ্ঠিটা দেখি আগে, তারপর বলছি।"

তারিণীচরণ ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং খানিকক্ষণ খুঁজিয়া মৃত সরোজের কোষ্ঠীখানা আবিষ্কার করিয়া শিরোমণি মহাশয়কে সেটি আনিয়া দিলেন। শিরোমণি সেটি প্রসারিত করিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসুক তারিণীর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসংকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি বলিলেন—"কুকুর বাচ্ছাটিকে খুলে দাও!"

"কেন বলুন ত?"

"ও সরোজ! কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। যত্ন-আত্তি ক'রো ওকে। আর একটা স্বস্ত্যয়ন করানও দরকার। পরজন্মটায় যাতে সদ্গতি হয়। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!"

শিরোমণি উঠিয়া পড়িলেন।

বিহ্বল তারিণী তাড়াতাড়ি গিয়া বাঘাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাঘার বন্দীত্ব ঘুচিল। বাঘা যদি মানুষ হইত তাহা হইলে অবিশ্বাসী লোকে সন্দেহ করিত যে বাঘা বোধহয় শিরোমণিকে ঘুষ দিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিরোমণির আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় যথাকালে স্বস্ত্যয়নও হইয়া গেল। সেই হইতেই বাঘা বন্ধনমুক্ত।

বস্তুত সেই হইতেই বাঘার সুখের দশা পড়িল। তারিণীচরণ কুক্কুর-যোনিপ্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। সরোজ অকৃতদার ছিলেন। সুতরাং সরোজের

বিধবার আদর-যত্ন লাভে বাঘাকে যদিও বঞ্চিত হইতে হইল কিন্তু তারিণীচরণ ভ্রাতৃভক্তির যেরূপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন তাহাই বাঘার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপর বিধবা থাকিলে বাঘার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর হইত কিনা সন্দেহ।

সুতরাং বাঘা সুখে ছিল।

তারিণীচরণ এবং শিরোমণিও সুখে ছিলেন।

পরস্পর দেখা হইলে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন প্রায়ই হইত।

"সরোজ ভাল আছে ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কর্তব্য করে যাও—ফলাফল ভগবানের হাতে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—যথাসাধ্য করেই যাচ্ছি।"

করিতেওছিল।

॥ তিন ॥

এই ভাবেই চলিতেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বোধহয় চলিতও। কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া সমস্ত ওলট-পালোট হইয়া গেল। রিট্রেঞ্চমেন্টের ধাক্কায় বেচারি তারিণীচরণের চাকুরিটি টিঁকিল না। যদিও অন্নবস্ত্রের জন্য তারিণীচরণকে কোনদিন চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হয় না তবু বেচারার একটু কষ্ট হইল বৈকি। যদিও তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই, জমিজমা কিছু আছে তথাপি আজকালকার বাজারে মাসিক চল্লিশ টাকা আয় নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত নহে। তারিণীচরণ একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে তাঁহার এই বিমর্ষভাবটা হয়ত কাটিয়া যাইত কিন্তু বাঘা কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে অন্নজল ত্যাগ করাতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তারিণীচরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

শিরোমণি শুনিয়া বলিলেন—"ও অন্নজল ত্যাগ করবে না? হাজার হোক দাদা ত! তাছাড়া তুমি যে ওর প্রাণ ছিলে ভায়া! তোমার চাকরি গেছে শুনে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না ত কে করবে!"

শিরোমণির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তারিণীচরণ আগে হইতেই কাঁদিতেছিলেন।

শিরোমণি চক্ষু-মার্জনা করিয়া বলিলেন—"যাই হোক্, খাওয়াবার চেষ্টা কর তুমি। তুমি অনুরোধ করলে ঠিক খাবে।"

শুনিলাম বাঘা একটা অন্ধকার ঘরের কোণ আশ্রয় করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কি হইল তাহা দেখিবার সুযোগ তখন আর ঘটিল না। আপিস খুলিতেই শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইল।

॥ চার ॥

কয়েকদিন পরে হঠাৎ এক জরুরি তার পাইলাম—অবিলম্বে চলিয়া এস।

তার করিতেছেন আমার গৃহিণী অর্থাৎ শিরোমণির ভগিনী।

যাইতে হইল। গিয়া শুনিলাম তারিণী শিরোমণিকে কামড়াইয়াছে।

সে কি! আরও শুনিলাম বাঘা তারিণীকে কামড়াইয়া মারা গিয়াছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ডাক্তার ডাকিলাম।

ডাক্তারটি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।

সুতরাং বলিলেন—দুইজনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই।

এখন সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে হরিসংকীর্তন হইতেছে।

জৈবিক নিয়ম

বেচারার দোষ ছিল না। এমন অবস্থায় সব যুবকই এমনই করিয়া থাকে। জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্মই এই। মনে হয় বুকটা একটু ফুলাইয়া চলি, মাথাটা একটু উঁচাইয়া রাখি। হাব-ভাবে চলনে-বলনে পৌরুষের মাহাত্ম্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক। মেয়েটি তাহা দেখুক, অনুভব করুক, একবারও অন্তত মনে মনে ভাবুক—বাঃ বেশ ছেলেটি ত! অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে, পেশীগুলির মধ্যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়, শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে বাহুল্যে ও আতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে-অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাহা নিজস্ব ধরণে, নিজস্ব ভঙ্গীতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।

সেদিন প্লাটফর্মে রোগা-গোছের ছোকরাটি তাহার নিদারুণ কৃশতাসত্ত্বেও যাহা করিতেছিল তাহা এই সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতেই করিতেছিল। নিরপেক্ষভাবে নিরীক্ষণ করিলে ছোকরাটির মধ্যে তেমন অসাধারণ কিছু ছিল না। সাদা টুইলশার্ট পরা উনিশ-কুড়ি বছরের একটি রোগা ছোকরা। গোঁফ উঠি-উঠি করিতেছে। পায়ে সস্তা চটকদার একজোড়া স্যাণ্ডাল।

অদূরে বেঞ্চে একটি কমবয়সী মেয়ে বসিয়া আছে।

স্টেশনটি ছোট।

প্লাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জনচারেক যাত্রী অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে জন দুই সাঁওতাল। তাহারা মোট-ঘাট লইয়া একটু দূরে বসিয়াছিল। বাকী দুইজনের মধ্যে একজন ওই রোগাগোছের ছোকরা এবং আর একজন ওই তরুণীটি। এদিকে ওদিকে দুই একটি কুলি ও ফেরিওয়ালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রেলের বাবুরা নিজ নিজ কামরায় কাজ

করিতেছেন। এই নিরীহ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ছোকরাটির অন্তরে কেমন যেন একটা উদ্দীপনা অকারণে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোকরাটি অবশ্য মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

উত্তেজনার আধিক্য সম্ভবত সেই জন্যই।

ছোকরা কন্ঠস্বরকে অকারণে অসম্ভব রকম পরুষ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কুলি, কুলি—এই কুলি—

একটি কুলি আসিল।

কি বাবু?

আমার মোটটা ট্রেনে উঠিয়ে দিবি। বুঝলি?

আচ্ছা বাবু।

কত নিবি?

চার পয়সা বাবু।

চার পয়সা কেন, চার আনা দেব তোকে। ভাল দেখে একটা গাড়ীতে চড়িয়ে দিস—কেমন?

বিস্মিত কুলি বলিল—আচ্ছা বাবু।

ঠিক পারবি ত?

ঠিক পারব বাবু।

বহুৎ আচ্ছা।

ছোকরা কুলির পিঠটা চাপড়াইয়া দিল।

কোনটা আপনার মোট বাবু?

একটি ছোট সুটকেশ ছাড়া অবশ্য অন্য কোন গুরুতর মোট ছিল না। ছোকরা তাহাই দেখাইয়া দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—ট্রেন আজ লেট্ আসছে না কি?

আধ ঘণ্টা লেট্ বাবু।

রিপোর্ট করব আমি!

কাহার কাছে এবং কাহার নামে রিপোর্ট করিবে তাহা অবশ্য অনুক্তই রহিল।

কুলি চলিয়া গেল।

ছোকরা দৃপ্তভাবে রোষকষায়িত লোচনে তরুণীর সম্মুখে খানিকক্ষণ পদচারণা করিল এবং কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া রুষ্টভাবটা একটু প্রশমিত হইলে মুখটি সুচালো করিয়া শিস্ দিতে লাগিল। খানিকক্ষণ শিস্ দিবার পর আবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল! আদেশের ভঙ্গীতে ডাকিতেছে—সোডা—সোডা—এই সোডা—ইধার আও!

সেডা-বিক্রেতা সমীপবর্তী হইল।

একঠো সোডা দেও। জল্‌দি করো—

দাম দু'আনা বাবু—

কুছ পরোয়া নেহি—দেও তুম!

এই বলিয়া যেন দেখিতেছে না এইভাবে সে মেয়েটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। বলা বাহুল্য মেয়েটিও ছেলেটিকে লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ চোখোচোখি হইয়া যাওয়াতে মেয়েটি তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

লিজিয়ে বাবু—

ফেনায়িত সোডার বোতলটা ধরিয়া কৃশ যুবকটি সগর্বে পা ফাক করিয়া উর্ধ্বমুখে সোডা পান করিতে লাগিল। সোডা-পান করাটাও যেন মস্ত একটা বীরত্ব!

ইতিমধ্যে একটা চানাচুরওয়ালা আসিয়া জুটিল।

মেয়েটি ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া চানাচুর খরিদ করিতেছে দেখিয়া যুবকটিও সেই দিকে আগাইয়া গেল!

কি দর তোমার চানাচুরের হে!

এক পয়সা ঠোঙা বাবু।

ওই টুকু ঠোঙা এক পয়সা! যে রকম সাইজ, পয়সায় চারটে করে হওয়া উচিত! সিম্‌প্লি এ কাটথ্রোট্! পয়সায় চার ঠোঙা করে দিবি?

পারব না বাবু।

পারব না, মানে?

চানাচুরওয়ালা বলিল—ছোলার দর আজকাল বাবু—

ছোলার দর আজকাল কত? বেশ ত খতিয়েই দেখা যাক।

রুখিয়া ছোক্‌রা আগাইয়া গেল।

ওসব কথা ছেড়ে দিন বাবু। বেকার বাত বানিয়ে ফয়দা কি! লেবেন আপনি চানাচুর? ক ঠোঙা চাই?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ছোকরা একবার আপাদমস্তক চানাচুরওয়ালাটাকে দেখিয়া লইল। তাহার পর বলিল—ক ঠোঙা? তোর যত চানাচুর আছে সব কিনে নিতে পারি আমি জানিস? কি ঠাউরেছিস তুই আমাকে!

উত্তরে চানাচুরওয়ালা দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল।

হাসছিস যে বড়? কত চানাচুর আছে তোর? দাম কত হবে?

এক টাকা বাবু—

ছোকরা তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। চানাচুর-বিক্রেতা এতটা প্রত্যাশা করে নাই। কি গভীর মনোবৃত্তি যে ছোকরাকে নাচাইতেছে তাহা মূর্খ বেচারা কি করিয়া বুঝিবে! টাকা লইয়া সে চলিয়া গেল।

এত চানাচুর লইয়া ছোকরা কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়িল!

একটু ইতস্তত করিয়া মেয়েটিকে বলিল—আপনি আরও কিছু নিন!

না—না—আমার আর চাই না!

কুণ্ঠিতা তরুণী সলজ্জভাবে মাথা নাড়িল।

এতগুলো নিয়ে আমি কি করব? রেখে দিন কিছু আপনি,—অনেকগুলি ঠোঙা সে তরুণীটির পাশে বেঞ্চিটার উপর একরকম জোর করিয়াই রাখিয়া দিল। ইহার দৃষ্টিকটুতা তরুণীটিকে সংকুচিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে বেচারা কি আর করিবে! লজ্জায় আনতনয়নে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোন ভদ্র উপায় তাহার মাথায় আসিল না।

বাকী ঠোঙাগুলি সুট্‌কেসের উপর রাখিয়া আসিয়া ছোকরা সহাস্যমুখে বলিল—ওগুলো ট্রেনে যেতে যেতে ধীরে-সুস্থে শেষ করবেন। কোথা যাচ্ছেন আপনি? এই ট্রেনেই যাচ্ছেন ত?

মেয়েটি লজ্জা পাইয়াছিল।

মৃদুস্বরে বলিল—আমি এর পরের ট্রেনটায় যাব।

ও, তাই না কি !

ছোকরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার পাইচারি শুরু করিল। বুক চিতাইয়া উন্নত-মস্তকে অকারণ পুলকে বেশ খানিকক্ষণ সে পদচারণ করিল।

আবার থামিল।

তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া হাতের পেশীগুলি ফুলাইয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল। পেশী অবশ্য বেশী ছিল না। কিন্তু যতটুকু ছিল ততটুকুই বা ফুলাইতে ক্ষতি কি !

...একটু শিস্ দিল।

যৎসামান্য গোঁফটুকুতে দুই-একবার তাও দিল !

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল প্লাটফর্মের ওধারটায় একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের পুষ্পিত ডাল প্লাটফর্মের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সে তখন সেই দিকে গেল এবং লাফাইয়া লাফাইয়া ডালটাকে ধরিয়া ফুল পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া কিছু ফুল পাড়িলও।

শ্রান্তদেহে একগোছা কৃষ্ণচূড়া ফুল লইয়া আবার সে মেয়েটির কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন আসিয়াছে।

কুলিটা স্যুটকেস ও চানাচুরের ঠোঙাগুলি একটা ফাঁকা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া চার আনা পয়সাই পাইল।

ছোকরা গাড়ীতে উঠিয়া জিনিস-পত্রগুলি ঠিকমত রাখিয়া আবার নামিয়া আসিল !

উপবিষ্ট তরুণীটির পানে একবার চাহিয়া দেখিল।

দেখিল তরুণীটিও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

গার্ড বাঁশী বাজাইয়া বিধিমত সবুজ নিশান নাড়িলেন।

ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল।

তখনও ছোকরা ট্রেনে ওঠে না।

ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশ বাড়িয়াছে তখন সে শেষ বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য সহাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নীচে, চাকার নীচে পড়িয়া গেল।

আর কিছু করিবার সুযোগ সে পাইল না।

জ্যোৎস্না

॥ এক ॥

সুন্দর জ্যোৎস্না।

পৃথিবীটাই অপার্থিব বলিয়া মনে হইতেছে। সমস্ত মন-খানি স্বপ্নলোকে মেঘের মত সঞ্চরমান। লঘুভাবে সব কিছু স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে; কোথাও থামিতেছে না, কোথাও যাইবারও তাড়া নাই। সময়ের স্রোত মন্থর-গতিশীল, আবিষ্ট ধীর মন্থরগতিতে সমস্ত সত্তাও ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাত্রি গভীর। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে বাতায়ন

পথে চাহিয়া আছি। সহসা স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া সশব্দে কপাটটা খুলিয়া গেল। টলিতে টলিতে একটি লোক প্রবেশ করিল। বগলে বোতল। বলিল—"এক্স্‌কিউজ্ মি—আমার নাম খৃষ্টচরণ খর্মকার! ভাজি দেখাব। আমি হাতি ঘোরাতে পারি। ইউ সি দিস্ ইজ্ এলিফ্যান্ট—নাউ সি বন্ বন্ বন্ বন্—" দুই হাতে বোতলটা ধরিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল। দারোয়ান ডাকিতে হইল।

অর্ধচন্দ্রীকৃত হইয়া কৃষ্ণচরণ কর্মকার চলিয়া গেলেন। স্বপ্নটি কিন্তু ভাঙিয়া গেল। কিছুতেই আর জোড়া লাগাইতে পারিলাম না। জ্যোৎস্নাকে জ্যোৎস্না ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিলাম না। মন লঘুতা হারাইয়া গুরু-গম্ভীর হইয়া পড়িল। অলক্ষ্যে বিধাতা বোধহয় হাসিলেন।

॥ দুই ॥

তাহার পর দিন।

সেদিনও জ্যোৎস্না। আগের দিনের মতই মনোরম জ্যোৎস্না। আজ দ্বিতলের ঘরে বসিয়া ছিলাম এবং পূর্ববৎ বাতায়ণ পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া স্বপ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। দূর দিগন্ত-রেখায় দিশাহারা মন কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। বাস্তব ও স্বপ্নের সীমা-রেখা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইতেছিল।

"বাবু—"

নীচে কে যেন ডাকিল। খৃষ্টচরণ নয় ত!

আজ যদি আসে ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে লোকটাকে।

"বাবু সাহেব—"

জড়িত কণ্ঠ!

জ্যোৎস্না চুলোয় গেল এবং আপাদমস্তক জ্বলিতে লাগিল।

"দারোয়ান—"

অপর একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল দারোয়ান বাজারে গিয়াছে।

তাহাকে বলিলাম—"দেখে আয় ত নীচে কে ডাকছে—"

সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরে আসিয়া হিন্দিতে যাহা বলিল তাহা এই—"একটা লোক বোতল বগলে দাঁড়িয়ে আছে!"

"টলছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ধাক্কা মেরে ফেলে দে ব্যাটাকে।"

যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম একটু পরে তাহাই ঘটিল। গুরুভার পতনের শব্দ ও একটা আর্তনাদ। খৃষ্টচরণের শিক্ষা হইল ভাবিয়া শান্তিলাভ করিলাম। স্বপ্ন কিন্তু টুটিয়া গেল। আজও বিধাতা হাসিলেন।

॥ তিন ॥

তৃতীয় রাত্রি।

আজও জ্যোৎস্না আকাশ-প্লাবিনী। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে মাঝে মাঝে তাহা লক্ষ্য করিতেছি। হাজত ঘরের জানালাটি অত্যন্ত ছোট—ভাল করিয়া দেখাও যাইতেছে না। স্বপ্নও একটা আছে কিন্তু তাহা উকিলের। গুঁফো পরেশবাবুর। পরেশবাবু সুদক্ষ আইনজীবী। ভাবিতেছিলাম তিনি আমাকে খালাস করিতে পারিবেন কি ? দ্বিতীয় রাত্রে আমার ভোজপুরী ভৃত্য যাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল সে খৃষ্টচরণ নহে। একটি ম্যালেরিয়া রোগী। তাহার বগলে যে বোতল ছিল তাহা এডওয়ার্ডস টনিকের। বিদেশী লোক। সম্ভবত রাত্রে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। ভোজপুরী-ধাক্কায় ক্ষুণ্ণচিত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এখন পরেশবাবুই একমাত্র ভরসা। শরীর মন কিছুই ভাল নাই। মনে হইতেছে জ্বর হইয়াছে। বিধাতার মুখে মৃদু হাসি।

॥ চার ॥

খালাস পাইয়াছি।

অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে এডওয়ার্ডস টনিকের বোতলে এডওয়ার্ডস টনিক ছিল না—মদই ছিল। পরেশবাবুও প্রমাণ করিয়াছেন যে লোকটা মদ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মদ জিনিসটাকে চিরকাল ঘৃণা করি। লোকটার মৃত্যুতে একটুও দুঃখ হইতেছে না। শরীরটা কিন্তু বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত হাজত বাস করিয়া। হাকিম কড়া লোক—কিছুতেই জামিন দিলেন না।

যে ডাক্তারটির চিকিৎসাধীন আছি তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আজও আকাশে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

সোচ্ছ্বাসে বলিলাম—দেখুন ডাক্তারবাবু, কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ !

বিস্মিত ডাক্তার বলিলেন—কই তেমন জ্যোৎস্না তো এখনও ওঠে নি !

বলিলাম—এইতেই কিন্তু আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

ডাক্তার বলিলেন—ক'দাগ ওষুধ খেয়েছেন আপনি ?

সবটা খেয়ে ফেলেছি !

সবটা ? সবটা কেন খেলেন ? একটু বেশী ডোজে ব্র্যান্ডি ছিল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় থৈ থৈ করিতেছে।

বিধাতা অট্টহাস্য করিতেছেন।

॥ পাঁচ ॥

দশ বৎসর পরে।

সর্বস্বান্ত হইয়াছি—যকৃতের দোষ এবং পেটে জল হইয়াছে।

অনুভূতিও আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণতালাভ করিয়াছে।

এখন দিবালোকেও জ্যোৎস্না দেখি।

বিধাতা গম্ভীর।

আকাশ-পাতাল

॥ এক ॥

কল্পনার লূতাতন্তু বাহিয়া মাঝে মাঝে আমরা এমন এক ঊর্ধ্বলোকে গিয়া উত্তীর্ণ হই, যেখানে সর্বপ্রকার অসম্ভবই সম্ভব এবং যাবতীয় মিথ্যাই সত্য। কল্পনার লূতাতন্তু কিন্তু ক্ষণ-ভঙ্গুর। সুতরাং অক্ষয় কল্পলোকবাস ঘটিয়া উঠে না। বাস্তবের মৃদুতম স্পর্শে লূতা ছিন্ন হয় এবং রূঢ় মৃত্তিকার স্পর্শলাভ করিয়া কল্পনাবিলাসীর স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়ন সচকিত হইয়া ওঠে। হইলও তাই। সুরমাকে ঘিরিয়া স্বপ্ন রঙীন হইয়া উঠিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াও গেল।

॥ দুই ॥

সুরমার সহিত তাহার মাত্র বছর দুই হইল বিবাহ হইয়াছিল। অধিকাংশ বাঙালীর জীবনে বিবাহ যে পদ্ধতিতে হইয়া থাকে তাহার বেলাতেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল—কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অর্থাৎ লেখা-পড়া শেষ হইতে না হইতেই পিতামাতা বিবাহের জন্য যথারীতি ব্যগ্র হইলেন। সেও যথারীতি একটু আধটু আপত্তি করিল এবং আপত্তিও যথারীতি টিকিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ নানাস্থান হইতে নানারূপ মেয়ের ফটো ও কোষ্ঠী লইয়া হাজির হইতে লাগিলেন। পণ লইয়া ভদ্রভাবে খানিকটা দর কষাকষি চলিল। অবশেষে পণ, কোষ্ঠী, রূপ, বংশ প্রভৃতির মোটামুটি একটা সামঞ্জস্য করিয়া একদিন সুরমার সহিত তাহার শুভ-বিবাহ সংঘটিত হইয়া গেল। প্রীতি-উপহার ছাপান হইল, শালপাতা পাতিয়া খাওয়ান হইল। দুইপক্ষের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দিন-কতক হৈ চৈ করিলেন, গোলমালে কিছু জিনিস-পত্রও হারাইল। দানসামগ্রী, বধূর রূপ, কন্যাপক্ষের ব্যবহার ও নজর প্রভৃতি লইয়া মামুলি মিঠেকড়া সমালোচনা দুই চারিদিন চলিল। অর্থাৎ যেমন হইয়া থাকে সব হইল।

॥ তিন ॥

সুরমাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। যে তরুণীটির হাসিতে মাণিক এবং কান্নায় মুক্তা ঝরিতেছে সে যে একান্তভাবে তাহারই, একথা বিশ্বাস করিতে ভয় করে কিন্তু লোভ হয়। প্রলুব্ধ মন প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া ওঠে। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই সুরমার রং লইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সে সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল—রংটাই কি সব ? সুরমার রংটা ফরসা নহে—তাহা সত্য, কিন্তু লজ্জিত নয়নের স্নিগ্ধ চাহনি, অকম্পিত অধরের আলজ্জিত আকুতি, অলক্তক-রঞ্জিত চরণ দুই-খানির সরম-মন্থর গমন-ভঙ্গিমা, এসব কি কিছুই নয় ? রংটাই সব ? সে চক্ষু বুজিয়া

ভাবিবার চেষ্টা করিল যদি সুরমার রংটা আর এক পোঁচ সাদা হইত—কিংবা যদি সে উজ্জ্বল গৌরবর্ণই হইত কি এমন তফাতটা হইত তাহা হইলে ? কিছুই না। শ্যামাঙ্গিনী সুরমাই তাহার নিকট অধিকতর মনোহারিণী। সুতরাং সে ক্রমাগত রাত্রি জাগরণ করিয়া দিবসে ঢুলিতে লাগিল। তাহার পর বধূ যখন বাপের বাড়ী চলিয়া গেল উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, সে কিছু রঙীন খাম ও চিঠির কাগজও কিনিয়া ফেলিল। অর্থাৎ সমস্তই যথারীতি পর পর ঘটিতে লাগিল।

॥ চার ॥

অবশেষে সেই অনিবার্য ঘটনাটিও ঘটিল। অকস্মাৎ একদিন তাহাকে উপলব্ধি করিতেই হইল যে, অবিলম্বে উপার্জন না করিলে আর চলে না। জীবন-শকটের চক্রগুলি তৈলাভাবে আর্তনাদ করিতেছে—অনতিবিলম্বে তৈল নিষেক করা প্রয়োজন, তা সে যে তৈলই হউক। পিতামাতারূপ যে যুগল পর্বতের অন্তরালে বসিয়া এতদিন নিশ্চিন্তচিত্তে প্রেমলিপি রচনা করিতেছিল, মহাকাল অতর্কিতভাবে সেই পর্বত দুইটিকে অপসারিত করিয়া লইলেন। অবারিতভাবে ঝড়-ঝাপটা ধূলি-ধোঁয়া আসিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রেমলিপি রচনায় কুশলতা প্রকাশ করিবার মতো আবহাওয়া আর মিলিল না। দরখাস্ত রচনার কৌশল আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত সে প্রাণপণে সচেষ্ট হইল এবং নানাভাবে বিনয় প্রকাশ করিয়া চতুর্দিকে আবেদন করিতে শুরু করিল।

চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে বেচারা নিশ্চয়ই পথভ্রান্ত হইত যদি ভগবান চাটুজ্যে মহাশয়ের মারফত কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ না করিতেন ! দূর সম্পর্কের আত্মীয় চাটুজ্যে মহাশয় কলিকাতার কোন সদাগরি আপিসের বড়বাবুর পদ অলংকৃত করিতেছিলেন। তিনিই দয়াপরবশ হইয়া তাহার চাকুরিটি জুটাইয়া দিলেন। বেতন মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা। কলিকাতায় গিয়া থাকিতে হইবে।

॥ পাঁচ ॥

অন্নসংস্থান হইল বটে কিন্তু কাব্য-সংস্থান হইল না। সুরমাকে লইয়া কাব্যলোক সৃজন করিতে হইলে যে পরিমাণ সাজসজ্জা আয়োজন উপকরণ দরকার তাহা পঁয়ত্রিশ টাকা আয়ে জোটান অসম্ভব। বিশেষতঃ খোলার ঘরে নিজের বিবাহিত পত্নীকে লইয়া কাব্য কোন কিছুতেই জমিতে চায় না। সুরমার যে হাসিতে মাণিক ঝরিত, সেই হাসি এখন যেন ফুটিতেই চায় না। যদিও বা ক্বচিৎ ফোটে তাহাও এমন বক্রভাবে যে তাহার সহিত মাণিকের উপমা দেওয়া অত্যন্ত সহৃদয় কবির পক্ষেও কঠিন। উপমা দিতে হইলে ছুরির সহিত দিতে হয়। সব দিক দেখিয়া শুনিয়া বেচারা হতাশ হইয়া পড়িল। চেষ্টার অবশ্য সে ত্রুটি করিল না। সাবান কিনিয়া দিল, ছিট কিনিয়া দিল, রঙীন শাড়িও দুই একখানা কিনিয়া আনিল। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল কিছুই হইল না। উপরন্তু শস্তা সাবান মাখিয়া সুরমার সর্বাঙ্গ খস-খস করিতে লাগিল এবং নয়ন কোণে

যে অশ্রু জমিয়া উঠিল তাহার সহিত মুক্তার সাদৃশ্য হয়ত থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু তাহা দেখিয়া কবিত্ব জাগে না এটা ঠিক। এক ধোপ দিবার পর শস্তা ছিট ও শাড়ীর রঙও উঠিয়া গেল এবং সুরমা একটু শ্লেষ ভরেই তাহাকে সে কথা জানাইয়া দিল।

মোট কথা রঙীন বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া গেল।

॥ ছয় ॥

সর্বাপেক্ষা মুশকিল হইল প্রতিবেশীটিকে লইয়া। তিনি বড়লোক, তাঁহার তিনতলা বাড়ী। শুধু তাই নয়, তিনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন সেই তরুণীটি সুরমার বাল্য সখী। এই নিদারুণ যোগাযোগ ঘটাতে যে সকল নিরীহ অথচ মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটিতে লাগিল তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। সুরমা অনিবার্য ভাবে সখীর ঐশ্বর্যের নানা পরিচয় পাইতে লাগিল। তাহার তিন সেট গহনা, বিচিত্র রঙের বহুপ্রকার কাপড়, মেহগিনি কাঠের ডবল বেড্‌, সুন্দর দেরাজ, আয়না-দেওয়া আলমারি! ক্রমাগত স্বামীর কাছে সে সেই ঐশ্বর্যেরই গল্প করিত। স্বামী বেচারা মনে মনে অতিষ্ঠ হইলেও মুখে বিশেষ কিছু বলিত না। কি বলিবে! তাহা ছাড়া চিরকালই সে স্বল্পভাষী।

॥ সাত ॥

একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া দেখিল সুরমা নাই। ঠিকা ঝি বলিল, যে সুরমা পাশের বাড়ীর বাবুদের সহিত তাহাদের নূতন-কেনা মোটরে চড়িয়া সিনেমা দেখিতে গিয়াছেন! দেখিল একটি বাটিতে খানিকটা হালুয়া ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। ঠাণ্ডা হালুয়াটুকু গলাধঃকরণ করিয়া দুই গ্লাস জল সে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ শিস্‌ দিল এবং অবশেষে সান্ধ্যভ্রমণ করিবার ছলে গোলদীঘির জনতার মধ্যে গিয়া খানিকটা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিল। বাড়ী ফিরিয়া আসিল যখন, তখন সুরমাও ফিরিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই সুরমা সিনেমা এবং সদ্য-ক্রীত মোটর প্রসঙ্গে যেরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল তাহাতে সে বেচারা আর কিছু বলিতে পারিল না—বলিতে ইচ্ছাই করিল না! তা ছাড়া বলিবারই বা ছিল কি!

॥ আট ॥

এই মোটরই শেষকালে কাল হইল। নূতন মোটর কিনিয়া মোটরের মালিকেরা স্বভাবতঃই একটু বেশী ঘোরাঘুরি করিতে ভালবাসেন। এই পরিভ্রমণে সুরমাও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে লাগিল। গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি নিকটের দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে তাঁহারা ত গেলেনই—সুরমাও গেল। ক্রমশঃ সখীর মোটরে চড়িয়া বেড়াইতে যাওয়াটা সুরমার দৈনন্দিন কার্যতালিকাভুক্ত হইয়া পড়িল। দরিদ্র স্বামী বেচারা পত্নীর এই সুখে বাধা দিতে পারিল না। চাহিলও না। সে দিন দিন আরও কেমন যেন নীরব হইয়া পড়িতেছিল।

হঠাৎ একদিন সুরমা আসিয়া সোৎসাহে বলিল—"ওগো শ্নছ, সইরা মোটর ক'রে মধ্পর যাচ্ছে। আমাকেও যেতে বলছে। যাব ওদের সংগে ? যাই, কেমন ?"

"মধ্পর ? সে যে অনেক দূর !"

ইহার বেশী আর সে বলিতে সাহস করিল না।

সুরমা বলিল—"সইদের বাড়ীর যে ঠাকুরটা আছে সে-ই তোমার আপিসের ভাত রে'ধে দেবে এ-ক'দিন। সই বলেছে—সে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আপিসের ভাতের ভাবনা ভাবছি না—সে ত হোটেল থেকেও হতে পারে। ভাবছি—"

সুরমা তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।

বলিল—"নিজেদের পয়সায় মধ্পর যাওয়া ত কোন দিনই হবে না। সইদের সংগে তব্ গিয়ে দেখে আসতাম !"

"সইদের মোটরে ত রোজই চড়ছ। ভাল লাগে রোজ রোজ চড়তে ?"

"ভাল লাগবে না কেন ? মোটর চড়তে খারাপ লাগে না কি কারো ? খ্ব ভাল লাগে আমার।"

কিছ্ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—"আচ্ছা যেও তা হলে !"

॥ নয় ॥

দিন সাতেক পরে সুরমা যখন মধ্পর হইতে ফিরিল তখন সে হাসপাতালে। শোনা গেল রাস্তায় অন্যমনস্কভাবে চলিতে গিয়া মোটর-চাপা পড়িয়াছে। বাড়ীতে সুরমা একটি ক্ষ্দ্র পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পত্রখানি এই—

"আমি তোমার অন্পয্ক্ত। তোমাকে ল্কাইয়া একটি আড়াই হাজার টাকার লাইফ্ ইন্সিওরেন্স করিয়াছিলাম। টাকাটা তুমিই পাইবে। তাহা দিয়া একখানা মোটর কিনিও—ইহাই আমার শেষ অন্রোধ।"

অন্রোধ কিন্তু রক্ষিত হইল না।

কারণ সে মরিল না—হাসপাতাল হইতে সারিয়া ফিরিয়া আসিল। নাকটা কিন্তু চুরমার হইয়া গিয়াছিল। নাকের স্থানে প্রকান্ড একটা গহ্বর ছাড়া আর কিছ্ রহিল না।

সুরমা আত্মহত্যা করিল।

সে এখন পাগল।

একটা প্রকান্ড সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে 'সুরমা' লিখিয়া সেটা গলায় ঝ্লাইয়া সে রাস্তায় রাস্তায় ঘ্রিতেছে। ওই যে !

কল্পনা-ল্তা-তন্তু এইবার ছিন্ন হইল।

বিগতনাসা লোকটি নিকটে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "'সুরমা' লিখে গলায় ঝ্লিয়ে বেড়াচ্ছ কেন ?"

"ও একরকম ন্তন শাড়ী বেরিয়েছে বাব্, এ তারই বিজ্ঞাপন। খ্ব ভাল শাড়ী বাব্—সিল্কের অথচ খ্ব সস্তা—নানারকম রঙের পাওয়া যায়—চমৎকার জিনিস—"

খোনা স্বরে সে শাড়ীর গ্ণবর্ণনা করিতে লাগিল।

প্রশ্ন করিলাম—"তোমার নাকে কি হয়েছিল ?"

"ঘা হয়েছিল বাবু !"

বলিয়া সে একটা বীভৎস হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

স্বপ্নলোকচ্যুত আমি অভিভূত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

চিঠি পাওয়ার পর

॥ এক ॥

সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না।

তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব এই আশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। যাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার যে তাহাকে দেখিতে পাইব এ কল্পনাও করি নাই। সে যে এ-পথে আবার আসিতে পারে তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। সে আসিতেছে এবং আমি তাহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমার বিগত স্বপ্ন-জীবন পুনরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে! যদিও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য, যদিও তাহার স্বামী সংগে থাকিবে, তথাপি এই ঘটনাকে আমার জীবনের বৃহত্তম ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। যত কম সময়ের জন্যই হউক এবং যে-ভাবেই হউক তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইব ত! তাহাই যে পরম লাভ। চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িলাম।

শ্রীচরণেষু,

উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ী পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পেঁছিবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেক দিন আপনাকে দেখি নি। দেখতে ইচ্ছে করে। আসবেন ত? আশা করি আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।

অমিতা

॥ দুই ॥

কিছুই ভুলি নাই।

অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি তাহাদের সমস্ত বর্ণসুষমা লইয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই দিনটির কথা যে-দিন অনেক ইতস্ততঃ করিয়া আশা-আশংকা উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে প্রথম প্রণয়-নিবেদন করিয়াছিলাম। মনে ভয় ছিল যদি সে ভুল বোঝে—যদি সে রাগ করে। কিন্তু সে কিছুই করে নাই। স্মিতমুখে সহজ ভাবে সে আমার নিবেদন শুনিয়াছিল। তাহার লজ্জারুণ কপোল, অকম্পিত অধর, আনন্দিত নয়ন—তাহার সেদিনকার সম্পূর্ণ আলেখ্যখানি আমার মনের

পরতে পরতে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। কখনও বিলুপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ সুখ মানুষের জীবনে বহুবার আসে না। আমার জীবনে একবার মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিবে না তাহাও জানি। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইবে। ভুলিলে চলিবে কেন! ভুলি নাই! এক দণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না। তোমাকে এ-জীবনে বহির্লোকে পাই নাই তাহা সত্য, কিন্তু আমার অন্তরলোকে যে-আসন তুমি অলংকৃত করিতেছ সে আসন এখনও অবিচলিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে। তুমি তো আমাকে চাহিয়াছিলে—সমস্ত প্রাণ দিয়াই চাহিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে লইতে পারিলাম কই? তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে হইল। আমার দুর্ভাগ্য দিয়া তোমাকে লাঞ্ছিত করিতে আমি কিছুতে পারিলাম না। আমার দুর্ভাগ্য আমি একাই বহন করিব। ইহাই আমার ললাটলিপি। তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন? তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

॥ তিন ॥

ভগবান বলিয়া কেহ আছেন হয়ত। এই নিখিল বিশ্বের কার্যকলাপ তাঁহারই অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এই ধারণা করিয়া নির্মম নির্যাতনের মধ্যেও আমরা কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি! তাহা না হইলে অসহায় মানব অকারণ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিত না! কে একজন মনীষী না কি বলিয়াছেন যে ভগবান যদি নাও থাকেন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একটা ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। মানুষের পক্ষে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক। আমিও আমার এই দুর্ভাগ্যটাকে অমোঘ বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। মানিয়া লইয়াছিলাম যে যিনি আমার স্বপ্ন-সৌধ-শীর্ষে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৃষিত-অধর-সমীপবর্তী সুধাপাত্রকে যিনি অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতে বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন তিনি করুণাময় পরমেশ্বরই। যাহা করিয়াছেন তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছেন। ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে আমরা যে শুধু অপারগ তাহাই নয়—অনধিকারী। নিরুপায় মন এই যুক্তি মানিয়াছিল। অমিতাকে ভালবাসিয়াছিলাম। অমিতাও আমাকে ভালবাসিয়াছিল। অমিতার পিতা-মাতার আপত্তি ছিল না। আমার দিকে পিতামাতাই ছিল না। তবু বিবাহ হইল না। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, হঠাৎ একদিন কাসিতে কাসিতে এক ঝলক রক্ত আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত শুনিয়াও অমিতা কিন্তু আমাকে চাহিয়াছিল। আমি কিন্তু পারিলাম না।

বিবেকে বাধিল।

॥ চার ॥

অমিতার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল।

অমিতার মত পাত্রী পড়িয়া থাকে না। সুন্দর স্বভাব, সুন্দর চেহারা, সুন্দর শিক্ষা। অমিতার মত মেয়ে বাংলা দেশে বেশী নাই। আমার চোখে ত আর একটাও পড়িল না। রূপসী শিক্ষিতা মেয়ে হয়ত অনেক আছে কিন্তু অমন মৃদু, অমন স্নিগ্ধ, অমন সুরভিত সুমিষ্ট স্বভাব ত আর কোথাও দেখিলাম না। অমিতার পিতামাতা অমিতার জন্য যে পাত্রটিকে নির্বাচিত করিলেন তিনিও অমিতার উপযুক্ত। বড় বংশের ছেলে, বড় চাকুরী করেন। স্বাস্থ্যবান সুরূপ ভদ্রলোক। কোন দিক্ দিয়াই কোন খুঁৎ নাই। আইনতঃ অমিতার সুখে থাকিবার কথা। হয়ত সুখেই আছে। কিন্তু কেন জানি না আমার অন্তরনিবাসী অবুঝ ব্যক্তিটির বিশ্বাস, অমিতা সুখে নাই। আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলেই বেশী সুখী হইত। যদিও আমি অমিতার স্বামীর অপেক্ষা সব দিক্ দিয়াই নিকৃষ্ট, তথাপি মনে হয় অমিতা এখনও মনে মনে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত যুক্তিহীন এই স্বপ্নটিকে আমি মনে মনে আঁকড়াইয়া আছি যে তাহার স্বামীর বড় বংশ, ভাল চাকুরী, সুন্দর রূপ, অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে ততটা সুখী নয়, যতটা সুখী সে হইতে পারিত যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম। হয়ত ইহা আমার অহমিকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অহমিকাটুকুকে আশ্রয় করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। সর্বগ্রাসী জলপ্লাবনে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকার ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু শুধু জাগিয়া আছে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিয়া আছি।..

আবার তাহার চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম।

॥ পাঁচ ॥

দেখা হইলে কি বলিব তাহাকে!

এতদিন পরে দেখা—পাঁচ মিনিটের জন্য! স্টেশনের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি তাহাকে বলিব! অথচ বলিবার কত কথাই মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিব কেমন করিয়া! হয়ত কিছুই বলা হইবে না। হয়ত অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্নের ভিতর দিয়াই এই অতিশয় মূল্যবান পাঁচটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবে। জীবনে হয়ত তাহার সহিত আর দেখাই হইবে না। হয়ত···সহসা মনে হইল তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম।

॥ ছয় ॥

সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের ডালমুট অমিতার বড় প্রিয়বস্তু ছিল। নানা স্থানে ঘুরিয়াও ঠিক সে রকম ডালমুট জোগাড় করিতে পারিলাম না। হয়ত এখানকার

জিনিস তাহার পছন্দ হইবে না। একজনকে ফরমাস দিয়াছি। সে আশ্বাস দিয়াছে সন্ধ্যা নাগাদ ভাল ডালমুট প্রস্তুত করিয়া দিবে। ডালমুট ছাড়া অমিতার জন্য আর যে কি লইয়া যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না।

*   *   *

জামা কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে।

মেসের চাকরটাও ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছে। নিজেই একটা জামা ও কাপড়ে সাবান দিতে বসিলাম। ময়লা জামা কাপড় পরিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব না।

*   *   *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মনে পড়িল কিছু গোলাপ-ফুল জোগাড় করিয়া লইয়া গেলে হয়। লাল নয়—সাদা গোলাপ। নরেনদের বাড়ীতে আছে—গেলেই পাইব। হাতঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও দেরি আছে। নরেনের বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম।

॥ সাত ॥

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নরেনদের বাড়ী হইতে যখন বাহির হইলাম তখন চতুর্দিক অন্ধকার। বড় বড় সাদা গোলাপগুলি অতি সুন্দর। অমিতা নিশ্চই খুশী হইবে। ফুলগুলি পাইতে কিন্তু দেরি হইয়া গেল। নরেন বাড়ী ছিল না, মালীটাও বাহিরে গিয়াছিল। রাস্তায় নামিয়া হাতঘড়িটা আর একবার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। যে লোকটাকে ডালমুটের ফরমাস দিয়াছিলাম সে এখান হইতে কিছু দূরে একটা গলির মধ্যে থাকে। গেলাম সেখানে।

॥ আট ॥

স্টেশন।

নানা ধরনের যাত্রী নানা ধরনের জিনিসপত্র লইয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছে। ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্যমনস্কভাবে প্লাটফর্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা বেদনাময় অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? একজন রেলওয়ে-কর্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসিবার আর কত দেরি আছে।

তিনি নির্বিকার ভাবে বলিলেন—"সে ট্রেন ত আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। এ অন্য ট্রেন আসছে। এখন ত সাড়ে ন'টা!"

সে কি!

নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিলাম।

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে!

সহসা মনে হইল আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই! অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দিবা দ্বিপ্রহরে

॥ এক ॥

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

দারুণ দ্বিপ্রহর। খর রৌদ্র চতুর্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। সাধারণত এ সময়ে লোকে ঘরের বাহির হয় না। আজ কিন্তু একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাই এত লোকের ভিড়! আজ সকালে হারু ঘোষের পুত্রকে দংশন করিয়া যে সাপটা নিকটস্থ ইটের গাদার ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিল, সেটা মারা না পড়িলেও ধরা পড়িয়াছে। বিশু বাগ্দী সাবধানে ইট সরাইয়া সাপের লেজের দিকটা শুধু যে দেখিতে পাইয়াছে তাহা নয়, বল্লম দিয়া গাঁথিয়া সাপটাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে। দেখিবার মত দৃশ্য বটে! গ্রামের সমস্ত লোক সভয়বিস্ময়ে দেখিতেছে। সিদ্ধমনস্কাম বিশু বাগ্দী সগর্বে জাহির করিতেছে যে এমন মোটা এমন লম্বা এমন ফণা ও গর্জন-বিশিষ্ট গোক্ষুর-সর্প সে আর কখনও দেখে নাই। সত্যই সর্পটি ভয়ংকর।

॥ দুই ॥

একটু দূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জনৈক ব্যক্তি খানিকটা ছাতু খাইতেছিল। ভিড়ে যোগদান করে নাই। লোকটির চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন। পরিধানে একটা ময়লা হাফ-প্যাণ্ট এবং একটা ময়লাগোছের ফতুয়া। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়িতে ছাতু লাগিয়া চেহারাটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়াছে। নিতান্ত নিরুৎসুকভাবে আপন মনে সে ভোজন করিতেছিল। এমন সময়ে ভিড়ের ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া জনতার দিকে সে কিছুক্ষণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর কি মনে করিয়া একটু হাসিল এবং অবশেষে উঠিয়া ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবখানা—ব্যাপারটা কি দেখাই যাক না! ভিড়ের নিকটে গিয়া একজন লোককে প্রশ্ন করিল, এখানে এত ভিড় কিসের?

গোখরো সাপটা ধরা পড়েছে—

কোন্ গোখরো-সাপ?

যে গোখরো-সাপটা ন্যাপলাকে আজ সকালে কামড়েছিল।

ন্যাপলা কে?

হারু ঘোষের মেজছেলে।

তাই নাকি ? বেঁচে আছে এখনও ?

বেঁচে আছে এখনও। ডাক্তারবাবু এসে তিন চারটে বাঁধন দিয়ে কেটেকুটে কি সব ওষুধপত্তর লাগিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা কিন্তু খারাপ।

ডাক্তারিতে কিছু হবে না, কিৎসু হবে না।—বলিয়া আগন্তুক সহাস্যে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল।

ভিড়ের লোকটি বলিল, না হ'লেই বা উপায় কি ?

বিস্ফারিতনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া আগন্তুক বলিল, উপায় কি ? আলবৎ উপায় আছে। মন্তর ঝাড়ব আর উঠে বসবে। চালাকি নাকি ? কই দেখি, সাপটা কোথায় ? ডাক ন্যাপলাকে।

॥ তিন ॥

দেখিতে দেখিতে জনতা সাপ ছাড়িয়া আগন্তুককে লইয়া পড়িল! দ্রুতবেগে রটিয়া গেল একজন মস্ত গুণী ওঝা আসিয়াছেন। হারু ঘোষকে খবর দিতে লোক ছুটিল, এবং খবর পাইবামাত্র তিনি সর্পাহত পুত্রটিকে লইয়া ব্যস্তসমস্তভাবে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল, পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

তৎক্ষণাৎ পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল।

এইবার সাপটাকে ছেড়ে দাও।

বিশু বাগ্দী বলিল, ছেড়ে দিলে ফের যদি ছুটে গিয়ে কামড়ায় কাউকে ?

কামড়াবে ? আচ্ছা, আমি ধরছি, খুলে নাও তুমি বল্লম। কামড়াবে, চালাকি নাকি ?

নির্ভয়ে আগাইয়া গিয়া আগন্তুক সাপটাকে ধরিল। ধরিবামাত্র সাপটা সগর্জনে তাহার ডান হাতে একটা ছোবল বসাইয়া দিল। ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আগন্তুক বাম হাতে সাপটাকে ধরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, খুলে নাও বল্লম।

একটু ইতস্তত করিয়া বিশু বাগ্দী অবশেষে বল্লমটা খুলিয়াই লইল। সাপটা আগন্তুকের বাম হাতে দংশন করিল এবং বহু পাকে সমস্ত হাতখানা বেষ্টন করিয়া ধরিল। আগন্তুকের সমস্ত মুখে অদ্ভুত হাসি। ছাতু-মাখা খোচা খোচা গোঁফদাড়ি ভেদ করিয়া বিকট একটা অট্টহাস্য চতুর্দিক কাঁপাইয়া তুলিল।

রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও, চুমু দাও একটা আমাকে—

ক্রুদ্ধ বিষধর তাহার এ অনুরোধ রক্ষা করিল।

তৎক্ষণাৎ গণ্ডদেশে একটা করাল চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

॥ চার ॥

সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নাই। উত্তেজিত জনতা কলরব করিতেছে। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।

দারোগা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া আগন্তুকের মুখটা ভাল করিয়া অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, একেই তো আমরা খুঁজছি।

শোকার্ত হারু ঘোষ বলিলেন, এ কে বলুন তো ?

এ একটা পাগল। পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। একে ধরবার জন্যে চারিদিকে ফোটো পাঠিয়ে হুলিয়া করা হয়েছে।

বিশু বাগ্দী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। তিক্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, পাগল নয় কে ? সবাইকে ধ'রে পাগলা-গারদে পুরুন আপনি হুজুর ! ছি ছি ছি ছি ! কি কাণ্ড !

* * *

অন্ধকার ঘনীভূত হইতে জনতা ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

পরিবর্তন

॥ এক ॥

খেজুর গুড়ের সন্দেশ খাইয়া সমস্ত মুখটা তিক্ত হইয়া গেল। অথচ সন্দেশগুলা ভালই ছিল।

গোড়া হইতে শুনুন তাহা হইলে।

* * *

হরিমোহন বড়লোক ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে না ইহা জানিতাম। অর্থদ্বারা যতটা চিকিৎসা ক্রয় করা সম্ভব তাহা ক্রয় করা হইবে, হইতেওছিল। দুইজন কৃতবিদ্য নাম করা ডাক্তার প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া হরিমোহনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। দুইজন নার্স আসিয়া হয়তো তাহার শুশ্রূষার ভারও লইতেন, কিন্তু সরমা—হরিমোহনের স্ত্রী, তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজেই সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সেবা-নিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে সেবার কোন ত্রুটি হইতেছে না। বেতনভোগী নার্স এতটা করিত কিনা সন্দেহ।

রোগটি কিন্তু সাংঘাতিক,—যক্ষ্মা। মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, প্রত্যহ জ্বর হইতেছে। কফ পরীক্ষা করানো হইয়াছিল—যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পয়সার জোরে সুচিকিৎসা হয়তো হইবে, কিন্তু সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বরং তাহার জীবননাট্যের যবনিকা-পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এই কথাই বারম্বার মনে হইতেছিল।

হরিমোহন আমার বাল্যবন্ধু। ক্লাসে উভয়ে পাশাপাশি বসিতাম এবং সেই সূত্রে যে ঘনিষ্ঠতাটুকু বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল, কেন জানি না, এখনও তাহা অটুট আছে। না থাকিবারই কথা। ধনী ও দরিদ্রের প্রেম বড় ভঙ্গুর। আমাদের কপালে কেন যে তাহা টিকিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। যাই হোক, রোজ তাহার খবরটা লইতে যাইতাম। আরও বিশেষ করিয়া যাইতে হইত, এই জন্য যে, অর্থ এবং পত্নী ব্যতীত হরিমোহনের আপন বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। গুড় থাকিলে অবশ্য পিপীলিকার অসম্ভাব হয় না। বহু পিপীলিকা আনাগোনাও করিতেছিল, কিন্তু যেই ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গেল যে হরিমোহনের ব্যাধিটি যক্ষ্মা, অমনই পিপীলিকার দল ক্রমশ অন্তর্ধান করিল। সম্ভবত অন্য গুড়ের গুদামের সন্ধানে গেল। আমি একা পড়িলাম। সরমার সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে যে লৌকিক আলাপটুকু ছিল, এই সূত্রে তাহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, না হইলেই ভাল ছিল।

॥ দুই ॥

হরিমোহন বসিয়া কাশিতেছিল।

যক্ষ্মার বুক-ফাটা কাশি!

কাশিটা থামিলে বলিল, থ্রোটটা বড্ড খারাপ হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে লাগিয়ে আর গার্গল ক'রে ক'রে তো হয়রান হয়ে উঠলাম। কাশিটা কিছুতে কমছে না কেন বল্‌ দেখি!

বলিলাম, কমবে কমবে—এত ঘাবড়াস কেন?

—ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই! তবে কি জানিস ক্রমাগত কাশাটা বিরক্তিকর।—দুইটা কথা বলিতে না বলিতেই আবার কাশিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ।

হরিমোহন বলিল, স্পিউটাম একজামিন ক'রে কিছুই পাওয়া যায় নি, শুনেছিস তো? যাবে না, তা আগেই জানতাম। এক্‌টা ইনফ্লুয়েঞ্জার অ্যাটাক হয়েছে আর কি।

এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া সরমা প্রবেশ করিল।

কাশি শেষ করিয়া হরিমোহন বলিল, ও কি আবার?

—দুধ।

—এখন আবার দুধ কেন?

— ডাক্তারেরা ব'লে গেছেন দুধ দিতে যে।

— কি মুশকিল, একটু বিশ্রাম দাও আমাকে তোমরা। এই তো—। আবার কাশি শুরু হইল।

সামলাইয়া সে বলিতে লাগিল, এই তো কিছুক্ষণ আগে ওষুধ খেলাম, তারপর গার্গল, তারপর স্প্রে, তারপর ফলের রস—আবার এখনই দুধ!

—ডাক্তাররা বলেছেন, ভাল ক'রে খাওয়া দাওয়া করলেই শিগ্‌গির সেরে উঠবে! বেশি দুধ তো আনি নি! নাও।

সরমা পেয়ালাটা সম্মুখে ধরিল।

দুই চুমুক খাইয়া হরিমোহন বলিল, আর না, দোহাই তোমার, জায়গা নেই আর পেটে—

—না না, খেয়ে নাও এটুকু। বলুন না আপনি একটু।

আমিও অনুরোধ করিলাম।

—আচ্ছা, আর এক চুমুক খাচ্ছি তোর অনুরোধে।

আধ পেয়ালার বেশি সে কিছুতেই খাইল না।

সরমা পেয়ালাটা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। রাত হইয়াছিল। সরমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতে হইবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, টেম্পারেচারের কথাটা হরিমোহনকে যেন জানানো না হয়। হরিমোহনকে বলিলাম, নটা বেজে গেছে। আজ উঠি ভাই। কাল আবার আসব।

—আচ্ছা।

হরিমোহন পাশ ফিরিয়া শুইল।

॥ তিন ॥

পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধটা পান করিতেছে। বলিলাম, এ কি করছেন আপনি?

ধরা পড়িয়া গিয়া সরমা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরক্ত মুখে বলিল, ও কিছু নয়।

তারপর সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল, দেখে যখন ফেলেছেন, উপায় নেই। কিন্তু বলবেন না কাউকে।

—তা না হয় বলব না। কিন্তু এঁটো দুধটা খাচ্ছেন কেন?

একটু হাসিয়া সরমা বলিল, স্বামীর এঁটো খেলে দোষ কি?

দোষ কি!

যক্ষ্মার সংক্রামকতা সম্বন্ধে আমার যতটা জানা ছিল বলিলাম। সরমা আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিল, তাহার পর সহসা প্রদীপ্ত এক জোড়া চোখ আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, সবই তো বুঝলাম, কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে? উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও একটা যদি থাকত তা হ'লেও বা কথা ছিল!

অনেক হিতকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বলিলাম। আনতমস্তকে হাসিমুখে নীরবে সে সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রতিবাদ পর্যন্ত করিল না।

॥ চার ॥

হরিমোহনের অসুখ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। তাহার যে যক্ষ্মা হইয়াছে, এ সংবাদ তাহার নিকটও আর চাপা রহিল না। সে জানিতে পারিল এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে দুইজন ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্যস্ত হইলেন এবং আরও দুই জন ডাক্তারকে

পরামর্শার্থে ডাকিলেন। চারি জনে মিলিয়া ঠিক হইল যে, কয়েকটি এক্সরে প্লেট লওয়া দরকার। তাহাও যথাসময়ে হইল। এক্সরে করিয়া দেখা গেল একটি ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অপরটি একেবারে নির্দোষ আছে। স্যানাটোরিয়মে গিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করাইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে হরিমোহন ধরমপুর চলিয়া গেল। সুরমাও সঙ্গে গেল।

॥ পাঁচ ॥

ইহার পর অনেক দিন হরিমোহনের খবর পাই নাই। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালিখি হইয়াছিল, তাহাও কালক্রমে থামিয়া গেল। হরিমোহন পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে, ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হরিমোহন সম্বন্ধে কৌতূহলও ক্রমশ কমিয়া গেল, হরিমোহনও বিশেষ খবর লইল না। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম, হরিমোহন সুইটজারল্যান্ড যাত্রা করিয়াছে। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, টাকা আছে যাইবে না কেন!

নিয়মিতভাবে কেরানিগিরি করিতে লাগিলাম। আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের খবর লইবার অধিকার আমার নাই, সুযোগও ছিল না। হরিমোহন কোন ঠিকানা দিয়া যায় নাই।

॥ ছয় ॥

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হরিমোহনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন তাহার পত্র পাইলাম। দুইছত্র চিঠি।—

ভাই নরেশ,

আগামী মঙ্গলবার কলিকাতায় পেঁাছিব। পার তো দেখা করিও।

হরিমোহন

দেখিলাম চিঠিখানা লিখিয়াছে দেশের ঠিকানা হইতে। কবে দেশে আসিল সে। কিছুই তো জানি না।

* * * *

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর আপিস ফেরত তাহার বাসায় গেলাম। সে বাড়িতেই ছিল। খুব ঘটা করিয়া আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। হরিমোহনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুস্থ সবল লম্বা চওড়া চেহারা। কে বলিবে ইহার যক্ষ্মা হইয়াছিল!

বলিলাম, বেশ সেরে গেছিস তো?

—হ্যাঁ, কমপ্লিটলি!

যে যে ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে নিরাময় হইয়াছে, তাহাদের গল্প করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—সুইট্‌জারল্যাণ্ড গেছলি না কি ?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগল ?

—অতি চমৎকার ! কেতাবে যা পড়া যায় তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুন্দর। চল চল, ওপরে চল।

উপরে গেলাম। উপরে গিয়াই হরিমোহন চীৎকার জুড়িয়া দিল, সরমা কই, নরেশ এসেছে—চা জলখাবার আন—ব'স ব'স।

দামী সোফাটার উপর একটু সন্তর্পণেই বসিলাম।

হরিমোহন বলিতে লাগিল, তারপর তোর খবর কি বল ! তুই তো অনেক বদলে গেছিস দেখছি। কানের কাছের চুলগুলো যে বেবাক পেকে গেছে রে ! এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেলি ! ওদেশে পঞ্চাশ বছরে যৌবন শুরু হয়—বুঝলি ?

'শুরু' কথাটার উপর সে জোর দিল।

আমার যে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে এবং ডাক্তার যে আমারও টি. বি. সন্দেহ করিতেছে, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না, বলিয়া লাভ নাই। কেবল বলিলাম, ওদেশে এদেশে ঢের তফাৎ রে ভাই ! তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস কেন ? সেই বিশ বছর বয়স থেকে এক নাগাড়ে কেরানিগিরি ক'রে চলেছি—দম নেবার অবসর নেই।

—তাতে কি হয়েছে ? খাটলে কি মানুষ রোগা হয় ?—বলিয়া হরিমোহন হা হা হাসিয়া উঠিল। ঘর-কাঁপানো হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

সরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে জলখাবারের প্লেট।

সরমাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্তন হইতে পারে !

আমার ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত সরমা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

—চা-টা নিয়ে আসি !

জলখাবারের প্লেটটা সামনের তেপায়াটার উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে এ !

হরিমোহনকে বলিলাম, সরমাকে ত একদম চেনা যায় না ! এই দশ বৎসরে ভীষণ বদলে গেছে দেখছি।

হরিমোহন স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, হ্যাঁ, বদলে গেছে। তুই যাকে দেখেছিলি এ সে নয়—এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি. বি. হয়েছিল। দুটো লাংসেই ! কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, শেষটা ইন্‌টেসটাইনও খারাপ হয়ে গেল। অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। হরিমোহনই আবার কথা বলিল।

—থাকতে পারলাম না—দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে হ'ল। খ‍ুঁজে খ‍ুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে বার করলাম শেষে। ও নামটা ম‍ুখস্থ হয়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আর ফিরবে না জানি, তব‍ু নামটার—

থামিয়া গেল। সরমা দ্বারপথে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে। হরিমোহনের দিকে নানার‍ূপ খাদ্যপ‍ূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল, অত আমি খাব না। কত দিয়েছ আমাকে!

শ‍ুনিলাম সরমা বলিতেছে, ডাক্তারে তোমাকে খেতে বলেছে ভাল ক'রে। আজকাল তুমি খাচ্ছ না মোটে। একটু ব'লে যান তো আপনার বন্ধ‍ুকে।

হরিমোহন বলিল, নরেশের জন্যে খেজ‍ুরে গ‍ুড়ের সন্দেশ আনিয়েছ তো? ভারি ভালবাসে ও খেজ‍ুরে গ‍ুড়ের সন্দেশ খেতে!

—হ‍্যাঁ, এই যে আনিয়েছি।

হাসিয়া এক প্লেট খেজ‍ুরে গ‍ুড়ের সন্দেশ সে আমার দিকে আগাইয়া দিল।

হাসির গল্প

॥ এক ॥

খ‍ুব ছোট ছোট করিয়া মাথার চুল ছাঁটা, স্থানে স্থানে মাংস বাহির করা। ইহার উপর মাথা ও কপাল বেষ্টন করিয়া কয়েক ফেরতা টোয়াইন্ জাতীয় স‍ুতা বেশ জোরে বাঁধা থাকাতে রগের শিরাগ‍ুলি স্ফীত এবং চক্ষ‍ু দ‍ুইটি লাল। এইখানেই বিসদ‍ৃশতার শেষ হয় নাই। রোমশ নাসারন্ধ্রে কফ ও নস্য মিলিয়া দ‍ৃষ্টি-কটুতার স‍ৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহা কয়েক দিনের না কামানো দাঁড়িগোঁফের সহযোগে যে চিত্রটি স‍ৃজন করিয়াছে তাহা মাধ‍ুর্যময় নহে।

বারান্দায় একটি শিশ‍ু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। ঘরের ভিতর আর একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত।

কৃত্তিবাস, ওরে কিতে—

রক্তচক্ষ‍ু তুলিয়া ভদ্রলোক দ্বারের দিকে চাহিলেন।

—কিতে—

কৃত্তিবাসের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

উচ্চতর কণ্ঠে প‍ুনরায় ডাকিলেন—কিতে।

কেহ আসিল না।

সগর্জনে—ওরে শালা কিতে—

গর্জনে রোগশয্যায় শায়িত মেয়েটির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেও কাঁদিতে লাগিল। ক্ষীণ-স্বরে একটানা ধরনের কান্না। বারান্দার শিশ‍ুটি আগে হইতেই কাঁদিতেছিল। এ ক্ষীণ কণ্ঠে নয়, জোরেই। দ‍ুইপ্রকার ক্রন্দনের প্রভাবে ভদ্রলোক আরও যেন চটিয়া গেলেন। কণ্ঠস্বর অসম্ভব রকম চড়াইয়া ক্ষেপিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন—কিতে—কিতে, কিতে—ওরে শালা।

ফলোদয় হইল।

ঝিকে আসিল না বটে, আসিলেন হরিদ্রালাঞ্ছিতবসনা স্থূলাঙ্গিনী একটি মহিলা। তাহাতেই ফল ফলিল। ভদ্রলোক অকস্মাৎ অত্যন্ত নরম হইয়া গেলেন এবং অপ্রতিভভাবে মিটমিট চাহিতে লাগিলেন। মহিলাটি কিন্তু কিছুমাত্র নরম এবং কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া রোষ-কষায়িত লোচনে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটি হাত কোমরে দিয়া অপর হস্তটি আস্ফালন করত সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপারখানা কি, পাড়া যে মাথায় তুলেছ!

আমতা আমতা করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, গরম জলটা—

—গরম জলটা! আমার কি দশখানা হাত!—

—তোমাকে ত বলিনি, ঝিকে কোথা গেল!—

—ঝিকে গেছে বাজারে—

—সকালে তাকে একবার বাজার পাঠিয়েছিলে না?

—আবার পাঠিয়েছি।

—ও!—

ইহার বেশী আর কিছু বলিতে ভদ্রলোক ভরসা করিলেন না। এমন সময় স্বয়ং কৃত্তিবাস আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল এবং বলিল—পাঁচফোড়ন এনেছি মা।

ভদ্রলোক আরক্ত নয়ন দুইটি কৃত্তিবাসের কুণ্ঠিত নয়নে স্থাপিত করিতেই কৃত্তিবাস বলিল, জল এখুনি করে আনছি বাবু, হয়ে গেছে বোধ হয় চড়িয়ে দিয়ে এসেছি—

কৃত্তিবাস চলিয়া গেল। মহিলাটি বাহির হইয়া গেলেন ও যাইবার সময় বারান্দার ক্রন্দন-নিরত শিশুটির পৃষ্ঠে দুম দুম করিয়া কয়েকটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিলেন—খালি বায়না, খালি বায়না—খালি বায়না! পোড়ারমুখো মেয়ে হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে আমার!

ক্রন্দন ঘোরতর হইয়া উঠিল। রুগ্না মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল—বড্ড মাথা ব্যথা করছে বাবা!

স্ত্রীর যে রণচণ্ডী মূর্তি এইমাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে এখন কিছু বলা সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নিজেই উঠিয়া গিয়া টেম্পারেচারটা লইলেন। দেখিলেন জ্বর বাড়িয়া ১০৫ হইয়াছে। খানিকক্ষণ থার্মোমিটারটার পানে নিবদ্ধদৃষ্টি থাকিয়া হরিহরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন।

—পাশ ফিরে শো, চেঁচাস নি!

পাঁচ ছয় বছরের মেয়েটি পাশ ফিরিয়া শুইল।

দুয়ারে কড় কড় শব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল। হরিহর কপাট খুলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই দেখিলেন—মুদি বিল আনিয়াছে।

বলিলেন—পরশু দেব, আজ হাতে কিছু নেই।

কটূক্তি করিয়া লোকটা চলিয়া গেল।

—জল এনেছি বাবু—

পিছন ফিরিয়া হরিহরবাবু দেখিলেন কেৎলিহস্তে কুণ্ঠিত কৃত্তিবাস দাঁড়াইয়া আছে।

—গামলা-টামলা আন—

কেৎলি নামাইয়া কৃত্তিবাস চলিয়া গেল এবং একটা বড় গোছের গামলা ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। হরিহরবাবু নিজেই ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত দিয়া দেখিলেন উত্তাপ মনোমত হইয়াছে কিনা। দেখিলেন—হয় নাই। পুনরায় খানিকটা গরম জল ঢালিতে যাইতেছিলেন এমন সময় অসুস্থ মেয়েটি বমি করিতে শুরু করিল।

—ওরে কিতে—দেখ তুই ওকে—

কৃত্তিবাস মেয়েটিকে সামলাইতে লাগিল। হরিহরবাবু ঠাণ্ডা জল গরম জল ঠিক মত মিশাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন, ওকে শুইয়ে দে। এইবার তুই আমার ছোট টেবিলটা আর কাগজ কলম দিয়ে যা ত!

হরিহরবাবু একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া গরম জলে পা দুইটি ডুবাইয়া ফুটবাথ লইতে লাগিলেন। কৃত্তিবাস কাগজ কলম দোয়াত ও ছোট টেবিল দিয়া গেল।

চেয়ারের ছারপোকাগুলি কামড়াইতে শুরু করিয়াছে, পাশের গলিটাতে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে, বারান্দায় ক্রন্দনরোল সমানে চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। হরিহরবাবু বামহস্তে রগ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজই লিখিয়া দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাগাদা দিয়াছেন, নিজের তাগাদাও প্রবলতর। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিহরবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।

ব্যতিক্রম

॥ এক ॥

স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, উপার্জন করিতেছে, অথচ বিবাহ করে নাই, এহেন সুরেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বিশেষ কিছু বলে না, খালি একটু হাসে।

বহু অর্থবোধক ছোট্ট হাসিটুকুর বিশেষ কোন তাৎপর্য বোঝা যায় না। পিতামাতা হার মানিয়া বহুদিন পূর্বেই স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। এখন জোরজবরদস্তি করিয়া বিবাহ দিবার মত নিকট আত্মীয় কেহ নাই। হালকাভাবে চেষ্টা করিয়া বন্ধুবান্ধবগণও হাল ছাড়িয়াছেন। দুই একজন পিতা, কন্যার পিতা বলিয়াই এখনও হতাশ্বাস হন নাই, নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টাতেও সুরেনের কৌমার্যব্রত ভঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইদানীং সে এই জাতীয় পত্রের উত্তর দেওয়া পর্যন্ত ছাড়িয়াছে। কারণ সোজা 'না' উত্তরেরও মিনতিপূর্ণ প্রত্যুত্তর আসে এবং তাহারও উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়। সুতরাং ও বিষয়ে সে আর অকারণ সময় এবং অর্থ নষ্ট করিতে রাজি নয়। কয়েকদিন পূর্বে এইরূপ একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তাহার এক পরিচিত ব্যক্তির মারফৎ তাহাকে ধরিয়াছিলেন। মেয়েটি আই. এ. পাস, দেখিতে ভাল, গান-বাজনা আদব-কায়দা রন্ধনবিদ্যা গৃহকর্মাদি সর্ববিষয়েই পারঙ্গমা। পরিচিত ব্যক্তি বর্ণনা শেষ করিয়া বলিলেন, এক কথায় তোমারই উপযুক্ত।

সুরেন তাহার সেই হাসিটি হাসিল।

—হাসছ যে !

আর একটু হাসিয়া বলিল, হাসছি আপনার আক্কেল দেখে ! যার নিজেরই খেতে কুলোয় না, তার আবার বিয়ে !

—দেড়শো টাকা মাইনে পাচ্ছ, খেতে কুলোয় না কি রকম ?

সুরেন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, কোন রকমে কুলিয়ে যাচ্ছে আমার একার। আর একজন এবং তার সঙ্গে বহুজনের সম্ভাবনা, কুলোবে না। তা ছাড়া হাল-ফ্যাশানদুরস্ত মেয়ের—

কথাটা সে সম্পূর্ণ করিল না, কিন্তু মনের ভিতর ধারণাটা তাহার সম্পূর্ণই আছে। আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চধারণা নাই তাহার। সে প্রাচীনপন্থী। আজকাল খবরের কাগজের কল্যাণে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয় না, ভয় হয়। মহাভারত রামায়ণে পুরুষ-দুঃশাসন, পুরুষ-রাবণ ছিল, এখনও তাহারা অবশ্য আছে। কিন্তু স্ত্রী-দুঃশাসন, স্ত্রী-রাবণের আমদানিটা বোধহয় আধুনিক। মাসিক মাত্র দেড় শত টাকা আয় লইয়া ইহাদের সহিত পাল্লা দিবার স্পর্ধা তাহার নাই। এই তো কয়েকদিন আগে সে খবর পাইয়াছে, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বি. এ. পাস বউ ভ্যানিটি-ব্যাগটি মাত্র সম্বল করিয়া কোথায় উধাও হইয়াছে। কানাঘুষা যাহা শুনা যাইতেছে, তাহা গৌরবজনক নহে। কোন এক আর্টিস্টের সঙ্গে নাকি—

সুতরাং ও পিছল-পথে সে পা বাড়াইবে না। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে নিজেকে লইয়া। মনের মধ্যে ক্ষুধিত কামনা একটা তপ্ত তীরের মত বিঁধিয়া আছে, সেটাকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ—

ভাবিয়া কোন কূলকিনারা মেলে না। এই ভাবেই চলিতেছিল।

॥ দুই ॥

সুরেন থাকে পশ্চিমের একটি শহরে। শহরের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে তাহার ছোট বাসাটি। বাসায় থাকিবার মধ্যে আছে বৃদ্ধ ভৃত্য হুকরু আর একটি বাইক। হুকরু রাত্রে বাড়ি চলিয়া যায়, বাইকটি বারান্দায় ঠেসানো থাকে। দুই বেলা খাইবার সময় পাড়ার একটি অজ্ঞাতকুলশীল কুকুর আসিয়া উঠানে থাবা পাতিয়া উন্মুখ হইয়া বসে। গভীর রাত্রে সংগোপনে একটি বিড়ালও যাতায়াত করে। মাঝে মাঝে দুই একজন কন্যাদায়গ্রস্ত লোক অথবা ওই জাতীয় কেহ আসেন। এতদ্ব্যতীত সুরেনের বাসাটিতে অপর বিশেষ কাহারও গতায়াত নাই। তাহারা কারণ, বোধহয়, সুরেন লোকটি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাপ্পাগোছের শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি। সাধারণ লোকের সঙ্গে কেমন যেন তাহার মেলে না। অপরিচিত প্রতিবেশীদের বৈঠকখানায় অনাহূতভাবে গিয়া দাদা খুড়া মেসো পাতাইয়া হুঁকাহস্তে তাসের আড্ডা গুলজার করিবার মত স্বভাব তাহার নয়। সে একটু মুখচোরা স্বভাবের লোক এবং সম্ভবত একটু অহঙ্কারীও।

নিছক ডিগ্রীর জোরেই চাকুরিটি মিলিয়াছে।

॥ তিন ॥

হেমন্তের শুক্লা দ্বাদশী।

অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়া চাঁদ উঠিতেছে। আপিস হইতে প্রত্যাগত সুরেন জলযোগ সমাপনান্তে তাহার প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতে যাইতেছে, এমন সময় একটি গাড়ি আসিয়া বাড়ির সম্মুখে থামিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সেদিকে চাহিয়া সুরেনের ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। কারণ গাড়ি হইতে যিনি অবতীর্ণা হইলেন, তিনি একজন তরুণী, রীতিমত আধুনিকা একজন। হস্তে ভ্যানিটি-ব্যাগ, চোখে চশমা, পায়ে হাই-হীল জুতো। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সহাস্যে তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনার নামই বোধহয় সুরেনবাবু ?

প্রতিনমস্কার করিয়া সুরেনকে সত্য কথাই বলিতে হইল।

সুরেনের সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া তরুণীটি হাসিয়া বলিলেন, আমি হচ্ছি আপনার বন্ধু ললিতবাবুর স্ত্রী।

স্তম্ভিত সুরেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিবার জন্য তরুণীটি ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া নানা ভাবে সেটি দেখিলেন, তাহার পর ভিতর হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, মুশকিলে পড়লাম তো, খুচরো নেই, এই নোটটা এখানে ভাঙাবার সুবিধে হবে কোথাও, কাছাকাছি কোন দোকান-টোকান আছে ?

সুরেন বলিল, ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি আমি, খুচরো আছে আমার কাছে।

গাড়োয়ান ভাড়া লইয়া চলিয়া গেল। সুরেনের আহ্বানে বন্ধু ললিতের স্ত্রী সুরেনের বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। আহ্বান করিতেই হইল, ভদ্রতা বলিয়া একটা জিনিস আছে তো। হাজার হোক—ললিতের স্ত্রী।

॥ চার ॥

বলা বাহুল্য, এরূপ আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সুরেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিনা ভূমিকায় হেমন্তসন্ধ্যার চন্দ্রোদয়লগ্নে ললিতের গৃহত্যাগিনী স্ত্রীর অভ্যাগম, তাও যে-সে স্ত্রী নয়, রীতিমত রূপসী। সুরেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

তাহার অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য করিয়া আভা বলিলেন, আপনাকে বোধহয় বিব্রত করলাম, নয় ?

—না না, বিব্রত কি, কি বলেন !

একটু হাসিয়া সুরেন অভিভূত ভাবটা সামলাইয়া লইল !

—ওঁর কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। তাই দেখা করতে এলাম।

কানের দুল দুইটি চমৎকার, লাল পাথরটায় ইলেকট্রিক আলো পড়িয়া অদ্ভুত দেখাইতেছে ! সুরেন তন্ময় হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। হঠাৎ ভদ্রমহিলার প্রশ্নে পুনরায় আত্মস্থ হইল !

—আপনি কতদিন আছেন এখানে ?

—বেশি দিন নয়, বছরখানেক হবে।

দুইখানি চেয়ারে দুইজন দুইজনের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

সুরেন ভাবিতেছিল, উনি কি এখানে থাকিতে চাহিবেন ? যদি চাহেন, তখন সে কি বলিবে ? আভা ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া কথাটা পাড়া যায়, উনি সব শুনিয়াছেন কি ? শুনিয়া থাকিলে কেমন ভাবে শুনিয়াছেন কে জানে!

কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর নীরবতার পর মুখভাব যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিয়া সুরেন বলিল, এর আগে কখনও দেখিনি আপনাকে আমি। বিয়ের সময়টাতে কিছুতে যেতে পারলাম না, ছুটি পাই নি।

আসল কথা অবশ্য, ছুটির জন্য সে চেষ্টাও করে নাই। ললিতের 'লভ ম্যারেজ' শুনিয়াই তাহার কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল, তাহা ছাড়া পাওনা ছুটিটা এমন ভাবে নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না, বরং ছুটি জমিলে পুরী বেড়াইয়া আসিবে, মনে মনে এই বাসনা ছিল। কিন্তু এসব কথা বলা চলে না। ছুটি পাই নাই বলাটাই শোভন।

আভা বলিলেন, আপনার কথা শুনেছি কিন্তু অনেক, তাই তো এলাম। মনে হ'ল, এই বিদেশে একমাত্র আপনাকেই বোধহয় বিশ্বাস করতে পারব।

সুরেন মনে মনে ঘামিতে লাগিল। এই রে, এইবার বুঝি ভদ্রমহিলা থাকিবার প্রস্তাবটা করিয়া বসেন! আজকালকার এই সব অগ্রগতিশীলা মহিলাদের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান একেবারে নাই। ইহারা সব করিতে পারে। স্বামীকে যখন স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছে, তখন ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে, কয়েকদিন আপনার বাসায় আশ্রয় দিন আমাকে। সুরেনের পক্ষে 'না' বলা মুশকিল, 'হাঁ' বলা আরও মুশকিল। অবশেষে মরিয়া হইয়া সে বলিল, কোথা থেকে আসছেন আপনি এখন ?

—এখন আসছি আমি আমার কোয়ার্টার্স থেকে। এখানকার মেয়েদের ইস্কুলে হেড-মিস্ট্রেস হয়ে এসেছি আমি। কাল জয়েন করেছি। আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাই মনে হ'ল, যাই, আলাপটা ক'রে আসি।—বলিয়া আভা দেবী অতি সুমিষ্ট একটি হাসি হাসিলেন।

কিন্তু এই নিশ্চিন্তকর শুভসংবাদ শুনিয়া সুরেনের যেরূপ পুলকিত হইয়া উঠা উচিত ছিল, আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক ততটা পুলকিত সে হইল না। বরং এই সমস্যাসংকুল অবস্থাটার এমন একটা নিরামিষগোছের সমাধান হইয়া যাওয়াতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে একটু যেন বিমর্ষই হইয়া পড়িল। হয়তো তাহার মুখচ্ছবিতে সে ভাবটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

আভা দেবী বলিলেন, সত্যি অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধহয়, কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি ?

—না না, বিরক্ত আবার কিসের!

এইরূপ ভাসা-ভাসা আলোচনা খানিকক্ষণ চলিল।

তাহার পর আভা দেবী বলিলেন, আজ এইবার উঠি। আবার আসব এখন মাঝে মাঝে।

হুকুরু গাড়ি ডাকিয়া দিল, আভা দেবী চলিয়া গেলেন।

সুরেন রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে তেমন কিছু

সাংঘাতিক বলিয়া তো মনে হইল না, ভালই লাগিল বরং। বেশ তো সহজ সুন্দর ভদ্র কথাবার্তা, অথচ ইনিই ললিতের মত স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন! বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নিশ্চয়ই কোন রকম কিছু—

সমস্ত সন্ধ্যাটা সুরেনের মাথায় অন্য কোন চিন্তাই আসিল না।

॥ পাঁচ ॥

কয়েকদিন পরে আবার একদিন বৈকালে আভা দেবী আসিয়া দর্শন দিলেন। আসিয়া নিজেই বলিলেন, মুখ ফুটেই চাইব আজ, চা হুকুম করুন। সেদিন আপনি যে রকম মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইলেন, তাতে চায়ের কথা বলতে আর ভরসা পেলুম না।

আভা দেবী সহাস্যমুখে একটা চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। সুরেন তাড়াতাড়ি চা আনিতে বলিল।

—খাবার-টাবার আনতে বলব কিছু? আমার এখানে মুখ ফুটেই বলতে হবে সব, কারণ বুঝতেই পারছেন, আমি ব্যাচিলর মানুষ, আমার ভরসা ওই বুড়ো হুকুরু।

—না, খাবার চাই না। ভাল এক কাপ চা হ'লেই চলবে। আপনার হুকুরু ভাল চা করতে পারে তো?

সুরেন স্মিতমুখে বলিল, হুকুরু আমার কাছে আসার আগে আর কখনও চা করে নি। আমি ওকে সম্প্রতি চা-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছি। সেজন্যে জোর গলায় কিছু বলতে পারছি না।

—তা হ'লে ওকে জলটা গরম ক'রে সব জিনিসপত্র এখানেই দিয়ে যেতে বলুন, নিজেরাই ক'রে নেওয়া যাক।

সুরেন সেইরূপ হুকুম করিল।

—চা টুকু মনোমত না হ'লে কেমন যেন তৃপ্তি হয় না, যাই বলুন আপনি।

সুরেন একটু হাসিল।

যথাসময়ে চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া হুকুরু সামনের টেবিলটায় সাজাইয়া দিয়া গেল। আভা দেবী স্বচ্ছন্দ-নিপুণতার সহিত চা প্রস্তুত করিয়া পরিবেশন করিলেন ও পান করিলেন।

—কেমন হয়েছে চা?

—সুন্দর।

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করিবার পর আভা দেবী হাতঘড়িটি দেখিয়া বলিলেন, এইবার উঠতে হবে আমাকে, সেক্রেটারি বাবুর আসার কথা আছে আমার বাসায়।

—কে আপনাদের সেক্রেটারি?

—খালি ঘরের কোণে ব'সে পড়াশোনা করা ছাড়া দুনিয়ার আর কোন খবরই রাখেন না বুঝি আপনি?

—আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারি কে, এইটাই কি একটা রাখার মত খবর বলতে চান?

—আপনার পক্ষে না হ'তে পারে, কিন্তু আমার পক্ষে ওইটেই এখন সবচেয়ে বড় খবর।

—কে বলুন তো সেক্রেটারি আপনাদের ?

—মুরারিমোহন পুরকায়স্থ, উকিল একজন। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। আমার যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয়, তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন। উঠি আমি, তাঁর আসবার কথা আছে এখন।

আভা দেবী চলিয়া গেলেন। যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আজও অনুক্ত রহিয়া গেল ; এবং যাহা শুনিবার জন্য সুরেন মনে মনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। উভয়েই ললিতের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে সমুৎসুক, কিন্তু—। 'কিন্তু'তেই বাধিতেছে। সুরেন একবার ভাবিল, ললিতকে একটা চিঠি লিখিলে কেমন হয়! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, সেটা ঠিক হইবে না। তাহার স্ত্রী এই শহরে আসিয়া চাকুরী করিতেছে এবং আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, শুনিলে ললিত হয়তো অত্যন্ত মর্মাহত হইবে। দরকার কি, অনর্থক তাহাকে খবর দিয়া! কিন্তু এই পুরকায়স্থ লোকটা কে ?

॥ ছয় ॥

আরও মাসখানেক কাটিয়াছে। ললিতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। আভা দেবীর কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সুরেনের কাছে আভা দেবীই এখন মুখ্য, ললিত গৌণ। আভা দেবীর সংস্পর্শে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধে তাহার মতামতের উগ্রতা কমিয়া গিয়াছে বলিলেই ঠিক বলা হয় না, মতামত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। সে এখন ভাবে, আভা দেবী যদি শিক্ষিতা মহিলার নমুনা হন, তাহা হইলে সমাজের শঙ্কিত হইবার কারণ নাই, আনন্দিত হইবারই কথা। সুরেনের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে, ললিত ঘটিত ব্যাপারটার নিগূঢ় একটা কোন রহস্য আছে। মোট কথা, আভা দেবীকে তাহার ভাল লাগিয়া গিয়াছে, এবং ভাল-লাগার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সে নিজেরই সঙ্গে নানারূপ জটিল তর্ক করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার মনে হইয়াছে—

যাক, কি মনে হইয়াছে তাহা আর নাই লিখিলাম। আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কাব্য নয়। আজকাল সন্ধ্যার সময় সে আর বেড়াইতে বাহির হয় না, বাড়িতেই থাকে। আভা অবশ্য রোজ আসেন না। কিন্তু যদি কোনদিন আসিয়া ফিরিয়া যান, সেটা বড় অন্যায় হইবে! ইহাই বর্তমানে সুরেনের মনোভাব। আপনারা হয়তো আশ্চর্য হইতেছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হইয়াছে সুরেন নিজে।

॥ সাত ॥

মাস দুই পরে।

উপর্যুপরি তিনটি সন্ধ্যা বৃথা গিয়াছে। আভা দেবী আসেন নাই। চতুর্থ সন্ধ্যায় অত্যন্ত আকুল অন্তঃকরণে সুরেন বসিয়া আছে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ হইল। তাড়াতাড়ি ঘাড় ফিরাইয়া সুরেন দেখিল, আভা দেবী নয়, বকের মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া মুরারিমোহন পুরকায়স্থ আসিয়া প্রবেশ করিতেছে।

—আসতে পারি কি ?

—আসুন।

পুরকায়স্থ মহাশয় আসিয়া উপবেশন করিলেন।

—ইতিপূর্বে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়নি। আভা দেবীর মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনতে পাই। তাই ভাবলাম, একটু আলাপ ক'রেই আসা যাক, মানে—চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন আর কি !—গলা খাঁকারি দিয়া পুরকায়স্থ মহাশয় একটু হাসিলেন, চেয়ারটা আর একটু কাছে সরাইয়া আনিলেন এবং পুনরায় বলিলেন, মানে, শুনেছি আপনি ওঁর স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। কিন্তু পুরকায়স্থ মহাশয় কাজের মানুষ, কাজের কথাটা পাড়িতে অযথা বিলম্ব করিলেন না। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু নিম্ন স্বরে বলিলেন, ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন তো। যা শুনছি তাতে তো, মানে—

—আমার মনে হয়, ওসব মিছে কথা।

যেন মস্তবড় একটা ভুল ধারণা সংশোধিত হইয়া গেল, এইরূপ একটা মুখভাব করিয়া পুরকায়স্থ বলিলেন, তাই, নয় ?

তাহার পর একটু উচ্চাঙ্গের হাস্য করিয়া তিনি বলিলেন, গুজবের কথা আর বলবেন না, আপনার মত নিরীহ লোকের নামও ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে কত কথাই না রটেছে শহরে !

—তাই নাকি ?

—আর বলেন কেন ! অতি পাজি জায়গা এ।

সুরেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। পুরকায়স্থ মহাশয় বলিলেন, আজ তবে উঠি, ঘোষ-পাড়ায় যেতে হবে একবার। ওসব ছেঁড়া কথায় কান দেবেন না মশাই, নিজে নিজে ঠিক থাকলেই হ'ল। কোন্ ব্যাটার তোয়াক্কা করেন আপনি ! আচ্ছা, চলি তবে আজ।

বকের মত পা ফেলিয়া ফেলিয়া পুরকায়স্থ চলিয়া গেলেন।

আভা দেবী কেন আসিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরেন বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল ! শহরে গুজব রটিয়া গিয়াছে !

॥ আট ॥

তাহার পরদিন বৈকালে স্টেশনারি দোকানে গিয়া অনেক নির্বাচন করিয়া সুরেন চিঠি লিখিবার প্যাড ও খাম কিনিল। দাম একটু বেশি দিতে হইল। এত দামী প্যাড ও খাম সে জীবনে এই প্রথম কিনিল এবং কিনিয়া আনন্দও পাইল। বাসায় ফিরিয়া ঘরে খিল দিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথম দুই তিনখানা কাগজ নষ্ট হইল, লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইল, কিছুতেই ঠিক যেন মনোমত হইতেছে না। শেষে অনেক ভাবিয়া, অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া সে দীর্ঘ একটি পত্র লিখিয়া ফেলিল। লেখা শেষ হইলে চিঠিটি আদ্যোপান্ত বার কয়েক পড়িয়া তবে সেটি খামে পুরিল। খামের উপর ঠিকানা লিখিতে যাইবে, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ। সেই পরিচিত পদশব্দ। তাড়াতাড়ি চিঠিটা প্যাডের তলায় ঢাকা দিয়া সে তাড়াতাড়ি গিয়া কপাট খুলিল।

আভা দেবী আসিয়াছেন।

—কি করছেন ঘরের ভেতর একা একা ?

সুরেনের মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে আভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—হ'ল কি আপনার ? অসুখ করে নি তো কিছু ?

—না।

—চলুন, ভেতরে বসা যাক একটু। সময় নেই বেশি হাতে।

সুরেন একটু অনুযোগের সুরে বলিল, অনেক দিন পরে এলেন।

—হ্যাঁ, সময়ই হয়ে ওঠে না। আজ চ'লে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে।

—চ'লে যাচ্ছেন !

—হ্যাঁ, চাকরি করা পোষাল না।

—পোষাল না মানে ?

—মুরারিবাবুর জন্যে। তিনি সেক্রেটারির কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে এমন সচেতন হয়ে উঠলেন যে, রোজ সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে যাওয়া তাঁর নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়াল। যাক, সে কথা অবান্তর। যে কথাটা বলতে এসেছি, ব'লে যাই। অনেক দিনই বলব বলব মনে করেছি, হয়ে ওঠে নি। আপনি বোধহয় শুনেছেন, আপনার বন্ধুকে ত্যাগ ক'রে আমি চ'লে এসেছিলাম। কথাটা মিথ্যে নয়, ত্যাগ ক'রেই এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম, সেই কথাটাই আপনাকে আজ বলব। আপনাকে ব'লে যেতে চাই এই জন্যে যে, আপনি আমার স্বামীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আপনি আমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করবেন, এটা আমি চাই না।

সুরেন নির্বাক হইয়া শুনিতে লাগিল।

—আপনার বন্ধু লেখাপড়া-জানা স্বাধীনমনোবৃত্তিসম্পন্না মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। আমি ঠিক তাঁর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ছিলাম কি না জানি না। এইটুকু শুধু জানি, আমাকে তাঁর ভাল লেগেছিল, আমারও তাঁকে ভাল লেগেছিল। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পরে তিনি তাঁর এক আর্টিস্ট বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন ; এবং সাধারণত যেমন গল্পে পড়া যায়, আমার বেলায় সত্যি সত্যি তাই হয়ে গেল। আর্টিস্ট বন্ধু আর্টিস্টিক কায়দায় আমাকে একদিন একখানি চিঠি লিখে বসলেন। চিঠিটা পেয়ে ভাবলাম, স্বামীকে তাঁর বন্ধুর কীর্তিটা একবার দেখাই, তখুনি আবার মনে হ'ল, কি দরকার বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিয়ে। ওরকম ধরনের চিঠি জীবনে তো অনেকই পেয়েছি, কখনও হৈ চৈ করি নি। এসব নিয়ে হৈ চৈ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। চুপ ক'রে থাকাই ভাল। স্বামীকে কিছু না ব'লে চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিলাম। সেই হ'ল কাল। পুড়িয়ে ফেললেই চুকে যেত। হঠাৎ সেই চিঠি একদিন আমার স্বামীর হাতে প'ড়ে গেল, আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। ফিরে এসে দেখি, তুমুল কাণ্ড। আপনার বন্ধুর যে মূর্তি সেদিন আমি দেখেছিলাম, তা আমি জীবনে কোন দিন ভুলব না। সামান্য একখানি চিঠি, তার ইতিবৃত্ত কিছুই না জেনে তিনি এ রকম ভাষায় আমাকে গাল দিলেন যে, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে চ'লে এলাম। আসবার সময় ব'লে এলাম, লেখাপড়া জানা রূপসী

মেয়ে বিয়ে করবার উপযুক্ত তুমি নও। কোন খুকীকে বিয়ে ক'রে হারেমে পুরে রাখা উচিত ছিল তোমার।

এই পর্যন্ত বলিয়া আভা চুপ করিলেন।

—তারপর?

—আজ ওঁর চিঠি পেয়েছি, উনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে চিঠি লিখেছেন ফিরে যেতে। আমিও কিছুদিন চাকরি ক'রে বুঝেছি, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া আমাদের আর কোন সত্য আশ্রয় নেই। যেখানেই যাই, নানা ছুতোয় এক ঝাঁক পুরুষ পেছু নেবে। জীবনে কত রকমারি ধরনেরই যে চিঠি পেয়েছি, তার আর ইয়ত্তা নেই। এখানে মুরারিবাবু তো আছেনই, আরও আছেন কয়েকজন ভদ্রলোক, নাম আর করব না। আভা দেবী চুপ করিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যি বলছি, আপনিই একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেন নি। সত্যি বলছি, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে এবং এত কথা আপনাকে বললাম এর জন্যেই। আপনার বন্ধু যা বলতেন, ঠিকই দেখছি, স্ট্রিক্ট্‌লি পিউরিটান আপনি। এবার কিন্তু বিয়ে করুন একটা। বলেন তো সম্বন্ধ করি।

সুরেন বিবর্ণমুখে একটু হাসিবার ভান করিল।

আভা হাত-ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন, ওমা, ট্রেনের আর বেশি সময় নেই তো, চললাম, নমস্কার। মনে রাখবেন।

চলিয়া গেলেন। সুরেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রভু-ভৃত্য

॥ এক ॥

গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়াছেন।

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবার কথা, কিন্তু হাঁফটি ছাড়িতে পারিতেছি না। ভৃত্যটি পথরোধ করিয়া ধরিয়া আছে। যে ভৃত্যটির তত্ত্বাবধানে গৃহিণী আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন সে অতিশয় বিচক্ষণ। কর্তব্য-কর্মে বিন্দুমাত্র শিথিলতা নাই, পান হইতে চুনটি খসিতে দিতেছে না, আদেশ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা নির্বিবাদে প্রতিপালিত হইতেছে। তথাপি কিন্তু রুদ্ধশ্বাসে রহিয়াছি। কেমন যেন স্বস্তি পাইতেছি না।

কারণ ভৃত্যটি গৃহিণী পক্ষীয়।

নাম অরিন্দম।

আমার কোন আচরণের সে প্রতিবাদ করিতেছে না বটে, কিন্তু আমার প্রতি আচরণটি সে লক্ষ্য করিতেছে। যদিও তাহার বাড়ি এখানেই কিন্তু আজকাল সে রাত্রে আমার বাসাতেই শুইতেছে। কারণ, তাহার গৃহিণীও নাকি পিত্রালয়ে। প্রোষিতপত্নীক ভৃত্য প্রোষিতপত্নীক প্রভুর পাহারা দিতেছে। আমি কোথায় যাই, রাত্রে কখন বাড়ি ফিরি, কি ধরনের লোকের সহিত মেলামেশা করি, ব্যঞ্জনে কি পরিমাণ ঝাল দিতে বলি,

কাপড় জামা কত শীঘ্র শীঘ্র ময়লা করি, যে সব বই পড়ি তাহাতে কি ধরনের ছবি থাকে—সমস্তই সে নীরবে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। মনে হইতেছে যেন গোপনে সে আমার নামে একটি 'চার্জ' শীট' প্রস্তুত করিতেছে, যথাসময়ে যথাস্থানে একদা পেশ করিয়া দিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলিবে—একবর্ণ' মিথ্যা নহে!

॥ দুই ॥

সুতরাং ভয়ে ভয়ে আছি।

আকারে ইঙ্গিতে খোসামোদ করিয়াই চলিতে হয়। সে আনন্দিত হইলে আমিও আনন্দ প্রকাশ করি, সে দুঃখিত হইলে আমিও দুঃখিত হই। কারণে অকারণে বখশিসও দিতেছি। তথাপি কিন্তু তাহার কেমন একটা সি-আই-ডি সি-আই-ডি গোছ ভাব—কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারি না। একজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবার অনেকদিন হইতে বাসনা কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিবার সাহস হইতেছে না। মফঃস্বল জায়গা, তেমন হোটেল-ফোটেলও নাই, খাওয়াইতে হইলে বাড়িতেই আয়োজন করিতে হইবে, অরিন্দমই করিবে। রাত্রে খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলাম কথাটা কি ভাবে পাড়া যায়। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে পদে পদে নানারূপ অপরাধ করিতেছি নিশ্চয়, বোঝা হয়ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর এটাও চাপানো ঠিক হইবে কি না ভাবিতেছিলাম।

নিতান্ত শাকের আঁটিটিও ত নয়!

অকস্মাৎ অরিন্দম বলিল, দুধটা কেমন খেয়ে দেখুন ত বাবু।

দুধের বাটিটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া অরিন্দমের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম সে ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে বাটিটার পানে চাহিয়া আছে। বুঝিলাম দুধকে ভাল বলা চলিবে না।

বলিলাম, তেমন সুবিধে নয়!

গভীর একটি 'হুঁ' করিয়া অরিন্দম কার্যান্তরে চলিয়া গেল। যে গুঁফো বুড়ো গোয়ালাটি অতি প্রত্যুষে আসিয়া আমাকে রোজ দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া থাকে তাহার সহিত আমার ক্বচিৎ দেখা হয় কারণ আমি বেলায় উঠিয়া থাকি। আগামী কল্য অরিন্দমের হস্তে তাহার অনিবার্য লাঞ্ছনার কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল। বুড়োকে সাবধান করিবারও ত আর সময় নাই।

॥ তিন ॥

দিন দুই পরে পুনরায় একদিন রাত্রে অরিন্দম বলিল, আজকের দুধটা খেয়ে দেখুন ত!

দুধে চুমুক দিয়া অরিন্দমের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম।

পুলকিত মুখচ্ছবি!

সত্য গোপন করিয়া বলিতে হইল, আজকের দুধটা ভাল—বেশ ভাল।

ঢক্ ঢক্ করিয়া এক নিশ্বাসে সবটা পান করিয়া ফেলিলাম! কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম কাল সকাল সকাল উঠিয়া গুঁফো বুড়োকে যেমন করিয়া হোক ধরিতে হইবে। দুধ দিয়া যখন বাহির হইয়া যাইবে তখন রাস্তায় তাহাকে ধরিয়া ধমকাইতে হইবে। অরিন্দমের সামনে কিছু বলা চলিবে না! কি জানি বুড়োর সহিত কি প্যাক্ট করিয়াছে হয়ত! কিন্তু এরকম দুধ মেশানো জল প্রত্যহ খাইলে মারা যাইব যে!

॥ চার ॥

ভোরে উঠিয়াই কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া গেল।

গুঁফো নয়।

একটি কম বয়সী গোয়ালিনী রান্নাঘরের দাওয়ার উপর বসিয়া অরিন্দমকে দুধ মাপিয়া দিতেছে এবং অরিন্দম হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া অরিন্দম বলিল, বুড়োর দুধ আপনার খারাপ লেগেছিল বলে একে বাহাল করেছি। কালও এই-ই দুধ দিয়ে গিয়েছিল, আপনি ত ভালই বললেন!

কয়েক মুহূর্ত নীরবে চাহিয়া রহিলাম।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

তাহার পর গম্ভীরভাবেই বলিলাম, দুধ একটু বেশী নে আজ। পুডিং বানাতে হবে। হাসপাতালের নার্স রুবি আজ খাবে রাত্রে এখানে। সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠে অরিন্দম বলিল, যে আজ্ঞে।

প্রস্তর-সমস্যা

॥ এক ॥

সূত্রপাত এইরূপে—

সাঁওতাল পরগণার এক পার্বত্য অঞ্চলে বায়ু পরিবর্তন মানসে গিয়াছিলাম। প্রত্যহ ভ্রমণ করি, নৈসর্গিক শোভা নিরীক্ষণ করিয়া পুলকিত হই, পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিয়া পরিপাক করিয়া ফেলি, নিদ্রা এত প্রগাঢ় হয় যে তাহাকে সূচীভেদ্য না বলিয়া সূচী-অভেদ্য বলাই উচিত, ছুঁচ ফুটাইলেও পাশ ফিরি কি না সন্দেহ। স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। অস্থিসার গণ্ডদ্বয় মাংসল এবং অক্ষিকোটরে বিলীয়মান অক্ষিযুগল শুধু প্রত্যক্ষগোচর নয় রীতিমত কটাক্ষশালী হইয়া উঠিল। বহু কাল শিস দিই নাই। এক দিন মনের আনন্দে শিস দিতে গেলাম, পারিলাম না। দেখিলাম আবহাওয়ার গুণে ওষ্ঠযুগল এরূপ স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি কুঞ্চিত ও বিকৃত করিয়াও সুরের সূক্ষ্মতা আনয়ন করা গেল না। হৃত-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার

করিয়া মনে কিন্তু সুর জাগিয়াছিল। সুতরাং অনতিবিলম্বে এবং অনিবার্যভাবে আলোকপ্রাপ্ত মাইতি-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম। যখন তখন কারণে-অকারণে মিস যূথিকা মাইতিকে দেখিয়া আমার মাংসল গণ্ড ও স্থূলে ওষ্ঠ হাস্যজনিত কুঞ্চন-প্রসারণে অপরূপ হইতে লাগিল। মাইতি পরিবারও বায়ু পরিবর্তন মানসে আসিয়াছিলেন এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এক পুণ্ডরীকাক্ষবাবু ব্যতীত সকলেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। বৃষস্কন্ধ, ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ বলিষ্ঠ পুণ্ডরীকাক্ষ বাবু যে কেন আসিয়াছিলেন প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। আর যে প্রয়োজনই তাঁহার থাক বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল না। প্রায়ই ভাবিতাম স্বাস্থ্য শব্দটির উপর মতুপ (বা বতুপ) প্রত্যয় যিনি এত সফলতার সহিত করিতে পারিয়াছেন তাঁহার এখানে আসিবার কারণ কি ?

॥ দুই ॥

কিছুদিন পরেই মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে বাঁধিতে কারণটি উপলব্ধি করিলাম। রাত্রে মাইতি মহাশয়ের বাড়ি হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম। গেটটি ছাড়াইয়া কিছুদূর আসিয়াছি, যূথিকার শেষ কথাগুলি তখনও কানে বাজিতেছে, এমন সময় একটি সুনিক্ষিপ্ত সুকঠিন প্রস্তরখণ্ড আসিয়া মস্তকে আঘাত করিল। চলিত বাঙলায় মস্তকের যে স্থানটিকে 'রগ' বলা হয় সেই স্থানটি বিদীর্ণ হইয়া গেল! আমি প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া পাথরটি কুড়াইয়া পকেটে পুরিলাম। ভবিষ্যতে মামলা করিতে হইলে পাথরটি কাজে লাগিবে। মামলা করিতেই হইবে, কারণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায়শক্তির সাহায্য ব্যতীত পুণ্ডরীকাক্ষকে কায়দা করা যাইবে না। স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! আজকালকার স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে যূথিকার মত মেয়ের চতুর্দিকে উনি হারেম বানাইতে চান!

যথারীতি ডাক্তার এবং দারোগার শরণাপন্ন হইলাম।

দারোগাবাবুকে পাথরটি দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সেটি আমাকে ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, এ পাথরে তো তেমন কিছুই দেখছি না, তাছাড়া শুধু পাথরের জোরেই তো আর কেস চলবে না। অন্য প্রমাণ চাই। দেখি এনকোয়ারি করে—

সন্দেহ হইল অপর পক্ষ হইতে ঘুস খাইয়াছেন। পাথরটি কিন্তু ফেলিয়া দিলাম না, রাখিয়া দিলাম। ভাগ্যে ফেলিয়া দিই নাই। কারণ কয়েকদিন পরেই ভাগ্যবিধাতার দূত এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বেশ ধরিয়া আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইলেন। ভদ্রলোক আমার অপরিচিত হইলেও আমার জনৈক বন্ধুর পরিচিত এবং তাঁহার নিকট হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছেন। যতদিন তিনি একটি বাসা জোগাড় করিতে না পারেন ততদিন যেন আমি তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে দিই। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য খারাপ, বিশুদ্ধ বায়ুর আশায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

স-প্রস্তর সমস্ত কারণ অকপটে তাঁহার গোচর করিলাম।

তিনি পাথরটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন এবং চুপ করিয়া গেলেন। দুই চারিদিন পরে তিনি যে কথা বলিলেন তাহা গোপনে বলিলেই পারিতেন, কিন্তু কথাটা জানাজানি হইয়া গেল।

আমি মামলা উঠাইয়া লইতে চাহিলাম!

পুণ্ডরীকাক্ষ কিন্তু ছাড়িল না।

॥ তিন ॥

মামলা চলিতেছে।

মামলার স্বরূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

আমি আদালতে শপথ করিয়া বলিয়াছি, পুণ্ডরীকাক্ষ আমাকে পাথর ছুঁড়িয়া মারেন নাই, তাঁহার সহিত আমার কোন কলহ নাই, আমি হঠাৎ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া মস্তকে আঘাত পাইয়াছি। প্রস্তরটি আমি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম।

পুণ্ডরীকাক্ষ শপথ করিয়া বলিতেছেন পাথরটা তাঁহারই এবং আমি চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিলাম বলিয়া তিনি আমাকে তাড়া করিয়াছিলেন এবং তাড়ার চোটে পড়িয়া গিয়া মস্তকে চোট পাইয়াছি।

উভয়েই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। সার্থক এবং নিরর্থকভাবে উকীল, ডাক্তার, দারোগা যাহাকে পাইতেছি তোয়াজ করিতেছি। জলের মত অর্থ ব্যয় হইতেছে।

॥ চার ॥

আমার বাসায় আগত ভদ্রলোকটি প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে প্রমাণ করিয়াছেন যে পাথরটি সহজ পাথর নহে—অতিশয় দামী একখণ্ড হীরা। দাম পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত অনায়াসে উঠিবে।

শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সাঁওতাল পরগণার উক্ত পার্বত্য স্থানটির নাম আমি উহ্য রাখিলাম। গল্প লেখকের অন্তত এ অধিকারটুকু আছে আশা করি।

যূথিকা

॥ এক ॥

অপ্রত্যাশিত রকম যোগাযোগ। সে-ই গত পরশ্ব আমাকে জানাইয়াছে সে ছাড়া তাহাদের বাড়ীতে আর সকলে সিনেমায় যাইবে। তাহার সিনেমা দেখিতে ভাল লাগে না বলিয়া যাইবে না। এ সুযোগ, এ অভাবনীয় সুযোগ ছাড়া শক্ত। চিঠি লিখিয়া দিয়াছি আপিস ফেরত তাহার নিকট যাইব। তাহাকে বহুবার দেখিয়াছি, রোজই আমাদের বাড়ীতে

আসে কিন্তু কখনও একা পাই নাই, সুযোগ ঘটে নাই। ছিপছিপে চটুলনয়না, মেয়েটি আমার ভগ্নীর সখী। ভগ্নীর সখী হিসাবেই প্রথম আলাপ হইয়াছিল প্রায় মাস ছয়েক পূর্বে তাহার পর……ঘনঘন আপিসের ঘড়ির দিকে তাকাইতেছি কখন পাঁচটা বাজিবে।

॥ দুই ॥

স্পন্দিত বক্ষে বাহিরের ঘরটাতে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকার। এইখানেই তাহার থাকিবার কথা ; চাকর-বাকরদের কোন অজুহাতে সরাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম, তাহা তো ঠিকই করিয়াছে দেখিতেছি। কেহ কোথাও নাই। কিন্তু সে কোথায়। অন্ধকারে বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোথায় সে। সহসা কাপড়ের খস্‌খস্‌ ও চুড়ির শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম সোফার উপর কে যেন বসিয়া আছে, মুখ দেখা যাইতেছে না। সোফার কাছে আগাইয়া গেলাম।

যূথি—

যূথি উত্তর দিল না। আমি আর একটু কাছে গিয়া চুপি চুপি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, যূথি, তোমাকে প্রথমে দেখতে না পেয়ে আমার কি যে মনে হচ্ছিল,—কতক্ষণ বসে আছ ?

কোন জবাব নাই। একটু নড়িয়া চড়িয়া আর একটু জড়োসড়ো হইয়া বসিল।

রাগ করলে নাকি ?

যূথি নিরুত্তর।

কথা বলচ না কেন যূথি ?

যূথি মাথাটি একটু হেঁট করিল। তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সে আর একটু সঙ্কুচিত হইল।

তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলাম, যূথি, রাগ করেছ ?

যূথিকা তবু কিছু বলে না।

যূথি—

প্রাণে অনেক কিছু জাগিতেছে কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলি কি করিয়া। আকুতির ভাষা নাই। একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম। কিন্তু তাহাও কিছুক্ষণ পরে অসহ্য হইয়া উঠিল।

যূথি—

যূথিকা নীরব। মনে হইল তাহার সমস্ত শরীরে যেন কিসের একটা শিহরণ বহিয়া গেল, তথাপি সে নীরব।

যূথি—

যূথির কি হইয়াছে, কথা বলে না কেন! তাহার একখানা হাত আমার হাতের মধ্যে ছিল। স্পর্শে অনুভব করিলাম অনামিকায় একটি আংটি রহিয়াছে। যূথিকাকে কোন দিন আংটি পরিতে দেখি নাই। হাত দিয়া আংটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আবেগকম্পিত কণ্ঠে পুনরায় কহিলাম, যূথি—

যূথি হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

॥ তিন ॥

একটু পরে বাড়ী ফিরিয়া দেখি যূথি আমাদের বাড়ীতে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত নির্বিকার কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনার আজ ফিরতে এত দেরি হল যে আপিস থেকে। ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলাম, আটকে পড়েছিলাম এক জায়গায়। মা আমার চা জলখাবার আনিতে বাহির হইয়া গেলেন। ভগ্নী পাশের ঘরে তাহার খোকাটিকে ঘুম পাড়াইতেছিল। যূথিকে একা পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, আমার চিঠি পাওনি সকালে ?

না, কি চিঠি ? কার হাত দিয়ে পাঠিয়েছিলেন ?

ডাকে পাঠিয়েছিলাম। তোমাকে বাইরের ঘরটায় একা থাকতে বলেছিলাম, দুটো কথা ছিল তোমার সংগে। পাওনি সে চিঠি ?

যূথি অনামিকার আংটিটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নির্বিকারভাবে বলিল, কই না !

অবাক হইয়া গেলাম।

বুর্জোয়া-প্রোলিটারিয়েট

॥ এক ॥

ছা' পোষা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হলধর হালদার মহাশয় চতুর্থ কন্যার বিবাহের ফর্দ করিতে বসিয়া নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন যে সত্যই তিনি বিপন্ন। নিজের পুঁজিপাটা সব নিঃশেষ হইয়া হাজার খানেক টাকা ধারও করিতে হইয়াছে তথাপি সঙ্কুলান হইতেছে না। বরপক্ষীয়গণ যাহা লইবেন তাহা তো সুনির্দিষ্ট, এক পয়সা কমাইবার উপায় নাই। ভোজের খরচ যদি কিছু কমানো যায় এই আশায় হলধর ফর্দটি লইয়া প্রিয়বন্ধু ও মন্ত্রি অখিল মিত্রের নিকট পুনরায় গমন করিলেন। সমস্ত শুনিয়া অখিল বলিলেন, ওর চেয়ে কম খরচে আর হয় না-রে দাদা, কোনটা কমাবে বল তুমি ?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হলধর ফর্দটির পানে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই কিছু কমাইবার নাই। লুচি, শাকভাজা, কুমড়োর ডালনা, ছ্যাঁচড়া, মাছের কালিয়া, চাটনি, একরকম মিষ্টি এবং দই। ভদ্রতা বজায় রাখিতে হইলে ইহা অপেক্ষা কম করিলে আর চলে না।

অখিল বলিলেন, এই করে করে চুল পাকিয়ে ফেললাম রে ভাই, ওর চেয়ে কমে আর হয় না, হতে পারে না।

বলিয়া তিনি হাসিলেন। হাসির অর্থ—পাগল না কি তুমি ! বোঝা গেল অখিল মিত্রকে বিচলিত করা যাইবে না। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল অধিকতর কুঞ্চিত করিয়া হলধর বলিলেন—তাহলে—

অখিল কহিলেন, উপায় নেই—

ব্যর্থ-মনোরথ হলধর বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন নিধি গোয়ালা দধির বায়না লইবার জন্য আসিয়াছে। নিধিরামকে দেখিবামাত্র হলধরের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলিয়া গেল।

পেটি বুর্জোয়া হলধর প্রোলিটারিয়েট নিধিরামের সহায়তায় কিছু খরচ বাঁচাইবেন সংকল্প করিলেন।

ভাল দই কত করে মণ ?

ভাল দই বিশ টাকা করে পড়বে বাবু—

তার চেয়ে নিরেশ ?

পনেরো আছে, দশ আছে—

তার চেয়ে কম নেই ?

থাকবে না কেন বাবু, সাড়ে সাত আছে, পাঁচ টাকা মণ অবধি আছে, তবে সে ভাল জিনিস হবে না—

হলধর চিন্তা করিয়া দেখিলেন দুই মণ দধি লাগিবে। টাকা পঁচিশেক অনায়াসে বাঁচানো যায়।

বলিলেন, দেখ বাপু নিধিরাম, ওই পাঁচ টাকা মণের দই-ই তুমি দু'মণ দিও। কিন্তু একটি কথা আছে—

আজ্ঞে করুন।

দই খেয়ে যদি কেউ নিন্দে-টিন্দে করে—

নিন্দে আজ্ঞে করবেই। পাঁচ টাকা মণের দই, সঙীন দই হবে হুজুর—

হ্যাঁ, তাই বলছি নিন্দে-টিন্দে যদি কেউ করে তখন তোমাকে ডেকে আমি একটু ধমক-টমক দেবো। ভাবটা যেন তোমাকে আমি ভাল দই-ই দিতে বলেছিলাম তুমি যেন আমাকে ঠকিয়েছ। তুমি একটু কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো—বাস্ আর কিছু করতে হবে না।

নিধিরাম ঘোষ তাহার ঝাঁকড়া গোঁফে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বলিল, সেটা কি ঠিক হবে হুজুর! ওসব তঞ্চকতার ভেতর আমি—

এর জন্যে একটা টাকা বেশী দেব তোমায়! এ দায় থেকে আমায় উদ্ধার করো তুমি, ভাল দই কেনবার আমার পয়সা নেই। অথচ মানটা বাঁচাতে হবে—

দ্বিধাগ্রস্ত নিধিরাম অবশেষে রাজি হইয়া গেল।

॥ দুই ॥

নিধিরামের কথা মিথ্যা হয় নাই।

দধি নয় যেন আগুন!

আহার্যদ্রব্যের প্রতিপদেই হলধর কার্পণ্য করাতে বরযাত্রীগণের প্রত্যেকেই এক একটি বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়া ছিলেন। দধি পড়িতেই একযোগে সকলে ক্ষেপিয়া উঠিলেন!—এরকম দই যে কোন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোকের পাতে দিতে পারে তাহা কল্পনাতীত!

পাতা ঠেলিয়া দিয়া সকলে নাকে কাপড় দিলেন।

হলধর করযোড়ে কহিলেন—দইটা কি,—

অখাদ্য মশাই—অখাদ্য!

তাই না কি ! অথচ আমি ভাল দই ফরমাস দিয়েছিলাম। সহসা হলধরের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়া গেল। তারস্বরে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিধে—নিধে—

নিধিরাম নিকটেই ছিল, আসিয়া দাঁড়াইল।

হলধর বলিতে লাগিলেন—কি দই দিয়েছ তুমি ?

আজ্ঞে দই তো ভালই—

এঁরা তাহলে মিথ্যে কথা বলছেন ! বেটাচ্ছেলে, হারামজাদা, ঠকাবার আর জায়গা পাওনি তুমি !

নিধিরাম কাচুমাচু হইয়া মস্তক অবনত করিল। সম্ভবত আবেগের আতিশয্যেই হলধর কিন্তু থামিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া নিধিরামের গালে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, জুয়াচোর পাজি কোথাকার—

নিধিরাম মুখ তুলিয়া বলিল, চড় মারবার তো কথা ছিল না। চড় মারলেন যে বড় ! আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক রয়েছেন, বিচার করুন আপনারা—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলধর গিয়া প্রাণপণে নিধিরামের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

শ্রীধরের উত্তরাধিকারী

॥ এক ॥

মক্ষিচুস্ !

স্থানীয় বেহারীগণ শ্রীধর মিত্রকে এই আখ্যাই দিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত কথাটির অর্থ অনেকে হয়ত জানেন না। মক্ষিচুস্ আখ্যা সেই সকল মহাত্মাকেই দেওয়া হয় যাঁহারা মক্ষিকাকে চুষিয়াও গুড় অথবা মধু আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। শ্রীধর মিত্তিরের কৃপণতা ও শোষণপটুতা সম্বন্ধে স্থানীয় বাঙালী, বেহারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একমত। সজ্ঞানে প্রভাতে কেহ তাঁহার নামোচ্চারণ করেন না এবং দৈবাৎ করিয়া ফেলিলে উপবাস আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীধর মিত্রের দীর্ঘ জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে তিনি কখনও কাহাকেও এক কপর্দক দান করেন নাই ; কিন্তু বহু কপর্দক বহু লোকের নিকট হইতে বহুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখনও করিতেছেন। বর্তমানে সুদে টাকা খাটানোই তাঁহার প্রধান উপজীবিকা। কয়েকখানা ভাড়াটে বাড়ীও প্রতি মাসে তাঁহাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রজা বিলি করা কিছু জমি আছে। কিছু কোম্পানির কাগজও আছে। আয়ের পথ এতগুলি আছে কিন্তু ব্যয়ের পথ নাই বলিলেও চলে। জন থাকিলেই ধনক্ষয় হয়। শ্রীধরের তিন কুলে কেহ নাই। আত্মীয়স্বজন সকলেই একে একে পরলোক গমন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন শ্রীধর নিজে এবং তাঁহার পুরাতন ভৃত্য নকুড়। নকুড় অবশ্য শুধু ভৃত্য নয়। সে একাধারে পাচক, ভৃত্য, বন্ধু, পরামর্শদাতা—সব। দিনে নকুড় ভাতে ভাত ফুটাইয়া দেয়। রাত্রে হরিগোয়ালা সুদ পরিশোধ কল্পে যে দুধটুকু দিয়া যায় তাহাই উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। জলখাবারের পাট নাই। পোষাক-পরিচ্ছদের খরচও নাই বলিলেই চলে। আইন বাঁচাইবার জন্য যতটুকু আবরণ প্রয়োজন ততটুকুই শ্রীধর মিত্র

অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। দিনে সূর্য এবং রাত্রে রেড়ির তেলের ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ তাঁহার অন্ধকার মোচন করিয়া থাকে।

টাকা সুতরাং জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয়—মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি। শ্রীধর মিত্র যদিও ভুলক্রমেও কখনও নিজের ঐশ্বর্যের কথা কাহারও নিকট উল্লেখ করিতেন না, কিন্তু সকলেই জানিয়াছিল যে শ্রীধর মিত্র নামক কদাকার বৃদ্ধটি বেশ শাঁসালো ব্যক্তি। তাঁহার শাঁসটুকুর কিয়দংশও অন্তত হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে নানালোকে নানা ভেকধারণ করিয়া সততই তাঁহার দুয়ারে ধর্ণা দিত। শ্রীধর থাকিতেন শহরের বাহিরে নিজেরই একটা শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে অর্থাৎ সেই বাড়িটাতে—যাহার ভাড়াটে সহজে জুটিত না। কিন্তু শহর-প্রান্তের সেই পোড়ো বাড়িতেই অর্থ-অনুসন্ধিৎসু মতলববাজগণ গিয়া হাজির হইতেন।

॥ দুই ॥

সেদিন গিয়াছিলেন জলধরবাবু।

জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে, স্বদেশ হিতৈষীও। সম্প্রতি শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহ করিতেছেন। শ্রীধর মিত্রের হৃদয় বিগলিত করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী একটি বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ শ্রীধর মিত্র তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, “খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার দরকার কি ?”

বিস্মিত জলধর বলিলেন, “তার মানে ?”

“মানে, লেখাপড়া না শিখেই এই শহরের মেয়েগুলো যে রকম বাবু হয়ে উঠেছে লেখাপড়া শিখলে এদেশের সব গণেশই ত উল্টে যাবে। কি বলিস নোক্ড়ো ?”

নকুড় একটু মৃদু হাস্য করিল মাত্র।

শ্রীধর আবার বলিলেন, “ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই গণেশকে কাৎ করেছে—মেয়েরা শিখলে একদম উল্টে যাবে। কেউ রক্ষে করতে পারবে না। ওসব দুর্বুদ্ধি ছাড়ুন আপনি জলধরবাবু।”

জলধরবাবু কোনদিন গণেশের দিক দিয়া স্ত্রীশিক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই। প্রথমটা তিনি একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি উকিল মানুষ। কোথায় কি ভাবে কোন কথা বলিলে কাজ হাঁসিল হয় তাহা তাঁহার জানা আছে।

সুতরাং তিনি বলিলেন, “মেয়েরা লেখাপড়া শিখে নিজেরা রোজগার করলে তবে না বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন না করলে টাকার প্রতি দরদ হয় না। গণেশকে খাড়া রাখবার জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো উচিত।”

দেখা গেল, অ-উকিল শ্রীধর মিত্রও কম নন।

নকুড়ের দিকে এক নজর সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, “ছাগলকে দিয়ে যব মাড়িয়ে নেওয়া যদিই বা সম্ভবপর হয়, ছাগলের স্বভাব কি বদলে যাবে তাতে বলতে চান ? সে কি যব গাছে আর মুখ দেবে না ? না, যবের গাদায় ছেড়ে দিলে নয়-ছয় করবে না ? বল্ না রে নোক্ড়ো ও পাড়ার ব্যাপারখানা !”

অদূরে উপবিষ্ট নকুড় এবারও কিছু না বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

শ্রীধর তখন নিজেই বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ঘোষাল পাড়ায় আমার যে বাড়ীটা আছে তার এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী। দুজনেই বেশ লেখাপড়া জানে শুনেছি। কিন্তু তাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে আসুন কি কাণ্ড-কারখানা। স্বামীটি ক্রমাগত সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছেন আর স্ত্রীটি ক্রমাগত শেলাই করে যাচ্ছেন। কলের খচখচি শুনে মনে হয় দরজির বাড়ী! ওই যে কি এক রকম জামা মেয়েরা পরে তাই ক্রমাগত শেলাই হচ্ছে শুনলাম! জামাগুলোর কি নাম যে ভাল—মনেও থাকে না ছাই!"

নকুড় বলিল—"বালাউস।"

"বালাউস্—বালাউস্! এত বালাউস নিয়ে যে কি হবে তাই ভাবি। পরবে কখন?"

জলধরবাবু বুঝিলেন তর্ক-পথে চলিবে না।

বলিলেন, "সবাই কি আর এক রকম হয়? তাছাড়া আপনার মত প্রবীণ বুদ্ধিমান লোকের সংগে তর্ক করতে পারি কি আমি? মোট কথা, সৎকার্য আরম্ভ করেছি একটা কিছু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত বদনে শ্রীধর কিছুক্ষণ জলধরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন—"সাহায্য!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ পাঁচজনের কাজ, কিছু দিতে হবে আপনাকে।"

সকাতরে শ্রীধর বলিলেন—"আমি দরিদ্র মানুষ। এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে সাহায্য করা আমার সাধ্যে যে কুলোবে না জলধরবাবু। বিশ্বাস করুন, অতি দরিদ্র আমি।"

জলধরবাবু বিশ্বাস করিলেন না।

বলিলেন, "তিল কুড়িয়েই ত তাল। সবাই কিছু কিছু সাহায্য না করলে হবে কি করে! বুঝছেন না!"

"বুঝছি ত! কিন্তু আমার যে তিলের সামর্থ্যও নেই!"

"ও আমি শুনব না—কিছু দিতেই হবে আপনাকে!"

জলধরবাবুর ব্যবহারে একটা নাছোড়বান্দা ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীধর শঙ্কিত হইলেন। উকিল মানুষকে চটাইতে সাহস হয় না। সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের মৃত্যুকালীন উপদেশের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। অশুভস্য কালহরণম্! বলিলেন—"এখন ত কিছুতেই পেরে উঠব না। আসচে মাসে চেষ্টা করে দেখতে হবে। আধপেটা খেয়ে থাকব আর কি! কি বলিস রে নোক্ড়ো!"

নকুড় পুনরায় মৃদু হাস্য করিল।

জলধরবাবু অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন।

॥ তিন ॥

জলধরবাবুর কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম। সকলের কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেহই শ্রীধর মিত্রের ধনভার লাঘব করিতে পারেন নাই—সকলকেই ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইয়াছিল। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল, খদ্দরধারী স্বদেশীর দল, হার্মোনিয়ামধারী বন্যাসাহায্য-

কারীর দল, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনী-সভার সভ্যগণ, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতৃগণ, কন্যাদায়গ্রস্ত দুঃস্থ ব্রাহ্মণ—সকলের আবেদনই শ্রীধর মিত্র ধৈর্যসহকারে শুনিয়া যাইতেন। ধৈর্য হারাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। সকলকেই কিন্তু অবশেষে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইয়াছিল।

॥ চার ॥

টাকা সুতরাং জমিতেছিল।

তিলে তিলে, ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া শ্রীধর মিত্রের ধনরাশি এমন একটা অঙ্কে গিয়া পৌঁছিল যে শেষকালে তাহা শ্রীধর মিত্রেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

শ্রীধর চিন্তা করিতে লাগিলেন—জীবন ত শেষ হইয়া আসিয়াছে। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে আসিয়া হানা দিতে পারে। এতগুলো টাকার পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হইবে! মাটির তলায় এই বিপুল ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? সেদিন লটারির খেলাতেও তিনি বেশ কিছু টাকা পাইয়াছেন। লটারি খেলার দিকে শ্রীধরের ঝোঁক আছে। মাঝে মাঝে লটারির জন্যই তিনি দুই চারি টাকা বাজে খরচ করেন। গত বৎসর লটারির দৌলতে বেশ কিছু অর্থাগম হইয়াছে। কিন্তু এত অর্থের পরিণতি কি হইবে? নকুড়টা শেষকালে সব ভোগ করিবে? আযৌবন-সহচর নকুড়কে অবশ্য তিনি কিছু দিয়া যাইবেন, কিন্তু সমস্ত টাকাটাই সে ভোগ করিতেছে এ চিত্র মোটেই মনোজ্ঞ নয়। নকুড়টাই বা কতদিন বাঁচিবে? শেষকালে সমস্ত টাকাটা নকুড়ের উত্তরাধিকারী সেই ঘাড়ছাটা ভাইপোটার হস্তে গিয়া পড়িবে না কি! এ কথা চিন্তা করিলেই শ্রীধরের সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া ওঠে। বালিকা বিদ্যালয়ে টাকাগুলা দিয়া যাইবেন? না, প্রাণ থাকিতে তাহা তিনি পারিবেন না। আজকালকার বিলাস-প্রবণ হাই-হিল জুতাপরা মেয়েগুলাকে দেখিলেই তাঁহার অস্থিপঞ্জর জ্বলিতে থাকে। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে টাকাটা দিলে কেমন হয়? দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বর্তমান ডাক্তার খোঁচা গোঁফ পরেশ চক্রবর্তীর মুখটা স্মৃতিপটে উদিত হইলেই এ ইচ্ছা আর দ্বিতীয়বার হয় না। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের? ও ভণ্ড ব্যাটাদের টাকা দিয়ে লাভ? বন্যা প্রপীড়িতদের? স্বয়ং ভগবান যাহাদের শাস্তি বিধান করিয়াছেন তাহাদের বাঁচাইবে শ্রীধর মিত্তির? ও চিন্তা করাই অনুচিত। টাকাগুলা শুধু জলে পড়িবে। স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির ছোঁড়াগুলা কিছু টাকার জন্য ধরিয়াছিল! তাহাদের কিছু দিলে কেমন হয়? ঘোড়ার ডিম হয়! যে স্বাস্থ্য তাহাদের আছে তাহারই আহার জোগান কঠিন ব্যাপার। এমনিই ত প্রত্যেকটা ষণ্ডামার্কা। ইহার অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবান হইলে খোরাক জোগাইবে কে! সকলেরই গণেশ উল্টাইয়া যাইবে শেষ কালে!

শ্রীধরের কিছুই মনঃপূত হয় না।

রোজই চিন্তা করেন। কিন্তু কি করিলে যে অর্থটার প্রকৃত সদ্গতি হয় কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন না।

॥ পাঁচ ॥

অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। কি ভীষণ রাত্রি সেদিন! মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত, মুষলধারে বৃষ্টি, প্রবল ঝড়। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বেচারি নকুড় সেই দারুণ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দাহ করিবার জন্য লোক ডাকিতে হইবে। জলধরবাবুর নিকটে গেল। শ্রীধরের উপর জলধরবাবু প্রসন্ন ছিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন যে তাঁহার শরীর খারাপ—এই দুর্যোগের রাত্রে তিনি মড়া বহিতে পারিবেন না। নকুড় তখন পরিচিত অন্যান্য ভদ্রলোকদের নিকটে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং সকাতরে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু মক্ষিচুসের শব বহন করিয়া এই দারুণ রাত্রে তিন ক্রোশ দূরবর্তী শ্মশানে যাইতে কেহই রাজী হইলেন না। একটা না একটা অজুহাত দেখাইয়া সকলেই ঘরে খিল দিলেন। বিপন্ন নকুড় ব্যাকুলভাবে প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল।

॥ ছয় ॥

অনেকক্ষণ পরে নকুড় ফিরিল।

একটিমাত্র লোককে সে জোগাড় করিতে পারিয়াছিল। লোকটি অপর কেহ নয়—ঘোষাল পাড়ার সিগারেটখোর সেই ভদ্রলোকটি। শ্রীধরের মৃত্যুসংবাদে একমাত্র তিনিই বিচলিত হইয়াছিলেন এবং এই নিদারুণ দুর্যোগসত্ত্বেও শব বহন করিতে আপত্তি করেন নাই। ব্লাউসবিলাসিনী তাঁহার পত্নীটিও এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন; নকুড় বাহিরে দাঁড়াইয়া স্বকর্ণে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই মৃত শ্রীধর মিত্র উঠিয়া বসিলেন ও সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "কে কে এলো?"

সিগারেটখোর ভদ্রলোক স্তম্ভিত!

নকুড় সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা করিল। লটারি খেলোয়াড় শ্রীধর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার পর অকস্মাৎ উঠিয়া সিগারেটখোর ভদ্রলোককে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে বন্ধ করিয়া চুম্বন করিলেন। শ্রীধরকে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে নকুড়ও কখনও দেখে নাই। চুম্বনান্তে শ্রীধর বলিলেন—"তোমাকেই আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলাম। নোকড়কেও অবশ্য কিছু দিতে হবে!"

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—"দেখ, নগদ চার লাখ টাকা আছে আমার। তার থেকে ইচ্ছে কর ত স্ত্রী শিক্ষা বাবদ কিছু খরচ করতে পার তুমি। আপত্তি করবার উপায় নেই আর আমার!"

* * *

তাহার পরদিনই যথাবিধি উইল করিয়া শ্রীধর কথাকে কার্যে পরিণত করিলেন। আমরণ এ উইল তিনি পরিবর্তন করেন নাই।

জাগ্রত দেবতা

॥ এক ॥

মন্দিরটি যদিও জীর্ণ, আশে পাশে কচুবন ঘেঁটুবন, দিনান্তে মহাদেবের মাথায় এক ফোটা জল পড়ে কিনা সন্দেহ—মহাদেব কিন্তু জাগ্রত। সনাতনপুরের নাম শোনে নাই কে? জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে। বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়াই মকোদ্দমায় জিতিয়াছেন এবং অত বড় বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পালদের বাড়ীর ছেলেটা টাইফয়েডে তো প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিলই, এই মহাদেবের দ্বারে ধর্ণা দিয়াই তাহার মা তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। মুকুজ্যেদের যে আজকাল এতো বাড়বাড়ন্ত তাহাও এই মহাদেবের কৃপায়। মহাদেবই স্বপ্নে দেখা দিয়া তাহাকে পাটের ব্যবসায়ে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়া হরিহর ঘোষালও লটারিতে টাকা পাইয়াছেন। এরকম ছোটোখাটো প্রমাণ ছাড়াও জীর্ণমন্দিরবাসী মহাদেবের মহিমার আর একটি ভয়ানক প্রমাণ প্রতিবৎসর পাওয়া যায়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া সনাতনপুরে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড উৎসব হয়। বহু নরনারী সেদিন শিবের মাথায় জল ঢালিয়া থাকেন, শিব শিব হর হর ব্যোম ব্যোম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। মুকুজ্যেরা এই উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করাইয়া মহাদেবের স্বপ্ন-ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পান। চৌধুরীদের বাড়ী সেদিন আলোকমালায় সুসজ্জিত হয় এবং গ্রামের সকলে সেদিন সেখানে ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। আরও একটা ঘটনা সেদিন ঘটে—এইটাই মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত প্রমাণ—একজন লোক সেদিন পাগল হইয়া যায়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পাগল ভোলানাথ প্রতি বৎসর একজনকে তাঁহার নিজের দলে টানিয়া লন।

॥ দুই ॥

সে বছরও বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। মুকুজ্যেদের বাড়ীতে অভিনীত ‘কর্ণার্জুন’ নাটকের অভিনয়-চমৎকারিত্বে সকলেই পুলকিত। চৌধুরী বাড়ীতে যদিও পায়েসটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল তথাপি সকলে পরিতৃপ্তি সহকারেই আহার করিয়াছিলেন। মেলাটাও বেশ জাঁকজমক সহকারেই বসিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সংখ্যাও নিতান্ত কম আসে নাই। উৎসবের পরদিন এই সব লইয়া পালদের চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় যাদব আসিয়া বলিল, ওহে শুনেছ, এ বছর কেউ পাগল হয়নি!

সমস্ত আলোচনা থামিয়া গেল। বলে কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! হরেন বলিল, কেন, ওই গেঁজেল বিশেটা?

যাদব বলিল, দেখে এলাম ঠিক আছে।

সকলেই আশা করিয়াছিল বিশেই এবার মহাদেবের মান রক্ষা করিবে ! সেও ঠিক আছে !

প্রবীণ নীলমণি এতক্ষণ নীরবে তামাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এ হতে পারে না, ভাল করে খ‌ুঁজে দেখ, কেউ না কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে !

যাদব বলিল, এবার সকলের মাথা ঠিক আছে, কেউ বেঠিক হয়নি।

নীলমণি বলিলেন, এ হতে পারে না।

যাদব হাসিয়া বলিল, আমি বলছি কেউ পাগল হয়নি এবার !

নীলমণি ধমকাইয়া উঠিলেন।

তুমি তো সেদিনকার ছোঁড়া হে, তোমার কথার আবার ম‌ূল্য কি! তোমার কথায় কি চিরকালের নিয়ম উল্টে যাবে ? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ না কেউ পাগল, এখনও জানা যায়নি !

যাদব স্মিতম‌ুখে নীরব হইয়া রহিল।

॥ তিন ॥

পরদিনও কোন পাগলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনাতনপ‌ুরবাসীরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয় কোন অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যই এ বছর কেহ পাগল হয় নাই ! নানালোকে নানাকথা বলিতে লাগিল। মহিলাগণ বলিলেন এ রকমটা যে ঘটিবে তাহা তাহারা প‌ূর্বেই অন‌ুমান করিয়াছিলেন ! বছরে মাত্র একদিন মহাদেবকে লইয়া ঘটা করিলে কি হইবে, বাকী তিন শো চৌষট্টি দিন তো শিবকে কেউ পোঁছেও না, শিবের মাথায় একফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ে না। মহাদেব বলিয়াই এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন ! কিন্তু আর কত সহিবেন ? মাতব্বর হালদার মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে ইহা আর কিছ‌ুই নয়,—কলির প্রতাপ। কলি নিজের প্রতাপ দেখাইবেন না ? সনাতনপ‌ুরের মহাদেব বলিয়াই এতকাল নিজ-প্রতাপ বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, অন্য কোন মহাদেব হইলে কোন কালে তলাইয়া যাইতেন। উদাহরণস্বর‌ূপ তিনি কয়েকটি মহাদেবের অধঃপতনের ইতিহাস বিব‌ৃত করিলেন। ধনী ম‌ুকুজ্যেরা দায়ী করিলেন প‌ুরোহিতকে—ওই ব্যাটাই কিছ‌ু গোলমাল করিয়াছে। প‌ুরোহিত চৌধ‌ুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নাম-হীন একটা বিপদের ছায়া সনাতনপ‌ুরের সকলকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিল।

॥ চার ॥

দমিলেন না কেবল দ‌ৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।

তাঁহার বিশ্বাস কেহ না কেহ নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খ‌ুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপ‌ুরের ব‌ুড়ো শিবের মাহাত্ম্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে ? হইতেই পারে না।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত চক্ষু স্ফীত-নাসা! ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল! তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে!

সনাতনপুরবাসিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।

ত্রিবেণী

॥ এক ॥

সে সব শুনিতেছিল।

—অতি বিচ্ছিরি ওষুধ আমি খেতে পারব না।

—ডক্টর বোস তো ব'লে গেলেন মিষ্টি হবে খেতে।

—মিষ্টি না ছাই, যা বিচ্ছিরি গন্ধ!

—কোথায় গন্ধ, তোর যত অনাছিষ্টি বাপু, নে, খেয়ে নে, বিজন আবার এসে পড়বে এখুনি। ছোট বউ, কটা বাজল দেখ তো। ওরে হীরু, পিকদানিটা দিয়ে যা, কতক্ষণ ধ'রে ধুচ্ছিস্?

হীরু পিকদানি দিয়া গেল।

পাশের ঘর হইতে ছোট বউ মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, সাড়ে দশটা বেজেছে।

—তা হ'লে তো আর দেরি নেই মোটে। নে, খেয়ে নে ওষুধটা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব আমি বাপু।

—কে দাঁড়িয়ে থাকতে বলছে তোমাকে, যাও না তুমি!

—ওষুধ খাবি না তুই?

—অত বিচ্ছিরি ওষুধ আমি খেতে পারব না।

—লক্ষ্মীটি।

—উঁ, তুমি খালি খালি বিচ্ছিরি ওষুধ খাওয়াবে আমাকে!

—কি করব বল মা, তখন আমার মানা তো শুনলে না, দল বেঁধে গেলে সিনেমায় ফিনফিনে ব্লাউজ গায়ে দিয়ে, এখন ভোগ। ডক্টর বোস বলেছেন ইনফ্লুয়েঞ্জা, চার পাঁচ দিন লাগবে সারতে।

—কিচ্ছু জানে না ডক্টর বোস, তোমাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ষোলটা ক'রে টাকা নিয়ে যায় খালি, আর যত রাজ্যের বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ওষুধ লিখতে জানে!

—বিলেতফেরত বড় ডাক্তার—সে কিচ্ছু জানে না, আর তুমি মহা পণ্ডিত হয়েছ!

—হয়েছিই তো।

—নে, খেয়ে নে শিগ্গির, ঠাকুর পায়েসটার কতদূর কি করলে, কে জানে! ওরে হীরু!

—আজ্ঞে মা, যাই।

—পোলাওটার চারপাশে আঙরা দিয়ে রাখতে হবে, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না হ'লে। তুই কাঠকয়লাগুলো ধরা ততক্ষণ। কি করছিস তুই ?

—বাসন মাজছি।

—আগে কাঠকয়লাগুলো ধরা।

—আচ্ছা।

—খেয়ে নে ওষুধটা তাড়াতাড়ি, অনেক কাজ আমার।

—কি কি রান্না হয়েছে আজ মা ?

—কই আর করতে পারলুম সব, কাঁকড়া ভেটকিমাছ এসেই পৌঁছল না। কেষ্ট যত বুড়ো হচ্ছে, তত যেন ওর ভীমরতি হচ্ছে।

—গলদা চিংড়ি এসেছে ?

—এসেছে।

—ফ্রাই করেছ বুঝি ?

—যা মূর্তিমান ঠাকুরটি জুটেছে, কি রকম যে কি করছে কে জানে ! কিমাগুলো আমি না গিয়ে পড়লে তো মাটিই ক'রে ফেলত আর একটু হ'লে।

—ফাউলের কি করলে ?

—রোস্ট্।

—মাটনের কোর্মা করেছ বুঝি ?

—কি আর করি, তুই ভাল থাকলে কাবাব করতে পারতিস। কাবাব করা আনাড়ি ঠাকুরের কর্ম নয়। নে, ওষুধটা খেয়ে নে।

—কত সব ভাল ভাল রান্না হচ্ছে বাড়িতে, আর আমাকে ওষুধ গেলাচ্ছ খালি। খাব না যাও আমি ওষুধ।

—আচ্ছা, তুই কি !

—এক দাগ তো খেয়েছি।

—এক দাগে অসুখ সারলে আর ভাবনা ছিল না। নে, খেয়ে নে, আর জ্বালাস নি।

—তুমি ঢাকা দিয়ে রেখে যাও, আমি খাব এখন পরে।

—দশটার সময় খাওয়ার কথা, সাড়ে দশটা বেজেছে, আবার পরে কেন ?

—ভাল লাগে না।

—আজ বাদে কাল বিয়ে হবে মেয়ের, খুকিপনা এখনও ঘুচল না।

—বিয়ে আমি করছি কিনা। আই. এ. পড়ব।

—দুবার ফেল ক'রে ম্যাট্রিক পাস করেছেন, আবার আই. এ. পড়ার সখ !

—বারে, সে কি আমার দোষ নাকি ? সবাই মিলে কার্সিয়ঙে নিয়ে গিয়ে আমাকে পড়তে দিলে নাকি একটুও ? খালি পার্টি আর পার্টি। তার আগের বারটা তো দিদির বিয়ের হাঙ্গামেই গেল। নিজেরা যত হাঙ্গামা জোটাবেন, আর দোষ হবে আমার !

—বেশ বেশ, সব দোষ আমাদের। এখন ওষুধটা খেয়ে নাও দেখি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—মা, পুডিং করেছ ?

—পুডিং না করলে চলে, বিজন আসছে।

—আমি পুডিং খাব একটু।

—ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস ক'রে দিতে পারি না মা।

—ডক্টর বোস তো দুধ এগ্‌ফ্লিপ সব খেতে বলেছেন। পুডিঙেও তো দুধ আর ডিম আছে। আর ভারী তো নাইণ্টি-নাইন জ্বর।

—নাইণ্টি-নাইন থেকে একশো পাঁচ হতে বেশি দেরি লাগে না মা। সেবার অমিতার বেলায় দেখেছি তো।

—পুডিং না দিলে আমি ওষুধ খাচ্ছি না।

—কাল খাস, রেফ্রিজারেটারে রেখে দোব।

—জামাইবাবু যা ভালবাসে তোমার হাতের পুডিং, সব শেষ করবে আজকেই। আমাকে এ—কটু দাও, তোমার জামাইয়ের ভাগে কিছু কম পড়বে না।

—তোকে নিয়ে আর পারি না বাপু। ডক্টর বোসকে ফোনে তা হ'লে জিজ্ঞেস করি; থাম, নিজের দায়িত্বে দিতে পারব না আমি। সাউথ থ্রী ফাইভ ও প্লীজ। ইয়েস। হ্যালো, কে, ডক্টর বোস? ও, ডক্টর বোস বাড়ি নেই, আমি মিসেস হালদার, ডক্টর বোস কখন ফিরবেন? ঠিক নেই? আচ্ছা, ধন্যবাদ।

—একটু দাও আমাকে, একটু খেলে কিছু হবে না।

—না মা। ডাক্তারকে না জিজ্ঞেস ক'রে দিচ্ছি না আমি। সেবার অমিতার বেলায় আধখানি কেক দিয়ে সে কি কাণ্ড!

—দিদির তো টাইফয়েড হয়েছিল!

—পরে না সেটা বোঝা গেল! গোড়ায় গোড়ায় তো প্রমথ ডাক্তার ইনফ্লুয়েঞ্জাই বলেছিল।

—বিলেত-ফেরত এই চালিয়াতটার চেয়ে বুড়ো প্রমথ ডাক্তার ঢের ভাল।

—আচ্ছা আচ্ছা, কাল তোমার প্রমথ ডাক্তারকেই ডাকা যাবে জ্বর যদি না ছাড়ে, এখন তো এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

—বড্ড বিচ্ছিরি যে।

—ছোট বউ, বেদানাগুলো ছাড়িয়ে আন তো।

—বেদানা খাব না।

—তবে আপেলটাই কেটে আন।

—আপেল বিচ্ছিরি।

—আঙুর তো ফুরিয়েছে, কেষ্টকে তখুনি বললুম আর এক বাক্স এনে রাখতে, দু বাক্সে কুলোয় কখনও! নাকটা টিপে ঢক ক'রে খেয়ে ফেল না মা, কতটুকুই বা! কি আনলে তুমি ছোট বউ?

মৃদুস্বরে ছোট বউ বলিলেন, আপেল, বেদানা, পেয়ারা।

—ওসব চাই না আমার, চারটি সুপুরি আর ধনের চাল ভাজা দাও।

—ও তো বললে খাব না, তবু কেন তুমি এগুলো কেটেকুটে নষ্ট করলে! সবাই মিলে পাগল ক'রে দেবে দেখছি আমাকে!

ছোট বউ কোন উত্তর দিলেন না।

—আচ্ছা, আমি এমনই খাচ্ছি, কিন্তু তার বদলে একটা জিনিস দিতে হবে আমাকে।

—কি আবার?

—ঝুমকো।

—এই ত সেদিন দুল গড়ালে, আবার ঝুমকো ?

— তা হ'লে ওষুধ খাব না যাও।

—তোকে নিয়ে আর পারি না আমি অনি।

—উঁ, কতদিন থেকে তো বলেছ, ঝুমকো গড়িয়ে দেবে। মালতী, রুবি, ফুলু—সক্কলের গড়িয়ে পুরনো হয়ে গেল।

—বেশ বেশ মা, তুমিও গড়িও, এখন ওষুধটা খেয়ে উদ্ধার কর আমায়। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আমি !

— এই বারটি খাচ্ছি, আর খাব না কিন্তু।

—পরের কথা পরে হবে, এবারটি তো খাও।

—তোমাকে চিনি না আমি ? প্রত্যেক বারই ওই কথা বলবে।

—অনি, আর কথা বাড়াস নি, ভাল লাগছে না আমার।

—বলছি তো খাব, দাও না, কিন্তু এই বারটি।

—বাবা বাবা, এক দাগ ওষুধ খাবেন মেয়ে, তা নিয়ে কি কাণ্ড !

—জল জল, শিগ্‌গির।

—এই যে, নে না।

হীরু আসিয়া বলিল, কয়লা ধরানো হয়েছে মা।

—আচ্ছা, তুই পিকদানিটা নিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফের দিয়ে যা।

—নাকটা ছাড়িস নি তুই অনি, চেপে থাক জোরে।

নাক-চাপা কণ্ঠস্বরে অনি বলিল, কতক্ষণ চেপে থাকব, এবার ছাড়ছি আমি।

—থাম, পিকদানিটা আনুক।

হীরু পিকদানি দিয়া গেল।

—চুপটি ক'রে শুয়ে থাক এবার, আমি রান্নার দিকটা দেখিগে একটু। ছোট বউ না হয় কাছে বসুক।

—না, কাউকে বসতে হবে না। তুমি ওই আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও। চোখের সামনে দপদপ ক'রে জ্বলছে। মাথা আমার আরও ধ'রে গেল।

—বেশ, এটা নিবিয়ে দিচ্ছি, শিয়রের দিকের নীল আলোটা জ্বলুক।

উজ্জ্বল আলোটা নিবিয়া গেল। স্নিগ্ধ নীল আলোয় সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর জানালার কাছে আবছা একটা মূর্তি দেখা গেল। অনি জানালায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঔষধটা ফেলিয়া দিতেছে। ষোল টাকা ভিজিটওয়ালা ডাক্তারের দামী ঔষধ সমস্তটা ফেলিয়া দিল।

সে সব দেখিতেছিল।

তাহার কেবল মনে হইতেছিল, তাহার প্রথম পক্ষের মেয়েটা মরিবার সময় এক ফোঁটা ঔষধ পায় নাই। বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে মারা গিয়াছে। হাসপাতালের ঔষধ পর্যন্ত আনা হয় নাই। কেমন করিয়া আনিবে ! সে যে-নিজেও তখন শয্যাগত। স্ত্রীও ছিল না। জমিদার-তনয় তাহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন !

॥ দুই ॥

একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল বোধ হয়। হর্ন শোনা গেল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। বিলাতী কুকুর, গলার আওয়াজেই বোঝা যাইতেছে। অনেকগুলো পদশব্দ, জিনিসপত্র নামানোর শব্দ।

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—বিজন এল বুঝি? ওমা, সায়েবি পোষাকে চেনাই যে যায় না দেখছি! তারপর, এস বাবা, এস। থাক, আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না। তারপর খবর সব ভাল তো?

বিনীত অথচ পুরুষকণ্ঠে উত্তর হইল. আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানকার খবর সব ভাল?

—ভাল আর কই, অনি জ্বরে পড়েছে।

—তাই নাকি?

—একা মুশকিলে পড়েছি আমি। ওঁকে টেলিগ্রাম পেয়ে বম্বে চ'লে যেতে হ'ল, ডিরেক্টার্সদের মিটিং সেখানে। যাবার দিন বার্থ রিজার্ভ নিয়ে সে আবার এক হাঙ্গামা, কেষ্টকে তো চেনই, কি ফোন করতে কি ফোন করেছে ওই জানে, বার্থ রিজার্ভ হয় নি। সে এক কাণ্ড!

—অনিতার ক'দিনের জ্বর?

—কাল থেকে হয়েছে। ডক্টর বোসকে ডেকেছিলাম, তিনি বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা। ওমা, ও বাড়ীর হারাণকাকা আসছেন, আমি যাই, তুমি দেরি ক'রো না বেশী।

গৃহিণীর চলিয়া যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

—বিজন ভায়া এসে পড়লে নাকি? থাক, থাক, আর পেন্নামে কাজ নাই, প্যাণ্টালুনের বোতাম ছিঁড়ে যাবে। হ্যাঁ, অমিতাদির ক্ষমতা আছে বটে! সাত দিন যেতে না যেতেই—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্—

হারাণবাবু তাঁহার নিজস্ব ধরনে হাসিতে লাগিলেন।

—আমার জিনিসটা এনেছ তো?

—এনেছি। কিন্তু রুপোর সেট, অন্য কিছু তেমন পছন্দ হ'ল না, জয়পুরী কাজ।

—ওরে বাবা, ডুবিয়েছ তা হ'লে বল!

—আপনাকে ডোবাবার মত সমুদ্র পৃথিবীতে আছে নাকি?

—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্ এহ্।

—হঠাৎ এ সখ হ'ল যে! দিদিমার বুঝি আবার—

—আরে না না, সে সব কিছু নয়। বিয়েতে উপহার দিতে হবে একটা।

—সে কথা জানলে অন্য রকম আনতুম। দিদিমাকে লক্ষ্য ক'রেই রাশটা আলগা ক'রে দিয়েছিলুম।

—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্ এহ্।

—তারপর এখানকার খবর কি?

—আমার মুখে তো সে সব ভাল শোনাবে না। স্বস্থানে সব শোন গিয়ে। আমি যাই এখন, অমিতাদির অভিশাপ কুড়িয়ে লাভ নেই—এহ্ এহ্ এহ্ এহ্—কাল আসব আবার।

হারাণকাকা চলিয়া গেলেন। বিজনও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুড়মুড় করিয়া একটা গুরুভার পতনের শব্দ হইল।

—কি হ'ল?

সুটকেস ও হোল্ড্-অলের ভারে হীর‍্ চাকরটা চকচকে মার্বেলের মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। সুটকেস ও হোল্ড-অলের কোন ক্ষতি হইল কি না, তাহা নির‍্পণ করিতেই সকলে প্রথমটা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর নজর পড়িল হীর‍্র প্রতি।

—লেগেছে নাকি, ওকি, রক্ত পড়ছে যে!

বিনীতকণ্ঠে হীর‍্ বলিল, না, বেশি লাগে নি।

— আচ্ছা জামাইবাব‍্, কি ব'লে আপনি আজ এলেন?

— উৎকণ্ঠিত হয়ে আছ ব‍্ঝতে পারছি, কিন্তু কি করি ছ‍্টি পেলাম না।

—ব'য়ে গেছে আমার উৎকণ্ঠিত হতে।

—জ‍্বর খ‍্ব বেশী নাকি?

—নাইণ্টি-নাইন।

—এত কম জ‍্বরে সাধারণত লোক ভুল বকে না।

—ভুল বকলাম কখন?

—চির-উৎকণ্ঠিতা তুমি, অথচ বলছ, ব'য়ে গেছে আমার উৎকণ্ঠিত হতে? এ যে বড় আশঙ্কাজনক উক্তি!

— অহঙ্কারটা একটু কমান।

—কমিয়ে দিন। সেইজন্যেই তো আসা।

—কেন আজ এলেন আপনি? নিজ বেশ মজা ক'রে নানা রকম জিনিস খাবেন, আর আমাকে শ‍্য়ে শ‍্য়ে ওষ‍্ধ খেতে হবে।

—সেটা কি আমার দোষ?

— না তো কি? আরো দ‍্দিন পরে এলেই হ'ত।

—দেখি নাড়ীটা?

—আপনি কি ডাক্তার?

—শালীর নাড়ী বোঝবার জন্যে ডাক্তার হওয়ার দরকার করে না।

—উঃ, উঃ, লাগছে—ছাড়‍্ন।

পাশের ঘরটা সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল।

গ‍ৃহিণীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

— অমিতা, ত‍্ই বিজনের খাবার কাছে থাক একটু। আমি চান ক'রে আহ্নিকটা সেরে ফেলিগে, রাত অনেক হয়েছে। তুমি আর দেরি ক'র না বাবা, ব'সে পড়।

গ‍ৃহিণী স্নান-আহ্নিকের ছ‍্তা করিয়া কন্যা-জামাতাকে আলাপের সুযোগ দিয়া চলিয়া গেলেন।

অমিতা বলিল, তুমি এলেই মায়ের বিপদ।

—কেন?

—তুমি এলেই উনি ফাউল আনাবেন, কারও মানা শ‍্নবেন না, আর ফাউল ছ‍্ঁয়ে চানও করবেন রাত দ‍্প‍্রে।

—তার চেয়েও বেশি মর্মান্তিক ট্রাজেডি, আমার ক্ষিধে নেই। বর্তমানে কেল‍্নারে ঢুকে এক পেট খেয়েছি।

—কেল্‌নারে ঢুকে খেতে যাওয়া কেন আবার ?

—ক্ষিধে পেয়েছিল।

—এখানেও খেতে হবে সব। একটি জিনিসও পাতে প'ড়ে থাকলে চলবে না। মা সেই দুপুর থেকে ব'সে ব'সে সব করিয়েছেন।

—তা হ'লে কি তোমার ইচ্ছেটা, জিনিসগুলো প'ড়ে না থেকে আমি প'ড়ে থাকি ? এসব খেলে তো আমি আর উঠতে পারব না এখান থেকে।

—একটু একটু ক'রে খাও না।

—একটা জিনিস খেতে পারি।

বিজন চুপি চুপি কি বলিল, শোনা গেল না।

অমিতা তর্জন করিয়া উঠিল, লোভীটা !

একটু পরে।

হীরু বলিল, কুকুরটা আর খেতে পারছে না মা।

—কি আর হবে তা হ'লে, কুড়িয়ে বাড়িয়ে ডাস্ট্‌বিনে ফেলে দিগে যা।

—আচ্ছা।

—আমি এবার শুতে যাচ্ছি। তুই চায়ের টেবিলটায় সব গুছিয়ে রেখেছিস তো ? নতুন চাকরের সঙ্গে বকতে বকতে প্রাণটা গেল।

—রেখেছি মা।

—অনির ঘরের জানালার পরদাগুলো টেনে দিয়েছিস ?

—দিয়েছি।

—খিড়কির দরজাটায় বাইরে থেকে তালাটা টিপে দিয়ে যাস্‌।

—আচ্ছা।

গৃহিণী শুইতে গেলেন।

হীরু চাকরও চলিয়া গেল। চতুর্দিকে নীরবতা ঘনাইয়া আসিল।

সে আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রথম স্ত্রীকে গ্রাস করিয়াছে জমিদার, দ্বিতীয় স্ত্রীকে যক্ষ্মা। ঘরে একপাল অনাহারক্লিষ্ট ছেলেমেয়ে। বাজারেও আজকাল ধার জোটে না। ডাস্টবিনটা একবার দেখিয়া আসিলে কি হয় ! ভাল মন্দ জিনিস—না, দরকার নাই। অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া সে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল। অমিতা ও বিজন যে ঘরটায় শুইয়াছিল, সেই ঘরের জানালাটার নীচে আসিয়া কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কিছু শোনা গেল না। সন্তর্পণে উঠিয়া জানালায় কান পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিল। না, কোন সাড়াশব্দ নাই। চাকরটাও ঘুমাইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে সিঁধকাঠিটা বাহির করিয়া সে কাজ শুরু করিয়া দিল।

মাসখানেক পরে চোরের শাস্তি হইল।

থানার দারোগা, কোর্ট-ইন্সপেক্টর, কয়েকজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী, সকলের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া মাননীয় বিচারপতি মহাশয় অকাট্য প্রমাণ পাইলেন যে, হীরু চাকরটাই চুরি করিয়াছিল।

আইন অনুযায়ী তাহার সাজা হইয়া গেল।

মাধব মুকুজ্যে

[রাত্রি দশটা। অমাবস্যার রাত্রি, চতুর্দিকে অন্ধকার। মাধব মুকুজ্যে ক্লাব হইতে ফিরিতেছিলেন, পথে চাটুজ্যে মহাশয়ের সহিত দেখা। চাটুজ্যের হাতে লণ্ঠন।]

মুকুজ্যে। কিহে চাটুজ্যে, খবর কি ?

চাটুজ্যে। চলে যাচ্ছে !

মুকুজ্যে। মেয়ের বিয়ের কিছু হল ?

চাটুজ্যে। কই আর হল ভাই। বিনা পণে কোন সুপাত্রই বিয়ে করতে রাজি নয়। অথচ দেখ আমার মেয়ে কিছু নিন্দের নয়। লেখাপড়াও কিছু জানে, গেরস্তালি কাজকর্মে নিখুঁত, শেলায়ের কাজ নেহাৎ মন্দ করে না, গান বাজনাও কিছু শিখেছে, কিন্তু হলে কি হবে সাড়ে তিন হাজারের কম কোন ব্যাটাই রাজি হয় না ! এমন সমাজে বাস করি—

মুকুজ্যে। সমাজের দোষ দিও না। তুমি নিজে অসমর্থ তাই বল।

চাটুজ্যে। সমাজের দোষ নয়, বল কি তুমি !

মুকুজ্যে। [গম্ভীর ভাবে] সমাজের বিন্দুমাত্র দোষ নেই।

চাটুজ্যে। বিন্দুমাত্র দোষ নেই ?

মুকুজ্যে। না।

[চাটুজ্যে উত্তেজিত হইলেন। বাঁ-হাতি গলিটার মধ্যে মধ্যে ঢুকিয়া কিছুদূর গেলেই তাঁহার বাড়ি। কিন্তু তিনি গলিতে ঢুকিলেন না, তর্ক করিতে করিতে মুকুজ্যের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।]

চাটুজ্যে। তোমার মতে তাহলে পণপ্রথাটা অন্যায় নয়। আমার ধারণা ছিল তুমি পণপ্রথার বিরোধী।

মুকুজ্যে। পণপ্রথা যদি অন্যায় হয় তাহলে ট্রেনে টিকিট কেটে যাওয়ার প্রথাটাও অন্যায়।

চাটুজ্যে। তার মানে ?

মুকুজ্যে। তুমি কাশ্মীর বা গোহাটী যাবার বেলায় রেল-কোম্পানিকে পয়সা দিতে ইতস্তত কর না, যে ক্লাসে চড়ে যাও সেই ক্লাসের মতই ভাড়া দাও, অথচ মেয়ে পার করবার বেলায় পাত্রের যোগ্যতা অনুসারে দাম দিতে চাও না, এরই বা মানে কি !

[চাটুজ্যে একটু থতমত খাইলেন। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিলেন।]

চাটুজ্যে। কাশ্মীর বা গোহাটী যাওয়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়ের তুলনা চলে না।

মুকুজ্যে। চলবে না কেন, খুব চলে। রেলে গমনাগমন করাও তোমার যেমন প্রয়োজন, মেয়ের বিয়ে দেওয়াও তেমনি তোমার প্রয়োজন। একটার জন্যে স্বচ্ছন্দে পয়সা খরচ করতে তোমার আপত্তি হয় না, আর একটার জন্যে হয় কেন ?

চাটুজ্যে। বিয়েটা একটা সামাজিক ব্যাপার। ও নিয়ে অত দর কষাকষি করা—

মুকুজ্যে। তুমি যে পুরুতগিরি কর, বিনা দক্ষিণায় কর ? ওটাও তো সামাজিক

ব্যাপার! ডাক্তার, মাস্টার, উকীল, লেখক, ব্যবসাদার—সবাই নিজের যোগ্যতা অনুসারে মূল্য নেয়, বরই বা নেবে না কেন?

চাটুজ্যে। তা বলে এত নেবে?

মুকুজ্যে। খুব বেশি কি? যে ধরনের পাত্র তুমি চাও সে হিসেবে খুব বেশী নয়। ফার্স্টক্লাসে যেতে হলে বেশী ভাড়া দিতে হবে না? থার্ডক্লাসে যাও, কম ভাড়ায় হবে। তোমরা সবাই যে ফার্স্টক্লাস পাত্র চাও! দেখতে ভাল হবে, বিদ্বান হবে, উপার্জনশীল হবে, বংশ ভাল হবে, সচ্চরিত্র হবে, বাপের বিষয় থাকবে, দোজবরে হবে না! অর্থাৎ চাও একটি নিখুঁত জিনিস, কিন্তু বিনা পয়সায় তা কি কখনও হয়? হওয়া উচিতও নয়।

চাটুজ্যে। উচিত নয়?

মুকুজ্যে। নিশ্চয় নয়। তোমার মেয়ের ভরণপোষণের জন্য তুমিই দায়ী। কিন্তু সে দায়িত্ব নির্বিবাদে চাপিয়ে দিতে চাও আর একজনের স্কন্ধে। বিনা পয়সায় এ ভার সে নেবে কেন? একটি মেয়ের ভরণপোষণের খরচ যদি গড়পড়তায় মাসে পনেরো টাকা করেও ধর এবং তার বিবাহিত জীবন যদি কুড়ি বছর হয় মনে কর তাহলে একুনে কত টাকা হয় হিসেব করে দিকি! সাড়ে তিন হাজার টাকার উপর হয়। আইনত, এই টাকাটা তোমারই দেয়, কারণ তুমিই মেয়েটির জন্মদাতা। তুমি তোমার মেয়েকে যে স্টাইলে রাখো সেই অনুসারেই হিসেব করলাম, মেয়েকে যদি বড়লোকের ঘরে দিতে চাও তাহলে অংকটা আরও বেশী হবে।

চাটুজ্যে। অংক তো বুঝলাম, কিন্তু বিয়ে করাটা কি কেবল মেয়েরই প্রয়োজন, ছেলের নয়?

মুকুজ্যে। এখানে তো ছেলেমেয়ের প্রয়োজনের প্রশ্ন উঠছে না। এখানে তোমার প্রয়োজনটাই মুখ্য। তুমি তোমার প্রেসটিজ, কুল, গোত্র, গণ বাঁচিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাও। বেশ ত, হও না! আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেতে চাও, ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ কর। কিন্তু ফার্স্টক্লাসে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েও যাবে অথচ পয়সা চাইলেই নাকে কাঁদবে এ মনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনের কথা তুলেছিলে—

চাটুজ্যে। হ্যাঁ তুলেছিলাম বৈ কি—

মুকুজ্যে। তাদের প্রয়োজন তারাই অনায়াসে মিটিয়ে নিতে পারতো যদি আমরা তাদের বাধা না দিতাম। তোমার যুবতী মেয়ে যদি স্বাভাবিক নিয়মে কোন বলিষ্ঠ সদ্গোপ যুবককে আকৃষ্ট করে তাহলে তুমিই সবচেয়ে বেশী খাপ্পা হয়ে উঠবে। অথচ যদি ঐ ছোকরাটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হও একটি পয়সা পণ লাগবে না তোমার। উলটে হয়তো ওই ছোকরাই কিছু দেবে তোমাকে—

চাটুজ্যে। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যত তো ভাবতে হবে। সে যদি মোহে পড়ে যাকে তাকে একটা—

মুকুজ্যে। ঠিক কথা। তাকে মোহ থেকে বাঁচিয়ে তার ভবিষ্যত যদি ইনসিওর করতে চাও প্রিমিয়ম দিতে হবে। এবং যে কোম্পানি যত ভাল তার প্রিমিয়মও তত বেশী—এ তো সোজা হিসেব!

চাটুজ্যে। তাহলে কি তুমি বলতে চাও—

মুকুজ্যে। আর আমি কিছু বলতে চাই না। বাড়ি পেঁছে গেছি, এবার তুমি যেতে পারো! (হাসিলেন)

চাটুজ্যে। না, না, কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক, দাঁড়াও।

মুকুজ্যে। পরিষ্কারই তো আছে! (হাসিয়া) আরে, এ কথাটা ভুলে যাও কেন, আমার নিজেরই চারচারটি বিবাহ-যোগ্যা মেয়ে বর্তমান! কিন্তু আজ অন্ধকার ভীষণ, টর্চটা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার হাতে লণ্ঠনটা দেখে তর্কটা তুললাম। তর্ক না তুললে কি তুমি আসতে আমার সঙ্গে এতদূর?

চাটুজ্যে। তাহলে তোমার মত পণপ্রথাটা—

মুকুজ্যে। অতিশয় খারাপ।

মুকুজ্যে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।]

নির্ভর

বেরি-বেরি হইয়াছিল, চেঞ্জে আসিয়াছি!

শুনিলাম দিবাকরবাবুই এখানে বিচক্ষণ নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক। তাঁহাকেই ডাকিয়াছিলাম এবং তাঁহার উপদেশাবলী মন দিয়া শুনিতেছিলাম।

ডাক্তারবাবু বলিতেছিলেন, "দেখুন ওভারলোড্ করবেন না কখনও নিজেকে, অল্প অল্প খাবেন, বারে বেশী খেতে পারেন কিন্তু একবারে কখনো বেশী খাবেন না। আপনার হার্ট খারাপ, বেশী খেলেই কষ্ট পাবেন। আর একটা কথা—অ্যাণ্ড্ দিস্ ইজ মোস্ট ইম্পর্টাণ্ট—রেস্ট। ফিজিকাল্ অ্যাণ্ড্ সাইকিকাল্ রেস্ট্। বিশ্রাম করতে হবে। বেশী চলাফেরা করা, বেশী উত্তেজিত হওয়া এ-সব একেবারে চলবে না।" সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "উপন্যাস টুপন্যাস পড়তে পাবো তো?" ডাক্তারবাবুর কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা দিল। বলিলেন, "উত্তেজনামূলক উপন্যাস না পড়াই ভাল। সাদা-মাটা গোছের হলে পড়তে পারেন!"

তাহার পর তিনি নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দিলেন মানসিক উত্তেজনায় হার্টের গতি-বেগ দ্রুততর হয় এবং দুর্বল হার্টের গতি-বেগ দ্রুততর হইলে তাহা বিপজ্জনক হইয়া থাকে। আমার হার্টের রিজার্ভ শক্তি না-কি খুব কম।

"বই পড়ার দরকার কি, সামনের জানালাটা খুলে দিয়ে সিনারি দেখুন! এমন চমৎকার সিনারি রয়েছে আপনার বাড়ির সামনে দিব্যি দেখুন না বসে বসে, আপনার সময় কাটাবার ভাবনা কি!"

বুঝিলাম তর্ক করা নিষ্ফল।

"সিগারেট খেতে পারি?"

"একদম নয়!"

অপ্রতিভমুখে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "খাবার কি কি খেতে পারি—"

"খেতে সবই পারেন কিন্তু সেটা লঘু-পথ্য হওয়া চাই, গুরুপাক কিছু খেলেই কষ্ট পাবেন। তেল একদম চলবে না। আর এমন কোন জিনিস খাবেন না যাতে পেটে গ্যাস হয়। দু'একখানা লাইট বিস্কুট, কি টোস্ট, দু'একটা ভাজাভুজি—কিন্তু ঘিয়ে মাইণ্ড-দ্যাট—একটু চা, যদি সহ্য হয় একটু দুধ কিম্বা ডিম, দু'একখানা হাতে-গড়া রুটি এইসব

খাবেন আর কি, যখন যেটা সুট করে। খাওয়াটা নিজেই ঠিক করে নিতে হবে আপনাকে। কোন্ খাবার কা'কে সুট করবে তা অফ্-হ্যাণ্ড বলা বড় শক্ত! কেউ এক কুঁচি শশা খেয়েই আই-ঢাই করে, কারো আবার এককাপ দুধ খেলেও কিছু হয় না। দুটি জিনিস কেবল লক্ষ্য রাখবেন—ওভারলোড্ করবেন না আর পেটে যেন গ্যাস না হয়। তা'হলেই ভাল থাকবেন। ভাতটা খাবেন না।"

"ওষুধ-বিষুধ কিছু দেবেন কি?"

"ওষুধ দিতে হবে বই কি, কাগজ দিন একখানা—"

পকেট হইতে চশমার খাপ বাহির করিলেন এবং খাপ হইতে বেশ পুরু রিম-ওয়ালা একটি চশমা বাহির করিয়া পরিধান করিলেন। টেবিলের উপর একখানা প্যাড্ ছিল, আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তারবাবু পুরা দুইখানি পাতায় ঔষধের ফর্দ লিখিয়া দিলেন। দুইটি মিক্শ্চার—একটি গ্যাস-নিবারক, অপরটি হৃৎপিণ্ডের শক্তিবর্ধক। একটি কোষ্ঠ-পরিষ্কারক পুরিয়াও দিলেন, প্রয়োজন হইলে রাত্রে শুইবার সময় খাইতে হইবে। ভিটামিন-বি-ঘটিত একটা পেটেণ্ট ঔষধও প্রত্যহ দুইবার করিয়া চলিবে। ইহা ছাড়া আপাততঃ সপ্তাহে চারটি করিয়া ইন্জেক্শন্ লইতে হইবে, একটি গ্লুকোজ পঞ্চাশ সি. সি. এবং তিনটি ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামের কোর্স শেষ হইলে ভিটামিন বি'র ইন্জেক্শন শুরু করিবেন। ভিটামিন বি বেরি-বেরির হার্টের পক্ষে না কি খুবই উপকারী। এ-সব ছাড়া তিনি ব্রাণ্ডি প্রভৃতি দিয়া আর একটি মিকশ্চার লিখিয়া দিলেন সময়-অসময় রাত-বিরাতে যদি হার্ট বিগড়াইয়া যায় একদাগ খাইয়া ফেলিতে হইবে।

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "রোজ দু'বেলা আপনার ব্লাড্-প্রেশারটা মাপতে হবে। ডায়াস্টোলিক্ প্রেশার আর পাল্স্-প্রেশারটা দু'বেলাই দেখা দরকার—"

"বেশ—"

চশমাটি খুলিয়া খাপে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, "হ্যাঁ, আর একটি কথা মশাই, পুবে হাওয়াটি বাঁচিয়ে চলবেন। পুবে হাওয়া গায়ে লাগলে, কি জানি কেন, হার্ট'টা একটু বিগড়ে যায়—"

"বেশ, পুবে হাওয়া লাগাবো না—"

চশমার খাপ পকেটে পুরিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আচ্ছা এবার উঠি তবে। আর কোন ভয় নেই আপনার, চিয়ার আপ—"

সহাস্যমুখে পিঠ ঠুকিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিদেশে নির্ভরযোগ্য ডাক্তারবাবুটিকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

রাত্রে একটু যেন শ্বাস কষ্ট হইতে লাগিল।

বুঝিলাম হার্ট গোল বাধাইয়াছে। বিবেকও গোল ছিল। সন্ধ্যার সময় পুডিংটা একটু বেশীই বোধহয় খাইয়াছি, সিগারেটও টানিয়াছি, তাহা ছাড়া যে উপন্যাসখানি পাঠ করিতেছি সে খানি জেম্স্ জইসের লেখা কমা-ফুলস্টপ-হীন একটানা কাঁচা বাস্তব ব্যাপার!

হার্টের অপরাধ নাই।

শুইয়াছিলাম, উঠিয়া বসিতে হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম,

ভাবিলাম একটু পরে আপনিই বোধহয় কমিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, কমিল না। বাহিরে গভীর রাত্রি সাঁ সাঁ করিতেছে—কেমন যেন ভয় ভয় করিতে লাগিল। পাশেই পত্নী শুইয়া ঘুমাইতেছিল, তাহাকে জাগাইলাম। শোভা তাড়াতাড়ি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং ব্যস্তসমস্তভাবে মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস মাথায় হাওয়া করিলেই সব রোগ সারে।

খানিকক্ষণ হাওয়া করিয়াও যখন কোন ফল হইল না তখন বলিলাম, "ভানুকে বল দিবাকরবাবুকে আর একবার ডেকে আনুক—"

ভানু আমার ভাই, সঙ্গে আসিয়াছে। পাশের ঘরেই ছিল।

বাইসিক্‌ল্‌ চড়িয়া সে অবিলম্বে বাহির হইয়া গেল।

শোভা বলিল, "ডাক্তারবাবু ব্রাণ্ডি দিয়ে সেই যে ওষুধটা দিয়ে গেছেন সেইটে খাওনা ততক্ষণ, এনে দেব?"

"দাও—"

একদাগ সেবন করিলাম।

শোভা পুনরায় হাওয়া করিতে লাগিল।

একটু পরে যে কারণেই হোক সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। শ্বাসকষ্ট অনেকটা কমিয়া গেল, ধীরে ধীরে শুইতেও পারিলাম। ভাবিতেছিলাম চাকরটাকে পাঠাইয়া ডাক্তারবাবুকে আসিতে বারণ করি। অকারণে ডবল ফি গণিয়া লাভ কি, এই তো খানিকক্ষণ আগে বৈকালবেলায় দেখিয়া গিয়াছেন।

ভানু আসিয়া প্রবেশ করিল।

"দিবাকরবাবু মারা গেছেন এক্ষুণি একটু আগে—"

"সে কি! কি করে?"

"সিবিল সার্জন বললেন হঠাৎ হার্ট ফেল করে!"

উঠিয়া বসিলাম।

শোভা আবার মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

দর্জি

॥ এক ॥

এত কাজ নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

কলের খচ্‌খচানিতে নিজেরই বিরক্তি ধরিতেছে, কিন্তু উপায় নাই, কাল সকালের মধ্যে আড়াই শত পতাকা প্রস্তুত করিয়া দিতেই হইবে। এই খচ্‌খচানির অন্তরালে রজত-নিক্কণ উহ্য আছে এই টুকুই যা সান্ত্বনা।

নির্মল আসিয়া প্রবেশ করিল। চেনা ছোক্‌রা, এইখানকার কলেজেই পড়ে। আমারই কাছে কামিজ পাঞ্জাবি করাইয়া থাকে।

নির্মল বলিল, "শিশিরদা, আমাদের কলেজ ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ট্রাইকলার ফ্লাগ চাই—"

"আমার ভাই আজ ফ‌ুরসৎ নেই, অন্য কোথাও যাও—"

"কারো ফ‌ুরসৎ নেই, সকলের কাছেই গেস্‌লাম—"

"সবাই ফ্লাগ তৈরি করছে ?"

"সকলে।"

কথাটা মিথ্যা নয়। সহরের সমস্ত দর্জিই ব্যস্ত।

"আমার কিন্তু ভাই অবসর নেই। চারটে দর্জি লাগিয়েছি তব‌ু কুল পাচ্ছি না—"

"আমার কিন্তু চাই-ই। বলেন তো বেশী চার্জ দেব—"

"ডবল দিতে হবে—"

"বেশ—"

নির্মল তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি কাজ করিতে হইবে—উপায় নাই।

মহাত্মা গান্ধী কাল এই স্টেশন দিয়া 'পাস্‌' করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে যাইবে।

॥ দ‌ুই ॥

দ‌ুই বৎসর কাটিয়াছে।

আজও প‌ুনরায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছি না। আজও অবিরাম কলের খচ্‌খচানিতে বিরক্তি ধরিতেছে এবং আজও নির‌ুপায়ভাবে তাহা সহ্য করিতেছি। আজও সেই একই ব্যাপার, কাল সকালের মধ্যে আড়াই শত পতাকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আজও নির্মল আসিয়া প্রবেশ করিল।

সেই এক কথা।

"শিশির দা, আমাদের কলেজ ইউনিয়নের জন্যে পঞ্চাশটা ফ্লাগ চাই—"

আমিও সেই একই উত্তর দিলাম।

"আমার ভাই আর ফ‌ুরসৎ নেই, অন্য কোথাও যাও—"

উত্তরে নির্মল দ‌ুই বৎসর আগে যাহা বলিয়াছিল এবারও তাহাই বলিল—"কারো ফ‌ুরসৎ নেই, সকলের কাছে গেস্‌লাম—আমাদের করে দিতেই হবে—বলেন তো বেশী চার্জ দেব।"

পূর্ববৎ সুযোগ ব‌ুঝিয়া আমি ডবল মজ‌ুরি চাহিলাম।

নির্মল প‌ূর্ববৎ রাজি হইল।

ঘটনাও প‌ূর্ববৎ—মহাত্মা গান্ধী কাল এই স্টেশন দিয়া 'পাস্‌' করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া স্টেশনে হাজির থাকিবে। সবই এক, সামান্য একটু তফাৎ আছে। এবারে ত্রিবর্ণ পতাকা নয়, কৃষ্ণবর্ণ পতাকা।

ছেলে মেয়ে

॥ এক ॥

মেয়েদের হাসপাতাল।

আন্নাকালী ও নমিতা একই ঘরে আছেন, পাশাপাশি খাটে। আন্নাকালীর বয়স চল্লিশ, নমিতা সপ্তদশী। দুইজনেই আসন্ন-প্রসবা, এখন-তখন হইয়া আছেন।

আন্নাকালীর গালের হাড় উঁচু, কপাল শিরা-বহুল, চক্ষু পীতাভ, হাসি দন্তসর্বস্ব, পেট প্রকাণ্ড, হাত পা সরু সরু, মাথার সম্মুখ দিকটায় টাক। সাতটি সন্তানের জননী, গর্ভে অষ্টম সন্তান। আগের বার প্রসব করিবার সময় যমে-মানুষে টানাটানি হইয়াছিল তাই এবার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আন্নাকালী হাসপাতালে আসিয়াছে। স্বামী কেরানি।

নমিতা সুন্দরী। এইবার প্রথম সন্তান হইবে। সহসা দেখিলে গর্ভবতী বলিয়া মনেই হয় না। সমস্ত অবয়ব পরিপুষ্ট, আসন্ন মাতৃত্বের পূর্বাভাসে সে যেন আরও শ্রীমতী হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী ডাক্তার। বিজ্ঞান-সম্মত প্রসব-পদ্ধতি হাসপাতালে ঠিক-ঠিক অনুসৃত হইবে বলিয়া স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছেন।

॥ দুই ॥

বয়সের, রূপের এবং অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। প্রথম প্রথম অবশ্য রাখিয়া-ঢাকিয়া শোভন, সংযত, কেতা-দুরস্ত ভাবে আলাপ শুরু হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের উজ্জ্বল দিকটা সুকৌশলে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। ক্রমশঃ নিজের নিজের স্বামীর প্রসঙ্গ লইয়াও আলোচনা শুরু হইল এবং রাখা-ঢাকা ভাবটা ক্রমশঃ যেন তিরোহিত হইতে লাগিল। আলাপটা যখন ভাল করিয়া জমিল তখন দেখা গেল উভয়েই পুরুষ-বিদ্বেষী। পুরুষ জাতির নানাবিধ দোষ কীর্তন করিতে উভয়েই পঞ্চমুখ। এমন কি উচ্ছ্বাসের মুখে উদাহরণ স্বরূপ নিজের নিজের স্বামীর দোষও উভয়ে আজকাল অকাতরে উদ্ধৃত করিতেছেন। দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবলীলাক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। আন্নাকালীর প্রাত্যহিক কোমর-কন্‌কনানিটাও যেন কিছু কম পড়িয়াছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হইতেছিল।

আন্নাকালী। ব্যাটাছেলেদের কথা আর বোলো না ভাই, অমন স্বার্থপর জাত দুনিয়ায় আর আছে নাকি!

নমিতা। (মৃদু হাসিয়া) নিজেদের পান থেকে চুন খসলেই তুল্‌কালাম্‌!

আন্নাকালী। সে কথা আর বলতে! আমাদের বাড়ির কর্তাটি আপিস থেকে এসেই ছুটবেন পাশার আড্ডায়, ফিরবেন কোনদিন এগারোটায়, কোনদিন বারোটায়। কিন্তু এসে ভাত যদি না গরম পান বাড়ি মাথায় তুলবেন। আচ্ছা, অত রাত্তির পর্যন্ত ভাত গরম রাখা কি সহজ কথা ভাই, আঁচ আর কতক্ষণ থাকে বল। এদিকে আবার কয়লা যদি কোনমাসে বেশী খরচ হয়েছে তো সেও আবার ফাটাফাটি ব্যাপার।

নমিতা। আমাদের উনিও তাই।

আন্নাকালী। পাশা খেলা বাই আছে না কি ?

নমিতা। না, উনি খেলেন বিলিয়ার্ড্স্। বিলিয়ার্ড্স্ খেলে আড্ডা দিয়ে সিনেমা দেখে রোজ বাড়ি ফিরবেন রাত দুপুরে। কিন্তু এক ডাকে কপাট না খুলে দিলেই রাগ ! আমরা যেন চাকরাণী, রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়ার গোড়ায় বসে থাকব। একদিন রাত্তিরে এসে দেখেন আমি নেই, পাড়ায় একজনের বাড়ি কীর্তন হচ্ছিল আমি শুনতে গেছলাম। বাবুর সে কি রাগ !

আন্নাকালী। ওই রাগটুকুই ভগবান দিয়েছেন শরীরে, আর কোন গুণ নেই। আমাদের পাশের বাড়ির বৈকুণ্ঠবাবু কি কাণ্ডই যে করেন রোজ মদ খেয়ে এসে। প্রহার তো বউ-দুটোর অঙ্গের ভূষণ হয়েছে !

নমিতা। (সাগ্রহে) কি রকম ?

আন্নাকালী। রোজ ঠ্যাঙায় ধ'রে। মুষ্কো চেহারা, ইয়া গোঁফ, লাল চোখ, কালো রঙ্—যেন একটা দৈত্য ! অগাধ পয়সা আছে শুনেছি, রোজ সন্ধেবেলা মদ খাবে, মদ খেয়ে বউ-দুটোকে ডেকে এনে ঘরে পুরে কপাটে খিল দেবে। খিলও আবার এত উঁচুতে যে বউরা কেউ নাগাল পায় না। সেই খিলটি এঁটে বন্ধ করে শুরু করবে মার। মারতে মারতে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাবে ততক্ষণ ছাড়বে না।

নমিতা। বউ দুটো ?

আন্নাকালী। দুটোই তো ! সেদিন আবার একটা বিয়ে করেছে লুকিয়ে। ওদের কি লজ্জা আছে ! চিরকালই ওই রকম, আগেকার দিনে দুশো পাঁচ শো বিয়ে করতো এখন আর খ্যামতায় কুলোয় না বলে করে না।

নমিতা। (মুচকি হাসিয়া) মনে মনে কিন্তু লোভ আছে প্রচুর। আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীতেই একজন ভদ্রলোক থাকেন, প্রবীণ লোক, কিন্তু তার জ্বালায় ওদিকের জানালা খোলার জো নেই।

আন্নাকালী। (নাসা কুঞ্চিত করিয়া) ঝ্যাটা মার, ঝ্যাটা মার ! দেখে দেখে আর শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে জাতটার উপর !

নমিতা। নেশা তো একটা করাই চাই !

আন্নাকালী। ওঁর সে বালাই ছিল না এতদিন, কিন্তু বুড়ো বয়সে আবার আপিঙ্ ধরেছেন মরতে !

নমিতা। উনি দিনরাত সিগারেট চালাচ্ছেন !

আন্নাকালী। স্বার্থপর, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর সব।

নমিতা। খবরের কাগজে তো পুরুষদের কীর্তি রোজ একটা না একটা আছেই ! হয় গুণ্ডায় মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে, না হয় কোন মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে, না হয় স্বামী বউকে খুন করেছে। রোজ একটা না একটা কিছু থাকবেই।

আন্নাকালী। খবরের কাগজের কথা বলতে পারি না, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখছি রোজ। অমন নেমকহারাম জাত আর আছে না কি ! এই ধর না যে ছেলেকে পেটে ধ'রে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমরা, সেই ছেলেই বিয়ে ক'রে একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায় না। সেই বউও আবার কিছুদিন পরে পানসে হয়ে যায়, তখন আবার অন্য দিকে নজর—স্বার্থপর পাজি সব !

নমিতা। তাছাড়া, নিজেরা রোজগার করেন বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, কথায় কথায় দশবার করে শোনানো হয় সে কথা আমাদের। কিন্তু আমরা যে এদিকে একাধারে রাঁধুনি, চাকরানী, সেবাদাসী, আমাদের দামও নেই, কদরও নেই। একটি পয়সা চাইতে হলে ওঁদের কাছে হাত পাততে হয়, দেন তো সাড়ে বাইশ, কিন্তু লম্বা লম্বা লেকচার কত। বাজে খরচ করতে নেই, বিলাসিতা করা মাহাপাপ, নিজেরা যেন সব সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী!

আন্নাকালী। নিজেরা? নিজেরা এক একটি কাছিম। জলেও থাকেন স্থলেও থাকেন, যখন যেখানে সুবিধা, একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলে মুখটি গুটিয়ে নেন, সর্বাঙ্গে কঠিন আচ্ছাদন, মারো বকো ভ্রূক্ষেপ নেই! নিজের সুবিধে মতন আস্তে আস্তে মুখটি বার করেন, আর যদি একবার কামড়ে ধরেন তো রক্ষে নেই। জেদি, ভীতু, একগুঁয়ে—অবিকল কাছিম সব।

নমিতা। (হাসিয়া) আমি ভেবেছিলাম—বলবেন বুঝি ঘুঘু, উপমাটা বেশ বের করেছেন তো!

॥ চার ॥

সেই দিনই গভীর রাত্রে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। পুরুষদের অপেক্ষা করিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে আন্নাকালীর স্বামী ভজহরি বিশ্বাস আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া বসিয়া আছেন। বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ, সম্মুখে উপবিষ্ট সুদর্শন যুবক, প্রাচীর বিলম্বিত টকটকায়মান ঘড়ি, কোন কিছুরই সম্বন্ধে তিনি সচেতন নহেন। তন্ময় বিভোর ভাবে অর্ধ নিমীলিত নয়নে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মাত্র কর্তব্যের অনুরোধে আসিয়াছেন।

সুদর্শন যুবকটি ডাক্তার বি. কে. দত্ত। নমিতার স্বামী। দীর্ঘ সরু একটি পাইপে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 'ট্রু লাভ স্টোরি' নামক ইংরেজি পত্রিকা হইতে সচিত্র একটি প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিতেছেন। তাঁহারও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত।

পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইটি টেবিলের উপর আন্নাকালী ও নমিতা শায়িতা। উভয়েই প্রসব-বেদনাতুরা। উভয়ের নিকটেই ধাত্রীবিদ্যা-পারদর্শী ডাক্তার ও নার্স দণ্ডায়মান।

আন্নাকালী বলিতেছিলেন, "ওগো ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান গো ডাক্তারবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি—"

নার্স বলিল, "আর একটু পরেই সব যন্ত্রণার অবসান হবে মা, ছেলের মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবে!"

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিলেন।

"আর পাচ্ছি না, উঃ আর পাচ্ছি না আমি, ওঁকে ডেকে দিন, উঃ গেলুম, ডাক্তারবাবু, উঃ উঃ ওঁকে ডেকে দিন, শিগ্‌গির ওঁকে ডাকুন।"

নমিতার নার্স বলিলেন, "ভয় কি, এখনি হয়ে যাবে, ছি, অমন করে না।"

ডাক্তারবাবু সাবান দিয়া হাত ধুইতে লাগিলেন।

ঘণ্টা খানেক পরে ভজহরি বিশ্বাস ও ডাক্তার দত্ত খবর পাইলেন প্রসব নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। দত্তের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি লম্বা পাইপে আর একটি সিগারেট গুঁজিয়া ধরাইয়া ফেলিলেন। ভজহরি স্বপ্নাচ্ছন্ন-নয়নে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল।

উভয়েই রাস্তায় নামিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে।

নার্স আসিয়া আন্নাকালীকে বলিল, "এই দেখ মা, কেমন সুন্দর মেয়ে হয়েছে তোমার!"

আন্নাকালীর পাণ্ডুর মুখ আরও যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

সদ্যোজাত শিশুর মুখের উপর দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া সহসা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "মেয়ে! আমার মেয়ে হয়েছে!"

"মেয়েই তো, কেমন সুন্দর গোলগাল, ফুটফুটে, একমাথা চুল!"

"নমিতার কি হয়েছে?"

"ছেলে।"

নার্স মেয়েটিকে আন্নাকালীর বিছানার পাশে শোওয়াইতে যাইতেছিল, হঠাৎ আন্নাকালী উঠিয়া দুই হাত দিয়া শিশু কন্যাটিকে ঠেলিয়া দিলেন।

"ও আমার মেয়ে নয়, নিয়ে যাও, বদলাবদলি করে দিয়েছ তোমরা।"

বিস্মিত নার্স বলিল, "সে কি কথা, বদলাবদলি করব কেন!"

"নিশ্চয় বদলাবদলি করেছ, আমার মেয়ে হতে পারে না—জ্যোতিষী বলেছে এবার আমার ছেলে হবে—"

আন্নাকালীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

"এ তোমারই মেয়ে—"

"না, না, আমার মেয়ে নয়, আমার সাত সাতটা মেয়ে, আর মেয়ে আমি চাই না, আমার মেয়ে হয় নি, আমার ছেলে হয়েছে, নমিতা ডাক্তারের বউ বলে আমার ছেলেটি তাকে দিয়েছ তোমরা।"

"ছি ছি, তাকি কখনও হতে পারে! এ তোমারই মেয়ে, নাও কোলে কর।"

"না মেয়ে আমি চাই না—চাই না—চাই না,—আমার ছেলে এনে দাও, আমার ছেলে এনে দাও—নিশ্চয় আমার ছেলে হয়েছে।"

হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আন্নাকালী চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আর্ত অসহায় চীৎকার।

পাশের খাটে নমিতা সভয়ে তাহার শিশু পুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

ঘোষাল মহাশয়

॥ এক ॥

শ্বশুর-বাড়িতে নূতন বধূ আজ প্রথম মাংস রান্না করিবে।

ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, তবু শাশুড়ী হইতে শুরু করিয়া বাড়ীর চাকরানী পর্যন্ত সকলেই মনে মনে অল্প-বিস্তর উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ শুধু নূতন নয়। সবিতা এ বাড়ির প্রথম বধূ। তাছাড়া কলেজে-পড়া মেয়ে। কলেজে-পড়া বউ এ গ্রামে এই প্রথম। সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল হয়ত হাই হিল জুতা পড়িয়া বউ পাল্‌কি হইতে অবতরণ করিয়া শাশুড়ীর সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিবে। ঘোষাল মহাশয় তো আগাগোড়াই এ বিবাহের বিরোধী ছিলেন, কেবল পুত্রের আগ্রহাতিশয্যে রাজি হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সবিতাকে দেখিয়া সকলের দুর্ভাবনা ঘুচিয়াছে। বেশ শান্তশিষ্ট মেয়েটি, লজ্জা-সরম আছে, বাড়ির সঙ্গে বেশ মিশিয়া গিয়াছে। আর পাঁচ জনের মতই ধরন-ধারণ, কোনরূপ বদ চাল নাই।

ঘোষাল মহাশয় সব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে যেন গদগদ হইয়া উঠিয়াছেন।

ছোট দেবর বীরেনই সবিতাকে মাংস রাঁধিতে প্ররোচিত করিয়াছে। তাহাদের ক্লাবে 'ফীসট্‌' হইবে, সে ধরিয়া বসিয়াছে বৌদিদিকেই মাংসটা রাঁধিয়া দিতে হইবে।

সবিতা রাজি হইয়াছে।

ছোট ননদ পুষি বলিল, "ছোটদা'র ফিস্‌টিতে আমিই এতকাল মাংস রান্না করে দিয়েছি, দেখা যাক বৌদি এবার কেমন করে। খুব ঝাল দিও বৌদি, তা নাহলে—" বলিয়াই সে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি তাহার একটি রোগ-বিশেষ। কথায়-কথায় যখন-তখন যেখানে-সেখানে কারণে-অকারণে সে হাসিয়া ফেলে।

বীরেন-পুষি পিঠোপিঠি, সুতরাং অহি-নকুল সম্পর্ক।

বীরেন বলিল, "তুই কি আর মাংস রাঁধিস, কতকগুলো মশলার শ্রাদ্ধ করিস খালি—"

"বেশ, বেশ!"

পুষি নাক ফুলাইয়া রাগ করিতে গিয়া পুনরায় হাসিয়া ফেলিল এবং বৌদিদির দিকে একবার তাকাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বীরেন বলিল, "বৌদি মান রাখতে হবে কিন্তু—"

সবিতা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "চেষ্টা করব। একটু ভিনিগার জোগাড় করতে পারবেন?"

"নিশ্চয়—"

ভিনিগারের চেষ্টায় বীরেন বাহির হইয়া পড়িল।

হুঁকা-হস্তে ঘোষাল মহাশয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সবিতা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল; শাশুড়ী বার্তাটি কর্তার কর্ণগোচর করিলেন।

"নতুন বউ আজ মাংস রাঁধছে—"

সবিস্ময়ে কর্তা বলিলেন, "কেন, নতুন বউ কেন?"

"এমনি।"

"বিন্দি ঝিটা শুনেছে—"

"কোথা সে, মানা করে দাও তাকে, কাউকে যেন না বলে একথা—"

"সে বাড়ী চলে গেছে।"

"তাকে আবার কেন শোনানো। যতো সব—"

খড়ম চট-পট করিয়া ঘোষাল মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন।

॥ তিন ॥

বীরেনের বন্ধুগণ মাংস খাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

মাংস যে ধরিয়া গিয়াছিল তাহা তাহারা একটুও ধরিতে পারে নাই।

পরদিন কিন্তু জানা গেল খবর গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। এত রাষ্ট্র হইয়াছে যে রাঙী নাপ্তিনীটা পর্যন্ত তাহা শুনিয়াছে! আলতা পরাইতে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে সে পুষিকে প্রশ্ন করিয়াছে, "হ্যাঁগা পুষিদিদি, তোমাদের নেকাপড়া জানা বউ নাকি কাল মাংস রানতে গিয়ে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সব একাকার করেছিল।"

পুষি জিজ্ঞাসা করিল—"তুই কোথেকে শুনলি। বিন্দি মুখপুড়ি রটিয়েছে বুঝি—"

"না, বিন্দি তো কিছু বলে নি আমাকে। আমি শুনে এনু মুকুজ্যে গিন্নির কাছে।"

"মুকুজ্যে গিন্নি! তিনি কি করে জানলেন?"

"তাতো আমি জানি নি বাপু!"

বীরেন বলিল, "আমি খোঁজ নিচ্ছি দাঁড়াও। যত সব মিথ্যুক কোথাকার!"

বীরেন খোঁজ করিয়া যাহা জানিল তাহা এই—মুকুজ্যে গিন্নি শুনিয়াছেন চাটুজ্যে গিন্নির নিকট, চাটুজ্যে গিন্নির বার্তাবহ চাটুজ্যে মশাই, চাটুজ্যে মশাই শুনিয়াছেন দত্তের মুখে, দত্তকে বলিয়াছিলেন বাঁড়ুয্যে, বাঁড়ুয্যের কানে কানে সংগোপনে এবং চুপি চুপি খবরটি দিয়াছেন স্বয়ং ঘোষাল মহাশয়।

পুষি হাসিয়া বলিল, "বৌদি মাংস রাঁধছেন শুনে বাবা রাগ করেছিলেন। তাই বোধহয় বলে দিয়েছেন সকলকে!"

বীরেন বলিল, "বাঃ, বাবাই তো আমাকে কাল আড়ালে ডেকে বললেন যে তোদের ক্লাবের ফিস্ট হচ্ছে, মাংসটা বৌমাকে দিয়ে রাঁধা!"

পুষি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল।

আইন

॥ এক ॥

কাপড়-চোপড় বদলাইয়া পরের স্টেশনে জীবন নামিয়া পড়িল। চিন্তা করিয়া দেখিল একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়। খোঁজ-খবর করিয়া নিকটবর্তী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুর সহিত সে সুযোগমত গোপনে সাক্ষাৎ করিল। ডাক্তারবাবু অনেকদিন হইতে চাকুরি করিতেছেন, এ

জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন তাঁহাকে বহুবার হইতে হইয়াছে। চুলে পাক ধরিয়াছে। সুতরাং এক কথায় রাজি হইলেন না। জীবনও তাহা আশা করে নাই। একাধিক কথা বলিতেও সে প্রস্তুত।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আজ থেকে চান দিতে পারি। কিন্তু ব্যাক্‌-ডেটের সার্টিফিকেট দেওয়া শক্ত। আপনাকে আমি চিনি না, শুনি না—এর আগে কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন, কিছুই জানা নেই, দিয়ে দিলেই হ'ল সার্টিফিকেট!

জীবন কিন্তু না-ছোড়। ব্যাক্‌-ডেটেরই মিথ্যা একখানা সার্টিফিকেট চাই। তাহাতে লেখা থাকিবে যে, গত পরশু হইতে জীবনচন্দ্র কুণ্ডু ডাঃ টি. সি. পালের চিকিৎসাধীনে আছেন।

ইহার জন্য যত 'ফী' লাগে সে দিবে।

বড় রিস্‌কি ব্যাপার মশাই।

বড় বিপদে পড়েছি, দিতেই হবে দয়া করে—

দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশত, দুইশত, পাঁচশত, শেষে হাজার টাকা পর্যন্ত জীবন উঠিল। পূর্ব-পুরুষের কৃপায় টাকার তাহার অভাব নাই।

ডাক্তারবাবু গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।

জীবন বুঝিল পাল মহাশয় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছেন।

আপনার কোন অসুখ-বিসুখ আছে?

বছর দুই আগে একবার অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছিল।

অপারেশন করিয়েছিলেন?

না।

বেশ তাহলে আসুন, আপনার অ্যাপেনডিক্‌সটাই কেটে বার ক'রে দি।

তাতে লাভ!

লাভ আছে বইকি! অ্যাপেনডিসাইটিসটা তো সেরে যাবে!

তার দরকার নেই, সার্টিফিকেট দরকার আগে।

বুঝছেন না, সব দিক বাঁচিয়ে তো করতে হবে। হাসপাতালে ভরতি হলে খাতায় একটা রেকর্ড থাকবে—খাতাটা অবশ্য বদলাতে হবে—আপনার পেটের ওপর একটা দাগও থাকবে।

জীবন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

ডাক্তারবাবু বুঝাইয়া দিলেন।

হাসপাতালের অ্যাডমিশন রেজেস্টারখানা বদ্‌লে আপনাকে পরশুর তারিখেই ভর্তি করে নিতে চাই। অর্থাৎ আমার অ্যাসিসটেন্ট ডাক্তারকে আর কম্পাউন্ডারটিকেও কিছু খাওয়াতে হবে। আমার একার দ্বারা হবে না। এ সব বড় রিস্‌কি ব্যাপার, বুঝছেন না? আইন যে বড় কড়া!

পুনরায় গুম্ফাগ্রকে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।

জীবন বলিল, সবসুদ্ধ কত লাগবে তাহলে বলুন।

হাজার দুই।

জীবন চিন্তা করিয়া দেখিল, প্রাণের অপেক্ষা দুই হাজার টাকা বেশী নয়।

অপারেশনটাও হইয়া যাইবে। তা ছাড়া, ডাক্তারবাবু যেভাবে কাজটা করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কাজটা পাকা হইবে।

জীবন রাজি হইয়া গেল।

॥ দুই ॥

ডাক্তারবাবু সার্জনও ভাল। নিখুঁতভাবে অপারেশনটি করিয়া দিলেন, শুধু তাহাই নয়, জীবন যে কয়দিন হাসপাতালে রহিল, তিনি এমন মনোযোগ সহকারে তাহার তত্ত্বাবধান করিলেন যে, জীবন মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন প্রাণ দিয়া লোকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়েরও বোধহয় শুশ্রূষা করে না। সহকারী ডাক্তার এবং বুড়া কম্পাউণ্ডারটিও অতিশয় সজ্জন। জীবনের সামান্যতম অসুবিধা দূর করিবার জন্য যেন সতত উন্মুখ হইয়া আছে। বড়লোকের ছেলে জীবন জীবনে এমন কত দুই হাজার টাকা উড়াইয়াছে কিন্তু এমন ভদ্রতা কখনো দেখে নাই।

ডাক্তারবাবু জীবনকে যেদিন হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ করিলেন, সেদিন সকালে সে ডাক্তারবাবুর বাসায় গেল। ডাক্তারবাবু তাহাকে খাতির করিয়া বসাইলেন এবং জোর কলমে বেশ জোরালো একটা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

হাসিয়া বলিলেন, এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে।

জীবন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

এইবার কিন্তু আসল কথাটি বলতে হবে। এত টাকা খরচ করে যে মিথ্যা সার্টিফিকেট নিলেন—কেন, কি করেছিলেন আপনি?

প্রশ্নটার জন্য জীবন প্রস্তুত ছিল না।

বলুন না, এখন আর বলতে বাধা কি!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জীবন বলিল, বিশ্বাস করতে পারি তো আপনাকে?

নিশ্চয়ই।

খুন করেছিলাম।

বলেন কি, কাকে?

নামটা জীবনের জানা ছিল, কিন্তু বলিল না। ক্ষণিকের জন্য রক্তাক্ত লোকটার মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। বাঁ হাতে উল্‌কি দিয়া লেখা ছিল 'রমেশ'। জীবন নামটা বলিল না।

হঠাৎ খুন করতে গেলেন কেন?

জীবন হাসিয়া উত্তর দিল, মেয়েমানুষ! লোকটা আমার 'রাইভাল' ছিল।

কোথায় খুন করলেন?

ট্রেনে—

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং লম্বা খামে একখানা চিঠি দিয়া গেল। জীবন উঠিয়া পড়িল।

আমি এবার উঠি তাহলে, মেনি থ্যাঙ্কস্!

সার্টিফিকেটখানা পকেটে প‍ুরিয়া জীবন চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাব‍ু চিঠিখানা খ‍ুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সমস্ত ম‍ুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। প‍ুলিশ খবর দিতেছে যে, প্রায় একমাস প‍ূর্বে তাহারা একটি ম‍ৃতদেহ একটি ট্রেনের কামরায় পায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যাইতেছে যে, লোকটির ম‍ৃত্যুর কারণ ছ‍ুরিকাঘাত। আত্মহত্যা নয়, কেহ খ‍ুন করিয়া গিয়াছে। তাহার বাঁ-হাতে উল‍্কি দিয়া নাম লেখা ছিল—'রমেশ'। ইহা ছাড়া সনাক্ত করিবার মতো আর কোন চিহ্ন তাহারা পায় নাই। এখন অন‍ুসন্ধান করিয়া প‍ুলিশ জানিতে পারিয়াছে যে, উক্ত রমেশ কলিকাতায় মেসে থাকিয়া দালালি করিত এবং সে নাকি ডক্টর টি. সি. পালের জ্যেষ্ঠপ‍ুত্র। এই সংবাদটি সত্য কি-না, তাহা যেন ডক্টর পাল প‍ুলিশকে অবিলম্বে জানান এবং যদি সত্যি হয়, তাহা হইলে রমেশ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য প‍ুলিশের গোচর করিয়া যেন আইনতঃ প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার সহায়তা করেন।

সামান্য ঘটনা

॥ এক ॥

নরেন কমলাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

ভাল করিয়া একবার দেখিল—হ্যাঁ কমলাই তো! সেই কমলা, যাহাকে ঘিরিয়া কত স্বপ্নই না একদা রঙীন হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনের প্রথম স্বপ্ন, প্রথম নারী, প্রথম প্রেম। জীবনের প্রথম স্বপ্ন সফল হয় না, প্রথম নারী ধরা দেয় না, প্রথম প্রেম প‍ূর্ণ হয় না। কমলাকে সে পায় নাই। দ‍ুঃখ শ‍ুধ‍ু ইহাই নয়, নিদার‍ুণ দ‍ুঃখ কমলা বিধবা। বিবাহের ঠিক তিন মাস পরেই বিধবা হইয়াছে।

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিধবা বেশে নরেন কমলাকে এই প্রথম দেখিল। র‍ুক্ষ চুল, পরনে শাদা থান। সেই কমলা, যাহার একপিঠ কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল, সৌখিন শাড়ির সখ ছিল। নরেন একদ‍ৃষ্টে চাহিয়া রহিল!

……কুষ্ঠির মিল হয় নাই বলিয়া বিবাহ হয় নাই। কুষ্ঠির মিল হইলে স্থমিত্রা তাহার পত্নী হইত না, কমলাকেই সে বিবাহ করিত। কমলার বাবা গোঁড়া হিন্দ‍ু, কুষ্ঠির নিখ‍ুঁত মিল করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন!

…কিন্তু ইহাও তো মিথ্যা কথা নয় যে স্থমিত্রাকে পাইয়া সে কমলাকে ভুলিয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কয়বার সে কমলার কথা ভাবিয়াছে? অথচ……। কমলা কি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে? বোধহয় পায় নাই।

ও তো ওদিকে ম‍ুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। ডাকিয়া কথা কহিবে? কিন্তু—

॥ দুই ॥

ওদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেও কমলা নরেনকে দেখিয়াছিল।

শুধু দেখিয়াছিল নয়, একবার-দেখা মুখখানিকে মনে মনে বার বার দেখিতেছিল। নরেন যে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে তাহাও সে অনুভব করিতেছিল! কিন্তু না, সে আর ওদিকে চাহিতে পারিবে না, কিছুতেই না—তাছাড়া সঙ্গে শ্বশুর রহিয়াছেন। সে কাপড়-চোপড় সামলাইয়া মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া সম্বৃত হইয়া বসিল।

কিন্তু মনকে তো ঢাকা যায় না। মানস-পটে নরেনদার মুখখানাই যে বারবার ফুটিয়া উঠিতেছে। নরেনদা একটু রোগা হইয়া গিয়াছেন যেন, চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে। কতদিন পরে নরেনদাকে সে আবার দেখিতে পাইল। পাঁচ বৎসর। নরেনদা'র বউটি কেমন হইয়াছে, কে জানে।

সেই নরেনদা, যে তাহার অঙ্কের খাতায় কবিতা লিখিয়া দিয়াছিল, যে তাহাকে······ কমলার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

কিন্তু না, সে এ কি করিতেছে! হাজার হোক নরেনদা পর-পুরুষ।

কমলা চোখ বুজিয়া তাহার মৃত স্বামীর মুখখানা ভাবিতে চেষ্টা করিল।

মানস-পটে কিন্তু মুখখানা ফুটিয়া উঠিল না—ফুটিয়া উঠিল শাদা কাপড় ঢাকা শব-দেহের ছবিটা। তাহার উপর ফুটিয়া উঠিল নরেনদার সেই অনেকদিন আগে দেখা দুষ্টামিভরা মুখখানা। সেই অনেকদিন আগে শোনা কথাগুলিও আবার যেন সে শুনিতে পাইল—কমলি আমাকে বিয়ে করবি? তোকে আমার বড্ড ভালো লাগে।

কমলা জোর করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুতেই সে আর ওদিকে চাহিবে না।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং

কমলা আর পারিল না, কে যেন জোর করিয়া তাহার ঘাড়টা ফিরাইয়া দিল। কিন্তু সে নরেনকে দেখিতে পাইল না—একটা কুলি মাথায় করিয়া প্রকাণ্ড একটা ট্রাঙ্ক লইয়া যাইতেছে—তাহার পর আর একটা কুলি—নরেনদা আড়ালে পড়িয়া গেল।

গার্ডের বাঁশী বাজিল।

ট্রেন চলিতে শুরু করিল।

নরেনের ট্রেনটাও ছাড়িয়া দিল।

সুমিত্রা প্রশ্ন করিল—কি দেখছ তুমি অমন ঝুঁকে?

নরেন বলিল—কিছু না। নরেন ভিতরে আসিয়া বসিল।

দুইখানি বিপরীতগামী ট্রেন দুইদিকে চলিয়া গেল।

নিপুনিকা

লীলাময়ী তন্বী রূপসী ।

খঞ্জন নয়নের চটুল চাহনি, পীবর বক্ষের সংযত অসংযম, লাস্য-চপল ললিত গমন-ভঙ্গিমা, মিষ্ট কণ্ঠের রজত-নিক্বণনিভ হাস্যধ্বনি, ছদ্ম-কোপ-কমনীয় ভ্রূভঙ্গী পাষাণকেও উতলা করিয়া তোলে ।

কঠিন-হৃদয় সেনাপতি বিচলিত হইলেন । হাসপাতালের এই নার্সটি নিকটে আসিলেই তাঁহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া যায় । যুদ্ধে সামান্যরূপ আহত হইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষত সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন রকম আঘাতে তিনি জর্জরিত । সঞ্চরমান এই শিখাটি তাহার অন্তরলোকে যে বহ্নিকাণ্ড শুরু করিয়াছে তাহার উত্তাপে তিনি উন্মাদপ্রায় ।

নানা ছুতায় বারম্বার কাছে আসে, মনে হয় বুঝি ধরা দিল দিল, আবার সরিয়া যায় । স্ফুরিত অধরের বাণীহীন আকুতি দুর্বোধ্য !

আর তো সময়ও নাই, কালই হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে ।

আগামী পরশ্ব শিবিরে হাজির হইবার কথা ।

সেনাপতি বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিলেন । গভীর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া কাছে দূরে আলো জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আহত সৈনিকের করুণ আর্তনাদ শোনা যাইতেছে । অন্তরের অন্তস্তলে তীব্র তীক্ষ্ণ বাসনা সমস্ত হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছে ।

নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল ।

খাবার লইয়া আসিয়াছে ।

সেনাপতি নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন ।

তাহার পর বলিলেন, "কালই আমাকে চলে যেতে হবে—"

তাঁহার মনে হইল নার্সের চটুল নয়ন দুটিতে যেন বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিল । একটি দীর্ঘশ্বাসকে হাসিতে রূপান্তরিত করিয়া নার্স বলিল, "জানি ।"

"কি জান ? সত্যি কথাটা জান কি ?"

নার্স চকিতে একবার চাহিয়া আনত-নয়নে কফিতে দুধ মিশাইতে লাগিল ।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সেনাপতি বলিলেন, "আমার জন্যে মন-কেমন করবে ?"

"সে কথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন—"

ছোট টেবিলটিতে কফি প্রভৃতি সাজাইয়া সেটি সেনাপতির কাছে আগাইয়া দিয়া ত্বরিতপদে নার্স বাহির হইয়া গেল ।

"শোন—"

পুনঃ প্রবেশ করিল ।

সেনাপতি কথাটা শেষে বলিয়াই ফেলিলেন ।

"আমার সঙ্গে যাবে তুমি ?"

"কোথায় ?"

"আমার ক্যাম্পে—"

"কেন ?"

নার্সের নয়ন দুইটি চঞ্চল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিতে লাগিল।

সেনাপতি বলিলেন, "কেন, তা কি তুমি জান না ? চল, অন্ততঃ এক রাত্রির জন্যে চল—"

"চাকরি ছেড়ে যাবো কি করে ?"

"ছুটি নাও"—

"সেনাপতির শিবিরে নার্স যাবে কোন্ ওজুহাতে !"

"পুরুষের ছদ্মবেশে এসো, কেউ বুঝতে পারবে না—"

নার্স কিছুক্ষণ নীরব রহিল, কিন্তু মনে হইল সে যেন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসকে প্রাণপণে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বলিল, "ছুটি কি পাবো ?"

"যাতে পাও তার ব্যবস্থা করব—"

॥ দুই ॥

দুই দিন পরে !

সেনাপতির শিবির। চতুর্দিকে গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে। দ্বারপথে চাহিয়া অধীর আগ্রহে সেনাপতি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল।

পুরুষের বেশ।

সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

নার্স হাসিয়া আসন গ্রহণ করিল।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, অত্যন্ত তীব্র-মদির নীরবতা। উভয়ে উভয়ের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া আসিল। সহসা সেনাপতি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

"চল, ওঘরে চল—"

নার্স উঠিল না, মধুর হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"চল, ওঘরে যাই—"

নার্স তথাপি উঠিল না।

"উঠছ না যে, কি চাই তোমার ?"

"আমি যা চাই তা দেবেন ?"

"নিশ্চয় দেব।"

নার্সের অকম্পমান অধর দু'টি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেনাপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কি চাই ?"

"কিছুই না। আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করে আপনি এত বড় বড় যুদ্ধ জয় করেন কি কৌশলে—"

"কৌশল তো এক রকম নয় যে এক কথায় বলব।"

"কিছুদিন পরে শুনছি আবার আপনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করবেন ! তার কৌশলটা কি ?"

"অর্থাৎ যুদ্ধের প্ল্যানটা তুমি জানতে চাও !"

"হ্যাঁ।"

নার্স নিষ্পলক নয়নে সেনাপতির মুখের পানে চাহিল।

সেনাপতি বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিলেন। এই মায়াবিনী তাহা হইলে স্পাই !

"যুদ্ধের প্ল্যান জেনে তুমি কি করবে !"

অবিচলিত কণ্ঠে নার্স বলিল, "কিছুই না, কৌতুহলমাত্র।"

"যুদ্ধের প্ল্যান কখনও কাউকে বলি না, বলতে মানা।"

"পর-পুরুষের শয়নকক্ষেও আমি কখনও প্রবেশ করি না, শাস্ত্রে মানা—"

তাহার কালো চক্ষু দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিল।

সেনাপতির মুখভাব ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। নির্নিমেষ নয়নে আরো কিছুক্ষণ তিনি তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"যুদ্ধের প্ল্যান না বললে তুমি যাবে না ?"

কোটটি খুলিয়া দেওয়ালের একটি পেগে টাঙাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া নার্স বলিল—"না—"

নার্সের নাতি-আবৃত দেহের দিকে সেনাপতি প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

যৌবন ফাটিয়া পড়িতেছে, অধরে মৃদু হাসি, চক্ষু আবেশময়।

"যদি জোর করি—"

"আমি চীৎকার করব ! মাননীয় সেনাপতির পক্ষে সেটা সম্মানজনক হবে না—"

সেনাপতির মুখভাব কঠিনতর হইল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আরও কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন,—"বেশ, দেখ—"

ড্রয়ার খুলিয়া একটি ম্যাপ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

নার্স মনোযোগ-সহকারে ম্যাপটি সাগ্রহে দেখিতে লাগিল।

"এইবার চল—"

"আপনি যান, আমি আসছি এক্ষুণি, আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে। বাথরুমটা কোথায়—"

বাথরুম দেখাইয়া দিয়া সেনাপতি পাশের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নার্স টেবিল হইতে কাগজ লইয়া কি যেন লিখিতে লাগিল।

লেখা শেষ করিয়া বাথরুমে গেল এবং বাথরুম হইতে বাহির হইয়া সেনাপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

॥ তিন ॥

আধ ঘণ্টা পরে।

সেনাপতি শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বিস্রস্ত-বাসা নার্সও বাহির হইল।

সেনাপতির মুখ পাষাণের মত নির্মম হইয়া উঠিয়াছে।

নার্স মৃদু হাসিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না—চকিতের মধ্যে সেনাপতির পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল, নার্সের মস্তক বিচূর্ণিত হইয়া গেল!

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সেনাপতি বলিলেন, "ঘৃণ্য স্পাই কোথাকার!"

নার্সের রক্তাক্ত মৃতদেহটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পানে চাহিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সহসা নজরে পড়িল, টেবিলের উপর একটা চিঠি রহিয়াছে।

প্রিয় সেনাপতি মহাশয়,

আমি ধরা পড়িয়াছি, হয়তো আমাকে এজন্য মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। আপনার হাতে মরিতে আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুকে কে অতিক্রম করিতে পারে? আপনার হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিলাম, ইহা আমার সৌভাগ্য।

একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ করিয়া যাইতেছি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে এ অনুরোধ হয়তো আমি করিতাম না, কিন্তু আপনাকে সত্যই আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই ভালবাসা-জনিত স্পর্ধায় এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি করিতে সাহস করিতেছি। আমার মৃতদেহটা আমার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি সেনাপতি, ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন। ইহাই আমার অন্তিম অনুরোধ।

ইতি—
আপনার ক্ষণ-সঙ্গিনী

॥ চার ॥

নার্সের মৃতদেহ স্বদেশে উপনীত হইল।

তাহার পূর্বে একটি সংবাদও উপনীত হইয়াছিল।

জীবিত নার্সই সংবাদটি পাঠাইয়াছিল—"আমার শব হয়তো গোপন সংবাদটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিও—"

বাথরুমে যে কাগজটি নার্স গলাধঃকরণ করিয়াছিল, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া কাগজটি পাওয়া গেল।

তাহাতে যুদ্ধের প্ল্যান লেখা ছিল।

সবেগে অন্দর হইতে বাহিরের ঘরটাতে আসিয়া চৌকির উপর বসিয়া স্বগতোক্তি করিলাম—টাকার গাছ আছে ঘরে যেন ! একেবারে উজবুক বানিয়ে ছেড়েছে আমাকে—

জানু আন্দোলিত করিতে লাগিলাম এবং আমার যেটি মুদ্রাদোষ—নাক দিয়া 'খোঁৎ' করিয়া একটি শব্দ বাহির করা—তাহাই করিয়া একটি সিগারেট ধরাইলাম ।

চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল ।

দ্বারপ্রান্তে একটি সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে নমস্কার করিলেন । মুখে প্রসন্ন হাসি, ললাটে চন্দনের টিপ, পরিধানে কোটের ধুতি ও ফতুয়া, পায়ে তালতলার চটি ।

কি চান ?

আমি হরিবাবুকে চাই ।

আমার নামই হরি—

ভদ্রলোক পুনরায় নমস্কার করিলেন এবং ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া আমাকে দিলেন । দেখিলাম যতীনের চিঠি । লিখিতেছে—এই ভদ্রলোক একজন জ্যোতিষী । আমাকে ধরিয়াছেন দুই একজনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য । তোমার নিকট পাঠাইতেছি । জ্যোতিষ-সংক্রান্ত কোন প্রয়োজন থাকিলে ইঁহাকে বলিতে পার । মনে পড়িল, কাল বৈকালে যতীনের সহিত দেখাও হইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল—এক নাছোড়বান্দা জ্যোতিষীর পাল্লায় পড়েছিলাম ভাই । সিম্‌প্লি তার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তোমার নামে একটি চিঠি লিখে দিয়েছি । কিছু মনে কোরো না যেন—

বলিলাম—আমার কোন দরকার নেই ।

ভদ্রলোক টেবিলের নিকট যে চেয়ারখানি ছিল, সেইটিতে উপবেশন করিলেন এবং আর একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার দরকার না থাকতে পারে, আমার দরকার আছে ।

তার মানে ?

যে বিদ্যেটা শিখেছি সেটা চর্চা করা তো দরকার । এক পয়সা দিতে হবে না আপনাকে । দেখি আপনার হাতটা—

হাতে কাজ ছিল না, পয়সাও লাগিবে না । সুতরাং জ্যোতিষ-চর্চা করিতে আপত্তি কি । টুলটা টানিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলাম ।

ভদ্রলোকটি হস্তটি পর্যবেক্ষণ করিতে শুরু করিলেন । ভ্রূ কুঞ্চিত হইতে কুঞ্চিততর হইতে লাগিল । মিনিট দুয়েক নীরবতার পর ওষ্ঠ নয় নাসার সাহায্যে ভদ্রলোক একটি ছোট্ট শব্দ করিলেন—হুঁ ।

আমিও করিলাম—খোঁৎ ।

ছোঁড়া চাকরটা আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল ।

মা ডাকছেন—

আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল । একদণ্ড স্বস্তিতে থাকিতে দিবে না ।

যা, যাচ্ছি একটু পরে—

জ্যোতিষী মহাশয় আমার দক্ষিণ করতলটি টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন ।

চাকর আবার ফিরিয়া আসিল।

মা এক্ষুণি আসতে বললেন—

আগন্তুকের সম্মুখেও রসনা অসংযত হইয়া পড়িল।

আঃ, জ্বালিয়ে খেলে দেখছি—

জ্যোতিষী মহাশয় আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া শান্তকণ্ঠে প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—যান, শুনে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।

চলিয়া গেলাম।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, স্মিতমুখে জ্যোতিষী মহাশয় বসিয়া আছেন। বাস্তবিকই ভদ্রলোকের মুখচ্ছবিতে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা লক্ষ্য করিলাম। আমি আসিয়া পুনরায় হস্তপ্রসারণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। আপনি কি বিষয়ে প্রশ্ন করতে চান করুন—

বর্তমান বিষয়ে—

অতীত বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি নির্বিকার! বেশ, বর্তমানের কথাই বলছি—আজকের বিষয়ই বলছি—

ভাবিলাম মালতীর বিষয়ই কিছু বলে বুঝি। উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম।

তিনি বলিলেন—আজ আপনার একটা অর্থনাশ যোগ রয়েছে—

তাই নাকি! আর কিছু?

আরও শুনতে চান? বন্ধুদের শত্রু হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে—

তাই নাকি! খোৎ।

তাইতো মনে হয়।

জ্যোতিষী মহাশয় উঠিয়া পড়িলেন।

বলিলেন—কাল আবার আসব! যদি আজকের ঘটনা মিলে যায়—কাল আপনার অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা যাবে—

সবিনয় নমস্কারান্তে তিনি বিদায় লইলেন।

গুম হইয়া বসিয়া জ্যোতিষীর নয়, মালতীর কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। আচ্ছা শাইলক তো! কাল রাত্রে না হয় আবেগের মাথায় প্রতিজ্ঞাই করিয়া ফেলিয়াছি যে, একখানা ভাল ঢাকাই শাড়ী আজ কিনিয়া দিব—কিন্তু তাই বলিয়া আজই কিনিয়া দিতে হইবে! রাঙা রাঙা ঠোঁট দুইটি ফুলাইয়া মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া আছে! খোৎ।

চাকর পুনরায় দ্বারপ্রান্তে দর্শন দিল!

মায়ের ভয়ানক মাথা ধরেছে—শরীর জ্বর জ্বর করছে। কিছু খাবেন না। আপনাকে খেয়ে নিতে বললেন—

বুঝিলাম—মোক্ষম অস্ত্র ধরিয়াছে। ভিতরে গেলাম এবং কিছুক্ষণ পরে এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, জার্মাণীর ঔষধ অথবা নানুরের পদাবলী তো ছেলেমানুষ, মালতীর বাবাও যদি আসিয়া সাধ্যসাধনা করেন, এ মাথা-ধরা ছাড়িবে না। শাড়ীই কিনিয়া দিতে হইবে। ইহাও বুঝিলাম বিলম্ব করিয়াও লাভ নাই, ড্রয়ার টানিয়া কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া গেল—মনিব্যাগ নাই! জ্যোতিষী এই ড্রয়ারটার কাছেই বসিয়াছিল যে! মালতীকে কিছু বলিলাম না—বলা বৃথা। আজ রবিবার—ব্যাংক বন্ধ—তবু বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া অনুভব করিলাম যে, জ্যোতিষীর

দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বাণীটাও মিলিয়াছে। যতীন, বীরেন, সুশীল, বিশু, হাবুল, নন্দ, পরেশ, কালো—সকলের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছি। দশটা টাকা কেহ ধার দিতে পারিল না। শেষটা দোকান হইতে ধারে কাপড় কিনিতে হইল।

ইহারা বন্ধু! থোৎ।

কাত্যায়নী

প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রভাতিক গীতি-বন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব-স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ পাঠে মগ্ন, কেহ গোচারণে গিয়াছেন, কেহ সমিধ আহরণে ব্যস্ত। আশ্রম-অঙ্গন-প্রান্তে যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী কাত্যায়নী উদূখলে মুষল প্রহার করতঃ নীবার কণ্ডন করিতেছেন এবং কৌতুক সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন অদূরে ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-সন্নিহিত গুল্ম-ছায়ায় সাবধান-সঞ্চরণে তিত্তির-দম্পতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতিশয় চতুর সংগোপনশীল প্রাণী ইহারা, আশ্রম শান্ত না হইলে আত্ম-প্রকাশ করে না। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলে প্রত্যহই কাত্যায়নীর যে-কাহিনীটি মনে পড়ে অদ্যও তাহা পড়িল। কথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন এবং সে সমস্তই তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া নাকি বহির্গত হয়। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলেই কাত্যায়নী উক্ত অলৌকিক কাহিনীটি স্মরণ করেন। একদা স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই, মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন মাত্র। জ্ঞান-গম্ভীর তপস্বী স্বামীকে প্রগল্‌ভ প্রশ্ন করিতে কাত্যায়নীর শংকা হয়। বস্তুতঃ, স্ত্রী-প্রজ্ঞা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্য-সমীপে চিরকালই সঙ্কুচিতা, গৃহ-কর্মের মধ্যে তিনি আজীবন আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মৈত্রেয়ীর মত তো তাঁহার বাক্‌পটুতা অথবা বিদ্যাবত্তা নাই যে স্বচ্ছন্দে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দীর্ঘ কথোপকথনে নিরত হইতে পারেন। ভারতপূজ্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি কি আলাপ করিবেন!

সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন কুটীর-অভ্যন্তরে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, “অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। অয়ি, পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়—”

কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ বক্র হইল। তিনি অনুমান করিলেন অদ্যও সপত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী-সহ ব্রহ্ম-বিষয়ক বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছেন। কাত্যায়নীর মনে প্রশ্ন জাগিল, ইহা না করিয়া অরণি-সহযোগে অগ্নি উৎপাদন করতঃ ভর্তার নিমিত্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্নী-কর্তব্য চারুতর রূপে নিষ্পন্ন হইত না? কাত্যায়নী বুঝিতে পারেন না মৈত্রেয়ীর মনোভাব কি। মৈত্রেয়ী কোন দিনই গৃহকর্ম বিষয়ে তাবৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন না, গৃহকর্মে সাতিশয় নিপুণাও নহেন, ব্রহ্ম-বিদ্যা-অনুশীলনেই তাঁহার যত কুশলতা! ব্রহ্ম, আত্মা, অমৃত! কাত্যায়নীর ওষ্ঠ-প্রান্ত বক্রতর হইল। তিনি অধিকতর

শক্তিপ্রয়োগ করতঃ উদূখলে মুষলচালনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষোভে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল স্বামী বলিতেছেন, "যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলে অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দসমূহ গৃহীত হয়, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক ধূম নির্গত হয় তেমনি অয়ি মৈত্রেয়ী, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ—"

ধূম শব্দটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবামাত্র কাত্যায়নীর স্মরণ হইল গত সন্ধ্যায় ধূমানাম্নী আশ্রম-ধেনুটি কিঞ্চিৎ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল, অবিলম্বে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য, হয়ত অচিরে তাহার শুশ্রূষারও প্রয়োজন হইবে। উদূখল-গাত্রে মুষলটি তির্যকভাবে স্থাপনকরতঃ কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া তাঁহার চিন্তা দূরীভূত হইল, দেখিলেন, ধূমা সুস্থ হইয়াছে, তৃণ-চর্বণে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। কাত্যায়নীকে দেখিয়া ধূম্রবর্ণা স্নিগ্ধ-নেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল, কাত্যায়নী তাহার সুচিক্কণ পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্তার্পণ-করতঃ তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

অদূরে বৃদ্ধ আশ্রয়-মৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল, কাত্যায়নীর পদশব্দে সে-ও তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত-শৃঙ্গ-শোভিত মস্তক তুলিয়া স্নেহ-প্রত্যাশী একাগ্র দৃষ্টিতে কাত্যায়নীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী তাহার নিকটেও গেলেন এবং ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে লইয়া খেলা করিবার মতো সময় এখন আমার নাই, আমার অনেক কাজ," চিত্রক শৃঙ্গ-শোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল এবং ভর্ৎসিত হইয়া অমনোযোগী বালক যেমন পাঠে মনঃসংযোগ করে তেমনি নবদূর্বাদলে মনঃসংযোগ করিল।

কাত্যায়নী পুনরায় অঙ্গন-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়ত এতক্ষণ বায়সকুল আসিয়া নীবার ভোজন করিতেছে। এবম্বিধ আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহাকে থামিতে হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, নবাগত আশ্রম-বালক আরুণির পীতবর্ণ উত্তরীয়টি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। আরুণি কিছুক্ষণ পূর্বে গোচারণে গিয়াছে। প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে বিধৌত আর্দ্র উত্তরীয় শুষ্ক করিবার মানসে আরুণি প্রত্যহ সেটি আমলকী-শাখায় প্রলম্বিত করিয়া দেয়, কিন্তু গ্রন্থি শিথিল থাকে বলিয়া প্রায়শই তাহা বায়ুতাড়িত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রায় প্রত্যহই কাত্যায়নী আরুণির উত্তরীয়টি ধূলি হইতে উদ্ধার করেন। উত্তরীয় হইতে ধূলি অপসারণ করিতে করিতে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করতঃ অন্য দিনের মতো আজিও স্থির করিলেন যে আরুণির ঈদৃশ অনবধানতার জন্য অদ্য তাহাকে ভর্ৎসনাই করিতে হইবে। একাধিকবার তিনি এ সংকল্প করিয়াছেন। আরুণিকে এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে তিনি সচেতন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর এ যাবৎ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। দুষ্টমতি এই চঞ্চল বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ৎসনা-বাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না, পরন্তু স্নেহ-রসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়। ইহা

আশ্চর্যের বিষয় হইলেও সত্য যে আরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়া-প্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদগুণাবলীই তাহাকে কাত্যায়নীর নিকট প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবাসী বটুর উপর কিছুতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।

অঙ্গনে প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না, একাধিক বায়স আসিয়া নীবার-অপহরণে রত হইয়াছে। করতালি-শব্দে তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিলেন, ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-তলস্থ তিত্তির-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করিল। কাত্যায়নী উদূখল-সমীপবর্তিনী হইয়া পুনরায় নীবার-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন।

পুনরায় তাঁহার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল স্বামী আবেগভরে বলিতেছেন, "যেমন সৈন্ধব-খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক করিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু জলের যে-কোন অংশ হইতে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তেমনি অয়ি, এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘন। এই মহান আত্মা এই সমুদয় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া ইহাতেই আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

এই সকল আধ্যাত্মিক বাক্যাবলী কাত্যায়নীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল না। অদ্য কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল স্বামীর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। সপত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া এমন আবেগ-কম্পিত-স্বরে স্বামী কি বলিতেছেন। কই, এমন আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে স্বামী তাঁহাকে কোন দিন কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তো।

সহসা মৈত্রেয়ীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইল। ক্ষোভ-সহকারে তিনি স্মরণ করিলেন মৈত্রেয়ী কেবল শাস্ত্র-চর্চাই করে, আর কিছু করে না। এই যে বৃহৎ আশ্রম, যে-আশ্রমে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মানী গুণী অতিথি-বৃন্দ সততই আগমন করেন, যে-আশ্রম পূর্ণ করিয়া বিদ্যার্থীর দল সর্বদাই বিরাজমান, যেখানে যাগ-যজ্ঞ নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে, সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রম-সাধ্য কর্মভার তিনি একাই তো এত কাল বহন করিলেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার শ্রমভার লাঘবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে? সে তো অহরহ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কাত্যায়নীর স্মরণপথে উদিত হইল কিছু কাল পূর্বে আশ্রমে যখন মন্থ-কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখনও মৈত্রেয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত না করিয়া সমাগত জনৈত মুনির সহিত ব্রহ্ম-বিষয়ক রচনায় সময়ক্ষেপ করিয়াছিল। একা কাত্যায়নীই কয়েক জন আশ্রম-বালকের সহায়তায় উদুম্বর বৃক্ষ হইতে স্রুব, চমস, ইন্ধন, অরণি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একাই ব্রীহি, যব, তিল, মাস, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসুর, খল্য, খলকুল প্রভৃতি গ্রাম্য শস্য একত্র করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিতে হইয়াছিল। তিনিই রাত্রি জাগরণ করিয়া সমাগত অতিথিবর্গের জন্য পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী কিছুই করে নাই। তাঁহার আরও মনে পড়িল গত বৎসর ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য অংসল বৃষ-মাংস ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন, তাহারও সমস্ত আয়োজন কাত্যায়নীকেই একা করিতে হইয়াছিল। তিনিই যজ্ঞাগ্নি-কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া মাংস-শূল্য প্রস্তুত করতঃ স্বামীর সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ী কিছুই করেন নাই। অথচ স্বামীর আবেগ-কম্পিত যত আলাপ সব মৈত্রেয়ীর সঙ্গে! কাত্যায়নী একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। ক্ষণপরেই

তাঁহার মনে হইল, না, না, ইহা মিথ্যা। মৈত্রেয়ী যতই না কেন ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনা করুক স্বামীর নিভৃত অন্তর-দেশে কাত্যায়নীরই আসন অবিচলিত আছে।

সহসা কুটীরাভ্যন্তরে আলোচনা বন্ধ হইল। দ্বারপ্রান্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেখা দিলেন।

প্রতীভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাট, পিঙ্গল জটাভারে বার্ধক্যের রজতচ্ছটা, জ্যোতির্ময় নয়ন-যুগল আনন্দ-সমুজ্জ্বল। কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "অয়ি কাত্যায়নী, আমি অদ্য বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। মৈত্রেয়ী সত্যই আনন্দদায়িনী, তাহার আগ্রহ বিশুদ্ধ অমৃত-পিপাসা প্রকৃতই অনন্তমুখিনী, সত্যই ব্রহ্মবাদিনী সে। অয়ি কাত্যায়নী, গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া আমি জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এইবার আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। সেজন্য তোমার ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার মানসে আমি মৈত্রেয়ীকে আজ আহ্বান করিয়াছিলাম। মৈত্রেয়ী কি বলিল, জান ? সে বলিল, আমি বিত্ত চাহি না, আমি অমৃতত্ব চাই, সমুদয়ের একায়ন যে আত্মা আমি তাহাকেই উপলব্ধি করিতে চাই। বিত্ত লইয়া আমি কি করিব। অয়ি কাত্যায়নী, আনন্দে, বিস্ময়ে, গর্বে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন মৈত্রেয়ী আমার প্রিয়া ছিল আজ সে আমার প্রিয়তমা হইয়াছে—"

আবেগের আতিশয্যে বাক্‌রুদ্ধ হইল, যাজ্ঞবল্ক্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রীড়াবনতমুখী মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া এক অপরূপ শোভা বিকীরিত হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম-অনভিজ্ঞা কাত্যায়নী পাংশু বিবর্ণমুখে উদূখল-সমীপে বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্মৃতি

হোটেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যে ঘরটিতে আমাকে থাকিতে দিয়াছে সেটিও সুন্দর। দক্ষিণ দিক খোলা, পাখাও আছে। খাওয়াও নিন্দনীয় নয়। যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিব এইখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে। কাহারও বাসায় উঠিয়া সসঙ্কোচে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। ভালই হইয়াছে। হোটেলের চাকর আসিয়া বিছানা করিয়া দিয়া গেল। বেশ চাকরটি। ছিমছাম। পরিষ্কার ফতুয়া গায়ে, মাথায় ঈষৎ টেরি। চোখ মুখ হইতে বিনীত সম্ভ্রম বিকীর্ণ হইতেছে। বেশ ভাল লাগিল। মন্মথ আমাকে ভাল হোটেলই দেখিয়া দিয়াছে। নালিশ করিবার কিছু নাই। আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, শুইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়াও ঘুম কিন্তু আসিল না। মুদিত চোখের সম্মুখে বহুদিন আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

…অনেকদিন আগে একবার একটি ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেদিনকার সেই ছবিটি বারবার মনে পড়িতেছে। ভদ্রলোক স্টেশন মাস্টার ছিলেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে। স্টেশন খুব বড় নয় কিন্তু সেখান হইতে প্রচুর মাছ চালান হইত। মাছের ব্যবসা উপলক্ষেই সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানকার জেলেদের সহিত বন্দোবস্ত

করিয়া কলিকাতায় মাছের কারবার খোলার ইচ্ছা ছিল। ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজ শেষ করিয়া পরের ট্রেনে ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু কাজ শেষ হইল না, থাকিতে হইল। কোথায় থাকা যায় চিন্তা করিতেছিলাম। জেলেদের বাড়িতে থাকিবার প্রবৃত্তি হইল না। পল্লীগ্রাম—হোটেল, ডাকবাংলা, ধর্মশালা কিছু নাই। একজন বলিল—মাস্টার মশাইয়ের ওখানে যান না, সেখানে তো অবারিত দ্বার। গেলাম। একটু কুণ্ঠার সহিতই গেলাম। মাস্টার মশাইয়ের সহিত সকালে স্টেশনে আলাপ হইয়াছিল, মাছ চালান দিবার রেট, সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি জানিতে তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম। পুষ্টকান্তি সদা-হাস্যমুখ ভদ্রলোক। মাথায় ঈষৎ টাক, প্রশান্ত প্রদীপ্ত এক জোড়া চোখ, পুরুষোচিত একজোড়া গোঁফ। তখন গ্রীষ্মকাল, আপিসেও খালি গায়ে ছিলেন। এক বুক চুল, তাহার উপর ধপধপে শাদা উপবীত গুচ্ছ। টেবিলের উপর একটি টুকটুকে লাল গামছা পাট করা আছে, প্রয়োজনের সময় তাহা দিয়াই হাতমুখ মুছিতেছেন। বাড়িতেও দেখিলাম সেই একই বেশ। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

“আসুন আসুন, আজকের ট্রেনে যাওয়া হল না বুঝি ? বসুন। খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল—ওই জেলে বেটাদের ওখানে তো সুবিধে হওয়ার কথা নয়, তার চেয়ে নিমু হালুয়াই ঢের ভাল। কিছু যদি না করে থাকেন আমার এখানেই হোক না না হয়।”

একটু ইতস্তত করিয়া শুরু করিতেছিলাম, “ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবেই। আপনার এখানে আবার এত রাত্রে”—আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া মাস্টার মশাই বলিয়া উঠিলেন, “আরে রাত আর কত হয়েছে, এই তো সবে আটটা। আমার এখানেই হোক—বলে আসি ভেতরে,” আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন—“গিন্নিকে কেবল একটু খবর দেওয়া যে আর চারটি চাল বেশী করে নাও। রাবণের চুলো তো জ্বলছেই দিন রাত। রেলের কয়লা, পয়সা তো লাগে না—হা—হা—হা—” চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া মাস্টার মশাই হাসিয়া উঠিলেন।

“এইবার আপনার পরিচয়টা নেওয়া যাক ভাল করে—চা খাবেন ?…”

“না থাক।”

“খানই না এক কাপ, এক কাপ চা খেলে আর কি হয় ? কোথা দেশ আপনার ?”

“হুগলি জেলায়।”

“বাঃ, আমারও যে হুগলি…”

একটু পরেই চা আসিল। তন্ন তন্ন করিয়া মাস্টার মশাই আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। এমন কি আমার শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতি গোষ্ঠীর খবর যতটা আমার জানা ছিল তাহা তাঁহাকে বলিতে হইল। হাঁটু দোলাইয়া দোলাইয়া “বেশ বেশ” বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি সব শুনিতে লাগিলেন। মনে হইল যেন কোন মনোজ্ঞ কাহিনী শুনিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম ইহাই তাঁহার স্বভাব। তুচ্ছ উচ্চ যাহাই হোক মানব মাত্রেই তাঁহার প্রিয়। বহু মানুষের সঙ্গ, বহু মানুষের কাহিনী, বহু মানুষের সুখ দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার নিজের সংসারটি খুব ছোট। একটি মাত্র পুত্র, বিদেশে বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়ে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া আর কেহ নাই। কিন্তু প্রতিদিন প্রায় কুড়ি বাইশ জন লোক খায়। টালিক্লার্কবাবুর বউ বাপের বাড়ি গিয়াছেন, তিনি মাস্টার মশাইয়ের বাসায় খান। নবাগত টিকিট কালেক্টারটির এখনও বিবাহ হয় নাই, একাই এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাস্টার মশাই আর রান্নার হাঙ্গামা করিতে দেন

নাই। গঙ্গার ধারে বায়ুপরিবর্তন মানসে মাস্টার মশাইয়ের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কয়েকজন আসিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য অতিথি। আমার মতো অনাহূত লোকও প্রায়ই থাকেন দুই একজন। চাকরির আশায় গ্রামের একটি ছেলেও আসিয়াছে। স্থানীয় বাঙালীরা মিলিয়া ছোট খাটো থিয়েটার পার্টি করিয়াছেন, তাহাতে যিনি বাঁশী বাজান তিনি এখানে খান। নানা লোকের নানা পরিচয়, সকলেরই আশ্রয় এখানে। মাস্টার মশাইয়ের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, গুটিগুটি সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বংশীবাদক ভদ্রলোক (স্থানীয় একটি মাড়োয়ারির আড়তে মাস্টার মশাই তাঁহার চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন) প্রথমেই আসিলেন। ক্রমশঃ তবলা হারমোনিয়মও বাহির হইল। মাস্টার মশাইয়ের গান-বাজনার শখ আছে। গায়কেরও অভাব নাই দেখিলাম। টালিক্লার্ক, ডাক্তারবাবু, দারোগাবাবুর শালা, বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জন দুই—বেশ গাইতে পারেন। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল। নিধুবাবু, রবিবাবু, দ্বিজবাবু, রামপ্রসাদ কেউ বাদ গেলেন না। সব রকমই হইল। রাত্রি এগারোটার মালগাড়ি 'পাস' করিয়া ছোটবাবু আসিলেন। তখন চাকর আসিয়া খবর দিল—খাবার জায়গা হয়েছে। সকলে উঠিয়া ভিতরে গেলাম। এখনও ছবিটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মাস্টার মশাইয়ের কোয়ার্টারের অপরিসর বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। ছোট বারান্দায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিতে হইল। সকলের ভাগ্যে আসনও জোটে নাই। পাট-করা সতরঞ্চি, কম্বল, বোরা প্রভৃতি দিয়া মাস্টার-গৃহিণী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন দেখিলাম। আহারও অতি সাধারণ গোছের —কলাপাতার উপর গরম ভাত, একটু ঘি, আলুভাতে, ডালভাতে, একটা সাধারণ একটু ডাল, একটু তরকারি, মাছের ঝোল, একটু অম্বল। অতি সাধারণ ভোজ্য, কিন্তু কি পরিতৃপ্তি সহকারেই সেদিন খাইয়াছিলাম। আজও ভুলিতে পারি নাই। আহারাদির পর কোথায় শোওয়া যায় তাহাও একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। মাস্টার মশাইয়ের কোয়ার্টারে স্থানাভাব। আমি ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেই মাস্টার মশাই বলিয়া উঠিলেন—"খবরদার খবরদার, ছারপোকায় খেয়ে ফেলবে, অমন কাজটি করবেন না। দেখুন না এইখানেই হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। গোটা দুই বেঞ্চ আছে—তাই জুড়েই করে দিচ্ছি দেখুন না।" বাইরের বারান্দায় দুইখানি বেঞ্চি জুড়িয়া মাস্টার মশাই নিজে দাঁড়াইয়া আমার বিছানা করাইয়া দিলেন। স্থানে-অস্থানে পেরেক ঠুকিয়া একটা হাওড়ার হাটের শতচ্ছিন্ন মশারিও টাঙান হইল।

...সেদিন আহার শয্যা কিছুই ভাল ছিল না, কিন্তু এক ঘুমে রাত কাটিয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন হইতে মাস্টার মশাই আমার আপন লোক হইয়া গিয়াছিলেন।

...মাস্টার মশাইয়ের সম্বন্ধে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একবার মনে আছে শীতকালে গিয়াছিলাম। ট্রেনটা খুব ভোরে পেঁছিত। ট্রেন হইতে নামিয়া দেখি অভূতপূর্ব ব্যাপার। স্টেশন প্লাটফর্মের এক কোণে চায়ের একটা স্টল গোছের হইয়াছে। অনেকেই চা পান করিতেছেন। পুলকিত চিত্তে আমিও আগাইয়া গেলাম। শীতকালের ভোরে এখানে চা পাইব আশাই করি নাই। চমৎকার চা। চা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"দাম কত?"

"দাম লাগবে না বাবু।"

“দাম লাগবে না ! সে কি !”

“মাস্টারবাবু মোসাফিরদের রোজ মাংনিতে পিলান”—এই অদ্ভুত আধাবাংলা আধাহিন্দিতে যে লোকটা জবাব দিল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম সে স্টেশনেরই কুলী একজন। অবাক হইয়া গেলাম। সমস্ত প্যাসেঞ্জারদের মাস্টার মশাই বিনা পয়সায় চা খাওয়াইতেছেন। মাস্টার মশাইয়ের সহিত একটু পরেই দেখা হইল।

“চায়ের সদাব্রত খুলেছেন, ব্যাপারটা কি ?”

দরাজ গলায় মাস্টার মশাই হাসিয়া উঠিলেন।

“আমার সে সামর্থ্য কি আছে ভাই ? একজন টি মার্চেণ্ট এক ‘কেস’ চা এমনই দিয়েছিল। ভাবলাম একা খাই কেন, পাঁচজনে মিলে খাওয়া যাক। গণেশ মাড়োয়ারিকে বলাতে চিনিও পাঠিয়ে দিলে কিছু। ঘরের গায়ের দুধ—দুটো গরুতে সের আস্টেক দিচ্ছে আজকাল। আর রেলের কয়লা, রাবণের চুলো দিনরাত জ্বলছে। জংশন থেকে একটা বড় কেৎলি আর কিছু কাপ আনিয়ে নিয়েছি। ঝক্‌সুর ভোরে ডিউটি—তাকে বললাম তুইও খা পাঁচজনকেও খাওয়া। বাস, মিটে গেল—”

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মাস্টার মশাইয়ের উপর জোর জবরদস্তি করিতে কাহারও বাধিত না। লাইনের সকলের তিনি ‘দাদা’ ছিলেন। আর একবারের আর একটা ঘটনা আমার মনে পড়িতেছে। শীতকালে প্রচুর মাছ চালান হইত, প্রত্যেক জেলেই মাস্টার মশাইকে মৎস্য উপঢৌকন দিত। মাস্টার মশাই নিজের জন্য কিছু রাখিয়া বাকীটা বিতরণ করিতেন। ডাক্তারবাবু, দারোগা, পোস্টমাস্টার প্রভৃতিকে তো দিতেনই, বেশী হইলে পরের স্টেশনের বাবুদেরও পাঠাইয়া দিতেন। একবার মাছ বেশী হয় নাই। চালান কম। পরের স্টেশনে পাঠাইবার মতো প্রচুর মাছ একদিনও জোটে নাই। হঠাৎ একদিন মাস্টার মশাইয়ের নামে একটা প্রকাণ্ড পার্শ্বেল আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। আমি তখন সেখানে উপস্থিত। বাক্সটা খুলিতেই দুইটা বিড়াল লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাক্সে একখানা চিঠি ছিল। পরের স্টেশনের বাবুরা লিখিতেছেন—“দাদা, বিড়াল দুইটাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা অন্তত আপনার পাতের কাঁটা চিবাইয়া বাঁচুক।”

“দেখেছ, দেখেছ, ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড দেখেছ—”

মাস্টার মশাইয়ের চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। তখনই বাজার হইতে কিছু মাছ কিনিয়া পরের ট্রেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এমনই কত ঘটনা... ।

কলিকাতায় নিজের কাজেই আসিয়াছিলাম। হাওড়া স্টেশন হইতে সোজা হয়তো বড়বাজারের সেই হোটেলটাতেই উঠিতাম। হাওড়া স্টেশনেই পূর্বপরিচিত একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহারই মুখে শুনিলাম মন্মথ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, ভাল চাকরি পাইয়াছে, একটা ঠিকানাও আমাকে দিল। অনেকদিন মন্মথকে দেখি নাই একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল, হাওড়া হইতে সোজা তাহার বাসাতেই গেলাম। বাড়িটি বেশ সুন্দর। —আমি বারান্দায় উঠিতেই একটি বালক-ভৃত্য আগাইয়া আসিল।

“কি চান আপনি ?”

“মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বল—”

বালকটি আমার কথা শেষ করিতে দিল না। ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটি শ্লেট পেন্সিল আনিয়া বলিল—"আপনার নাম আর কেন দেখা করতে এসেছেন তা এতে লিখে দিন—"

লিখিয়া দিলাম। বালক ভৃত্যটি ড্রইং রুম খুলিয়া দিয়া বলিল, "আপনি বসুন এখানে..."

বসিলাম। সোফা সেটিতে সাজানো ড্রইং রুমটিও বেশ সুন্দর। সুরুচির পরিচয় দিতেছে। প্রায় মিনিট দশেক পরে মন্মথ বাহির হইল। ভীড়ের মধ্যে দেখিলে চিনিতে পারিতাম না। ঢিলা পায়জামা পরা, বাটার ফ্লাই গোঁফ। আশা করিয়াছিলাম প্রণাম করিবে, কিন্তু করিল না। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"ও আপনি এসেছেন—"

"অনেকদিন দেখি নি। ভাবলাম—"

"বেশ করেছেন। উঠেছেন কোথায়—"

"কোথাও উঠি নি এখনও। হাওড়া স্টেশনে বেচুলালের সঙ্গে দেখা, সে-ই তোমার খবর আর ঠিকানা দিল। সোজা এখানেই চলে এলাম···"

মন্মথ হাত ঘড়িটা একবার দেখিল। তাহার পর বলিল—"আমর বাসায় আজ মোটে জায়গা নেই। একে ছোট বাসা, তার উপর আমার শালী ভায়রাভাই সবাই এসেছেন। চলুন আপনার থাকবার জায়গা একটা ঠিক করে ফেলা যাক আগে। বেশী রাত হয়ে গেলে হোটেলেও জায়গা পাওয়া যাবে না। যা লোকের ভীড় আজকাল কোলকাতায়—"

অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ উক্তিতে রাগ করিবার কিছু নাই। কিন্তু আমার কেবলই মনে হইতেছে তাহার সোফা সেটি সরাইয়া ওই ড্রয়িংরুমে আমার শুইবার একটু স্থান কি করিয়া দিতে পারিত না ?

আপনারা হয়তো বলিবেন এমন অসংগত প্রত্যাশা আপনি করেন কেন ? করিতাম না যদি এই মন্মথ সেই মাস্টার মশাইয়ের ছেলে না হইত।

মকরধ্বজ মহিমা

॥ এক ॥

স্থান বঙ্গদেশ, বৃন্দাবনবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র নিকুঞ্জবিহারী, সাধারণ দৃষ্টিতে নিন্দনীয় পাত্র নয়—বিদ্বান এবং চাকুরিস্থ। তথাপি, কালের গতিক এমনই হইয়াছে যে বৃন্দাবনবাবুকে পুত্রের বিবাহের জন্যই চিন্তিত হইয়া পড়িতে হইল। নিকুঞ্জবিহারী অবশ্য কন্যা নয়, বৃন্দাবন বাহিরে ব্যস্ততা দেখাইবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না, মনে মনে কিন্তু তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। বিবাহের প্রস্তাব যে আসে নাই তাহা নয়, অনেক আসিয়াছিল, কিন্তু নিকুঞ্জকে দেখিবার পর আর কেহ ফিরিয়া আসে নাই। নিকুঞ্জ ট্যারা। সুতরাং পুত্রের বিবাহ ব্যপদেশে বৃন্দাবন অর্থাগমের যে আশা করিয়াছিলেন তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া রুষ্ট চিত্তে কালের গতিকেরই নিন্দা করিতে

লাগিলেন। এ সম্পর্কে ইহা করা ছাড়া তাঁহার আর কিছু করিবার ছিল না। পরিস্থিতি এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত শানাই বাজিল। কারণ কালের গতিক পরিবর্তিত হইলেও প্রেমের গতিক পরিবর্তিত হয় নাই। ট্যারা নিকুঞ্জ খাঁদা কাদম্বিনীর প্রেমে পড়িয়া গেল। একেবারে মুখ থুবড়াইয়া পড়িল।...

কাদম্বিনীর পিতা ত্রিলোচন দাঁ ও নিকুঞ্জের পিতা বৃন্দাবন মল্লিক সহকর্মী। একই ব্যাঙ্কে উভয়ে কর্ম করেন। বৃন্দাবন কেশিয়ার, ত্রিলোচন কেরাণী। উভয়ের বাসাও কাছাকাছি, ঘরও পালটি। তথাপি কোন পক্ষই যে ইতিপূর্বে বিবাহের প্রস্তাব করেন নাই, তাহার কারণ মৌখিক ভদ্রতা বজায় থাকিলেও মনে মনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। ত্রিলোচনের আধুনিক চালচলন বৃন্দাবন পছন্দ করিতেন না, বৃন্দাবনের উচ্চপদ ত্রিলোচনের গাত্রদাহ সৃষ্টি করিত। সুতরাং ত্রিলোচন ট্যারা নিকুঞ্জবিহারীকে কখনও জামাইরূপে কল্পনা করিতে পারেন নাই, বৃন্দাবনের পক্ষেও কলেজ-গামিনী নাতি-উচ্চ-নাসা কাদম্বিনীকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল। প্রেমের দেবতা কিন্তু এসব গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া তরুণ হৃদয়যুগলকে এক অদৃশ্য বঁড়শীতে গাঁথিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন।

পরিস্থিতি পরিবর্তিত ও জটিলতর হইল।

॥ দুই ॥

প্রেম ও অগ্নি বেশী দিন চাপা থাকে না।

নিকুঞ্জবিহারী ও কাদম্বিনীর প্রণয়ও বেশী দিন চাপা রহিল না, প্রকাশ হইয়া পড়িল। একদা ত্রিলোচন-গৃহিণী অগোছাল কন্যার টেবিল গুছাইতে গিয়া তাহার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে যে কাগজের টুকরাটি আবিষ্কার করিলেন তাহা নিকুঞ্জবিহারী-লিখিত প্রণয় লিপি। সরল বঙ্গভাষায় লেখা। বুঝিলেন যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে যখনই উনি মেয়েকে কলেজে পড়িতে দিয়াছিলেন তখনই খাল খনিত হইয়াছিল। এখন কুম্ভীর ঢুকিবেই, জানা কথা। ত্রিলোচন আকাশ হইতে পড়িলেন। গৃহিণীর তাড়নায় এবং বিবেকের তাগিদে অবিলম্বেই কিন্তু তাঁহাকে উঠিতে হইল। একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

॥ তিন ॥

ব্যবস্থা করিতে গিয়া ত্রিলোচন স্বয়ং অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যার মনোভাব দেখিয়া তিনি ঘাবড়াইয়া গেলেন। যতদিন গোপনতার আবরণ ছিল ততদিন সঙ্কোচ ছিল। এখন সহসা-উদ্ঘাটিত-আবরণা মুহুর্মুহু-নিক্ষিপ্ত-শাণিত-মাতৃবাণ-সম্মুখীনা কাদম্বিনী মরীয়া হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দেশটা যে বাংলা দেশ, রাশিয়া নয়, কাদম্বিনী কিছুতেই তাহা বুঝিবে না। ট্যারা নিকুঞ্জকে ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবে না, তা সে ব্যক্তি আই-সি-এস-ই হোক বা কন্দর্প-ই হোক। বড়

ভয়ানক কথা। কন্যার অটল প্রবৃত্তিকে টলাইবার চেষ্টা যে বৃথা তাহা ত্রিলোচনকে অবশেষে উপলব্ধি করিতে হইল। অনুনয়-বিনয় তর্জন-গর্জন কিছুই কাজে লাগিল না। এই রাশিয়ান প্রবৃত্তির মুখে অগত্যা তখন তিনি সনাতনী-বঙ্গীয় মুখোস পরাইবার প্রয়াস পাইলেন। অর্থাৎ আন্তরিক বিরূপতা দমন করিয়া দন্তে হাসি ঝুলাইয়া বৃন্দাবনেরই দ্বারস্থ হইলেন। ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

॥ চার ॥

বৃন্দাবন চতুর লোক। কিন্তু অভদ্র নন।

তিনিও দন্তে হাসি ঝুলাইলেন, "বেশ তো। এ তো আনন্দের কথা, আপনি ঘরের লোক, আপত্তির তো কিছু দেখি না। বেশ, নিকুঞ্জকে দেখি বলে···আজকালকার ছেলে জানেনই তো··"

আবার হাসিলেন।

"আচ্ছা, আমি তাহলে পরে আসব একদিন—"

ত্রিলোচন চলিয়া গেলে ভ্রূকুটি-কুটিল-মুখে বৃন্দাবন কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ব্যাপারটা প্রণিধান-যোগ্য। ছেলেটা ট্যারা হইয়াই যত গোল করিয়াছে কি না। ভাল ভাল সম্বন্ধ সব ফিরিয়া গেল। ত্রিলোচনের মেয়েটাও কুরূপা। জুতা খট্-খটাইয়া কলেজে যায়। দেখিয়াছেন তিনি। খাঁদা নাক, কালো রং। নিকুঞ্জ পছন্দ করিবে কি ? ট্যারা হইলেও অন্ধ তো নয়। তাহার মতটা আগে লওয়া যাক। আজকালকার ছেলে, কিছুই বলা যায় না। ভাবিবে হয়তো আমি ট্যাবা বলিয়া একটা খাঁদা-বোঁচা ধরিয়া দিয়াছে। মা বাঁচিয়া থাকিলে কি···। বিপত্নীক বৃন্দাবন ঈষৎ বিচলিত হইলেন। পুত্রের প্রণয় কাহিনী তিনি শোনেন নাই. কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল তাঁহার পক্ষে। সুতরাং একটু ইতস্তত করিয়াই পুত্রের নিকট কথাটা একদিন পাড়িলেন তিনি। উত্তরে যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। আধুনিক উপমা দিতে হইলে বলিতে হয় যেন অ্যাটম্ বম্ পড়িল। বৃন্দাবন সাধারণ লোক হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ ব্যক্তি। মাথা ঠিক রাখিতে পারিলেন। পুত্রকে "আচ্ছা" বলিয়া বিদায় দিয়া টাকে একবার হাত বুলাইলেন। বুঝিলেন এ বিবাহে মত দিতেই হইবে। ফাঁকতালে মোচড় দিয়া ব্যাটার কাছ হইতে যদি কিছু আদায় করিতে পারা যায়। হাজার হোক আমি ছেলের বাপ। দেখাই যাক।

ত্রিলোচন আসিতেই তিনি বলিলেন, "আসুন। অনেক কষ্টে ছেলেকে রাজি করেছি, কিছুতে রাজি হয় না, বলে কালো মেয়ে—হ্যা হ্যা—। যাক রাজি হয়েছে। কিন্তু···"

মোচড়টি দিলেন।

॥ পাঁচ ॥

নগদ তিন হাজার টাকা !

বিপদবারণ মধুসূদনকে খানিকক্ষণ স্মরণ করিয়া ত্রিলোচন বুঝিলেন সময় নষ্ট হইতেছে, ইহা অপেক্ষা রামতারণের শরণাপন্ন হইলে বেশী কাজ হইবে। রামতারণ

হাজরা অল্প সুদে টাকা ধার দেন। লোকটি পরোপকারী। কিন্তু সেখানে গিয়াও ত্রিলোচনকে হতাশ হইতে হইল। রামতারণ অল্প সুদে টাকা ধার দেন বটে কিন্তু সকলকে দেন না। আদায় সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিলে মৃদু হাসিয়া বলেন—"দিতে পারলে খুবই সুখী হতাম, কিন্তু আমার হাতে এখন টাকা নেই—হেঁ—হেঁ"—ত্রিলোচনকেও তাহাই বলিলেন। কন্যার পিতা ত্রিলোচন নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। কন্যাকে তিনি বৃন্দাবনের দাবীর কথা কিছুই বলেন নাই। নিকুঞ্জবিহারীর আন্তরিক বার্তাও তিনি জানিতেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল কোনক্রমে বিবাহটা তাড়াতাড়ি হইয়া গেলে বাঁচেন তিনি। ভিতরে ভিতরে ব্যাপার যে কতদূর গড়াইয়াছে কে জানে! মেয়ে যখন এরূপ বদ্ধপরিকর তখন গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়। কলেজ যাইবার নাম করিয়া মেয়ে যে উচ্ছন্ন যাইতেছিল তাহা তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। উফ্! নানারূপ বিভীষিকা ত্রিলোচনের নয়ন হইতে নিদ্রা হরণ করিল। মেয়েকেও তিনি পণ বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না—তাঁহার ভয় হইল যদি আত্মহত্যা করিয়া বসে। টাকার চেষ্টায় ব্যাকুলচিত্তে তিনি নানাস্থানে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

…ঋণ কিন্তু কোথাও মিলিল না।

অবশেষে ত্রিলোচন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তাঁহাদের মনিব, মিস্টার মকরধ্বজ ভার্গবের কাছে গেলেন। নিরতিশয় কৃপণ বলিয়া লোকটার যদিও অখ্যাতি আছে, কিন্তু লোকটা বুদ্ধিমান। হয়তো কোন বুদ্ধি বাতলাইতে পারে। ত্রিলোচন তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল ভার্গব হৃদয়বানও। ত্রিলোচনকে তিনি আশ্বাস দিলেন। ইংরেজী ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম—তুমি ওইখানেই বিবাহ ঠিক কর, কেশিয়ারবাবুকে বল যে টাকা তিনি দাবী করিয়াছেন তাহা তিনি পাইবেন। কি করিয়া টাকাটা পাওয়া যাইবে নিম্নকণ্ঠে তাহার পরামর্শও তাহাকে দিলেন। ভার্গবের বিচক্ষণতায় ত্রিলোচনকে বিস্মিত ও হৃষ্ট হইতে হইল। কিছুক্ষণ পরে বৃন্দাবনও বিস্মিত ও হৃষ্ট হইলেন। ত্রিলোচন তিন হাজার দিতেই রাজি! একটু দরদস্তুর বা কচলাকচলি করিল না। মত পরিবর্তন করিয়া এ আশাও বৃন্দাবন পোষণ করিলেন যে হয়তো ত্রিলোচনের সহিত আত্মীয়তা করিয়া ভবিষ্যতে আনন্দও মিলিতে পারে।

বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।

॥ ছয় ॥

…সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে।

অন্যান্য দানসামগ্রীর সহিত পণের নোটগুলি একটি রূপার থালায় গুচ্ছ করিয়া বাঁধা আছে। বৃন্দাবন তখনও সেগুলি তুলিয়া রাখেন নাই।

বর কন্যা বাসর ঘরে।

বরযাত্রী কন্যাযাত্রীদের আহার সমাপ্ত হইয়াছে।

বৃন্দাবন মাঝে মাঝে প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। সকলেই আসিয়াছেন কেবল ভার্গব এখনও আসেন নাই। এখনও আসিবার সময় অবশ্য আছে। ওই যে…

সহসা মকরধ্বজ ভার্গবকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল। অতিশয় গম্ভীর মুখ।

“আইয়ে আইয়ে—”

বিকশিত-দর্শন উচ্ছ্বসিত বৃন্দাবন আগাইয়া গেলেন।

ভার্গবের অধরে কিন্তু প্রত্যাশিত ভদ্রতাসূচক হাসিটি ফুটিল না। বরং ওষ্ঠাধর দৃঢ়নিবদ্ধ হইল।

বৃন্দাবন নিকটে যাইতেই তিনি ইংরেজি ভাষায় যাহা বলিলেন তাহার বাংলা মর্ম এই—“আমি এই মাত্র খবর পাইলাম যে ব্যাঙ্ক হইতে তিন হাজার টাকার নোট চুরি গিয়াছে এবং তাহা নাকি আপনার বাড়িতেই আছে। আপনি পণস্বরূপ যে টাকাগুলি পাইয়াছেন সেগুলি কোথায় ?”

“ওই যে—”

ভার্গব আগাইয়া গিয়া নোটের গোছা তুলিয়া লইলেন। “এই তো আমাদের ব্যাঙ্কেরই ছাপ মারা নোট !”

“ত্রিলোচনবাবু—”

বৃন্দাবন গর্জন করিতেই ত্রিলোচন আগাইয়া আসিয়া সসঙ্কোচে বলিলেন—“আমিই ব্যাঙ্ক থেকে আজ চুরি করে এনেছি ওগুলো।”

“কি করে ?”

ভার্গব ইংরেজিতে পুনরায় বলিলেন—“তাহার বর্ণনা পরে শুনা যাইবে। টাকাগুলি যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর পুলিশে খবর দিব না, দিলে অনর্থক একটা হাঙ্গামা হইবে।”

বৃন্দাবনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—“আপনাকে হয়তো অ্যারেস্ট করবে।”

“আমাকে ! কেন ?”

“কারণ আপনি কেশিয়ার। যাক, টাকা যখন পাওয়া গেল তখন ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে গিয়া লাভ কি !”

ভার্গব হাসিয়া নোটের তাড়া পকেটে পুরিলেন। তাহার পর ত্রিলোচনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“দিস ইজ শেমফুল। আপনাকে ইহার জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। নট্ নাউ, টুমরো। চলুন এখন খাওয়া যাক—”

ত্রিলোচন সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন।

অণুবীক্ষণ

ডাক্তার বসু কিছু পুঁজ ও রক্ত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় ডাক্তার বসু নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক।

“আমার রিপোর্ট দুটো কখন দেবেন ?”

“‘বিকেল পাঁচটা-ছটা নাগাদ।”

“ইনি আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাইছেন। তাই নিয়ে এলাম। আমি আর পরিচয় করিয়ে দেব না, নিজের পরিচয় ইনি নিজেই দেবেন। আমি চলি, আমার

অনেক কাজ বাকী।" প্র্যাকটিস তুংগারূঢ় ডাক্তার বসু চলিয়া গেলেন। আমি আগন্তুক ভদ্রলোকের সংগে আলাপ করিবার জন্য ঘুরিয়া বসিলাম। তাঁহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। প্রৌঢ়বয়স্ক বটে কিন্তু অনিন্দ্যকান্তি। আলাপ করিয়া আরও মুগ্ধ হইতে হইল। এরকম পণ্ডিত লোক সচরাচর দেখা যায় না। সক্রেটিস হইতে শুরু করিয়া স্ট্যালিন পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কণ্ঠস্থ। ভারতবর্ষেরও বৈদিক যুগ হইতে গান্ধিযুগ পর্যন্ত নখদর্পণে। সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, সর্ববিষয়ে চৌকষ। নানাবিধ আলোচনার পর অবশেষে তিনি ব্রহ্মচর্য-বিষয়ক আলোচনা শুরু করিলেন। বলিলেন—"দেখুন, অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি ব্রহ্মচর্য না হলে কিছু হবার উপায় নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"

"তাই নাকি?"

"নিশ্চয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে এবিষয়ে ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। যে অগাধ জলে সাঁতার কেটেছে সেই জানে অগাধ জলে সাঁতরাবার কি সুখ।"

সহসা ভদ্রলোকের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা হইল। কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন—এখানে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। যে কয়দিন থাকেন এখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সংগে আলাপ করিয়া বেড়াইতেছেন।

"কারণ ভদ্রলোকদের সংগে আলাপ করাও একটা মস্ত শিক্ষা, বুঝলেন না?"

আমি কাজ করিতে করিতেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছি দেখিয়া তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, এখন উঠি। পরে আসব আবার।"

চলিয়া গেলেন। আমি কাজ করিতে লাগিলাম। একটু পরে শশধর পণ্ডিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শশধর আমাকে হতাশ করিয়াছিলেন। লোকটার কদর্য চেহারা; মাথার টিকি, কপালের চন্দন, ত্রিসন্ধ্যা, সদা সংকুচিত-ভাব, ইংরেজি জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি হইতে আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে তাঁহার ঠোঁটের ঘায়ের কারণ সিফিলিস। পরীক্ষা করিয়া কিন্তু অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইয়াছি। রক্তে দোষ নাই। শশধর ফী দিয়া রিপোর্ট লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমার কাজ শেষ হইল। ল্যাবরেটরি বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছি, ডাক্তার বসু পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

"আমার রিপোর্ট হল মশাই?"

"হ্যাঁ, হয়ে গেছে। কিন্তু রোগীর নাম তো দিয়ে যান নি—তাই রিপোর্টটা লেখা হয় নি।"

"স্বয়ং রোগীকে তো দিয়ে গেলাম তখন।"

"কে? ওই ভদ্রলোক! বলেন কি?"

"এতে আর বলবার কি আছে! কি পেলেন?"

"সিফিলিস গণোরিয়া দুটোই পজিটিভ্ যে!"

"তাই তো প্রত্যাশা করেছিলাম। বিলিতি এডুকেশনের মজাই ওই! এম. এ; ডি. লিট—প্রচণ্ড বিদ্বান!"

ডাক্তার বসু মুচকি হাসিলেন।

ঝুলন পূর্ণিমা

[মেঘ-ঢাকা জ্যোস্নায় চতুর্দিক স্বপ্নাতুর। বাহিরের প্রশস্ত বারান্দায় কথা মাঠের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সে গুনগুন করিয়া গান ধরিল—"আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কি এনেছিস বল।" গানটা যেন তাহার অন্তর হইতে আপনা হইতেই উথলিয়া উঠিল। মৃদু করুণ ভীরু কণ্ঠস্বব। সহসা কথার মা প্রবেশ করিলেন।

কথার মা। [রাগত কণ্ঠে] এখানে ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে গান গাওয়া হচ্ছে, ওদিকে যে বাসনের কাঁড়ি পড়ে আছে। কখন মাজা হবে সেগুলো ?

কথা। এই যাচ্ছি— [কথা উঠিয়া দাঁড়াইল।]

কথার মা। অত বড় মেয়ের যদি এতটুকু হুঁস আছে। উনি এখুনি তেতে পুড়ে এসেই ভাত চাইবেন।

কথা। এক্ষুণি মেজে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, বাবার আজ ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন মা ?

কথার মা। নফরগঞ্জে গেছেন বোধহয়।

কথা। কেন ?

কথার মা। তোমারই জন্যে, আবার কেন। কি যে আছে তোমার অদৃষ্টে ভগবানই জানেন। যেখানে সম্বন্ধ করছেন সেখানেই একটা না একটা বাগড়া লাগছে।

[কথার বাবা শ্রীকুমারবাবু প্রবেশ করিলেন। প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। কথা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।]

কথার মা। এত দেরী যে. নফরগঞ্জে গিয়েছিলে না কি ?

শ্রীকুমার। হ্যাঁ, ঠিক করে এলুম।

কথার মা। ওই মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে ?

শ্রীকুমার। হ্যাঁ।

কথার মা। কেন খগেন বলে যে ছেলেটি ছিল ?

শ্রীকুমার। সেখানে আমরা পেরে উঠব না। তার বাবা নগদ পাঁচটি হাজার টাকা চায়, তার ওপর গয়না দিতে হবে। তাছাড়া তোমার মেয়ে কালো। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, গান-বাজনা শিখিয়েছিলাম যদি বিয়ের বাজারে কিছু সুবিধে হয়। কিন্তু এখন দেখছি রূপ আর রূপিয়া এ দুটি না থাকলে কিছু হয় না।

কথার মা। আমার মেয়ে কালো হোক কিন্তু কটা মেয়ের অমন মুখ চোখ গড়ন—

শ্রীকুমার। লোকে মুখ চোখ গড়ন চায় না, রং চায় এবং তার সঙ্গে টাকা। এই দোজবরে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীই যা চায় তাতেই তোমার গয়না বন্ধক দিতে হবে। অথচ লোকটা প্রায় আমার বয়সী, এক ঘর ছেলে মেয়ে—

নেপথ্যে নন্দলাল। শ্রীকুমার বাড়ি আছ···

শ্রীকুমার। কে নন্দ, এস এস। এই ফিরলুম ভাই, এস বস। আমি কাপড় জামাটা ছেড়ে আসি।

[শ্রীকুমারের বন্ধু ও প্রতিবেশী নন্দলাল প্রবেশ করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কথার মা ও শ্রীকুমারবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। বারান্দার ইলেকট্রিক আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল বারান্দায় আরও গোটা দুই চেয়ার রহিয়াছে। একটা চেয়ারের উপর একখানা খবরের কাগজ ছিল, নন্দলাল সেটা তুলিয়া লইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে ক্ষোভ ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কাগজটা তিনি রাখিয়া দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকুমার পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তিনি জামা কাপড় ছাড়িয়া আসিয়াছেন।]

নন্দলাল। তোমার ফিরতে আজ এত দেরি যে—

[শ্রীকুমার একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন।]

শ্রীকুমার। পাত্রের চেষ্টায় নফরগঞ্জে গিয়েছিলাম ভাই।

নন্দলাল। হল কিছু ?

শ্রীকুমার। ওই মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গেই ঠিক করে এলাম।

নন্দলাল। [বিস্মিত ; আরে, তুমি পাগল না কি !

শ্রীকুমার। কি আর করি বল ভাই। বামন হয়ে আকাশের চাঁদ চাইলে তো চলবে না।

নন্দলাল। লোকটার গালে একটা প্যাচ আছে দেখেছ ?

শ্রীকুমার। দেখেছি, ছুলি টুলি বোধহয়।

নন্দলাল। বীরেন ডাক্তার বলছিল লেপ্রসি।

শ্রীকুমার। আরে না না, তুমি আর বাগড়া দিও না। আমারও ওই রকম একটা হয়েছিল বুকে। সেরে গেছে এখন—

নন্দলাল। আমি এলুম তোমার সঙ্গে এক দান পাশা খেলে চিত্ত বিনোদন করতে কিন্তু তুমি মাথাটি একদম ঘুরিয়ে দিলে যে—ছি ছি—মহেন্দ্র গাঙ্গুলী অফ অল মেন !

শ্রীকুমার। এতে মাথা ঘোরবার কি আছে ?

নন্দলাল। তুমি তোমার মেয়েকে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর হাতে দেবে ! তুমি—যে মেয়েকে খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছ—ভারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যার বক্তৃতা শুনে তাক লেগে যায় সকলের—

শ্রীকুমার। আমার দুরবস্থার কথাটা ভেবে দেখ। ফ্যাক্টকে তো অগ্রাহ্য করতে পারি না। টাকা না হলে মেয়ের বিয়ে হবে না এই হল ফ্যাক্ট। আমার টাকা নেই অথচ মেয়ের বিয়ে না দিলেও নয় সুতরাং যা জুটেছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে—তা সে পাত্র বুড়োই হোক আর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তই হোক।

নন্দলাল। কেন ওই নিখিলের সঙ্গে দাও না। এম. এ. পড়ছে, পণ চাইবার মতো গার্জেনও কেউ নেই তেমন। ওকে বললে তো আপত্তি করবে না সম্ভবত। কথার সঙ্গে ওর ভাবও আছে। নিখিলের মা অবশ্য আছেন—

শ্রীকুমার। আরে ও বামুনের ছেলে হলে কি আর ভাবনা ছিল, কিন্তু ও যে কায়স্থ—

নন্দলাল। হলেই বা। তোমার মুখেই শুনেছি আমাদের জাতিভেদ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা গুণগত। তোমার মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর তুলনায় নিখিল রায় ঢের বেশী ব্রাহ্মণ।

শ্রীকুমার। কিন্তু যে হিন্দুসমাজে বাস করি তার এতকালের প্রথাকে ওলটাবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই।

নন্দলাল। আমাদের দুরবস্থার আসল কারণ কি জান ?

শ্রীকুমার। কি ?

নন্দলাল। সাহসের অভাব। ভীরুতা। আমরা চিন্তায় যা উচিত বলে মনে করি বক্তৃতায় যা বলি কাজে সেটা করতে পারি না। যে সমাজে পৌরুষের স্বাধীন চিন্তার স্থান নেই সে সমাজ কি হিন্দু সমাজ ? নির্বোধ নপুংসক হওয়াটাই হিন্দুত্বের লক্ষণ না কি ? প্রায়ই কাগজে দেখি মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দু মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, হিন্দু মন্দির অপবিত্র করছে—আজও আছে একটা খবর, কই হিন্দুসমাজে তা নিয়ে তো কোনও আন্দোলন দেখি না। কোনও হিন্দু যুবক তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে এ রকম খবরও বড় একটা চোখে পড়ে না তো। এই নির্বীর্য সমাজের প্রথাকে মানবার কি সার্থকতা আছে ? এ সমাজ ভেঙে ফেলাই তো উচিত। একবার ভাঙতে আরম্ভ করলেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে সবটা, ঘুণে-ধরা বাড়ির মতো।

শ্রীকুমার। ভয় করে। তাছাড়া আমার স্ত্রী আছে, তারও একটা মতামত আছে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

নন্দলাল। তোমার স্ত্রীর মতামত মেনে তুমি চল ? ওই কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত দোজবরে মহেন্দ্র গাঙ্গুলীতে তার মত আছে ?

[এক্ষেত্রে সাধারণত যাহা হয় তাহাই হইল। শ্রীকুমার 'টেম্পার লুজ' করিলেন।]

শ্রীকুমার। এ নিয়ে বৃথা তর্ক করছ কেন ? ওইখানেই বিয়ে ঠিক করে এসেছি, ওইখানেই বিয়ে হবে। কেউ আটকাতে পারবে না।

নন্দলাল। আমি যদি তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে ওই নিখিলের সঙ্গে রাজি করাতে পারি তাহলে ?

শ্রীকুমার। না, তাহলেও আমি দেব না।

নন্দলাল। কেন ?

শ্রীকুমার। পাত্র হিসাবে ওই 'লোফার'টার চেয়ে মহেন্দ্র গাঙ্গুলী ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য। [কথা প্রবেশ করিল।]

কথা। আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে। নন্দ কাকা আপনাকেও মা খেতে বললেন, মা মুগের ডালের পুলি করেছেন আজ—

নন্দলাল। বেশ চল।

[শ্রীকুমার ও নন্দলাল উঠিয়া ভিতরে গেলেন। কথা বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দার আলোটা নিবাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক প্লাবিত হইয়া গেল যেন। শ্রাবণের মেঘ সরিয়া গিয়াছে। কথাও ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু দূরে নিখিলকে আসিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল। নিখিল আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে কয়েকটা কদম ফুল।]

কথা। নিখিল দা ?

নিখিল। হ্যাঁ।

কথা। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে, নয় ?

নিখিল। আজ যে ঝুলন পূর্ণিমা। তোমাদের বাড়ির পিছনের কদম গাছটা দেখেছ ? অপরূপ হয়ে উঠেছে।

কথা। না, দেখি নি।

[কিছুক্ষণ উভয়েই চুপচাপ। মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিল। জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গেল।]

নিখিল। (আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া) তোমাকে আজ বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে, কি হয়েছে?

কথা। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) বিমর্ষ দেখাচ্ছে? বিমর্ষ দেখানো তো উচিত নয়। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আজ।

নিখিল। কোথায়, কার সঙ্গে?

কথা। নফরগঞ্জে (হাসিয়া) বিয়ে হবার আগে তো নাম করতে দোষ নেই, না? নফরগঞ্জের মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে।

নিখিল। কি সর্বনাশ! সেই যার মহাজনী কারবার আছে? ওই বুড়োর বিয়ে করবার শখ আছে নাকি এখনও!

কথা। নন্দ কাকা বলছেন শুনতে পেলাম তার নাকি কুষ্ঠও আছে। বুড়ো বয়সে সেবা করবার লোক চাই তো একটা—

কথা মাথা নত করিল। নিখিলের সামনে চোখের জল ফেলিয়া অপ্রতিভ হইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কিন্তু কিছুতেই সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না।]

নিখিল। (একটু ইতস্তত করিয়া) মানে—

কথা। (ব্যাধ-ভীত হরিণীর মতো) আমাকে বাঁচাও তুমি নিখিল দা—

নিখিল। বিশ্বাস কর, আমার দিক দিয়ে চেষ্টা আমি যথেষ্ট করেছি। মায়ের কিছুতেই মত হল না। নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাঁর মন, তাঁর কেবলই ভয় পাছে কিছু অমঙ্গল ঘটে। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাই কি করে বল?

কথা। (স-শ্লেষে) সেদিন তুমি খুব ঠাট্টা করেছিলে কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল তখন ভীষ্মের মতো লোকও চুপ করে ছিলেন বলে। এখন তুমি যেমন যুক্তি দেখালে ভীষ্মেরও সেদিন তেমনি একটা যুক্তি ছিল। এদেশে মহা মহা রথী চিরকালই আছেন কিন্তু কার্যকালে সবাই গা বাঁচিয়ে চলতে জানেন বেশ। এদেশের দুঃশাসনদের হাতে এদেশের দ্রৌপদীদের লাঞ্ছনা তাই আজও সমানে চলেছে। কিছুই হবে না তা আমি জানতাম, কিন্তু তবু কেন জানি না তোমার কাছে একটু অন্য রকম প্রত্যাশা করেছিলাম। [তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল।]

নিখিল। আমার মনের ভাব তোমায় ঠিক বোঝাতে পারছি না। বিশ্বাস কর আমিও কষ্ট পাচ্ছি খুব। মনে হচ্ছে যেন একটা অদৃশ্য কারাগারে বন্দী হয়ে আছি—কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছি না।

কথা। ইচ্ছের তেমন জোর থাকলে মুক্তি পাওয়া যায় বই কি। তোমরা অক্ষম কাপুরুষ। সাধে হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বর্বরতার মধ্যে তবু খানিকটা পৌরুষ আছে।

[ভিতরে চলিয়া গেল এবং পরমুহূর্তেই আবার ফিরিয়া আসিল।]

কিছু মনে কোরো না নিখিল দা, এসব কথা আমার বলা উচিত ছিল না তোমাকে। বড় দুঃখে কথাগুলো বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। তোমারও দুঃখ হচ্ছে বুঝতে পারছি। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।

নিখিল। এই ঝুলন পূর্ণিমায় কত সুখী হতে পারতাম আমরা। কিন্তু এমন এক অদ্ভুত সংস্কারের বেড়াজালে বন্দী হয়ে আছি—

কথা। আমি যাই নিখিল দা—

নিখিল। এই ফুলগুলো নেবে না, তোমার জন্যেই এনেছিলাম।

কথা। দাও—

নিখিল। এসো তোমায় পরিয়ে দিই—

[কথা মাথা পাতিয়া দাঁড়াইল, নিখিল ফুলগুলি তাহার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। বাহিরের মাঠে জ্যোৎস্না মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছে। সহসা বারান্দার আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকুমার এবং নন্দলাল প্রবেশ করিলেন।]

শ্রীকুমার। এ কি !

[কথা ও নিখিল দুইজনেই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকুমারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি বোমার মতো ফাটিয়া পড়িলেন।]

এ কি কাণ্ড ! নিখিল, তুমি ভদ্রলোকের ছেলে না ? এই সব করতে এখানে আসা হয় ? হারামজাদা শুয়ারকা বাচ্ছা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—

[নন্দলাল বাধা দিবার পূর্বেই তিনি নিখিলকে গলাধাক্কা দিলেন। নিখিল ছিটকাইয়া বাহিরে পড়িয়া গেল।]

নন্দলাল। (শ্রীকুমারের হাত ধরিয়া) ছি ছি কি যে কর তুমি।

[শ্রীকুমার এক ঝটকায় নন্দলালকে ঠেলিয়া দিয়া কথার প্রতি ধাবমান হইলেন।]

শ্রীকুমার। বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা, তুইও দূরে হয়ে যা। রাক্ষুসী ডাইনি হাড় মাস কালি করে দিলে আমার। বেরো—

[কথাও সভয়ে মাঠে নামিয়া পড়িল। নন্দলাল শ্রীকুমারকে টানিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বারান্দার বাতিটা নিবাইয়া দিলেন। মেঘ-চাপা জ্যোৎস্নার চাপা হাসিতে চতুর্দিক ভরিয়া গেল। নিখিল অথবা কথা কাহাকেও দেখা গেল না। তাহারা দুইজনেই অন্তর্ধান করিয়াছে। একটি ভৃত্য জাতীয় লোক প্রবেশ করিল।]

ভৃত্য। শ্রীকুমারবাবু, শ্রীকুমারবাবু—

[নন্দলাল বাহির হইয়া আসিলেন।]

নন্দলাল। কে ?

ভৃত্য। আমি গাঙুলী মশাইয়ের কাছ থেকে এই চিঠিখানা এনেছি।

নন্দলাল। কোথাকার গাঙুলী ?

ভৃত্য। নফরগঞ্জের মহেন্দ্র গাঙুলী শ্রীকুমারবাবুকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন।

একটি পত্র বাহির করিয়া দিল।]

নন্দলাল। আচ্ছা আমি দিয়ে দেব এখন।

ভৃত্য। আমি কি অপেক্ষা করব ?

নন্দলাল। না, অপেক্ষা করবার দরকার নেই। শ্রীকুমারের শরীরটা ভাল নেই। কাল না হয় এসো বরং একবার।

ভৃত্য। আচ্ছা।

[চলিয়া গেল। শ্রীকুমার প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু সামলাইয়াছেন।]

শ্রীকুমার। কে ডাকছিল আমাকে ?

নন্দলাল। মহেন্দ্র গাঙ্গুলীর বাড়ি থেকে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

[চিঠিটা দিলেন।]

শ্রীকুমার। (পত্র পাঠান্তে) রাসকেল।

নন্দলাল। কি হল ?

শ্রীকুমার। লিখেছে আরও অন্তত পাঁচশ টাকা না দিলে সে বিয়ে করতে পারবে না। দুহাজার চেয়েছিল, আমি হাতে পায়ে ধরে বলে এসেছিলাম যে এক হাজার টাকার বেশী দিতে পারব না। চুপ করে রইল, ভাবলাম বুঝি রাজি হয়ে গেল।

[চেয়ার টানিয়া বসিয়া পা নাচাইতে লাগিলেন।]

(সহসা অযৌক্তিকভাবে) কেস করব আমি ব্যাটার নামে।

নন্দলাল। (এদিক ওদিক চাহিয়া) কথা কোথা গেল ?

শ্রীকুমার। যাবে আবার কোন চুলোয়, আসবে ঠিক।

নন্দলাল। অত উত্তেজিত হয়ো না, স্থির হও। গান-টান শোন বরং দু-একখানা। লতা কোথায় ?

শ্রীকুমার। (সবিস্ময়ে) গান !

নন্দলাল। হোক না, প্রকৃতিস্থ হও একটু।

শ্রীকুমার। জি ইউ এন্ 'গান' বরং জোগাড় করতে পার তো দেখ একটা।

নন্দলাল। (ভিতরের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন) লতা, লতা—

[কথার বোন লতা প্রবেশ করিল। বারো বছরের কিশোরী।]

নন্দলাল। দিদি কোথা ?

লতা। কি জানি।

নন্দলাল। আচ্ছা, তুমি একটা গান শোনাও দেখি। বস ওইখানে।

[লতা সিঁড়ির কাছে দেওয়াল ঠেস দিয়া বসিল এবং শ্রীকুমারের দিকে সভয়ে আড়চোখে চাহিতে লাগিল।]

নন্দলাল। না, তোমার বাবা কিছু বলবে না, গাও।

[শ্রীকুমার একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এক দল কালো মেঘ চাঁদটাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। চাঁদ হাসিতেছে। লতা গান ধরিল "জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।" দরদ দিয়া চমৎকার করিয়া গাহিল। গান শেষ হইলে নন্দলাল কথা কহিলেন। শ্রীকুমার নীরবে নির্ণিমেষে মাঠের দিকে চাহিয়াছিলেন।]

নন্দলাল। বাঃ চমৎকার। আর একটা গাও।

[লতা গান ধরিল,—'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণ দিয়া গাহিল। শ্রীকুমারবাবুও তন্ময় হইয়া শুনিলেন।]

নন্দলাল। (গান শেষ হইবার পর) বাঃ, বেশ। সুন্দর। আচ্ছা কথা গেল কোথা ? ভিতরে এসেছে কি না দেখ তো···

[লতা ভিতরে চলিয়া গেল ও মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিল।]

লতা। না, দিদি তো বাড়িতে নেই।

নন্দলাল। আমাদের বাড়ি গেছে বোধহয়। দেখে এসো তো, থাকলে ডেকে আনো—

[লতা চলিয়া গেল।]

শ্রীকুমার। (নিশ্বাস ফেলিয়া) মহেন্দ্র গাঙ্গুলী তো হাতছাড়া হল। কি যে হবে, আর পারি না।

নন্দলাল। আমার পরামর্শ শুনবে ?

শ্রীকুমার। কি ?

নন্দলাল। এই নিখিল ছোকরার সঙ্গে চেষ্টা কর।

শ্রীকুমার। আবার ওই কথা তুলছ ! নিখিল তোমাকে ঘুস দিয়েছে নাকি কিছু ?

নন্দলাল। (হাসিয়া) তার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপও নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা শিক্ষিতরা যদি সমাজসংস্কার না করি তাহলে কে করবে ?

শ্রীকুমার। ব্রাহ্মসমাজ সে চেষ্টা একবার করেছিল এখনও করছে, ফল কি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ।

নন্দলাল। ইয়োরোপ আমেরিকার দিকে চেয়ে দেখ।

শ্রীকুমার। এতদূর থেকে চেয়ে দেখলে কিছু দেখা যাবে না। সে সমাজে গিয়ে বাস করলে বোঝা যেতে পারে খানিকটা। সে সুযোগ আপাতত এখন নেই আমাদের।

নন্দলাল। তাহলে ওদের সভ্যতার নকল করে ছেলেমেয়েদের বিলাতী শিক্ষা দিচ্ছ কেন ? শিক্ষা দিচ্ছ অথচ শিক্ষা অনুসারে কাজ করতে গেলে বাধা দিচ্ছ, কোন মানে হয় এর ?

শ্রীকুমার। ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলাম চাকরি পাবে বলে। মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছিলাম কতকটা হুজুগে পড়ে, কতকটা ভাল পাত্রের আশায়। এখন দেখছি দুটো আশাই মরীচিকাবৎ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা-ও বিশেষ কিছু হয়নি। সুতরাং পথ এবং মত বদলাবার সময় এসেছে।

নন্দলাল। তাহলে কি করতে চাও তুমি ?

শ্রীকুমার। ভাল পথের যতক্ষণ না সন্ধান পাচ্ছি, ততক্ষণ প্রাচীন পথেই চলবার চেষ্টা করব, তা হোক সে গেঁয়ো মেঠো পথ।

নন্দলাল। কিন্তু তোমার মেয়ে যদি ওপথে না চলতে চায় ?

শ্রীকুমার। চলতেই হবে।

নন্দলাল। অন্য পথে যায় যদি, কি করবে ?

শ্রীকুমার। বাধা দেব।

নন্দলাল। পারবে ?

শ্রীকুমার। নিশ্চয়।

[ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে লতা প্রবেশ করিল।]

লতা। বাবা শিগ্গির এসো। আমাদের বাড়ির পিছনের কদম গাছটায় দিদি আর নিখিলদা ঝুলছে।

শ্রীকুমার। (সবিস্ময়ে) ঝুলছে !

লতা। পরবার কাপড় খুলে গলায় দাঁড় দিয়েছে দুজনেই !

নন্দলাল। অ্যাঁ সে কি ! চল চল—

[সকলে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।]

নমুনা

সুশীল। আজও চাল পেলে না ?

বিনোদ। (ম্লান হাসিয়া) কই আর পেলুম !

সুশীল। তুমি চেষ্টা করছ না ভাল করে।

বিনোদ। আর কি করব, বল ? পরশু দিন গালাগালি খেয়েছি, কাল গুঁতো খেয়েছি, আজ এই দেখ—

দক্ষিণ পদটি তুলিয়া দেখাইলেন। বুড়ো আঙুলে রক্তাক্ত নেকড়া জড়ানো।]

সুশীল। ছি ছি, এ কি কাণ্ড ! কি করে হল এ ?

বিনোদ। কাল জুতো জোড়া ভিজে গিয়েছিল, আজ খালি পায়েই গিয়েছিলুম, বুটজুতো-পরা এক ছোকরা মাড়িয়ে দিলে।

সুশীল। তোমার যাবার দরকার কি ! জীবু গেলেই পারে।

বিনোদ। যায় না তো।

সুশীল। বলেছিলে তাকে ?

বিনোদ। ছেলেমেয়ে বড় হবার পর আমি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিনি ভাই কোনদিন, আজই বা করব কেন ? (একটু থামিয়া) তা ছাড়া নিজের সন্তানকে ওই ভিড়ের মধ্যে পাঠাতে ইচ্ছেও করে না।

সুশীল। জীবু সমস্ত দিন করে কি ?

বিনোদ। জানি না। অধিকাংশ সময়ই বন্ধু বীরেনের বাড়িতে থাকে।

সুশীল। খাবার সময় ঠিক আসে নিশ্চয়।

বিনোদ। না এলে কোথায় যাবে, বল ? কোন কোন দিন তাও আসে না।

[উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।]

সুশীল। সারাজীবন মাস্টারি করে কাটালে, অথচ নিজের ছেলেমেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পার না কেন যে বুঝি না। তোমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তবু—

বিনোদ। কি করি বল ভাই ? নিজের স্বভাব তো বদলাতে পারি না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছি, তারা বড় হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মুখে লাগাম লাগিয়ে কাঁহাতক টেনে রাখি, বল ?

সুশীল। তোমার এই ঢিলেমির জন্যেই শিবু আর সবিতার জেল হয়েছে। তুমি যদি মানা করতে, ওরা কখনও এ আন্দোলনে যোগ দিত না।

[বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন। নিজের কেশবিরল মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন। ভিতরের ঘর হইতে সেতারের টুং-টাং শোনা গেল।]

সুশীল। অমিতা বুঝি ?

বিনোদ। হ্যাঁ।

সুশীল। বেশ আছ তোমরা ! ঘরে চাল নেই, অথচ মেয়ে সেতার বাজাচ্ছে বসে !

বিনোদ। সেতারটা ভেঙে ফেললে কি চাল পাওয়া যাবে ?

সুশীল। হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে রোজই ভুলে যাই। সুখময়বাবুর সঙ্গে

কি হয়েছে বল তো? ও ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব থাকলে চাল পেতে পার সহজে। বড়লোকের ছেলে, বড় চাকরি করে, অনেক ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাবও আছে, অনায়াসেই চাল যোগাড় করে দিতে পারে। হল কি ওর সঙ্গে?

বিনোদ। ঠিক জানি না। শিবুর বন্ধু হিসেবে আমাদের বাড়ি আসত মাঝে মাঝে। শিবুর জেল হওয়ার পরও অনেকবার এসেছে। হঠাৎ একদিন দেখি, অমিতা তাড়িয়ে দিচ্ছে ওকে বাড়ি থেকে। সুখময় চলে যাবার পর অমিতাকে কারণটা জিজ্ঞেস করলুম, কোন জবাব দিলে না। প্রণয়ঘটিত কিছু বোধহয়।

সুশীল। বেশ নির্বিকারভাবে বললে তো কথাটা!

বিনোদ। তুমি বাল্যবন্ধু বলেই বললুম। তা ছাড়া ওসব ব্যাপারে সত্যিই আমার কোন আপত্তি নেই, থাকলেও টিকত না। প্রতি ঘরেই বড় বড় অবিবাহিতা মেয়ে, সমাজের এমন অবস্থা যে ভদ্রভাবে বিয়ে দেওয়া যায় না, পুরুষের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবারও উপায় নেই, মিশতে দিতে হচ্ছে, সুতরাং এর অনিবার্য পরিণামটাকেও মানতে হবে।

সুশীল। ভাল।

[উভয়েই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ভিতর হইতে সেতারে তিলকামোদ বাজিতে লাগিল।]

সুশীল। বাঃ, বেশ হাত হয়েছে তো! আচ্ছা, আমি এবার উঠি ভাই।

[চলিয়া গেলেন। সেতার বাজিতে লাগিল। বিনোদবাবু চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরে তাঁহার জনৈক প্রাক্তন ছাত্র সুরেন আসিয়া প্রবেশ করিল।]

বিনোদ। এসো সুরেন। কি খবর?

সুরেন। চাল-টাল পাচ্ছেন সার্?

বিনোদ। কই আর পাচ্ছি!

সুরেন। হোর্ডিং স্টপ করতে না পারলে কেউ আর কিছু পাবে না।

বিনোদ। হোর্ডিং করছে কে?

সুরেন। অনেকে সার্, অনেকে। আমরা কত লোকের বাড়ি থেকে রোজ চাল সীজ করছি, বস্তা বস্তা চাল সব লুকিয়ে রেখেছিল।

বিনোদ। বটে?

[সেতার থামিয়া গেল।]

সুরেন। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে, জীবুকে আমাদের ফুড-ফ্রণ্টে যদি জয়েন করতে দেন, তাহলে বড় ভাল হয়।

বিনোদ। যারা সমুদ্র শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের তোমরা কিছু বলতে পার না, কার বাড়ির চৌবাচ্চায় দু বালতি জল বেশি আছে তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ কেন, বুঝতে পারি না।

সুরেন। না না, আপনি ব্যাপারটা ভুল বুঝছেন সার্।

[অমিতা প্রবেশ করিল।]

অমিতা। বাবা, ঘরে তো চাল কিচ্ছু নেই। রমেশকাকার বস্তা খুলব একটা?

বিনোদ। না। রমেশ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে, তাকে না জিজ্ঞেস করে খোলাটা ঠিক হবে না। আমি বেরুচ্ছি আবার এখুনি।

সুরেন। ক বস্তা চাল আছে আপনাদের ?

বিনোদ। আমার এক বন্ধুর, আমার নয়।

সুরেন। ক বস্তা, বলুন না ?

অমিতা। পঞ্চাশ বস্তা।

সুরেন। মাপ করবেন সার, আমরা সীজ করব।

বিনোদ। সীজ করবে !

সুরেন। নিশ্চয়ই। এসব ব্যাপারে আমরা কোন পার্শিয়ালিটি করি না। আপনিই ভেবে দেখুন না, একজনের বাড়িতে চাল জমা করা থাকবে আর বাকি সকলে স্টার্ভ করবে, সেটা কি ন্যায়সংগত ? এখন হোর্ডিং বন্ধ করাই প্রকৃত দেশসেবা করা। আপনি জীবুকেও আমাদের দলে দিন। অমিতাদি, আপনিও আসুন না।

অমিতা। আমি পারব না।

সুরেন। জীবুকে কিন্তু চাই আমরা।

অমিতা। জীবু রাজি হবে না। এ. আর. পি.র অমন ভাল চাকরিটাই নিলে না।

সুরেন। আপনি একটু বলে দেখবেন সার্।

বিনোদ। আচ্ছা। রমেশের চালগুলো সত্যিই নিয়ে যাবে নাকি তোমরা ?

সুরেন। (হাসিয়া) খবর যখন পেয়েছি, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আচ্ছা, এখন চলি। জীবুকে বলবেন একটু। [চলিয়া গেল।]

অমিতা। সুরেন আবার কবে কমিউনিস্ট হল ! এমন জানলে ওর সামনে চালের কথা তুলতুমই না।

বিনোদ। আমার জুতোটা শুকিয়েছে ? আর একবার বেরিয়ে দেখি চেষ্টা করে।

অমিতা। না, তুমি এখন বেরিও না। দুদিন থেকে প্রায় উপোস যাচ্ছে তোমার।

বিনোদ। না বেরুলে চলবে কেন মা ? তুইও তো কিছু খাস নি। আধখানা শশা রেখেছিলাম, খেয়েছিস সেটা ?

অমিতা। খেয়েছি।

বিনোদ। জীবু আজ এখনও ফিরল না ! কি যে করে সমস্ত দিন বুঝি না।

অমিতা। আজ বড্ড দেরি হচ্ছে।

বিনোদ। আমার জুতোটা দে।

অমিতা। না, তুমি এখন বেরুতে পারবে না।

বিনোদ। না বেরুলে চলবে কেন ?

[উভয়ে পরস্পরের দিকে অসহায়ভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।]

অমিতা। তুমি বরং বিশ্রাম কর একটু, আমি একটু বেরুই।

বিনোদ। তুই ‘কিউ’য়ে গিয়ে দাঁড়াবি নাকি ?

অমিতা। না, অন্য দরকার আছে।

বিনোদ। বেশি দেরি করিস না যেন।

অমিতা। না, বেশি দেরি হবে না।

[অমিতা ভিতরে গিয়া বাহিরে যাইবার উপযোগী বেশবাস পরিধান করিয়া আসিল। দেখা গেল, ঘরে চাল না থাকিলেও বাক্সে শাড়ি প্রভৃতির অভাব নাই। অমিতা সুন্দরী, নূতন সাজে তাহাকে অপরূপ দেখাইতেছে। বিনোদবাবু ক্যাম্প-চেয়ারে

চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন। অমিতা নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাহির হইয়া গেল। বিনোদবাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ যেন একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।]

গৌতম বুদ্ধ। ভেঙে পড়ো না বিনোদ। পৃথিবীতে দুঃখ থাকবেই, নিজের কর্ম এবং চরিত্র দ্বারা সে দুঃখকে জয় করতে হবে।

যীশুখ্রীষ্ট। তুমি দুঃখী বলেই তুমি ধন্য, দুঃখের আগুনে পুড়িয়েই ভগবান মানুষকে নির্মল করেন।

চৈতন্য। কারও ওপর রাগ কোরো না, কাউকে ঘৃণা কোরো না, তাহলে আর দুঃখ থাকবে না, অনুরাগের স্পর্শে পাষাণও বিগলিত হয়।

রামকৃষ্ণ। ভেদবুদ্ধির জন্যই কষ্ট। যে মুহূর্তে বুঝতে পারবি, আমরা সকলে একই সমুদ্রের ঢেউ, তখনই দেখবি, সব ঠিক হয়ে গেছে।

শঙ্করাচার্য। কিসের কষ্ট ? সবই তো মায়া, একবার উপলব্ধি কর দেখি যে, তুমিই সব, তুমি ছাড়া বাকি সব মায়া।

[সকলে একে একে আবার মিলাইয়া গেলেন। যে নির্বাক নিরুপায় হতাশা বিনোদের বুকে পাথরের মতো চাপিয়া ছিল, তাহা যেন অনেকটা লঘু হইয়া গেল। ঘুমের ঘোরেই তিনি যেন অনুভব করিলেন যে, সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি, নিয়তির সমস্ত নির্যাতন তিনি এবার হাসিমুখে সহ্য করিতে পারিবেন। দ্বারপ্রান্তে শব্দ হইল, ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিনোদ চোখ খুলিয়া দেখিলেন, সুখময়বাবুর বাজার-সরকার বিপিন দাঁড়াইয়া আছে।]

বিপিন। (নমস্কার করিয়া) সুখময়বাবু আপনার জন্যে এক বস্তা চাল পাঠিয়ে দিয়েছেন, কোথায় রাখিয়ে দোব বলুন, কুলিটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনোদ। আমার জন্যে ?

বিপিন। আজ্ঞে।

বিনোদ। কোন কথা তো ছিল না !

[বিপিন চুপ করিয়া রহিল।]

উনি চাল পেলেন কোথা ?

বিপিন। আমি কি করে বলি বলুন ? ওঁরা বড় মানুষ।

নেপথ্যে কুলি। বাবু !

বিনোদ। খিড়কির দুয়ার খোলা আছে, ভেতরের বারান্দায় রেখে যাও।

[বিপিন চলিয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অমিতার প্রবেশ।]

অমিতা। (খুব একটা আনন্দের ভান করিয়া) বাবা, ভারী একটা মজা হয়েছে। রাস্তায় বেরুতেই সুখময়দার সঙ্গে দেখা, তিনি নিজে এসে—

[সাজানো কথাগুলো হঠাৎ কেমন যেন বেসামাল হইয়া পড়িল।]

মানে, আমি ঝগড়াটা মিটিয়ে নিলুম। হাজার হোক দাদার বন্ধু তো।

বিনোদ। ভালই করেছ।

অমিতা। আজ একটা সিনেমায় উনি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছেন, যাব ?

বিনোদ। যেতে পার, কিন্তু চালটা ফেরত দাও।

[অমিতার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।]

অমিতা। চাল দিয়ে গেছে ?

বিনোদ। হ্যাঁ।

অমিতা। কেন, নিলে ক্ষতি কি ?

বিনোদ। বড্ড নোংরামি হয় সেটা।

অমিতা। (দৃঢ়কণ্ঠে) জীবন-মরণ সমস্যার সময় কি দরকার অত চুলচেরা বিচারের ?

বিনোদ। মানুষ বলেই দরকার, পশুর কোন দরকার নেই। (ম্লান হাসিয়া) নিজেকে এখনও ঠিক পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারিনি মা।

অমিতা। কিন্তু আমাদের চলবে কি করে ? তিন দিন থেকে ভাত পড়েনি পেটে, জীবুদা ক্ষিধের জ্বালায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিনোদ। সবাই যেখান থেকে পাচ্ছে, আমাদের সেইখান থেকেই পেতে হবে। আমি মনে করছি, ওখানে গিয়ে শুয়ে থাকব আজ থেকে।

[একটি পুঁটুলি হস্তে সুশীলের প্রবেশ।]

সুশীল। এই নাও। নিজেদের চাল যতটুকু ছিল, তার অর্ধেকটা তোমার জন্যে নিয়ে এলাম গিন্নীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে।

বিনোদ। কি দরকার ছিল ভাই, আমি আবার বেরুচ্ছি, এবার পাব ঠিক।

সুশীল। শেষে আমারটা শোধ কোরো, আমাকেও তো কিউ থেকেই নিতে হচ্ছে। ভাল কথা, রাস্তার ধারে একটা মড়া পড়ে আছে দেখেছ ? শুষ্ক শীর্ণ অনাহার-ক্লিষ্ট চেহারা ! আশপাশ দিয়ে জনতার স্রোত বয়ে চলেছে, কেউ বিশেষ লক্ষ্যও করছে না। মানুষ নয়, যেন ইঁদুর।

[অমিতা চালের পুঁটুলি লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।]

বিনোদ। মৃত্যুই এখন শান্তি।

[দ্রুতপদে জীবুর বন্ধু বীরেনের প্রবেশ।]

বীরেন। জীবু গলায় দড়ি দিয়েছে।

সুশীল। সে কি !

বীরেন। আমাদের তেতলার ঘরটায় সকাল থেকে চুপ করে শুয়ে ছিল। খাবার সময় ডাকতে গিয়ে দেখি, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে, আপনারা আসুন শিগ্‌গির।

বিনোদ। (স্থিরকণ্ঠে) যাও যাচ্ছি।

[বীরেন চলিয়া গেল। উভয়েই নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।]

সুশীল। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন—

বিনোদ। ও কথা থাক। একটা কথার জবাব দাও দিকি। এসব সত্ত্বেও কি ভালবাসা যায়, ক্ষমা করা যায়, মায়া বলে সব উড়িয়ে দেওয়া যায়, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ভগবান আমাকে নির্মল করে তুলছেন—এ কবিত্বে কি মন ভরে সত্যি ? জবাব দাও, (হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে) জবাব দাও, জবাব দাও।

[দ্রুতপদে সুরেনের প্রবেশ।]

সুরেন। (উচ্ছ্বসিত গদগদকণ্ঠে) সার্, হ্যাপি নিউজ ! একটা শত্রু নিপাত হল। ইটালি হ্যাজ সারেণ্ডার্ড আন্‌কণ্ডিশনালি।

গণেশ-জননী

আমি পশু চিকিৎসা করি। যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভাল করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে পশু-চিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা-নির্বাহ হয় এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে আমি সরকারি পশু-চিকিৎসা-বিভাগে চাকুরি করি। কমিশনার সাহেবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য-তদারক করিয়া এবং ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাশ' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়। মনুষ্য-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্র্যাকটিস' আমাদের নাই। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে থাকিবার কথাও নয়। তবু মাঝে মাঝে দু-একটা 'কল' জোটে। সেদিন এমনি একটি অপ্রত্যাশিত 'কল' জুটিল। একটি জরুরী তার পাইলাম—'আমার হস্তী অসুস্থ—অবিলম্বে চলিয়া আসুন।' উল্লসিত হইলাম। মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। যেখানে যাইতে হইবে তাহা ট্রেনযোগে সাত আট ঘণ্টার পথ! এতদূর যাইতে হইবে, হাতীর অসুখ···খুব কম করিয়া ধরিলেও দুইশত টাকা 'ফি' পাওয়া যাইবে। বাক্স প্যাটরা বাঁধিয়া সানন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই পূজা···বিরাট পরিবার·· ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন।

···সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল। মফঃস্বল জায়গা, ছোট গ্রাম। স্টেশনটিও ছোট। বেশী যাত্রী নাই। সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক। স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া হাতল ঘুরাইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনিই কি ভেটেরেনারি সার্জন?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন, আসুন, আমি আপনাকেই নিতে এসেছি।"

তাড়াতাড়ি আমার সুটকেসটা ভদ্রলোক তুলিয়া লইলেন। গোমস্তার মতো চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা, গায়েও মলিন জামাকাপড়, এক মুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই। আমি ভাবিলাম যে জমিদারের হাতী ইনি বোধহয় তাঁহারই কর্মচারী।.. স্টেশন হইতে বাহির হইলাম। আশা করিতেছিলাম মোটর বা ওই জাতীয় কিছু একটা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখিলাম সে সব কিছু নাই। ভদ্রলোক সাইকেলে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। সাইকেলটি স্টেশনের বাহিরের দেওয়ালে ঠেসানো ছিল। তিনি আমার জন্য একটি ছ্যাকড়া গাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া সাইকেলে আরোহণ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে ছ্যাকড়া গাড়ি একটি বাড়ির সম্মুখে থামিল। গাড়ির জানলা হইতে মুখ বাড়াইলাম। স্বল্পালোকে যে বাড়িটি চোখে পড়িল তাহা কোন বড়লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হইল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। এ বাড়ির মালিকের হাতী পুষিবার কথা নয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব কি না ভাবিতেছিলাম এমন সময় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। সাইকেল যোগে তিনি আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, "আসুন, আসুন, ডাক্তারবাবু আসুন—এই ঘরে—হ্যাঁ—" তাহার বাহিরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম।

একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, একটি নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি—ইহাই সে ঘরটির সাজসজ্জা। ভদ্রলোক আমার সুটকেসটি ঘরের এক কোণে নামাইয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন—"এক মিনিট বসুন, আমি একবার বাড়ির ভিতর থেকে আসি। দেখি, চা হল কি না।"

"আমার রুগী কোথায় ?"

"এইখানেই আছে। আমারই হাতী......"

ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা রসিকতা করিতেছে নাকি !

মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"আগে চা-টা খেয়ে নিন তারপর রুগী দেখবেন।"

"হয়েছে কি ?"

"বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ করেছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতীর খোরাক জোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি—" ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"হাতী পুষেছেন কি শখ করে ?"

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না।

"আরে না মশাই। জুটে গেসল, গরীব গেরস্ত মানুষ, হাতী পোষবার শখ হতে যাবে কেন"—

চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, "কি রকম ?"

"সে কি আজকের কথা ! আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না। বছর দশেক আগে একদিন অনেক রাত্রে মাঠ থেকে ফিরছি হঠাৎ নজরে পড়ল একটা লোক মুখ গুঁজড়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে···ঝুঁকে দেখলাম একেবারে অজ্ঞান। লোকজন ডেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেবা-শুশ্রূষা করতে তার জ্ঞান হল। পরিচয় হতে জানতে পারলাম সে একজন কচ্ছি। ব্যবসাদার। ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠামাঠি আসছিল, ঘোড়াটা তাকে ফেলে পালিয়েছে। পর দিনই তার লোকজন এসে পড়ল, ঘোড়াটিও পাওয়া গেল। আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল সে। কয়েকদিন পরে দেখি একটি লোক ছোট্ট একটি হাতীর বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির—সেই কচ্ছি ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি নাকি হাতীর ব্যবসা করেন। একটি চিঠিও লিখেছেন—আপনারা আমার প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। হাতীর বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার—তখন ছোট্ট ছিল—দুষ্টু দুষ্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভাল লাগল তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে—ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই একবাটি দুধ তার সামনে এগিয়ে দিলে। ব্যস, সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয়নি, ওই গণেশই আমাদের সব···"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। আমি সবিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এইটুকু বাসায় ওকে রাখেন কোথা ?"

"উঠোনের দিকে জায়গা আছে অনেকখানি। তাছাড়া সব বাড়িটাই তো ওর—দরজা দেখছেন না—সব কেটে কেটে বড় করতে হয়েছে যাতে ও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে—আমরাই সসংকোচে একধারে বাস করি।"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"গণেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নি তুলকালাম করবে। একশ বিঘে জমি আছে মশাই—যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায়—একটা হাতীর খোরাক, বুঝছেন না? পুজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়—এবার গিন্নি একটা রুপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছে···স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি এখনও···"

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাতী পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।

"খুব পোষ মেনেছে?"

"পোষ মেনেছে মানে! গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নি যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।"

"রান্নাঘরে ও ঢুকতে পারে?"

"আরে মশায় আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে, হাতীর ঘর হয়ে গেছে। এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট এ ছাড়া আর দুটি ঘর আছে—একটি রান্না ভাঁড়ার আর এক শোবার—দুটোই বিরাট 'হল'—মানে 'হল' করতে হয়েছে ওর জন্যে···বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না···এই দিক দিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন···কেটে বড় করতে হয়েছে···"

"আপনাদের সব কথা বোঝে?"

"সমস্ত। মানুষ একেবারে। মান-অভিমান পর্যন্ত করে। এই যে খাওয়া বন্ধ করেছে আমার বিশ্বাস সেটা অভিমানে।"

"কেন, কিছু হয়েছিল না কি?"

"বাগান থেকে দু'শ ল্যাংড়া আম এসেছিল মশাই···মালী দিয়ে গিয়েছিল···আমি বাড়ি ছিলাম না, গিন্নিও পাড়ায় কোথা বেরিয়েছিলেন · এসে দেখেন একটি আম নেই। সব গণশা খেয়েছে। তাই গিন্নি একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন—রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ একটি রাখতে পারনি আমাদের জন্যে। সেই যে ফোঁস করে গুম মেরে বসেছে তারপর থেকে আর জলস্পর্শ করেনি। এরকম মাঝে মাঝে করে ও। একটু বকলে-ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়···কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ আর কখনও করেনি···তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো—ভয় হয়ে গেছে আমাদের···"

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শংকা ঘনাইয়া আসিল।

"চলুন দেখি গিয়ে।"

ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ টব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তুপ।

"খাও লক্ষ্মী তো—লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু—"

গণেশ কুলোর মতো কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।

মহিলা আমার দিকে তাকাইয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, "ওর নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে—ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।"

দেখিলাম। রোগের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা অভিমানই।

ফিরিবার সময় কর্তা বলিলেন—"আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু…"

"অপরের কাছে হলে দুশ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে কিছু নেব না।"

"না, না, তা কি হয়, এত কষ্ট করে এসেছেন"—

"না, আমি নেব না—"

কিছুতেই লইতে রাজি হইলাম না। তখন তিনি বারান্দায় গিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে যাও।"

বুঝিলাম গণেশজননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অন্ধ

॥ এক ॥

যাঁহাদের গায়ের চামড়া শাদা তাঁহাদের একটা প্রধান গুণ তাঁহারা ভারী পরোপকারী। পরের, বিশেষতঃ, কালা আদমির, উপকার করিতে পারাটাই যেন তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া, পর্বত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কেবলই তাঁহারা পরোপকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

সদ্য-পাশ-করা ক্যাপ্টেন জোন্স আই. এম. এস. মহাশয়ও ভারত-ভূমিতে পদার্পণ করিয়া পরোপকারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 'টুরে' বাহির হইয়া তাঁহার অধীনস্থ জনৈক নেটিব ডাক্তারের নিকট একদা নিজের মহৎ অভিপ্রায়টি ব্যক্তও করিলেন। অবশ্য ইংরেজিতে।

"দেখ, আমি ঠিক করিয়াছি বিনা পারিশ্রমিকে গরীবদের চোখের ছানি কাটিয়া দিব। তুমি রোগী যোগাড় করিয়া সদর হাসপাতালে পাঠাইয়া দিও।"

নেটিব ডাক্তারটি কালা আদমি। সুতরাং অকৃতজ্ঞ। সাহেবের এবম্বিধ উদারতায় গদগদ না হইয়া মনে মনে বাংলায় বলিলেন—"ব্যাটা হাত পাকাবার মতলবে আছে।"

মনের কথা কিন্তু মুখে বলিতে পারিলেন না। সাহেব মানুষ, তাহার উপর মনিব। সুতরাং ভুল ইংরেজিতে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই—"ও ইয়েস সার। এ ত খুব ভাল কথা। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার হাসপাতালে যে সব রোগী আসে তাহারা সাধারণত বড় গরীব। ট্রেনের ভাড়া দিয়া যাইতে পারিবে কি না সন্দেহ!"

সাহেব ইহাতে দমিলেন না, তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"বেশ তো, তেমন গরীব যদি হয় আমিই তাহার যাইবার খরচ বহন করিব। তুমি যত পার রোগী যোগাড় কর। ভাড়ার জন্য আটকাইবে না। এখান হইতে সদরে তৃতীয় শ্রেণীতে যাইবার মাশুল আট আনা। রোগী পিছু আট আনা আমিই দিয়া দিব। বল তো পাঁচটা টাকা তোমাকে অগ্রিম দিয়া যাইতেছি।"

ডাক্তারবাবু দেখিলেন ব্যাটা বন্ধপরিকর।

বলিলেন—"না, না, টাকা অগ্রিম দিতে হইবে না। রোগী যোগাড় হইলে ভাড়ার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার এখানে তো চোখে ছানি পড়া রোগী আসে না। যদি আসে এবং যাইতে চায় আমি আপনাকে খবর দিব।"

"থ্যাঙ্কয়ু।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুও মনে মনে 'শ'কার 'ব'কার করিয়া যথারীতি দাদের মলম কুইনিন মিক্‌শ্চার প্রভৃতি পরিবেশনে মন দিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। প্রায় পনর দিন কাটিল। ইহার মধ্যে ডাক্তারখানায় কোন 'ক্যাটারাক্‌ট' রোগী আসিল না। আসিলে হয়তো ডাক্তারবাবু চেষ্টা করিতেন। চাকরি করেন। মনিবের মনোরঞ্জনের সুযোগ পাইলে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। কিন্তু সুযোগ আসিল না। ক্রমশ তিনি সে কথা ভুলিয়া গেলেন। সাহেব কিন্তু ভোলেন নাই। তাহার প্রমাণ কয়েকদিন পরে পাওয়া গেল। একটি টাইপ করা পত্র আসিয়া উপস্থিত।

প্রিয় ডাক্তারবাবু,

আশা করি ক্যাটারাক্‌ট বিষয়ক আমার প্রস্তাবটি আপনি ভুলিয়া যান নাই। ইতিমধ্যে কিন্তু আর একটি সুযোগ ঘটিয়াছে। কয়েকদিন পূর্বে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার সরকারকে আমি আমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক থানার দারোগাকে জানাইয়াছেন যে প্রত্যেকের এলাকায় যত অন্ধ রোগী বা রোগীণী আছে তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া আপনার নিকট চৌকিদার সহ যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আগামী রবিবার দিন বিভিন্ন এলাকা হইতে আপনার হাসপাতালে রোগী সমবেত হইবে। আমি সকালের ট্রেনে যাইব এবং অপারেশনের উপযুক্ত রোগী নির্বাচন করিয়া লইয়া আসিব। তাহাদের আপনি যত্ন করিয়া বসাইয়া রাখিবেন এবং বলিবেন যে তাহাদের যাতায়াতের সমস্ত ভাড়া আমি দিব। তাহারা হাসপাতালে থাকিবে। কোন খরচ লাগিবে না। যদি খুব গরীব হয় চশমাও কিনিয়া দিব। আশা করি আপনি এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। ইতি—

বশম্বদ
জে. জোন্‌স
ক্যাপ্‌টেন আই. এম. এস.

ডাক্তারবাবু আর একবার মনে মনে 'শ'কার 'ব'কার করিলেন। এ আবার এক ফ্যাসাদ জুটিল। কিন্তু একটি কথা মনে করিয়া তিনি একটু পুলকিতও হইলেন। নি-খরচায় কেবল মাত্র ফফরদালালি করিয়া যদি সাহেবটাকে খুশী করিতে পারেন মন্দ কি। অনেক দিন হইতে সাধ একটা ভাল জায়গায় বদলি হইবার। সাহেব প্রসন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ সম্ভব।

॥ দুই ॥

নির্দিষ্ট দিবসে হাসপাতালের সম্মুখস্থ ময়দানে বিভিন্ন থানা হইতে পুলিশ কর্তৃক নীত হইয়া বহু চক্ষু-রোগী সমবেত হইল। বিরাট জনতা। সকলেরই চোখে যে ছানি পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু থানার দারোগারা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। পুলিশ সাহেবের হুকুম—চোখের অসুখ থাকিলেই তাহাকে হাজির করিয়া দিবে—সিভিল সার্জন বাছিয়া লইবেন। তাঁহারা নিখুঁতভাবে হুকুম পালন করিয়াছেন। এত চক্ষু-রোগী দেখিয়া ডাক্তারবাবুরও চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি ইহাদের ভিতর হইতে ছানি-গ্রস্ত রোগীগুলিকে বাছিয়া বাছিয়া একধারে জড়ো করিতে লাগিলেন। করিতে গিয়া দেখিলেন কেহই আলাদা একটা দল-ভুক্ত হইতে রাজী নয়। কেবল পুলিশের ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছে না। একটি বৃদ্ধ থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"আমাকে ছেড়ে দিন বাবু, আমার ঘরে আমার বুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে তাকে দেখবে কে ? দোহাই ডাক্তারবাবু আমাকে বাদ দিন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এতে ভয় পাবার কি আছে। সাহেব নিজের খরচে তোমাকে নিয়ে যাবেন, তোমার চোখ ভাল হয়ে গেলে আবার তুমি ফিরে আসবে।"

বৃদ্ধটি ডাক্তারবাবুর সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু তাহার ভয় ঘুচিল না। বেচারা দাঁড়াইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

একটু পরেই ভয়ের কারণটা বোঝা গেল। তখন 'সারা-ব্রিজ' তৈয়ারি হইতেছিল। কে যেন রটাইয়া দিয়াছিল যে নর-কঙ্কাল দিয়া ব্রিজের বুনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের এই আয়োজন। কানাগুলাকে লইয়া গিয়া সেইখানে পুঁতিবে। জীবন্ত পোতা যায় না—তাই চিকিৎসার ছুতায় হাসপাতালে লইয়া গিয়া আগে শেষ করিবে—তাহার পর সারা ব্রিজে চালান দিবে। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সুশাসন সত্ত্বেও এই অসম্ভব গুজবে কেহ অবিশ্বাস করে নাই। পুলিশ কর্তৃক রোগী সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তাহারা সত্যই ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের চোখে অসুখের জন্য পুলিশের এত মাথা ব্যথা কেন ? বিরাট জনতা ভয়ে থম থম করিতেছে। কখন কি হয়।

॥ তিন ॥

যথাসময়ে সাহেব আসিয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবু যে কয়েকটি ক্যাটারাক্ট রোগীকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন সাহেবকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন। এত রোগী দেখিয়া সাহেব মহা খুশী। ডাক্তারবাবু ভীড়ের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। আবক্ষ সাদা দাড়ি, পাকা ভুরু, দুই চোখেই ছানি পড়িয়াছে। একেবারে অন্ধ।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এই কেসটি আমার খুব ভাল বলিয়া মনে হইতেছে।"

"চোখের টেনসন দেখিয়াছ ?"

"আপনি দেখুন।"

বৃদ্ধ ভয়ে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

"ডরো মৎ, ডরো মৎ, আচ্ছা হোগা।"

বৃদ্ধের কাঁপুনি থামে না।

সাহেব তখন তাহাকে চক্ষু বুজিতে বলিয়া চোখের উপরের পাতায় আঙুল দিয়া ঈষৎ চাপ দিলেন—উদ্দেশ্য 'টেন্‌সন্‌' দেখা। সামান্য চাপ—লাগিবার কথা নয়, বৃদ্ধ কিন্তু দারুণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"আঁ—আঁ—আঁ—"

চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অন্ধ, অর্ধ-অন্ধ, চক্ষুষ্মান যে যেদিকে পারিল দৌড়াইতে লাগিল। কেহ পড়িয়া গেল, কেহ হোঁচট খাইল, কাহারও মাথা ঠুকিয়া গেল, কেহ ভীড়ে আটকাইয়া গিয়া চীৎকার জুড়িল। নিমেষের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! সাহেব হকচকাইয়া ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"দেহাতি লোক, ভয় পাইয়াছে।" চৌকিদার লাঠি উঠাইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতে গোলমাল আরও বাড়িল। তারস্বরে অনেকে আর্তনাদ শুরু করিয়া দিল। সাহেব চতুর লোক। নিমেষের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিলেন বল-প্রদর্শন করিলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে।

ডাক্তারবাবুকে বলিলেন—"যাহারা চলিয়া যাইতে চায় তাহাদের বাধা দিবার প্রয়োজন নাই। যে স্বেচ্ছায় যাইবে সে-ই চলুক। একজনও যদি যায় আপাতত তাই যথেষ্ট। তুমি এই লোকটিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।"

দাড়ি-ওলা বৃদ্ধ তখনও সাহেবের কবলে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিল।

"ভয়টা তোমার কিসের? এসো তুমি আমার সঙ্গে।" ডাক্তারবাবু তাহাকে লইয়া হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হইলেন। সাহেব ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া আরও দুই-একজনকে বাগাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করিলেন যে তাহা অসম্ভব। তিনি যে দিকে যান সেই দিকেই হাহাকার পড়ে, যে দিকে চান সেই দিক হইতে সকলে পলায়ন করে।

স্বেচ্ছায় কেহই যাইতে রাজী নয়।

॥ চার ॥

দাড়ি-ওলা বুড়াকে একটি নিভৃত ঘরে বসাইয়া ডাক্তারবাবু তাহাকে বুঝাইতেছিলেন।

"কিসের ভয়টা তোমার বল না।"

অনেকক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বৃদ্ধ অবশেষে কারণটা চুপি চুপি বিবৃত করিল।

"শুনিছি নাকি সারায় যে পুল হচ্ছে তাতেই আমাদের পুঁতবে।"

"পাগল না কি তুমি! তাহলে কি আমি তোমাকে পাঠাতে পারি?"

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। সত্যই তো, ডাক্তারবাবু যখন তাহাকে যাইতে বলিতেছেন তখন গুজবটা নিশ্চয়ই অমূলক। এই ডাক্তারবাবু তাহার ছেলেকে বাঁচাইয়াছেন, স্ত্রীকে বাঁচাইয়াছেন, তাহাকেও দুইবার যমের মুখ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন। সব সময়, 'ফিস্‌' ও লন নাই। ইনি জানিয়া শুনিয়া তাহাকে কখনও এমন

বিপদে ফেলিবেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের ইহাও মনে হইল—হয়তো ডাক্তারবাবু নিজেই জানেন না। সাহেব হয়তো ইঁহাকেও ধাপ্পা দিয়াছে। এ কথা কিন্তু সে প্রকাশ করিল না।

বলিল—"কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাকে, আপনিই ওষুধ দিন। আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভাল হয়ে যাবে। আপনার কাছে কি ওষুধ নেই ?" ডাক্তারবাবু সোজাসুজি নিজের অক্ষমতা স্বীকার করিতে পারিলেন না।

বলিলেন—"আমার কাছে যে ওষুধ আছে তাতে সারতে অনেক দেরী লাগবে। সাহেবের কাছে যাও দুদিনেই সেরে যাবে। অত বড় ডাক্তার, নিজে এসে সাধছে, এমন সুযোগ আর পাবে না। চলে যাও। কত যত্ন করবে দেখো। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, খেতে দেবে, পরতে দেবে, চোখ সারিয়ে চশমা পর্যন্ত দিয়ে দেবে। যাও, চলে যাও।"

বৃদ্ধ চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—"একা যেতে যদি সাহস না হয়, তোমার ছেলেকে সঙ্গে নাও। ভয় কি, আমি যখন বলছি চলে যাও।"

অনেক বলা-কহার পর পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ যাইতে রাজি হইল।

॥ পাঁচ ॥

ডাক্তারবাবুর কথায় অন্ধ বৃদ্ধের সত্যই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সাহেব সত্যই তাহার হিতৈষী এবং আপনার লোক। তাহা না হইলে কি সঙ্গে করিয়া এমন করিয়া লইয়া যায়। ডাক্তারবাবু নিজে আসিয়া ট্রেনে চড়াইয়া দিয়া গেলেন। ট্রেন ছাড়িলে বৃদ্ধ তাহার পুত্রকে চুপি চুপি বলিল—"সাহেব কোথায় ? তার সঙ্গে আলাপ কর না একটু। বল, সাহেব আমি ভাল হয়ে গেলে—ঘরের তৈরি গাওয়া ঘি, দই, মাছ—তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

চক্ষুষ্মান পুত্র বলিল—"সাহেব তো ফাসটো কেলাসে উঠল। এটা থাড় কেলাস।"

"ও, তাই না কি ! তবে যে বললে—"

বৃদ্ধ ইতস্তত করিয়া চুপ করিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে গন্তব্য স্টেশনে নামিতে হইল। ভাগ্যে পুত্রটি সঙ্গে ছিল তাহা না হইলে নামিতে গিয়া বেচারা হয়তো পড়িয়া যাইত। গাড়ি হইতে নামিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বলিল—"ওরে সাহেব কোথা, দেখ ভীড়ে আমাদের খুঁজছে হয়তো—"

"এই বুড্ঢা হামারা সাথ চলো।"

"তুমি কে ?"

"হাম সাহেব কা চাপরাশি।"

"সাহেব ডাকছে বুঝি ? ও—চল, চল।"

"সাহেব মোটর মে গিয়া। তুমি হামারা সাথ পয়দল চলো—"

বৃদ্ধ বিমূঢ়ের মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পর ঢোক গিলিয়া বলিল—"চল।"

হাসপাতাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ও তাহার পুত্র বিনিদ্রনয়নে একটি ঘরে পাশাপাশি জাগিয়া আছে। সামনে বারান্দা। জুতা খট্‌খট্ করিয়া নার্স'রা যাতায়াত করিতেছে। মাঝে মাঝে কাহাকে যেন ধমকাইতেছে। চতুর্দিকে কার্বলিক এসিড ও আয়োডোফর্মের গন্ধ। পাশের ঘর হইতে কাহার যেন অস্ফুট কাতরানি শোনা যাইতেছে।

আসিয়া পর্যন্ত সাহেবের সহিত বৃদ্ধের দেখা হয় নাই। অন্য আর একজন ডাক্তারবাবু আসিয়া তাহার দাড়ি গোঁফ এমন কি ভুরু পর্যন্ত কামাইয়া দিয়াছেন। চোখে কি একটা ঔষধ দিয়া চোখটা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন! চোখের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে।

বারান্দায় পদশব্দ হইল।

বৃদ্ধ শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কি ?"

পুত্র চুপি চুপি উত্তর দিল—"আর একটা।"

"আর একটা মড়া ?"

"হ্যাঁ, এই নিয়ে তিনটে হল।"

সেদিন হাসপাতালে মৃত্যু সংখ্যা বেশী।

বারান্দার এক প্রান্ত হইতে সুরামত্ত একটা ডোম জড়িতকণ্ঠে বলিল—"সব সালা খতম হোগা আজ।"

খানিকক্ষণ কোন শব্দ নাই।

"বাপ রে—বাপ রে—জান্ গিয়া—ওঃ—ওঃ—"

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন কোথায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল। আবার চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

॥ ছয় ॥

ভোর হইতেছিল।

ডাক্তারবাবুও বিনিদ্রনয়নে জাগিয়াছিলেন। কল্পনা করিতেছিলেন যে সাহেব যদি খুশি হয় তাহা হইলে হয়তো তাঁহাকে মুরারীগঞ্জ ডিস্‌পেনসারিতে বদলী করিতে পারে। তাহা যদি করে তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই বেলারাণীকে আনিতে পারিবেন। মুরারীগঞ্জে কোয়ার্টার্স আছে। নবোদ্ভিন্নযৌবনা বেলারাণীর ঢলঢলে মুখখানি মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এই বুড়াটাকে বুঝাইয়া যখন পাঠাইতে পারা গিয়াছে তখন আরও দুই-চারিজনকেও হয়তো পারা যাইবে। তাহা হইলে হয়তো—

"ডাক্তারবাবু—"

আর্তকণ্ঠে বাহিরে কে যেন ডাকিয়া উঠিল।

"কে—"

ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন।

প্রথমটা তিনি চিনিতেই পারিলেন না। বুড়ার চুল দাড়ি ভুরু কিছুই নাই।

বাহিরে আসিতেই বুড়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"ভাল চিকিৎসার আমার দরকার নেই ডাক্তারবাবু। আপনার খারাপ ওষুধই আমাকে দিন আপনি। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, বুড়িকে বাঁচিয়েছেন, আপনার ওষুধেই আমার চোখ ভাল হবে—"

ডাক্তারবাবু বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করে এলে ? এ সময় তো ট্রেন নেই—"

পুত্র উত্তর দিল—"হেঁটে এসেছি। বাবা কিছুতেই থাকতে চাইলেন না। একটু ফাঁক পেতেই পালিয়ে এলাম—"

"এঁকে হাঁটিয়ে নিয়ে এলে ?"

"না, বাবাকে আমি কাঁধে করে এনেছি।"

নিস্তারিণী

"ডাক্তারবাবু, একটু বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে"—

"কি বলুন ?"

হৃষ্টপুষ্ট স্টেশন মাস্টার মহাশয় হাসিমুখে আমার দিকে চাহিলেন।

"যদি অভয় দেন তাহলেই বলি"—

"বলুন না।"

"সার্টিফিকেট দিতে হবে একখানা।"

"কিসের সার্টিফিকেট ?"

"সিক্ সার্টিফিকেট।"

"কার অসুখ ?"

"আমার স্ত্রীর।"

"কি হয়েছে ?"

মাস্টার মহাশয় হাসিলেন। চর্বি-স্ফীত গাল দুইটিতে টোল পড়িল।

"কিছুই হয়নি।"

"তবে ?"

"বদলির অর্ডার এসেছে। ঠেলেছে বেগমপুরে। ম্যালেরিয়ার ডিপো সেটি মশাই! খাসা আছি এখানে—সুন্দর জল হাওয়া; মাছ দুধ সস্তা। তাই স্ত্রীর অসুখের ছুতো করে একটা দরখাস্ত করব ভাবছি যে এখন যেতে পারব না। মাস দুই কোন রকমে টাল মাটাল করে কাটিয়ে দিতে পারলেই ফাঁড়াটা কেটে যাবে। মাস দুই পরে আমাদের চাটুজ্যে মশাই জয়েন করবেন। তখন আমার পোয়া-বারো! তিনি ছুটিতে গিয়েই মুশকিল হয়েছে কি না। তাঁর জায়গায় কাজ করছে গোখাদক এক ব্যাটা, কোন কথাই শুনবে না—"

"চাটুজ্যে মশাইটি কে ?"

"আমাদের হেড অফিসের বড়বাবু। আমার পেটোয়া লোক। তিনি এসে পড়লে আমার ভাবনা নেই।"

"আপনাদের রেলের ডাক্তারের কাছ থেকে নিন না সার্টিফিকেট।"

"তাই তো চিরকাল নিয়েছি মশাই। সম্প্রতি এমন এক ব্যাটা যুধিষ্ঠির এসে জুটেছে যে"—

মাস্টার মহাশয় বাক্যটি সম্পূর্ণ করিলেন না। চক্ষু পাকাইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। মাস্টার মহাশয় লোকটি ভাল। সেদিন আমার জন্য ট্রেন ডিটেন করিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে মাছ পাঠান। ইঁহাকে সাহায্য করিতে আমার আপত্তি নাই।

"আপনার স্ত্রীর কোন অসুখ নেই ?"

"কিছু না। বাধকের ব্যথা একটা ছিল, আজকাল কিছু নেই। বরং মুটিয়েছে আরও।"

একটু বিব্রত হইলাম।

বলিলাম—"ডাহা মিথ্যে কথা লিখি কি করে বলুন। লিখে না হয় দিলাম কিন্তু আপনার হেড আপিস যদি রেলের ডাক্তারের সার্টিফিকেট চায় আর তিনি এসে যদি দেখেন যে আপনার স্ত্রীর কিছু হয়নি তাহলে আমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখুন—"

"তা বটে। ব্যাটা যুধিষ্ঠির হয়েই মুশকিল হয়েছে কি না। তাহলে উপায় একটা বাতলান—কি করি"—

হাসিয়া বলিলাম, "বটতলার নিস্তারিণী দেবীর কাছে সিন্নি মানত করুন কিছু।"

"করিনি ভেবেছেন ? মাসখানেক আগেই করেছি। কিন্তু কিছু হল না। আজ আবার চিঠি এসেছে। নিস্তারিণী ফেল করাতেই না আপনার কাছে এলাম।"

"আমি কিন্তু কি করি বলুন। লিখে দিতে আমার আপত্তি ছিল না কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে লিখতে হবে তো—"

মাস্টার মহাশয় ক্ষুণ্ন চিত্তে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েকদিন পরে আবার তিনি আসিয়া হাজির।

"উপায় একটা হয়েছে ডাক্তারবাবু। নিস্তারিণী মুখ তুলে চাইলেন বোধহয়।"

"কি ?"

"দরখাস্ত করব ভাবছি স্ত্রী আমার আসন্নপ্রসবা, এ অবস্থায় তাকে নিয়ে ট্রেনে ট্রাভেল করা বিপজ্জনক। আপনিও সেই মর্মে একটা সার্টিফিকেট লিখে দিন।"

"স্ত্রী সত্যিই আসন্নপ্রসবা না কি ?"

"আরে না মশাই। কাল রাত্রে আমার এক শালী এসেছে। পেটের ভারে একেবারে নদপদ করছে। এখন তখন। রেলের ডাক্তার যদি আসে তাকেই স্ত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। কি বলেন—"

মাস্টার মহাশয় হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সার্টিফিকেটখানা লিখিতেছি এমন সময় মাস্টার মশাইয়ের বড় ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল।

"বাবা শিগ্গির চল। মাসীমার ছেলে হয়ে গেছে।"

"অ্যাঁ, বলিস কি ?"

"হ্যাঁ, ব্যাটাছেলে। শিগ্গির এস তুমি—"

"যাচ্ছি। যা তুই।"

ছেলেটা চলিয়া গেল।

মাস্টার মহাশয় বলিলেন, "নিস্তারিণীর কাণ্ডটা দেখছেন। প্রথমে পাঁচ পয়সার মেনেছিলাম—গা-ই করল না। পরশু দিন দুর্গা বলে পাঁচ সিকে কবলাতে শালীটা এল—ভাবলাম যাক টালটা সামলে দিলে বুঝি। আবার কাণ্ড দেখুন—" মাস্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

দিন দুই পরে ভোরবেলায় মাস্টার মহাশয়ের চীৎকারে আবার ঘুম ভাঙ্গিল।

“ডাক্তারবাবু—এবার মশাই নির্ঘাত।”

বাহিরে আসিতেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “আগস্ট ডিস্টারবেন্সের ঢেউ এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দুদিকের লাইনই সাফ। পুলটা পর্যন্ত ভেঙেছে। দুটি মাস এখন কোথাও নড়বার চড়বার উপায় নেই। তারপর আমার চাটুয্যে মশাই এসে যাবেন—”

বলিলাম, “যাক নিশ্চিন্ত হলেন আপনি”—

“কিন্তু নিস্তারিণীর ব্যবহারটা শুনবেন? উইল ইউ বিলিভ, নগদ পাঁচটি টাকা সিন্নি মানতে হয়েছে। এ যে দারোগার বেহদ্দ হয়ে উঠল একেবারে—ছি—ছি—”

অভিজ্ঞতা

তখন সরকারি চাকরি করি। একটি বড় সহরে সদর হাসপাতালের ভার লইয়া আছি, একদিন পাশাপাশি দুইটি কটেজে দুইটি রোগী ভর্তি হইল। রোগী লইয়াই কারবার, বিব্রত হইবার কথা নয় কিন্তু এ দুজনকে লইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। বিব্রত হইবার প্রধান কারণ রোগীরা নয়, রোগীর পিতারা। একজন ডাক্তার, আমার খুঁত ধরিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-মনোযোগ। আর একজনের পেশা কি তাহা তখনও জানিতাম না, লোকটি নিতান্ত গোবেচারা ভালমানুষ গোছের। প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক গীতা-পাঠ করেন। বয়েস আমার অপেক্ষা অনেক বড়, মাথার চুল সব পাকা, কিন্তু আমি গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং যে দুই চারিটি প্রশ্ন করেন, সসংকোচে করেন। অতিশয় ভদ্রলোক। ইঁহাকে লইয়া বিব্রত হইবার কারণ ইঁহার অতি-নির্ভরশীলতা। ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়াছেন। আমার সমস্ত নির্দেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া যাইতেছেন, কোনরূপ ব্যস্ততা নাই। অথচ রোগীটি তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং রোগটি টাইফয়েড। দুইটিই টাইফয়েড, ডাক্তারবাবুর পুত্রটির চিকিৎসা ডাক্তারবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়াই করিতেছিলাম, তবু কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি অতি আধুনিক একখানি বিলাতি গ্রন্থ খুলিয়া তদনুসারে চলিতে চাহিতেছিলেন। মফঃস্বলের হাসপাতালে অত সব বন্দোবস্ত ছিল না। তিনি ক্রমাগতই আফশোষ করিতেছিলেন, আহা কলিকাতায় লইয়া গেলেই হইত। কলিকাতায় না গিয়াও কিন্তু কলিকাতার প্রায় সমস্ত সরঞ্জাম তিনি ডাকযোগে, তারযোগে, রেলযোগে, লোকযোগে যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পত্রযোগে কলিকাতার দুই চারজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশও আসিয়া পড়িয়াছিল। করিৎকর্মা ভদ্রলোক মফঃস্বলীয় ত্রুটি সংশোধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই।

পাশের কটেজে বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। কোন অশোভন আড়ম্বর নাই, কোন অহেতুক ব্যগ্রতা নাই। একাই নীরবে নিপুণহস্তে সেবা করিয়া চলিয়াছেন। যাহা বলিতেছি বিনা মন্তব্যে নিখুঁতভাবে তাহাই করিতেছেন।

ডাক্তারবাবুটির অতি বৈজ্ঞানিকতা এবং বৃদ্ধটির অতি-নির্ভরশীলতা দুইই আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ডাক্তারবাবুটি আমার পূর্বপরিচিত, নিকটবর্তী একটি শহরে প্র্যাকটিস করেন। তাহার ছেলেটি এখানে হস্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়ে। হস্টেলেই জ্বর হইয়াছিল। বাড়াবাড়ি হওয়াতে এবং অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়াতে আমারই পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুও সপরিবারে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দিনে অন্ততঃ দশবার গিয়া রোগী দেখিতে হইতেছে। একটু টেম্পারেচার বাড়িলে, একটু বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিলে, একটু অস্থির হইলে, একটু কাসিলে ডাকের উপর ডাক আসিতেছে। প্রতিবারই যাইতেছি এবং প্রতিবারই তাঁহার আফশোষ শুনিতেছি—আহা, সময়মতো যদি কলকাতা নিয়ে যেতাম! তাঁহার স্ত্রীর আফশোষ আরও বেশী। নীলরতন সরকার নাকি তাঁহার সইয়ের মায়ের বকুল ফুলের কি একটা হন।

বৃদ্ধটি এ অঞ্চলে আগন্তুক। ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম তাঁহার এই পুত্রটির চাকুরির ব্যপদেশে তাহাকে লইয়া তিনি এখানে আসিয়া ধর্মশালায় উঠিয়াছিলেন। ছেলেটি সেখানেই জ্বরে পড়ে। জ্বর বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাহাকে লইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন।

উভয়ক্ষেত্রেই টাইফয়েড তাহার অপ্রতিহত প্রতাপে এবং অনিবার্য গতিতে চলিতেছিল।

॥ দুই ॥

একদিন গভীর রাত্রিতে ডাক আসিল।

"শিগ্‌গির চলুন একবার, শিগ্‌গির।"

ডাক্তারবাবু আলুথালুবেশে নিজেই আসিয়াছেন।

"হেমারেজ শুরু হয়েছে। চলুন, শিগ্‌গির—"

প্রায় ছুটিয়াই গেলাম। হেমারেজ নিবারণের সর্বপ্রকার উপায় অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই কাণ্ড। দারুণ হেমারেজ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভিটামিন সি অ্যামপুল আর আছে আপনার? আমার তো আর নেই, কোলকাতা থেকে যে কটা এসেছিল সব ফুরিয়ে গেছে…"

আমার ছিল না। বলিলাম।

"কংগো রেড?" (Congo Red)

"না।"

"এখানকার কোনও দোকানে নেই। খোজ করে দেখেছিলাম আজ বিকেলে। ভারী ভুল হয়েছে, কোলকাতা থেকে আনিয়ে রাখলেই হতো।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "অঃ,—এমন একটা ব্যাকওয়ার্ড জায়গা!"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "একটা মর্ফিন দিলে কেমন হয়?"

"মর্ফিন দিয়েছি, ক্যালসিয়াম দিয়েছি, সিরাম দিয়েছি, ষ্টিপটিসিন্ দিয়েছি, তারপর আপনার কাছে গেছি…"

আর কিছু করিবার ছিল না। আইসব্যাগ পেটের উপর রাখাই ছিল। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "কংগো রেড কোথাও পাওয়া যাবে না এখানে? ডাক্তার ভাদুড়ি তো খুব আপ-টু-ডেট্, তাঁর কাছে পাওয়া যাবে না?"

"বলতে পারি না।"

"দেখি চেষ্টা করে।"

তিনি একটা মোটর বাইকও যোগাড় করিয়াছিলেন। একটু পরেই সেটা গর্জন করিয়া উঠিল। ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে নিশীথ অন্ধকারকে সচকিত করিয়া কংগো রেডের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

...মৃত্যুকালে পুত্রের সহিত দেখা হইল না।

ছেলের মা মাথার শিয়রে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাস বাক্যও বর্ষিত হইল না! যতক্ষণ বসিয়াছিলেন কেবল হাহাকার করিতেছিলেন।

"এমন বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি রে বাবা..."

একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্তনাদ।

তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়া গেল না। আমিই যেন অপরাধী।

॥ তিন ॥

দিন দুই পরে হাসপাতালের নার্স আসিয়া আমাকে জানাইল যে, কটেজ ওয়ার্ডের দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির অবস্থাও ভাল নয়। নাড়ি বৈকালের দিকে আরও খারাপ হইয়াছে—গ্লুকোজ ইনজেক্‌শন দেওয়া সত্ত্বেও। সকালে একবার দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সমস্ত দিন আর খবর পাই নাই। নার্সের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম।

গিয়া দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন। মাথার শিয়রে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন...আশীর্বাদ করুন ওর সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয় এইবার...সব গ্লানি যেন মুছে যায়..."

আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আসুন..."

আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "ইতস্ততঃ করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলিই তো দরকার এ সময়ে। নিন...জুতো খুলুন...দিন...বেশ ভাল করে মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায়...আসুন—"

তাহার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পাথেয় দিয়ে দাও..."

এতদিন বহু মুমূর্ষু রোগীর গায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া বহুরকমে তাহাদের বাঁচাইবার

চেষ্টা করিয়াছি, সেদিন কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলাম।

পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। চেক্‌টা ভাঙাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন।

ভক্তি-ভাজন

॥ এক ॥

বড়লোকের নেকনজরে পড়িবার জন্য অনেক লোক যেমন ব্যাকুল, অনেক বড়লোকও তেমনি বহু লোককে নিজের নেকনজরাধীন করিবার জন্য ব্যগ্র! কেবল ধন-সম্পত্তি লইয়াই ধনীর তৃপ্তি হয় না। যশ, প্রতিপত্তি, বিশেষতঃ একটি ভক্তের দল না থাকিলে অতুল ঐশ্বর্যও লবণ-বিহীন ব্যঞ্জনের ন্যায় বিস্বাদ ঠেকে। অন্যান্য বিবিধ বিলাস-উপকরণের মতো একদল অনুগ্রহধন্য নর-নারীও বড়লোকদের প্রয়োজন। কিন্তু মনোমত বিলাস-উপকরণ সব সময়ে জোটে না। বাড়ি, গাড়ি এমন কি মনোমত ছড়িটাও সব সময় পয়সা ফেলিলেই পাওয়া যায় না। কৃপাক্রীত ভক্ত আরও দুর্লভ। শ্রীযুক্ত জনার্দন সরকার বহু দিন হইতেই সন্ধানে ছিলেন, কিছুতেই মিলিতেছিল না। জীবনে বহু রকম অনুগ্রহ তিনি বহু ব্যক্তিকে করিয়াছেন (বা অন্যকে দিয়া করাইয়াছেন) কিন্তু কই কেহই তো আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকে নাই। সাময়িক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌখিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করিয়া সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে। মানে, দুনিয়াটাই বেইমান। এবম্বিধ দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সত্ত্বেও জনার্দন সন্ধানে ছিলেন। কিছুই বলা যায় না, দৈবাৎ কত রত্নই তো মিলিয়া যায়। যোগেন বসাক সেদিন আসল মুক্তাই একটা কুড়াইয়া পাইল। নীলাম্বর পোদ্দারের কল্যাণে জনার্দনের আধিভৌতিক কোন অভাবই নাই। জমি-জমা, গাড়ি-বাড়ি, ফলের বাগান, ফুলের বাগান, সমস্ত হইয়াছে। ওই একটি শখই অপূর্ণ আছে এখনও! শ্রদ্ধাগদগদ ভক্ত একটি চাই। না পাইলে জীবনই বিফল। কেউ পোঁছে না! বাঁচিয়া লাভ কি? জনার্দন সন্ধানে ছিলেন।...দৈবাৎ রামধনের নাগাল পাইয়া তিনি পুলকিত হইলেন। ডুমুরহাটিতে কষ্ট করিয়া আসা সার্থক মনে হইল। ডুমুরহাটিতে জনার্দনের পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল। শৈশবে একবার মাত্র সেখানে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার সেখানে যাইবার প্রয়োজন এ যাবৎ ঘটে নাই। পূর্বপুরুষদের আবাস ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে স্বরাজ স্থাপন করিয়াছিল ঘেঁটু কচু প্রভৃতি আদিবাসিগণ। সব শুনিয়াও জনার্দন ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। করিতে হইল, যখন তাঁহার জ্ঞাতিরা ঘেঁটু-কচু উচ্ছেদ করিয়া ইষ্টকস্তূপ সরাইয়া সেখানে বসবাসের আয়োজন করিল। পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা বেদখল হইবে, এ অন্যায় জনার্দন বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্যই তিনি দুইটা চেঞ্জ এবং পাঁচ ক্রোশ গরুর

গাড়ির ধকল সহ্য করিয়া ডুমুরহাটিতে গিয়া হাজির হইলেন। নানাবিধ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রামধনকে পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জ্ঞাতিরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেও মোকদ্দমা-অভিজ্ঞ জনার্দন শত্রুর আতিথ্য গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিলেন না। অথচ অজ পাড়াগাঁ জায়গা, হোটেল জাতীয় কোন কিছু নাই। মাথা গোঁজা যায় কোথা, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটাই বা হয় কিরূপে। জনার্দন বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। কোথায় ওঠা যায়। স্টেশনটাও কাছে নয়। সহসা তাঁহার পিতৃগুরু ন্যায়রত্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। ন্যায়রত্নকে তিনি বাল্যকালে একবার মাত্র দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই একবার দেখাতেই তাঁহার মনে যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা আজও মোছে নাই। অধ্যাপক রামভূষণ ন্যায়রত্নের তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ, প্রশস্ত উন্নত ললাট, প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি, শুচি সৌম্য মুখচ্ছবি বালক জনার্দনের চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এত কাল পরে প্রৌঢ় জনার্দনের চিত্তকেও আশ্বস্ত করিল। তাঁহার সহসা মনে হইল যে, গ্রামের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সন্ধান করিতে গিয়া রামধনের দেখা মিলিল। ন্যায়রত্ন বহুদিন পূর্বেই দেহ-রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রামশরণও নাই। বস্তুতঃ ন্যায়রত্ন-পরিবারে এক রামধন ব্যতীত আর সকলেই গতাসু হইয়াছেন। ম্যালেরিয়া রাক্ষসী গ্রাম প্রায় উজাড় করিয়াছে।

রামধনেরও দুরবস্থা। শরীর শীর্ণ। পরিধানে ছিন্ন বসন। মলিন উপবীতগুচ্ছ এবং একটি সরু টিকি ছাড়া ব্রাহ্মণত্বের আর কোন চিহ্ন তাহার মধ্যে নাই। অধ্যাপক রামভূষণ ন্যায়রত্নের পৌত্র—নিরক্ষর। সামান্য লেখাপড়া শিখিবার সুযোগও গ্রামে নাই। জমিদার ব্রহ্মোত্তরটুকু গ্রাস করিয়াছেন। বিঘা দুই মাত্র জমি অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই রামধনের গ্রাসাচ্ছাদন কোনরূপে চলে। কুঁড়ে ঘরটি জীর্ণ। একটি বুড়ী গাই আছে। রামধন তাহারই সেবা করে। জনার্দন যখন গেলেন, রামধন তখন উঠানে বসিয়া খড় কাটিতেছিল। জনার্দনের আকস্মিক আবির্ভাবে সে বিস্মিত হইল। পরিচয় শুনিয়াও তাহার বিস্ময় ঘুচিল না। জনার্দনের নামই সে কখনও শোনে নাই। জনার্দন তাহার ভগ্ন-কুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

সসম্ভ্রমে বলিল—বেশ তো, আসুন।

কাঁটাল-কাঠের পিঁড়েখানি তাড়াতাড়ি ঘরের দাওয়ায় পাতিয়া দিল।

॥ দুই ॥

জনার্দন ডুমুরহাটিতে দিন দুই ছিলেন।

এই দুই দিনে শুধু ভিটা-উদ্ধার নয়, রামধনকেও তিনি আবিষ্কার করিয়া গেলেন। এতদিন যে সন্ধানে তিনি ছিলেন রামধনের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি যখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া আসিলেন—“দেখি তোমার কি করতে পারি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র তুমি, আমার যথাসাধ্য আমি করব”—তখন তাহার সরল চোখ দুটিতে যে আশাদীপ্ত উৎসুক দৃষ্টি তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতে নিজেও তিনি কম আশ্বস্ত হন নাই। এতদিনের আকাঙ্ক্ষা এইবার পূর্ণ হইবে হয়তো। প্রভু

নীলাম্বর পোদ্দার তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, কিন্তু আর বাকী সকলে করে ঈর্ষা। পা-চাটা, খোসামুদে, সুদখোর, বেহায়া…কত কি কথা। লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। এতকাল এই ভাবেই চলিয়াছে। এইবার হয়তো ভগবান জনার্দনের জীবনেও একটি ভক্ত জুটাইয়া দিলেন। বেশী নয়, শ-পাঁচেক টাকা খরচ করিলেই রামধনের হৃদয় জয় করা যায়। রামধনের শেষ সম্বল যে দুই বিঘা জমি, তাহাও পিতৃঋণে আবদ্ধ। এই বছরে শোধ না করিলে চৈতন্য চাকলাদার ওটুকুও নিঃসন্দেহে গ্রাস করিবে। দলিল তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। পাঁচ শত টাকা দিলে জমিটা উদ্ধার হয়। পাঁচ শত টাকা তিনি যে না দিতে পারেন তাহা নয় কিন্তু হঠকারী লোক তিনি নন। ফট করিয়া কিছু একটা করিয়া বসা তাঁহার স্বভাব নয়। রহিয়া বুঝিয়া মাথা ঘামাইয়া কাজ করিতেই তিনি অভ্যস্ত। করকরে পাঁচশ টাকা, সোজা কথা তো নয়। জনার্দন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ছিলেন, এমন সময় ভগবান আবার দয়া করিলেন। দয়াময়ের দয়ার আর শেষ নাই, জনার্দনের মনে হইল। নীলাম্বরের বৃদ্ধা জননী মাথার শির ছিঁড়িয়া হঠাৎ মারা গেলেন। সুরাহা হইয়া গেল।

নীলাম্বর পোদ্দার নামজাদা লোক। ব্যবসায়ী মহলে তাঁহার যথেষ্ট খাতির। গভর্ণমেণ্টের ঘরেও তদ্বির চলিতেছে, এবার অনেক টাকার 'ওয়ার বণ্ড' কিনিয়াছেন, শীঘ্রই রায়বাহাদুর হইবেন। কত লক্ষ টাকা যে তাঁহার আছে তাহা অনুমান করিয়া লোকে কুল পায় না। প্রিয় বয়স্য এবং ম্যানেজার জনার্দনের সহিত পরামর্শ করিয়া মহাসমারোহে তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মানীর মান রক্ষা যেন হয় এ ছাড়া জনার্দনেরও আর অন্য চিন্তা রহিল না। বিরাট আয়োজন। সমস্ত ভার জনার্দনের উপর। বহু লোক খাইবে, বহু রাঁধুনী চাই। জনার্দন লোক পাঠাইয়া দেশ হইতে রামধনকে আনাইয়া ফেলিলেন।

দরিদ্র রামধন একটু ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া গেল। এই ধুমধামের ব্যাপারে জনার্দনবাবু লোক পাঠাইয়া তাহাকে কেন আনাইয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। জনার্দন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধতে লেগে যাও। ডেলি পাঁচ টাকা করে পাইয়ে দেব তোমাকে।" রামধন অবাক হইয়া গেল। তাহাকে রাঁধুনী হিসাবে ডাকা হইয়াছে! মর্মাহত হইলেও চুপ করিয়া রহিল। সত্যই তো, রাঁধুনী হওয়া ছাড়া তাহার আর কি যোগ্যতা আছে। নিরক্ষর সে। তবু একটু আমতা আমতা করিয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, "আমি এর আগে কখনও রাঁধুনীগিরি করিনি। আমি কি পারব—"

জনার্দন ধমকাইয়া উঠিলেন—"খুব পারবে, খুব পারবে," পরমুহূর্তেই মুচকি হাসিয়া কোমলকণ্ঠে বলিলেন—"না পারবার কি আছে ওতে। একসপার্ট রাঁধুনী অনেক আসছে কোলকাতা থেকে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। খুনতি-টুনতি নাড়গে যাও একটু বসে। রান্নাঘরে থাকা নিয়ে কথা। যাও—"

রামধন আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া জনার্দন সসঙ্কোচে নীলাম্বরকে আর একটি পরামর্শ দিলেন। এতই যখন করা হইয়াছে তখন আর একটু না করিলে অঙ্গহানি হইবে। জনার্দনের এই উক্তি নীলাম্বরের কৌতুহল উদ্রিক্ত করিল।

"বল না, আর কি করতে হবে?"

জনার্দন মনোভাব বিবৃত করিলেন। খাটবিছানা আসন বাসন গাই-বাছুর এ রকম

দান রামাশ্যামা সকলেই করে! নীলাম্বরকে রামাশ্যামার সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিতে জনার্দন কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন। তাঁহার মনে হয়, লক্ষপতি নীলাম্বরের যেরূপ খ্যাতি, তাহাতে মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার হাতী দান করা উচিত।

…কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নীলাম্বর মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। বেশ, হস্তিদানই তিনি করিবেন।

হাতী কেনা হইল।

নীলাম্বর হাসিয়া তখন জনার্দনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এইবার একটি সদ্‌ব্রাহ্মণ জোগাড় কর। ওই পেশাদার ব্যাটাদের দেব না আমি…"

নীলাম্বরের স্বতঃপ্রবৃত্ত এই উক্তিতে জনার্দনের সুবিধাই হইল। যে জন্য এত কাণ্ড, সেই কথাটি পাড়িবার সুযোগ পাইলেন, দয়াময় ভগবানের দয়ার আর শেষ নাই।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি নিজে থেকেই যখন কাথাটা পাড়লেন, তখন একটি নাম আমি করতে পারি! যদি অভয় দেন বলি।" প্রিয়বয়স্য জনার্দনের কথা নীলাম্বর প্রায়ই অগ্রাহ্য করেন না।

"বল না—"

জনার্দন স্মিতমুখে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

"বলেই ফেল না—"

"ছেলেটি আমার নিজের গাঁয়ের লোক কি না, তাই মনে হচ্ছে—না থাক—এমনিতেই তো পাঁচ জন পাঁচ কথা বলে—"

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইলেন।

"পাঁচ জনের কথায় কান দিয়ে কাজ কি? তোমার কথাটাই বল না শুনি—"

নীলাম্বর না শুনিয়া ছাড়িলেন না।

জনার্দনকে রামধনের পরিচয় দিতে হইল। পিতামহের গুণ-গরিমা, বংশের বিশুদ্ধ কৌলীন্য, তাহার বর্তমান দারিদ্র্য প্রভৃতির সুনিপুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে জনার্দন বলিলেন—"এ বেচারীকে যদি দেন, একটা সদ্‌ব্রাহ্মণের বংশ রক্ষা পায়। সব যেতে বসেছে। ভিটেটা পর্যন্ত—"

নীলাম্বর বলিলেন—"দিতে আর বাধা কি। দেবার জন্যেই তো কেনা হয়েছে। কিন্তু হাতী নিয়ে ও সামলাতে পারবে কি, যা অবস্থা বলছ—"

"হাতী বেচতে হবে ওকে। সে-ও এক ঝঞ্ঝাট বটে। খরিদ্দার জোগাড় করা কম হাংগামা নয়। যত দিন জোগাড় না হয় তত দিন হাতীর খোরাক জোটাতে হবে। হুজুর যা বলেছেন তা ঠিক, ওর পক্ষে সামলানো কঠিন—"

নীলাম্বরের কথার পিঠে এ ধরনের কথা না বলিয়া উপায় ছিল না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াও জনার্দন মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। কি জানি মোড় কোন্ দিকে ফিরিয়া যায়। কিন্তু দেখিলেন ছোঁড়ার অদৃষ্ট ভাল এবং দয়াময় ভগবানের সত্যই দয়ার শেষ নাই।

নীলাম্বরের বন্ধু জমিদার মুকুন্দ সিং পাশেই বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাকে যদি বেচে আমিই কিনতে পারি। আমাদের মাতঙ্গীটা বুড়ী হয়ে গেছে। আমাকে একটা হাতী কিনতেই হবে। সস্তায় দেয় যদি এটাকেই কিনতে পারি।"

জনার্দন উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

"সস্তায় দেবে বই কি। আপনি পাঁচশ টাকা দিন। ওর দাম হাজার টাকা। কালই কিনেছি আমরা। পাঁচশ টাকা পেলেই বর্তে যাবে ও।"

গড়গড়ায় মৃদু টান দিয়া নীলাম্বর বলিলেন, "ব্রাহ্মণকে অতটা ফাঁকি দিও না মুকুন্দ। সাড়ে সাতশ দাও তুমি। ঠকবে না, হাতীটা ভাল।"

মুকুন্দ রাজি হইয়া গেলেন।

জনার্দনের কল্পনা-নেত্রে কৃতজ্ঞতা-সিক্ত ভক্ত রামধনের বিহ্বল মুখচ্ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। সাপও মরিল, লাঠিও ভাঙিল না। যাক্…এতদিনে বুঝি…।

॥ তিন ॥

"মানে?"

জনার্দন সরকারের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

কাচুমাচু রামধন আনতনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। "সোনার বেনের দান আমি নিতে পারব না সরকার মশাই, আমাকে মাপ করবেন। আমি গরীব, আমি মুখ্যু, সবই ঠিক কিন্তু বংশের নাম আমি ডুবিয়ে দিতে পারব না! আমাদের বংশে কেউ কখনও শূদ্রের দান নেয়নি"…

তাহার ঠোঁট দুটি কাঁপিতে লাগিল।

কশাই

শালা হারামিকা বাচ্চা…

একটু চটলেই এই তার বুলি, কখনও স্বগত কখনও প্রকাশ্যত। ছোট নিষ্ঠুর চোখ দুটো, মুখময় ছোট বড় কতকগুলো আঁচিল, একটা ছোট আবও আছে ডানদিকের চোয়ালটার নীচে। ভ্রূ নেই বললেই হয়। দাড়ি আছে। কটা, কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা ওলের উপর কটা চুল গজিয়েছে কতকগুলো। তাকে কেউ বোঝে না, সে-ও কাউকে বুঝতে চায় না। তাই উদীয়মান কমিউনিস্ট লেখক কমরেড দুলাল দত্ত যখন গল্প লেখার রসদ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তার বাড়ি গিয়ে জিন্না-গান্ধী-সম্পর্কিত আলোচনা করে মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং পাকিস্তান যে কতদূর ন্যায়সংগত তা বিচার করে তার প্রকৃত মনোভাব জানবার চেষ্টা করছিল তখন যদিও সে তার হলদে শ্বা-দন্ত দুটো বার করে "হাঁ বাবু" "হাঁ বাবু" বলে সায় দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু মনে মনে সে আওড়াচ্ছিল—"শালা হারামিকা বাচ্চা—"

সে জানে কপালে যে লেবেল সেঁটেই আসুক না কেন ফরসা কাপড়-জামা-পরা বাবু মাত্রেই শালা হারামিকা বাচ্চা। ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা হারামিকা বাচ্চাও সে অনেক দেখেছে কিন্তু তারা এমন স্বার্থপর ছদ্মবেশী নয়। এই 'বাবু'রাই "আসলি হারামজাদ্—"

কোট-প্যাণ্টপরা, আচকান চাপকান চড়ানো, খদ্দরধারী মোল্লা-মৌলভী, ডাক্তার-উকীল, হাকিম-ডেপুটি অনেক দেখেছে রহিম কশাই। তার চক্ষে সব শালাই হারামিকা বাচ্চা। সব শালা···

বিশেষত ওই দুলালবাবুর বাপটা। শালা সুদখোর। চতুর্থপক্ষে বিয়ে করেছে হারামজাদা। তাগদের জন্যে কচি পাঁঠার ঝোল খায় রোজ। ছেলেও হয়েছে একটা। নধরকান্তি শিশুটা পাশের গলিতে এসে খেলা করে যখন রহিম কশাই চেয়ে চেয়ে দেখে মাঝে মাঝে। জোঁকের বাচ্চা! বড় হয়ে রক্ত চুষবে। দুলালবাবু আবার দরদ দেখাতে এসেছেন আমাদের জন্যে—উড়ুনি উড়িয়ে পাম্প-শু চড়িয়ে···শালা হারামিকা বাচ্চা···!

ঘোলাটে চোখ দুটোতে হিংস্রদীপ্তি ফুটে ওঠে। নড়ে ওঠে কটা কোঁকড়ানো দাড়িগুলো। ভারী ধারালো ছোরাটা চালাতে থাকে সে সজোরে···প্রকাণ্ড খাসির রাং টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

পুরোহিত যেমন নির্বিকারচিত্তে ফুল তোলে, লেখক যেমন অসঙ্কোচে শাদা কাগজে কালির আঁচড় টানে, রাঁধুনী অবিচলিতচিত্তে যেমন জীবন্ত কই মাছগুলো ভাজে ফুটন্ত তেলে, রহিমও তেমনি ছাগল কুঁচো করে অকুণ্ঠিত দক্ষতা সহকারে। একটুও বিচলিত হয় না।

একটা খাসি, একটা পাঁঠা, গোটা দুই বক্‌রি প্রত্যহ জবাই করে সে। আধ সের পাঁঠার মাংস দুলালবাবুর বাপকে দিতে হয়। সুদ স্বরূপ। কবে পঁচিশ টাকা ধার নিয়েছিল তা আর শোধই হচ্ছে না। ভিটেমাটি সব বাঁধা আছে। সুদের সুদ তার সুদ··· হিসাবের মার-প্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে শেষে এই সোজা হিসাবে রাজি হয়েছে সে। রোজ আধ-সের কচি-পাঁঠার মাংস। চতুর্থপক্ষের অনুরোধে শালাও রাজি হয়েছে।

কিন্তু এ-ও আর পেরে উঠছে না রহিম। এই দুর্মূল্যের বাজারে রোজ কচি-পাঁঠা জোটানো কি সোজা কথা! এ অঞ্চলে যত কচি-পাঁঠা ছিল সব তো ওই শালার পেটে গেল। রোজ কচি-পাঁঠা পায় কোথা সে। অথচ শালাকে চটানো মুশকিল। এক নম্বর হারামি। হেলথ অফিসারটা পর্যন্ত ওর হাত-ধরা···ওর কথায় ওঠে বসে। একটু ইঙ্গিত পেলেই সর্বনাশ করে দেবে।···সেদিন সমস্ত দিন রোদে ঘুরে ঘুরে রহিম হতাশ হয়ে পড়ল। একটু ভয়ও হল তার। কচি-পাঁঠা কোথাও পাওয়া গেল না। কি হবে কে জানে!

হঠাৎ মাথায় খুন চড়ে গেল তার। চতুর্থপক্ষে বিয়ে করেছে শালা কচি-পাঁঠার ঝোল খাবে রোজ।

হারামির বাচ্চা! চিবুকের কটা দাড়িগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল।

তার পরদিন বাবুর বাবুর্চি বললে এসে—"কাল তুই যে মাংস দিয়েছিলি একেবারে ফাসট্ কেলাস। খেয়ে বাবুর দিল তর হয়ে গেছে। চেটেপুটে খেয়েছে সব···"

রহিম নীরব।

কেবল দাড়ির গোটা কয়েক চুল একটু নড়ে উঠল। বাবুর্চি বলতে লাগল—"খোকাটাকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই বাবুর মনে সুখ নেই, তা না হলে তোকে ডেকে বকশিসই দিত হয়তো। পাশের গলিতে খেলছিল—কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবু বলেছে, যে খুঁজে দিতে পারবে তাকে পঁচিশ টাকা বকশিস দেবে। একটু খোঁজ করিস, বুঝলি···কিরে কথা কইচিস না কেন···" রহিম পচ করে একবার থুতু ফেলে নীরবে মাংস কুঁচোতে লাগল। তার চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছিল!

অশ্রুর উৎস

প্রথম দৃশ্য

নিমাই। সত্যি যা দিনকাল পড়ল···

[সর্বত্র এইজাতীয় কথা শুনিয়া শুনিয়া গণেশ তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।]

গণেশ। আর ওকথা শুনে শুনে তো কান ঝালাপালা হয়ে পড়েছে। কতকগুলো বুড়ো লোক সকাল সন্ধে বসে বসে ওই একই কথা আওড়াচ্ছে। তিরিশ টাকা মণ চাল, তিন টাকা সের মাছ, টাকায় দেড় সের জোলো দুধ, অখাদ্য ডালডা, মুসলিম লীগের পাকিস্তান, বৃটিশের কূটনীতি, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক শুনে শুনে কানের পোকা মরে গেল। লেখকরা পর্যন্ত ওই এক বুলি কপচাচ্ছে ক্রমাগত। কথাগুলো মিছে নয়! কিন্তু ক্রমাগত দুর্দশার তালিকা আবৃত্তি করে লাভ কি। আমার প্রশ্ন এর থেকে উদ্ধার পাব কি করে?

নিমাই। কোটিং গণেশ—"ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস না করলে আমাদের মুক্তি নেই।"

গণেশ। (টেবিল চাপড়াইয়া) নিশ্চয়, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে তোমার?

নিমাই। কিছুমাত্র না। আমি শুধু বলছি ক্যাপিটালিজমকে ধ্বংস করা শক্ত। নার্ভের জোর চাই।

গণেশ। শক্ত বলেই পেছিয়ে যেতে হবে?

নিমাই। পেছিয়ে যাওয়া উচিত একথাও আমি বলছি না, কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে কোন কঠিন কাজে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না। মহাত্মাজীর অহিংস সত্যাগ্রহে আমাদের আন্তরিক অনুমোদন আছে কি? দেশে কাপড় নেই, তবু আমরা খদ্দর পরব না, চরকা চালাব না। শক্ত কাজে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না এবং না পারার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করি।

গণেশ। আমরা মানে কাদের 'মিন' করছ?

নিমাই। তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী বাবুরা।

গণেশ। এই সেদিনই আমরা—

[সহসা গণেশ সচেতন হইল যে বাহিরের দ্বারটা খোলা আছে এবং যে কোনও লোক ইচ্ছা করিলে তাহাদের কথোপকথন রাস্তায় দাঁড়াইয়া শুনিতে পারে। সে উঠিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল এবং ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বলিল—]

এই সেদিনই আমরা মেদিনীপুর চট্টগ্রাম করেছি।

নিমাই। আমরা করেছি বলছ কেন, যারা করেছে তারা ভিন্ন জাতের লোক। তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালী বাবু নয়। কাগজে মেদিনীপুরের সম্পর্কে নামের যে তালিকা বেরিয়েছিল, যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে ভারতের ইতিহাসে লেখা থাকবে তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কজন ছিল? যারা ছিল—যতদূর মনে পড়ছে—তারা, পুলিশের দিকেই ছিল। উত্তেজিত হবার দরকার নেই, আমি স্বীকার করছি এর ব্যতিক্রম আছে। ক্ষুদিরাম বোস থেকে রামেশ্বর বাঁড়ুয্যে পর্যন্ত কারও কথা ভুলিনি। কিন্তু এরা ব্যতিক্রম। আমাদের মধ্যে শতকরা আটানব্বুই জন কিম্বা তারও বেশী—উকীল ডাক্তার মাস্টার হাকিম লেখক কবি শিল্পী বক্তা এই সব হয়। বড়লোকের বাগানবাড়ি আলো-করা অভিজাত শ্রেণীর পাদপ আমরা—ঝড় ঝাপটা ভূমিকম্পে কাত হয়ে পড়ি।

গণেশ। থিয়েটার করে করে তোমার কেমন যেন থিয়েটারি ধরনের কথাবার্তা হয়ে গেছে। বক্তৃতা তো অনেক শোনালে, যা করতে বলেছি তা করেছ?

নিমাই। করেছি বই কি। এই যে।

[ভিতরের পকেট হইতে গোটা দুই চাবি বাহির করিয়া দিল।]

ছোটটা হচ্ছে দরজার চাবি আর বড়টা লোহার সিন্দুকের।

গণেশ। বাঃ—মেনি থ্যাংকস্ (উল্লসিত)।

নিমাই। রিভলভার যোগাড় করতে পারিনি, তার বদলে ছোরা এনেছি একটা।

[পেট-কাপড়ের গ্রন্থি খুলিয়া একটি ছোরাও বাহির করিল।]

গণেশ। ওতেই হবে। একটা ছোঁড়া চাকরকে ভয় দেখাবার পক্ষে ওই-ই যথেষ্ট।

নিমাই। ছোঁড়া চাকরকে ভয় দেখাবার দরকার নেই, তাকে আমাদের দলে টেনেছি। তার সাহায্য না পেলে চাবি দুটো করাতে পারতাম না। সে-ই গোপনে চাবিওয়ালাকে ঢুকতে দিয়েছিল একদিন।

গণেশ। তাহলে বেশ জানাজানি হয়ে গেছে বল, চাবিওয়ালাটা বেশ বিশ্বাসী তো?

নিমাই। বিশ্বাসী বলেই তো মনে হল। তবে দেখ, এসব ব্যাপারে বিপদের সম্ভাবনা আছেই। তুমি অত বড় একটা ধনীর সিন্দুক থেকে টাকা সরাতে চাও একেবারে নির্বিঘ্নে সেটা না-ও হতে পারে।

গণেশ। ওদের গদিতে ছোঁড়া চাকরটা ছাড়া আর কেউ থাকে না এ খবরটা তো ঠিক?

নিমাই। ঠিক। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভয়ের সম্ভাবনা থাকবেই কিছুটা—

গণেশ। ভয় আমি করি না। এমনি জিগ্যেস করলাম। তুমি ঠিক থাক।

নিমাই। আমি ঠিক আছি। কিন্তু আবার বলছি ভেবে দেখ, যা করতে যাচ্ছ সরল ভাষায় তার নাম চুরি।

গণেশ। শত শত লোককে বঞ্চিত করে লোকটা লোহার সিন্দুকে যে টাকা জমাচ্ছে, ছলে বলে কৌশলে তা নেওয়াকে আমি চুরি বলি না। আলেকজাণ্ডার ও রবারের গল্পটা আমার মনে আছে।

নিমাই। বেশ, কবে তাহলে যাচ্ছি আমরা?

গণেশ। দেরি করে লাভ কি, আজই চল।

নিমাই। বেশ। উঠি তাহলে এখন?

গণেশ। কোথা যাচ্ছ?

নিমাই। রিহার্স্যাল আছে। সেটা সেরেই সোজা এখানে আসব।

[গণেশের পত্নী সুরেশ্বরী প্রবেশ করিল। পরনে ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ চুল, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। যুবতী, কিন্তু যৌবনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সমস্ত মুখে হতাশা।]

সুরেশ্বরী। নিমাই ঠাকুরপো, তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও ভাই। ঘরে চাল নেই, চিনি নেই। আর কাপড়ের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। ওঁকে বলে বলে হার মেনেছি, তোমার সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের আলাপ, তুমি যদি ভাই একটু—

[মিনতিভরা দৃষ্টি তুলিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে চাহিল।]

নিমাই। বেশ বেশ, চেষ্টা করব বৌদি।

গণেশ। আমার স্বপ্ন যদি সফল হয় সুরো, কোনও ভাবনা আর থাকবে না তোমার।

সুরেশ্বরী। (সবিস্ময়ে) কি স্বপ্ন ?

গণেশ। এই ক্যাপিটালিস্টদের যদি—

সুরেশ্বরী। থাক, তোমার ক্যাপিটালিস্টদের বক্তৃতা অনেক শুনেছি। বক্তৃতায় দুঃখ ঘুচলে আর ভাবনা ছিল না।

[স্বামীর প্রতি ঘৃণাব্যঞ্জক একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।]

গণেশ। উঃ, আর সহ্য হয় না। ভাই নিমাই, এসো ঠিক—

নিমাই। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব।

[নিমাই চলিয়া গেল। গণেশ কেরোসিন আলোর স্বল্পালোকে চাবি দুইটি সাগ্রহে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। গণেশ নিমাইয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ একটি মৃদু কেরোসিনের আলোর সম্মুখে হাতলভাঙা চেয়ারে কুঁজো হইয়া বসিয়া উপন্যাস পড়িতেছে। সুরেশ্বরী প্রবেশ করিল।]

সুরেশ্বরী। তুমি শোবে না ?

গণেশ। তুমি শোও, আমার একটু দেরী আছে।

সুরেশ্বরী। কেরোসিন তেলটুকু কত কষ্টে ধারধোর করে এনেছি, অনর্থক পোড়াচ্ছ কেন সেটা ?

[গণেশ কোন জবাব দিল না। সুরেশ্বরী একটা রোষদৃষ্টি হানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ কাটিল। গণেশ যখন উপন্যাসের জটিল রহস্যে সম্পূর্ণ আত্মহারা, তখন দুয়ারের কড়াটা সহসা নড়িয়া উঠিল। সচকিত গণেশ সোজা হইয়া বসিল। তাহার পর উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিল। প্রত্যাশিত নিমাইয়ের পরিবর্তে প্রবেশ করিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আর একজন। খাকি পোশাকপরা পুলিশ অফিসার। প্রকাণ্ড গালপাট্টা দাড়ি, গগলস পরা, ভীষণ চেহারা। যখন কথা কহিল মনে হইল যেন বুলডগ ডাকিতেছে।]

পুলিশ অফিসার। হ্যাণ্ডস্ আপ।

[রিভলভার বাহির করিতেই গণেশ দুই হাত তুলিল।]

আমরা খবর পেয়েছি, আপনি চিরঞ্জীব প্রসাদের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করবেন বলে চাবি তৈরি করিয়েছেন। সত্যি কথা ?

গণেশ। আজ্ঞে না।

পুলিশ অফিসার। (সপদদাপে) খবরদার মিছে কথা বলবেন না, যে চাবি তৈরি করেছে সে-ই আমাদের খবর দিয়েছে। আপনার ঘর সার্চ করব এখনই। দেখুন, এখনও সত্যি কথা বলুন।

গণেশ। (ঢোক গিলিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, চাবি আমি করিয়েছি।

পুলিশ অফিসার। কোথায় চাবি ?

গণেশ। হাত নাবাব ? ওই সেলফে আছে।

পুলিশ অফিসার। নাবান, দিন আমাকে চাবি।

[গণেশ হাত নাবাইয়া সেল্‌ফ হইতে চাবি আনিয়া দিল।]

আপনার সঙ্গে আর কে কে আছে?

গণেশ। আমার সঙ্গে?

পুলিশ অফিসার। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার সঙ্গে। নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গী আছে কেউ। তাকেও ধরতে হবে তো—

[গণেশ চুপ করিয়া রহিল।]

চুপ করে আছেন যে?

গণেশ। আমার সঙ্গী কেউ নেই।

পুলিশ অফিসার। বেশ আমার সঙ্গে থানায় চলুন। থানায় সেই চাবিওলা বসে আছে। সেও যদি বলে যে আপনার কোন সহকারী নেই তাহলে আপনাকে ছেড়ে দেব। আর সে যদি অন্য কথা বলে তাহলে আপনার জেল অনিবার্য। চলুন।

গণেশ। চাবিওলা থানায় বসে আছে এসে?

পুলিশ অফিসার। হ্যাঁ, চলুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন।

গণেশ। (দ্বিতীয় ঢোক গিলিয়া) নি—নিমাইও আমার সঙ্গে যাবে বলেছিল। সে-ই চাবি এনে দিয়েছে।

[গোঁফ দাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া পুলিশ অফিসার নিমাইয়ে রূপান্তরিত হইল।]

নিমাই। তবেই তো গণেশ—এরপর আর কি করে—

গণেশ। এ কি নিমাই তুমি! এর মানে?

নিমাই। অত বড় একটা ঝুঁকি নেবার আগে একটু বাজিয়ে দেখলাম তোমাকে।

গণেশ। মানে—

[অপ্রস্তুত গণেশ কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ্বরী প্রবেশ করিল।]

সুরেশ্বরী। ও নিমাই ঠাকুরপো, তাই বলি এত রাত্রে বাইরের ঘরে কথা কয় কে।

নিমাই। এই নিন বউদি, আপনার পারমিট এনেছি। রিহার্স্যালেই দেখা হয়ে গেল ভদ্রলোকের সঙ্গে।

[পারমিট বাহির করিয়া দিল।]

সুরেশ্বরী। বেঁচে থাক, টুকটুকে বউ হোক একটি। এ পোশাক কেন এত রাত্রে?

নিমাই। আজকে ড্রেস রিহার্স্যাল ছিল আমাদের। এবার যে বইটা নাবাচ্ছি, তাতে দারোগার পাট আছে আমার।

সুরেশ্বরী। খাসা মানিয়েছে। আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

নিমাই। নিশ্চয়।

[পুলকিতা সুরেশ্বরী ভিতরে চলিয়া গেল।]

গণেশ। আচ্ছা ভাই, এখন উপায় কি বল তো? একটুতে যেন বড় বেশী নার্ভাস হয়ে পড়ি। স্নায়ুর শক্তি একেবারে কিছু নেই। কিন্তু এর উপায় কি?

নিমাই। স্নায়ুর শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করা।

গণেশ। আচ্ছা একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে, ত্রিফলা খেলে নাকি স্নায়ুর শক্তি বাড়ে। দুধ, ডিম বা ভাল ভাল ওষুধ খাবার মতো পয়সা নেই। ত্রিফলাটা অবশ্য অ্যাফোর্ড করতে পারি—তাই খেয়ে দেখব কিছুদিন?

নিমাই। আচ্ছা, উঠি এখন।

[নিমাই চলিয়া গেল। গণেশ নির্জন ঘরে একা চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর টেবিলে মাথা রাখিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।]

হার

সেদিন অষ্টম দিবস। মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ হরিহর সেন বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজটা উলটাইতেছিলেন। এ কয়দিন ধরিয়া একটি মাত্র খবরই অবশ্য তাঁহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে। সে খবরটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নাই যদিও কিন্তু তাহার গুরুত্ব হরিহর সেনের নিকট মলটভের রাজনৈতিক উক্তি অপেক্ষা অধিকতর চাঞ্চল্যকর। স্ত্রী রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন। বাপের বাড়ি অবশ্য কলিকাতাতেই, মোটরে মিনিট পনের-কুড়ির পথ। স্ত্রীর পিত্রালয়ের দূরত্ব অধিক না হইলেও স্ত্রীর মনের সহিত নিজের মনের দূরত্ব কত অধিক তাহা আবিষ্কার করিয়া ডাঃ হরিহর সেন প্রথমে যুগপৎ রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া পরে বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন। অপুত্রক হরিহর সেনের স্ত্রীই সব। বিশেষতঃ আজকাল। ওই মহিলাটিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সংসার। রিটায়ার করিয়া কলিকাতায় বাড়ি কিনিয়াছেন স্ত্রীরই অনুরোধে। কলিকাতা সহরে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পরিজনবর্গ ছাড়া আর কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয়ও নাই। যখন চাকুরি করিতেন তখন চাকুরি এবং রোগী লইয়া অধিকাংশ সময় কাটিত। এখন চাকুরি নাই, রোগীও নাই, আছে ব্যাঙ্কের টাকা এবং স্ত্রী। অথচ বিধাতার এমনই পরিহাস, এই অপরিহার্য ব্যক্তিটির সহিত মতের কিছুতেই মিল হয় না। ভয়ানক জিদি।

কলহের কারণ গহনা। লক্ষপতি হরিহর সেন যে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়া স্ত্রীকে একটা হার কিনিয়া দিতে পারেন না তাহা নয়, কিন্তু 'অন প্রিন্সিপল' তিনি দিবেন না। অনেক দিয়াছেন আর নয়। এই বয়সে এ কি কাণ্ড! এখন গলায় হার দুলাইয়া পুঁটুরাণী কাহাকে মুগ্ধ করিতে চায়। তিনি তো এমনিতেই মুগ্ধ, হারের প্রয়োজন কি। ডাঃ সেন আদর্শবাদী লোক। তিনি ভাবিয়া রাখিয়াছেন ভগবান যখন তাঁহাকে কোনও সন্তানাদি দিলেন না তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিয়া যাইবেন। এই আদর্শে প্রণোদিত হইয়া তিনি এখনও যথাসাধ্য ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া চলেন।

কিন্তু পুঁটুরাণীর আদর্শ অন্যরূপ। যে সমাজে তিনি বিচরণ করেন, সে সমাজে তিনি লক্ষপতি ডাক্তার-গৃহিণীর মর্যাদা লইয়াই বিচরণ করিতে চান। তাঁহার স্বামী একজন গণ্যমান্য লোক, রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন, তাঁহার কি ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া বেড়ান সাজে? পরিবেনই বা কেন? কোন দুঃখে? বিবাহ বাড়িতে, সিনেমার আসরে সকলে যখন গহনা-কাপড়ে ঝলমল করে তখন তিনি সেখানে সাদাসিধা পোশাকে মুখটি চুন করিয়া বসিয়া থাকিবেন? কেন? কিসের অভাব তাঁহার? কস্তুরবা গান্ধীর আদর্শ দেখাইয়াও হরিহর সেন তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। পুঁটুরাণী বলিয়াছেন—"আগে তুমি মহাত্মা গান্ধী হও, তাঁর মতন জগৎ-জোড়া নাম কেন, তারপর আমি কস্তুরবা গান্ধী হব, তার আগে নয়…।" মোট কথা, পুঁটুরাণী দমিবার লোক নন। তিনি যেখানেই যাইবেন সেখানটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, দশ জনে চাহিয়া দেখিবে, এই তিনি চান।

তাঁহার চেহারাখানাও অবশ্য দেখিবার মতো, যদিও বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। সাজিলে সত্যই এখনও রাজরাণীর মতো দেখায়। রুচিও রাজকীয়; সুতরাং হরিহর সেনকে অহরহই বিপন্ন হইতে হয়। এই লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই খিটিমিটি বাধে এবং এ-সব ক্ষেত্রে প্রায়ই যাহা ঘটে, হরিহরবাবুকে তাহাতে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এবার —দমকা পাঁচ হাজার টাকার প্রস্তাবে হরিহর বাঁকিয়া বসিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে লক্ষ টাকা তিনি জমাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে পাঁচ হাজার টাকা বাহির করিয়া প্রৌঢ়া স্ত্রীর জন্য হার কিনিতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইয়াছে। বুকে বল সঞ্চয় করিয়া তিনি সোজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পুঁটুরাণী যাইবার সময় শাসাইয়া গিয়াছেন—হার তিনি লইবেনই যেমন করিয়া পারেন। হরিহর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই দিবেন না।

সাত দিন কাটিয়া গিয়াছে। পুঁটুরাণী ফেরেন নাই। হরিহর সেনের প্রতিজ্ঞাও অটল আছে।

অষ্টম দিন প্রাতঃকালে খবরের কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে হরিহর সেন ভাবিতেছিলেন দিন কতকের জন্য কোথাও উধাও হইয়া গেলে মন্দ হয় না। তাঁহার ছেলেবেলার বন্ধু চন্দ্রনাথ কাশীতে একটি বাড়ি করিয়াছে, বারবার নিমন্ত্রণ করিতেছে। পুঁটুরাণীকে কোনও খবর না দিয়া কিছুদিনের জন্য সেইখানে গিয়া গা-ঢাকা দিলে হয়। মজাটা বুঝুক কিছুদিন! তাঁহার অন্তর্ধানে পুঁটুরাণীর সম্ভাব্য মনোভাবটা কিরূপ হইবে, তাহাই তিনি মানসপটে অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

'আসতে পারি—?'

হরিহর সেন চাহিয়া দেখিলেন দ্বারপ্রান্তে একটি হাস্যমুখী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। যুবতী এবং রূপসী।

'আসুন'।

মেয়েটি বেশ সপ্রতিভভাবে আসিয়া হরিহরকে প্রণাম করিল। তাহার পর আসন গ্রহণ করিয়া বলিল—'পুঁটুদি এই চিঠিটা দিয়েছেন।'

হরিহর সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া পত্রখানি লইলেন। ছোট এক টুকরা কাগজ। তাহাতে লেখা আছে—'মণি আমার ছোট মাসীর ছোট মেয়ে। এর এক ভাই অসুস্থ, সেইজন্যেই তোমার কাছে যাচ্ছে, একটা ব্যবস্থা করে দিও।'

মণি হাসিয়া বলিল—'আপনি আমাকে দেখেন নি কখনও। আমরা বরাবর পাঞ্জাবে মানুষ হয়েছি।'

'ও! কি হয়েছে তোমার ভায়ের?'

'মাথার অসুখ। এদিকে বেশ স্বাভাবিক, খায় দায় বেড়ায়। কিন্তু কেমন যেন মাথার ছিট হয়ে গেছে। সব কথা খুলে বলি তাহলে। হয়েছিল কি জানেন, একটা গয়নার দোকানে ও চাকুরি করত। সেখান থেকে কি করে একটা হার চুরি যায়। দোকানের মালিকেরা ওকেই সন্দেহ করে। পুলিশ কেস হয়, ওর জেল পর্যন্ত হয়ে যায়। পরে অবশ্য অন্য জায়গা থেকে সে হার পাওয়া গেল, দোকানের মালিকেরা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনলে ওকে, খেসারতও দিলে! কিন্তু তারপর থেকেই ওর মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। মুখে হার ছাড়া আর কথা নেই। হারটা কোথায় গেল, হারটা কোথায় গেল—এই বুলি কেবল। অপরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলবে হারটা কি পছন্দ

হল, দামটা কি এখনই দেবেন—এই সব। সব কথা ওই হার নিয়ে। অনেক ডাক্তার দেখান হয়েছে কিছু হয়নি। আপনি তো নামজাদা পাগলের ডাক্তার, আপনি যদি দেখে একটা ব্যবস্থা করে দেন।'

'বেশ তো, কোথায় আছে সে?'

'এখানেই। বলেন তো নিয়ে আসি। এখন সময় হবে কি আপনার?'

'তা আনো।'

'দেখি তাহলে একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে আসি—ট্রামেবাসে ওকে নিয়ে চলতে ভয় হয়।'

মেয়েটি চলিয়া গেল। বেশ চটুলা চটপটে তরুণীটি। হরিহরবাবুর মনের বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়া গেল। এই সূত্র ধরিয়া গৃহিণীর সহিত যদি একটা মিটমাট হইয়া যায়। ক্ষণপরে তাঁহার মুখে একটি মৃদু হাস্যরেখাও ফুটিয়া উঠিল। শুধু মেয়েদের নয়, হার পুরুষকেও পাগল করে তাহা হইলে! খবরের কাগজ উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে নূতন ধরনের একটি মানসিক ব্যাধি দেখিবার আশায় ডাক্তার হরিহর সেন উৎসুকচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে মেয়েটি ফিরিয়া আসিল। 'এখানে ট্যাক্সি তো পাচ্ছি না একটাও। আপনার "কারটা" পেতে পারি কি? বেশী দূর নয়, এই হরিশ মুখার্জি রোড—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়।'

শশব্যস্তে হরিহর উঠিয়া গেলেন এবং ড্রাইভারকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—'একে নিয়ে যাও, ইনি যেখানে যেতে বলেন নিয়ে যাবে।'

আধ ঘণ্টা পরে গাড়ি ফিরিল।

মণি একা গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—'গাড়িতে ও বসে আছে। চিকিৎসার কথা শুনলে ও আসত না। ডাক্তারদের সম্বন্ধে ওর ভীতি হয়ে গেছে একটা। ওকে এই বলে ভুলিয়ে এনেছি যে, জামাইবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আপনি উঠে গিয়ে ডাকুন ওকে। আচ্ছা জামাইবাবু, আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে?'

'ও, বাথরুম? এই যে ভিতরের দিকে। সোজা চলে গিয়ে বাঁ দিকেই।'

মণি বাথরুমের সন্ধানে ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। হরিহরবাবু বারান্দায় বাহির হইয়া মোটরে উপবিষ্ট যুবকটিকে আহ্বান করিলেন—'এস, ভিতরে এস।'

নিরীহ ভদ্রগোছের যুবকটি সসংকোচে আসিয়া সোফায় উপবেশন করিল। ডাক্তার সেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মনে হইল এসব রোগীকে আড়াল হইতে পর্যবেক্ষণ করাই উচিত।

'বস, আমি আসছি একটু ভিতর থেকে।'

ঠিক পাশেই যে ঘরটি ছিল ডাক্তার সেন তাহাতেই প্রবেশ করিলেন। কপাট ভেজাইয়া দিয়া জানালার ঝিলিমিলি ঈষৎ ফাঁক করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মিনিট দুই পরে একবার তাঁহার মনে হইল মণি তো কই বাথরুম হইতে এখনও ফিরিল না! কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন কোন্ মেয়ের যে বাথরুমে কতক্ষণ লাগিবে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব এবং নির্ণয় করিবার চেষ্টা করাটা অভদ্রতা। সুতরাং কৌতূহল দমন করিয়া তিনি এক মনে রোগী পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যুবকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর উসখুস করিতে লাগিল। প্রায় মিনিট দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু গলা খাঁকারি দিল। তাহার পর ডাকিল—'ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার সেন বাহির হইয়া আসিলেন।

'কি। কিছু বলছ আমাকে?'

'হারটা পছন্দ হল কি?'

হার-প্রসঙ্গ লইয়াই যে কথা কহিবে তাহা পূর্বেই জানা ছিল, সুতরাং হরিহর বিস্মিত হইলেন না।

'হচ্ছে হচ্ছে ব্যস্ত কি। বস না।'

'আজ্ঞে না। ব্যস্ত কিছু নেই।'

সসংকোচে পুনরায় উপবেশন করিল।

হরিহর খবরের কাগজটা উল্টাইতে লাগিলেন।

আরও মিনিট দুই কাটিল। যুবকটি আবার একটু উসখুস করিয়া পুনরায় বলিল—'আমার দোকানে কাজ আছে, আমি পরে আসব না হয়, কিংবা আপনি ফোনেও বলে দিতে পারেন, আমাকে একটা রসিদ দিয়ে দিন এখন—'

এ কথায় হরিহর একটু বিস্মিত হইলেন।

'দোকান? রসিদ? মানে'—

'আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্মী জুয়েলারি থেকে গিন্নিমা যে হারটা এখনই আনলেন সেটা যদি—'

'গিন্নিমা আনলেন? হার? কখন?'

'এখনই যে মোটরে এলেন আমার সঙ্গে। নেকলেসটা সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন। বললেন আপনারও যদি পছন্দ হয় রাখবেন ওটা। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই জন্যে—হারটা কি দেখেন নি এখনও?'

'কই না!'

উদ্‌ভ্রান্ত হরিহর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

বাথরুম খোলা। অন্তঃপুর খালি। কেহ কোথাও নাই। হঠাৎ চোখে পড়িল টেবিলের উপর একটি পত্র রহিয়াছে।

শ্রীচরণেষু—

জামাইবাবু, হারটা দিদিকে পৌঁছে দেব। দামটা দিয়ে দেবেন। আপনারও আর একটা হার হল।

ইতি—
মণি

গোবর্ধন-চরিত

যেমন বিশাল বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি পরিশ্রমী। কাঠ চেলাচ্ছে তো চেলাচ্ছেই—একটা গাছই কেটে সাফ করে দিলে। মাটি কোপাতে দাও, কুপিয়েই যাচ্ছে—শ্রান্তি, ক্লান্তি নেই। প্রথম যৌবনে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে কার মাথায় যেন লাঠি মেরেছিল, লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ভাগ্যে মরেনি, তাই দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করে গোবর্ধন ছাড়া পেয়ে গেল। জেলে যখন ছিল, তখন জেলার একবার নাকি তাকে হুকুম দিয়েছিল—বাগানটা সাফ করে দাও। গোবর্ধন অবাধ্য কোন কালে নয়। বর্ণে বর্ণে আদেশ পালন করেছিল শুনতে পাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাগান একেবারে সাফ।

আগাছা, পরগাছা, ফ্লগাছ—সব সাফ! বদমায়েসি করে যে করেছিল তা নয়, ওই রকমই ওর ব্দ্ধি। ঘোর-প্যাঁচ নেই। একবার এক জমিদার তার ছেলের বিয়েতে ওকে ব্যাগার ধরে নিয়ে যায়। ইঁদারা থেকে জল তুলতে হবে। জমিদার কার্পেট-পাতা বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে আলবোলায় তামাক টানছেন। বিরট এক কলসী জল নিয়ে গোবর্ধন দ্বারদেশে হাজির।

"জল কোথায় রাখব বাব্?"

অর্বাচীনটার এই প্রশ্নে জমিদারবাব্ একটু কৌতুক বোধ করলেন। আলবোলায় একটা টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—"আমার মাথায়।"

বিনা দ্বিধায় গোবর্ধন এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবার প্বেই হ্ড়-হ্ড় করে সব জলটা ঢেলে দিলে তাঁর মাথায়। রসিকতার ধার ধারে না সে।

এহেন গোবর্ধন জ্টল এসে শেষকালে আমার কাছে। আমার কিছ্ চাষ-বাস ছিল। গোবর্ধন একদিন সকালে দন্তবিকাশ করে এসে বললে—"আমাকে আপনি রাখেন, বাব্?"

"তুই যে জগদীশবাব্র ওখানে ছিলি।"

"আজ্ঞে, ওনারা বড় খ্যাচ-খ্যাচ করে।"

"তার আগে শীতলবাব্র কামতেও তো ছিলি কিছ্দিন?"

"আমার জেল হয়েছিল শ্নে রাখলে না।"

গোবর্ধনের হাসি আকর্ণ-বিস্তৃত হয়ে উঠল।

আমার লোকের দরকার ছিল, রাখলাম গোবর্ধনকে। দিন দ্ই পরেই বোঝা গেল, লোকে কেন ওকে রাখছে না। গ্হিণী বললেন, "হাতীর খোরাক!" হাতীর মতো কাজও করে। সুতরাং গ্হিণীর আপত্তি সত্ত্বেও গোবর্ধনকে রাখলাম। মাইনে কত নেবে, তা কিছ্ ঠিক হল না। তিনকুলে কেউ নেই, টাকার দরকারও ছিল না তার বিশেষ। দ্বেলা পেট ভরে খেতে পেলেই গোবর্ধন সন্তুষ্ট।

বছরখানেক কাটল।

একদিন গোবর্ধন এসে ঘাড় চুলকে মাথা চুলকে বললে—"বাব্, তিন কুড়ি টাকা আমাকে দিতে হবে···"

আকাশ থেকে পড়লাম।

"তিন কুড়ি টাকা! কেন রে?"

"আজ্ঞে, বিয়ে করব।"

"অত লাগবে?"

"ওর কমে মেয়ে দিতে চায় না কেউ।"

ঘাড়টা একদিকে কাৎ করে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার বিশাল বলিষ্ঠ বপ্র দিকে চেয়ে আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। এমন একটা সুস্থ সবল জোয়ান বিয়ে করবে না তো কে বিয়ে করবে! সেদিন একটা বিবাহ-সভায় গিয়েছিলাম। পাত্রের চেহারা দেখে হতাশ হয়ে পড়তে হল। রোগা লিকলিকে দেহ, কোটরগত চক্ষ্, গালের হাড় দ্টো উঁচু, ম্খময় ব্রণ! মহাসমারোহে বিয়ে করছে ছোকরা বিলিতি ব্যাণ্ড বাজিয়ে। ওই অপদার্থটার যদি বিয়ে করবার দাবী থাকে, গোবর্ধনেরও নিশ্চয় আছে।

গৃহিণী বললেন—"আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শংকরাকে ডাকে। ও নিজে শোয় তো বারান্দায়, বউকে এনে রাখবে কোথা ?"

গোবর্ধনকে প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁ রে, বউকে এনে রাখবি কোথা ?"

"ঘর টর বেঁধে লিব একটা ওহ একটেরে।"

আমার বাড়ির সামনে জমি পড়েছিল খানিকটা, আংগুল দিয়ে তারই একটা কোণ দেখিয়ে দিলে গোবর্ধন।

"তাই আগে বাঁধ।"

বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আর পোয়াল গাদা থেকে খড় নিয়ে সেই দিনই কুঁড়ে তুলে ফেললে গোবর্ধন। চমৎকার ছোট্ট কুঁড়েটি। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে এসে আমাকে বললে—"দ্যাখেন ··"

এর পর আর কোন আপত্তি টিকল না। বিয়ের জন্য টাকা তাকে দিতেই হল। এক বছর কোন মাইনেও তো নেয়নি ! কালো কোলো নধর-কান্তি স্বাস্থ্যবতী বউ এল একটি কিছুদিন পরে।

বেশ কাটল কিছুদিন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে বেশ কাজ-কর্ম করত। বউটাও বেশ খাটিয়ে। একদণ্ড চুপ করে বসে থাকত না। হয় ডাল ভাঙছে, না হয় ঘুটে দিচ্ছে, না হয় কাপড় কাচছে। আর সমস্ত হাসিমুখে। বেশ চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হল। গোবর্ধনের কর্তৃত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ক্রমশঃ। পান থেকে চুন খসলেই সে বউকে শাসন করতে ছুটত—কখনও লাঠি নিয়ে, কখনও থান ইট নিয়ে। বউটা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিত আমার স্ত্রীর কাছে। গোবর্ধন দূর থেকে শাসাত—"আচ্ছা, দাঁড়া—মজা দ্যাখাচ্ছি তোকে তখন।" আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। গোবর্ধনকে বকলে সে ঘাড় গুঁজে চুপ করে বসে থাকত, তারপর গজগজ করত আপন মনে এবং তার দুদিন পরেই আবার তাড়া করত বউটাকে।

আসন্নপ্রসবা বউটা একদিন শুনলাম বাপের বাড়ি পালিয়েছে। গোবর্ধনকে প্রশ্ন করলাম—"পালাল কেন ? হয়েছিল কি ?"

"হবে আবার কি ! দিয়েছিলুম একটা চাপড়।"

"গোঁয়ার গোবিন্দ ভুত।"

ঝংকার দিয়ে উঠলেন আমার গৃহিণী। গোবর্ধন চুপ করে রইল। পনর দিন কাটল। গোবর্ধনের বউ আর ফেরে না। গোবর্ধন বিমর্ষমুখে ঘুরে বেড়ায়।

আমার দারোগা বন্ধু বললেন—"নালিশ কর তুই। আমি তোর বউ আনিয়ে দিচ্ছি।"

গোবর্ধন নীরব।

উকীল বন্ধু বললেন—"বউ যদি না-ও আসে ক্ষতিপূরণ পাবি।"

গোবর্ধন তবু কিছু বলে না।

আধুনিকমনা একজন মন্তব্য করলেন—"স্ত্রী হলেও সে তো মানুষ। তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার না করলে সে থাকবে কেন ? গিয়ে মাপ চা।"

গোবর্ধন চুপ করে থাকে।

হঠাৎ খবর এল গোবর্ধনের ছেলে হয়েছে। পাঁচ ক্রোশ দূরে গোবর্ধনের শ্বশুরবাড়ি, কে একজন এসে খবর দিয়ে গেল। খানিকক্ষণ পরে গোবর্ধন উধাও।

আমার আধুনিকমনা বন্ধুটি বললেন—"মাপ চাইতে গেছে বোধহয়। মানুষ যতই মূর্খ হোক তার সুপ্ত মনুষ্যত্ব একদিন না একদিন জাগরিত হবেই—"

অনেক রাত্রে গোবর্ধন ফিরল। হাতে ছোট্ট একটি ন্যাকড়ার পুঁটুলি।

আমার স্ত্রী বললেন—"কি রে—ওটা কি ?"

আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে গোবর্ধন বললে—"বাছুরটাকে নিয়ে এলাম, গাই এবার আপনিই আসবে। আপনি একটু দুধের জোগাড় করেন দেখি—"

ন্যাকড়ার পুঁটুলির মধ্যে দেখি গোবর্ধনের সদ্যোজাত শিশুটা !

অর্জুন মণ্ডল

॥ এক ॥

কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলাম। শীতকালে এত রাত্রে কে এল আবার !

"কে—"

"আমি, আমি, কপাট খোল।"

খুললাম। সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বাললাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে ! মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলি-রেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

"আমার চিঠি পাওনি নিশ্চয় ?"

"না।"

"চিতুয়া পোস্ট করেনি তাহলে। শালা ডাকু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হতো···তাকে দেওয়াটাই ভুল হয়েছিল। ভুল, ভুল, এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।"

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা সরে গেল যেন।

"অর্জুনকাকা ! হঠাৎ এত রাতে কোথা থেকে ?"

"তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। শহরে জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারণা ছিল চিঠি পেয়েছ তুমি।"

"না, না, তার জন্যে কি হয়েছে"—

"হয়নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিতুয়াটার কথাই ভাবছি। এইসব ছোটখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কি না—"

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

"ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়তো।"

"না, ও কথা মানব না আমি।"

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেবে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নাবাতে উদ্যত হলেন।

"আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নাবাবে এখন।"

"কেন ওকে বেশী পয়সা দিতে যাব মিছামিছি"—

'মিছামিছি'ও অর্জুন কাকার বিশেষত্ব।

"দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তাহলে"—

"চাকরকেই বা ডাকবে কেন। আমার গায়ে জোর নাই না কি ?"

অবলীলাক্রমে নাবিয়ে ফেললেন সব। বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তি মাফিক গাড়োয়ানকে পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন—"কোন ঘরটায় শুব ?"

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল। সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন—"যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।"

"আপনার খাওয়া দাওয়া ?"

"রাত্রে আমি কিছুই খাই না।"

"দু-চারখানা লুচিটুচি ভেজে দিক না, কি আর এমন রাত হয়েছে"—

বিছানা পাততে পাততে অর্জুনকাকা বললেন—"তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি ?"

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারেনি, বুঝলে ?"

"ও"

"নিজেই ভুগবে শালা। আমার কি—"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"যাও, আর রাত কোরো না, শুয়ে পড়।"

"সত্যিই কিছু খাবেন না ?"

"দেখ, বেশী যদি পীড়াপীড়ি কর বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন-প্লাটফর্মে চলে যাব তাহলে।"

বুঝলাম অর্জুনকাকা বদলাননি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা। আশ্চর্য জীবন লোকটার। স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এ দেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন আমাদেরই বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চীৎকার চেঁচামেচি, কলরব আর্তনাদ

—সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভীড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কি যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভীড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুই মাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন। "আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।"

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "কি কেড়ে নিচ্ছে ? কারা ?"

"জমিদারের সিপাহিরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।"

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরীব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

"আচ্ছা তুমি চুপ করে বস এইখানে।"

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এককোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহি দুজন এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিগ্যেস করলেন, "এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা ?"

"এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই চাহিয়ে।"

"নেহি দেগা।"

কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহিদের চক্ষু অগ্নি বর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে বাবাকে ইতর ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহিরা আত্মসম্বরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহিদের বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বোলো না এখন।"

সিপাহিরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেসাই এরকম করে থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক্ লেগে গেল। অত বড় দুর্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তারবাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো। উঃ, বিদ্যার কি প্রতাপ ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল, অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন—"আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।"

"কি বল ?"

"আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেলফ। নীচের ফাকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কি সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে। খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমাদের পেন্সিল কলমও তিনিই বেড়ে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কি সুন্দর মলাট দিতেন।

কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জ্বেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয় মশাও পালাত। একটি ঘটি চা খেতেন তিনি, এক আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সর্ষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মতো বয়স হয়নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি পুরাকালে শিক্ষার্থী যেমন গুরু-গৃহে বাস করে অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মতো লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মতো। ওরকম নিষ্ঠা আর কোথাও দেখিনি। মাঝে মাঝে দু-একদিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু-এক দিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা করতেন তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসে। এই ভাবে পড়ে বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় সীতার বনবাস এবং ইংরেজীতে রয়াল রীডার নম্বর ফোর পর্যন্ত পড়ে ফেললেন তিনি, অংকও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মুলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এইভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে সব ওলট পালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিস-পত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না সাহেব। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাৎ হালকা নয়। অর্জুনকাকা নিজে কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রয় করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় এগিয়ে এসে সেলাম করে বললেন—"Yes, sir, I shall carry your things most gladly." অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরেজি শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নাবাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন—"Thank you sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you."

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন—"Why ?"

"You are our Doctor Babu's honoured Guest." সাহেব অত্যন্ত খুশী হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিস-পত্র নাবিয়ে চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, "ও যদি চায় আপনি ওকে অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ জোগাড় করে দেব।"

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন। একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলছিলেন হঠাৎ তাতে বাধা পেয়ে, সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাকে ড্রেসার হতে বলছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কি) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

ইতিপূর্বে তাঁর মুখের এরকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ্য করেছিলাম আমি। অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ্য করতাম। তাঁর মুখের এ রকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশী অস্থির হতে দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থির-ভাবে পায়চারি করতেন, মনে হতো জিবটা যেন চিবুচ্ছেন। নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘনঘন চিবুতেন মনে হতো। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটি সহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তার সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধহয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাংচাতেন। হয়তো কথঞ্চিত শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, "কাল থেকে ঘা ধোয়াব! সে কি। তিন তিনখানা ডিক্‌শনারি আনতে দিয়েছি আমি—"

"অত ডিক্‌শনারি কি হবে!"

"মুখস্থ করব।"

"মুখস্থ করবে ? কি হবে ডিক্‌শনারি মুখস্থ করে। তাছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কি, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।"

"দেবে না ? কেন!"

"এই নিয়ম ! প্রাইভেটলি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা…তাও তিন বচ্ছর চাকরি করার পর।" অর্জুনকাকা বললেন—"শুনেছি হাই স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।"

"তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভর্তি হতে হবে। আই. এ. পাশ করতে করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কি! তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়। কম্পাউন্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা।"

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসারের পদে বাহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিঞার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যাণ্ডেজ পাকাতে হয় কি করে। করিম মিঞার খুব সুবিধে হল। ছা-পোষা লোক তিনি। মুরগী, ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলে মেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে যে, হাসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাকরেদ্ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুনকাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যাণ্ডেজ পাকানো, ছুরি কাঁচি পরিষ্কার, খাতায় রুলটানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউণ্ডার হারাধনবাবুও প্র্যাকটিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন অল্প কিছুদিন পরে। সার্জিকাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতেন সেগুলি, এমন কি বাবার হয়ে রিটার্নও করে দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেণ্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন তাঁকে মঞ্জুর করেছিলেন যদিও তা সামান্যই কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেন নি, বরং বাড়িয়েছিলেন। বাঙলায় বসুমতী সংস্করণের বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক গ্রন্থাবলীই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজিতে রবিন্সন ক্রুশো, গ্যালিভার্স ট্রাভেল্স, পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিক্শনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হল ড্রেসারি বিষয়ক জ্ঞান-আহরণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একটানা চটি বই। কিন্তু ওইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এত বড় একজন দিগ্গজকে পরীক্ষার্থী রূপে পাবেন আশা করেন নি। কোন কোন বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশী এটা বরদাস্ত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যাণ্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা-অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশী কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারি লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জুনকাকা যে দিন ফিরে এলেন সেদিনও ওই রকম মুখভাব দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠেছে, চালে গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিত ভাবে ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন

মাত্র ; পরদিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ-উদ্যমে। যেন কিছুই হয়নি।

পরের বার পাস করলেন। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্য কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে ? দিন কয়েকের ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়। পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল একঘর। বেশ ভাল অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারি আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি না কি তাঁর সাত ছেলের সংগে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

"এ এক মহা আফৎ হল"—

অর্জুনকাকা 'আপদ' কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বললেন, "আমার তো মনে হচ্ছে ভালই হল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখেই থাকবে। ওরা বড়লোক"—

"বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাস, চোর, লম্পট, লুচ্চা—"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

"আপনি তো সবই জানেন ডাক্তারবাবু। এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কি হাল হয়েছিল আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা—"

"সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভাল।"

"আপনি বলছেন ?"

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশঃ। বড়লোকদের সংগে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি !

বাবা বললেন, "তোমার মেয়েদের যদি বিয়ে না দাও তাহলে কার কাছে রেখে যাবে এদের ? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।"

"তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।"

"তোমার যা খুশী করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের বিয়ে দিয়ে যাওয়াই ভাল"—এই বলে বাবা উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশঃ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তাঁর জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে তিনি গরীব মানুষ, বেশী বরযাত্রীর হাংগামা বরদাস্ত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশী বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রামশিংগে, পনরটা কাঁসি এবং দশটা শানাই সমভিব্যাহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক

সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন—হুজুর, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হল শেষ পর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেন নি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে করে এনেছিলেন। অর্জুনকাকার বাড়ির সামনের মাঠে তাঁর প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছিল। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশি হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হয়ে চুপ করে রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জনে মুখ-ভঙ্গী করে নিজেই নিজেকে ভেংচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এর পর বছর দুই অর্জুনকাকার কোন খবর পাইনি। মাইনার পাশ করে আমরা শহরের হাইস্কুলে গিয়ে ভরতি হলাম। অর্জুনকাকা কটকে কম্পাউণ্ডারি পড়ছেন এইটুকু শুধু জানতাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম অর্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর দুই পরে অর্জুনকাকা হঠাৎ এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভরতি করে দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন আমরা যেন একটু দেখা-শোনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, "বলছি বটে, কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসি—"

মুখ ভ্রুকুটি-কুটিল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। পরের ট্রেনেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিংয়ে থাকতাম। অর্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া করে রইল। সঙ্গে এল এক পিসি। তিনিই হলেন গার্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ দই মাছ ঘি আম কাঁঠাল সরবরাহ হতে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনোহারী দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জুনকাকার জামাইদের নিত্য-নূতন সাজ-সজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনকাকা যা বলেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই হল। অর্থাৎ জামাইদের কিচ্ছু হল না। জামাইরা প্রমোশন পেলে না। একদিন হঠাৎ আবার শুনলাম অর্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এস গো-বেড়েন করেছেন প্রত্যেকটি জামাইকে! বেচারাদের আর্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে না কি! দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় ভাঙা আয়না, চিরুণী, স্নো, পাউডার, সিগারেটের বাক্স, কয়েকটা শোখীন জামা, শাল প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানালা ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি অর্জুনকাকা! পিছনে দুহাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিব চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপি চুপি সরে পড়লাম। অর্জুনকাকা সেই দিনই চলে গেলেন। তার পরদিন জামাইরাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইয়ের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জুনকাকার, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিয়েছিলেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলেজে ভরতি হলাম। তারপর আই. এস. সি. পাশ করে গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকার খবর অনেক দিন পাইনি। এইটুকু

শুধু শুনেছিলাম যে তিনি কম্পাউণ্ডারি পাশ করে ডিস্ট্রীক্‌ট বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি করে বেড়াচ্ছেন। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম অর্জুনকাকা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার জন্যেই বিশেষ করে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজি বিষয়ে জ্ঞান-আহরণ করতে চান!

"তুমি তো পড়ছ এ সব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।"

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার সাধ্য আমার ছিল না। একবার শুধু ইতস্তত করে বললাম, "এখন আর কি করবেন এসব পড়ে!"

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা।

"কি করব! বাঃ।"

একটু থেমে তারপর বললেন, "শিখব। শিখতে দোষ কি আছে! তা ছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর! প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভাল করে শিখিয়ে দাও তুমি!"

যতদিন বাড়িতে ছিলাম অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হতো। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হতো আমার! ওই বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারোটায় শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা নাছোড়। রোজ ডাকাডাকি করে ঠিক তুলতেন আমাকে। কেবল দুপুরটা ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময়ে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিয়ে দিতেন ভিতর থেকে। আমি মনে করতাম ঘুমোন বোধহয়। একদিন জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি পিছনে দু-হাত রেখে পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিব চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ দুঃখ ঘৃণা ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে। হাতে ছোট আয়না খানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরছেন মুখের সামনে আর ভ্যাংচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কোলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় বড় স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখানা, "অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজ-বোধ্য ইংরাজি ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পার অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দিও।" যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার 'মেসে' এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন—"এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভাল স্কুলে ভরতি করব বলে এনেছি। ওখানে কিছু হবে না। তুমি একটা ভাল স্কুল বেছে দাও। শুনেছি মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয়?"

"কি হবে অত কড়া শাসনে রেখে?"

'তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিছু হবে না।"

তারপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন, "হে হে এসব দৈত্য নহে তেমন—"

চকিতের মধ্যে মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল জিবটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি নাম তোমার ?"

"চিতুয়া"।

অর্জুনকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

"চিত্তরঞ্জন বলতে পার না ?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—"এমন অসভ্য এরা, ভাল একটা নাম রাখলাম চিত্তরঞ্জন, সে নামকে করে ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে চিতুয়া, চিতুয়া। চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়া বাহিরই হয় না, কি করবে বেচারারা—" অর্জুনকাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইন্স্টিট্যুশনে ভরতি করে দিলাম।

মর্টনের উপরই অর্জুনকাকার ঝোঁক বেশী ছিল, কিন্তু আমি মানা করাতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—"টাকার কোন অভাব হবে না, এর বাবা না দেয় আমি টাকা দিব, কিন্তু পড়াশোনার ভাল ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে সেইটি দেখিও—"

আমি যতদিন কোলকাতায় ছিলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না ! একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লোহকণা আকর্ষণ করে চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার চারিদিকে। ক্লাশ প্রমোশন অবশ্য পেলে কিন্তু তা নিজের জোরে নয়, আমার তদ্বিরে।

…এরপর অর্জুনকাকার যে স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভাল ডাক্তার হতে হলে এখানকার ডিগ্রিই যে পর্যাপ্ত নয় এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রি লাগাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেতে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না-ও' বলতে পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না। এই সব নিয়ে বাড়িতে আলাপ-আলোচনা চলছে, হঠাৎ অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারি নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, "বিয়ে করে বিলেত যাও না, ভালই তো। শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন ?"

"ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।"

"বাঃ"

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, "বিলেত যেতে কত টাকা লাগে ?"

"পাঁচ-ছ হাজার।"

"মোটে ? আমি দিব তোমাকে টাকা।"

"আপনি ?"

"হাঁ—ছহাজার টাকা পোস্টাপিসে আছে আমার। কালই বাহির করে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না।"

চুপ করে রইলাম।

"কাল তাহলে টাকাটা বাহির করি ?"

"না, থাক !"

"কেন, আপত্তি করছ কেন ?"

"থাক না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয়নি এখনও।"

"হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তাছাড়া ওদের টাকার অভাব কি। ওদের আমি দিব না কিছু। তুমিই নাও, ভাল কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার। কি বল, বাহির করি ?" অর্জুনকাকার চোখে আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

"না, থাক।"

"কেন, আমাকে পর ভাবছ ?"

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তর দিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কোর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও সরে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরেই একটা জাহাজের চাকরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই। অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। দেখা হল বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ একরাত্রে এসে হাজির। কিন্তু, সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নীচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়ো বাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজের হাতে উনুনে আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলাতি ডিগ্রি সত্ত্বেও চাকরি পাইনি, প্র্যাকটিসও জমাতে পারিনি। কোটিপতি হবার আশায় কোলকাতা শহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয়নি। এখন এই মফঃস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় একজায়গায় যেতে হবে, তার আগে হাতে কোন কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় বসে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড়, গামছা।

"অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন ! চাকরটাকে বললেই সে বাথরুম দেখিয়ে দিত—"

"কষ্টটা আর কি। এতেই অভ্যস্ত আমি।"

ভিজে কাপড় গামছা জানালার গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতেই

জ্বলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়। “বারান্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো ?”

“না। উনুন দিয়ে কি করবেন ?”

“দেখ না”—বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তাতে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপর বসে গা হাত পা সেকতে লাগলেন।

“তুমিও সরে এসে বস না। সোয়েটারই পরো আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।”

অর্জুনকাকা হাত গরম করে করে দুই গালে দিতে লাগলেন। দু-পা ফাঁক করে উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু-একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুনকাকার সঙ্গে যে আমার কি সম্পর্ক তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝলাম সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুনকাকা সবিস্ময়ে বললেন—“এ সব কি !”

“একটু চা খান।”

“আমার কথা সব ভুলে গিয়েছ দেখছি।”

“চা তো আপনি খেতেন।”

“চা তো খাবই, ওই তো জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বল—আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমারটাই খাব আজ। শৌখিন পেয়ালায় এক আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার—”

“বেশ ত, বেশী করেই খান না।”

“আমি নিজের হাতে করব—নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।”

“খাবার-টাবারগুলো ?”

“আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জান। আগে দই চিড়া খেতাম, এখন তা-ও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তা-ও নিরামিষ।”

“এত খাবার কি হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—”

“বেশ, আমিই তোমাদের দিচ্ছি। তুমি খাও, তোমার ছেলে-মেয়েদের ডাক। ছেলে পিলে কটি তোমার ?”

“একটিও হয়নি এখনও।”

“কেন ?”

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্ম-নিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, “তুমি এসব নিয়ে যাও। মাকে বলো কিছু চা চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে, তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি।”

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন—“এ চা ভাল নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে।”

একটু লজ্জিত হলাম। সত্যি কথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায় নি—অর্থাভাবে সস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতেই পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো।

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ বড় একটি গ্লাশ বার করলেন। একটি পিতলের ছাকনিও। চা তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাশ নিলেন। চা খেতে খেতে নিজের কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনাও হয়নি তাঁর। নাতিও মনের মতো হয়নি। স্ত্রী মারা গেছেন। প্র্যাকটিস করতেও আর ভাল লাগে না। দুনিয়ার কারও সঙ্গেই বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।

"তোমার প্র্যাকটিস হচ্ছে কেমন ?"

"চলে যাচ্ছে।

"হবে, তোমার ঠিক হবে। আম গাছে আমই ফলবে।"

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

"আচ্ছা, তুমি বস। আমি বাজারটা ঘুরে আসি।"

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও রোগী দেখতে বেরুলাম।

...যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটা। ফিরে দেখি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় অর্জুনকাকা বসে আছেন।

"খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা।"

"কি ?"

"দেখবে ? চল না, কাছেই।"

"বলুন না কি ?"

"না দেখলে সে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটের পথ, চল না"—

যেতেই হল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহার দোকানে।

"ওই দেখ !"

"কি ?"

বিস্ময়কর কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

"লোহার চাদরটা দেখছ না ! হাত দিয়ে দেখ কত মোটা"—

কোট প্যাণ্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হল, তবু অর্জুনকাকার আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

"ভাল নয় ?"

"হ্যাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে।"

"পুরুই দরকার।"

"কি করবেন এ নিয়ে ?"

"উনুন। চমৎকার উনুন হবে এতে। তোমার জন্যও একটা করতে দি, কি বল ?"

"দিন।"

উনুনের দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুনকাকাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারলাম না। অর্জুনকাকা সোৎসাহে আরও খানিকটা লোহার চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারের ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন—"আর একটা উনুনও করতে হবে। বেশ ভাল মজবুত করে কোরো বুঝলে ?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাজারে যে সব তৈরি তোলা উনুন পাওয়া যায় সে সব বড় অমজবুত। এ দেখো কি রকম হবে—"

ফিরবার পথে বললেন, "এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি।"

তার পরদিন শুধু কাঁঠাল কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটি, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হল। অর্জুনকাকা সোৎসাহে সিন্দুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, "সিন্দুকটা এমন ভাবে করাব যাতে আমার সব কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানা-পত্তর, খাওয়া-দাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু-একখানা, বই-টই—পাঁচটা পুটুলি করে আর কি হবে। আমার কটা জিনিসই বা আছে! একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি…কি বল?"

"বেশ তো"।

উঠে পড়ে লাগলেন তিনি। সকালথেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধস্তা-ধস্তি চলত।

"ভাল করে র‍্যাঁদা দাও না, ওর নাম কি র‍্যাঁদা দেওয়া! বার্নিশ হবে। ওকি করছ তুমি?"

"একটু ভাল করে খেটে-খুটে কর বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিসও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না—"

"হাঁ, ঠিক করে মেপে নাও—থাম থাম, আমি ধরছি—"

"আরে বাবা কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ চারটে—"

"হাঁ হাঁ হাঁ প্যাঁচ কোষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—"

এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুনকাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন। জলের মতো পয়সাও খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিলটন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতর অস্তর দিলেন। যত খরচই হোক জিনিসটা মনোমত করতে হবে। জীবনে কোন জিনিসই মনোমত হয়নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন এই সান্ত্বনাটুকু আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করছেন তাই।

সিন্দুকটা হলও চমৎকার। যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।

অর্জুনকাকা বললেন—"এর উপর উঠে লাফাও তুমি"—

"কেন?"

"দেখ, কত মজবুত।"

"মজবুত হয়েছে বই কি।"

"আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি"—

অনিচ্ছা সহকারেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

"পা ঠুক।"

পা ঠুকলাম দু-একবার। "খুব মজবুত হয়েছে।"

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উনুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটা দুই তালা কিনলেন ভাল দেখে।

…ক্রমশ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারল না। দুজন লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দুজনে প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গাড়িতে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। সিন্দুকটা এত বেশী বড় হয়েছিল যে ট্রেনের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকল না। স্যুটকেস নিয়ে কত লোক উঠল নাবল কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুনকাকা উঠতে পারলেন না। ট্রেন ছেড়ে গেল।

…অর্জুনকাকার দিকে চেয়ে দেখলাম—তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল, ঘনঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।

অদৃশ্যলোকে

॥ এক ॥

একমুখ গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোক—মাথায় বাবরি চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—চোখ দুটোতে অস্বাভাবিক রকম প্রখর দীপ্তি। হঠাৎ দেখলে কাপালিক ব'লে সন্দেহ হয়। সাইকেল চ'ড়ে রোজ আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যায়—মাড়োয়ারীর তেলকলের কেরাণী।

॥ দুই ॥

শ্মশানে একদিন দেখেছি তাকে। মড়া পোড়াতে গিয়েছিলাম, দেখি লোকটি দূরে দূরে অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। আমাদের দেখে স'রে গেল।

॥ তিন ॥

নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। 'লু' বইছে। পাশের যোগেনবাবুর বাড়ীর বাইরের ঘর থেকে নারী-কণ্ঠের চাপা কান্না কানে এল। গিয়ে দেখি যোগেনবাবুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এক মলিনবসনা বধূ। রূপ নেই—স্বাস্থ্য নেই—অশ্রু ছাড়া আর কিছু নেই!

যোগেনবাবু দয়ালু লোক।

মেয়েটিকে পাঁচটি টাকা দিয়ে বললেন—আচ্ছা, শিবুকে আমি ধমকে দেব। রাতদুপুরে শ্মশানে যায় কেন!

শুনলাম শিবু সেই লোকটির নাম—সেই তেল-কলের কেরাণী।

॥ চার ॥

তন্ত্রের একটা বই হাতে এল।

পড়ে দেখলাম সাধনা করলে নাকি অদৃশ্যলোক থেকে ভামরী ঝামরী ডামরী নানা দেব দেবী ডাকিনী যোগিনী দেখা দেন অদৃশ্যলোকের অপরূপ ঐশ্বর্য নিয়ে। সিদ্ধ হয় সাধনার অনুরূপ। যে, যে কামনা নিয়ে সাধনা করে, সে, সেই সেই রূপে নাকি পায়। প্রিয়া-রূপেও নাকি পাওয়া যায়—যদি সাধনার জোর থাকে।

॥ পাঁচ ॥

যদি জেরা করেন সদুত্তর দিতে পারব না।

মনে কিন্তু গল্প জাগে।

দিনের আলোয় দৃশ্যমান জগতে শিবু তেলকলের সামান্য কেরাণী, কুৎসিৎ হাড়পাঁজরা-বার-করা স্ত্রীর স্বামী, একপাল রুগ্ন ছেলেমেয়ের পিতা ; অধিকাংশ লোকেই গ্রাহ্য করে না তাকে, গাল দেয় অনেকে। দিনের আলোয় সে নগণ্য। শ্মশান-সাধনায় কিন্তু সে উত্তীর্ণ হয়েছে। রাতের অন্ধকারে তার কাছে অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসে পদ্মিনী, গলায় পরিয়ে দেয় বরমাল্য।

রাত দুপুরে

রাত দুপুরে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ।

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নালোকিত নীল আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, শুভ্র একখণ্ড লঘু মেঘ ছায়াপথের পাশ দিয়ে অলস মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে রেবতী নক্ষত্রের দিকে। ঝাউবনের মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সহসা মনে হল—সে আসেনি। আসতে পারত কিন্তু আসেনি।

উঠে বসলাম বিছানায়। দূর চক্রবালরেখালগ্ন পর্বতশ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠেছে স্বপ্নপুরীর মোহ-মহিমায়—অব্যক্তের ইঙ্গিত যেন উঁকি দিচ্ছে দৃষ্টি সীমানার ওপার থেকে।

ধীরে ধীরে বাতায়নের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ কি !

দিনের বেলা যে তালগাছ দুটোকে প্রান্তরের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি—তারা কাছাকাছি সরে এসেছে—একজন আর একজনের কানে কি যেন বলছে চুপিচুপি।

সহসা তারা যেন টের পেয়ে গেল আমি দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল তারা প্রান্তরের দুই প্রান্তে, দুষ্টু ছেলের মতো। ডেকে উঠল একটা নাম না-জানা পাখী—যেন হেসে উঠ্‌ল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ ক'রে।

অবর্তমান

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য করেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে,

ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধু ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউ গাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গংগা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু হু করে তীক্ষ্ম হাওয়া বইছে একটা। কহল-গাঁয়ের খেয়াঘাটে গংগা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চলে এসেছি তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধ'রে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সংগীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গংগায় পাখী পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখী মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখী! ধু ধু করছে বালির চড়া আর কোথাও কিছু নেই। গংগার বুকে দু একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখী কোথায়! বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয় চখার শব্দটা ঠিক সে রকম নয় তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে কোথাও কাছেপিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম দম্পতীর একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে। আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে হলে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল! আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম কিন্তু উল্টো দিকে। পাখীটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছু দূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইল খানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ ক'রে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—

কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ

পরে বসল যদি কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখীটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জাগগায় বসল যার কাছে-পিঠে কোন আড়াল আবডাল নেই—চতুর্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে ঝাপে যা দুএকটা ছোট পাখী ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু ক'রে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

—আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল না, বালির স্তর দিয়ে কোন রকম স্পন্দনই গিয়ে পেঁছিল তার কাছে তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখীটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিইনি—ও-ও আমাকে দেয়নি। এখন দুজনে দুপারে। চুপ ক'রে বসে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল সূর্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল, আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ী ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্য গগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার ক'রে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়েনি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়েনি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনও সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনে তিনটি সখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত,

শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে! হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্ত-প্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, হিমশীতল মেরু-প্রদেশের ভাসমান তুষার পর্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম তাহলে আর কি হল! সংগীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সংগীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে!

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়েছিল, কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদনা মূর্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতী বাঘ গণ্ডার কিছুই মারিনি। মেরেছি পাখী আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীরা সাধারণতঃ রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার ক'রে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখীটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

—যাক্। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাইনি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ ক'রে বসে ছিলাম।

চতুর্দিকে ধু ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোন কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজু দেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাইনি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে?"

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেন নি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।"

পরিচয় দিলাম।

"ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম।

খানিকক্ষণ—তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের দুপাশে দেখি দুজন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে—দু'জনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে বসে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোন উত্তরই দিলে না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত ক'রে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি—বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদার বাড়ী জম্‌জম্‌ করছে ; প্রকাণ্ড কাছারি বাড়ীতে ব'সে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুণছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে—সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে ক'রে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হ'ল না কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছে রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু—হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছুদূরে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে—বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা, আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চক্‌মক্‌ করছে। বাগানে ছোট্ট একটি গেট, গেটের দুধারে উর্দি-চাপরাশ-পরা দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন ক'রে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দুজন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলে না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

"তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম—হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

"তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারি কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধ'রে যে সে আলাপ চলেছে তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁস হ'ল তখন দেখি, এক ছড়া মুক্তোর মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন?" কুটিরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন এক ছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখিনি কখনও।"

"তারপর?"

"আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ ক'রে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাজবাড়ী, কাছারি, চৌতারা, লোকজন—কোথাও কিছু নেই—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।"

"একা? কি রকম?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ীর পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বখ্‌শিষ দিয়ে গেলেন।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গান শুনবেন ?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়।"

"অসুবিধে আবার কি। সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনবাস করছি।"

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার ক'রে বললেন—"বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।"

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনিনি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারিনি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা-ও জানি না, ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি আমি সেই ধুধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চ'রে বেড়াচ্ছে, মরেনি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে ছিলাম। শিকার উপলক্ষেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর ?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে।"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিকে দেখিলাম—কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক। চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোন লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায় না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

শেষ-কিস্তি

॥ এক ॥

সেই সবে ডাক্তারি পাশ করেছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং নিজের নৈপুণ্যে তখন অগাধ বিশ্বাস। রোগী একটা পেলেই হয়। সাজ সজ্জা ক'রে রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। বুড়ো দীনু ডাক্তারেরই যত 'কল'—অথচ লোকটা যতদূর সেকেলে হতে হয়—অতি-আধুনিক আবিষ্কারের ধার ধারেন না কোন। নাড়ী টিপে, জিব দেখে, পেট টিপে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর পদ্ধতিতেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ

আমরা—যাক্, সে কথা। ওই দীনু ডাক্তারই আমাকে ডাকলেন একদিন তাঁর একটা ‘কেসে’। সে ‘কেসে’ দুজন নামজাদা ডাক্তার এসেছিলেন। আমাকে ডাকা হয়েছিল রাত জাগবার জন্যে। রোগীর কাছে সর্বদা একজন কৃতবিদ্য ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন সবাই। রাত্রির ভারটা আমার উপর দিয়েছিলেন দীনুবাবু। সম্ভবত আমার দাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল ব'লে।

গিয়ে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড। আশপাশের যত নামকরা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। কোলকাতা থেকে শুধু দু'জন ডাক্তারই নয়, নার্সও এসেছেন। আমিও গিয়ে হাজির হলাম। অথচ ছেলেটির হয়েছে ম্যালেরিয়া—ম্যালিগ্‌নাণ্ট টাইপের অবশ্য—কিন্তু তবু ম্যালেরিয়ার জন্যে এত ধুমধাম কেন বুঝলাম না। গ্রেন কয়েক কুইনিন দিলেই তো চুকে যেত।

সাড়ম্বর অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে মোটা মোটা ফি নিয়ে বড় বড় ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। ঠিক হল একজন নার্স শয্যাপার্শ্বে মোতায়েন থাকবেন, আমি থাকব পাশের ঘরে, দরকার বুঝলে আমাকে ডাকা হবে, তাছাড়া দুঘণ্টা অন্তর নাড়ীও পরীক্ষা করতে হবে ঘড়ি ধ'রে—শ্বাস-প্রশ্বাসও গুনতে হবে। যাবার আগে দীনু ডাক্তার বলে গেলেন—“তুমি এখানে আসবার আগে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার।”

“আচ্ছা।”

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে নানারকম ইন্‌জেক্‌শনের সরঞ্জাম ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। দীনু ডাক্তার বাইরের ঘরে একা বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

“এস, ব'স। একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। পাল্‌স রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর যেন কিছু করতে যেও না তুমি। কোন ইন্‌জেক্‌শন ফিন্‌জেক্‌শন দিও না যেন—”

“পাল্‌স্‌টা যদি খারাপ হয়, একটা ষ্ট্রিক্‌নিন্ বা ক্যামফার ইন্‌ ইথার দিলে ক্ষতি কি—”

“কিছু ক'রো না—বদনাম হয়ে যাবে।”

মিনিট খানেক গড়গড়া টেনে বললেন—“ও ছেলে বাঁচবে না।”

“ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন পড়ে গেছে, না বাঁচবার কোন কারণ দেখছি না তো।”

“কিছুতেই বাঁচবে না। এর আগে ছ'টা মরেছে! ওর ছেলে বাঁচে না।”

“ছ'টা মরেছে!”

“হ্যাঁ। এক একটা ছেলে জন্মায়, সাত আট বছর বেঁচে থাকে, তারপর একটা কিছু হয় আর পট্‌ ক'রে মরে যায়। কোনবারই চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। মরে যাবার বছর খানেক পরেই আবার একটা ছেলে জন্মায়—বছর কয়েক বাঁচে—তারপর অসুখ হয় আর মরে যায়। আমার হাতেই ছ'জন গেছে—এটাও যাবে। খরচ করাতে আসে খালি।”

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন।

আমার মনে হল বুড়োর বোধহয় ভীমরতি হয়েছে। ছ'জন মরেছে বলে সপ্তমকেও যে মরতে হবে—একি একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি হ'ল! আর কিছু যদি নাই করতে হয়, তাহ'লে শুধু শুধু আমাকে একশ' টাকা দেবার মানে কি? আমার মনে যাই হোক বাইরে চুপ করে রইলাম। বুড়োর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি।

॥ দুই ॥

গভীর রাত্রে নার্স এসে ডাকলে।

গিয়ে দেখি খোকার বাবা—এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন—বিছানার একধারে চুপ ক'রে বসে আছেন। তাঁর দিকে কটমট্ ক'রে চেয়ে 'খোকা বলে চলেছে—"ডাক্তারের একশ' টাকা আর নার্সের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও না, আমি চলে যাই! কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও শিগ্‌গির, আমি আর থাকতে পারছি না—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—"

বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দু'জনে মিলে চেপে ধরতে হ'ল তাকে।

"শিগ্‌গির দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও।"

যেন আট বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর নয়—একজন প্রবীন বুড়ো যেন খন খন ক'রে কথা বলছে! এ অবস্থায় হায়োসিন হাইড্রোবোম্ দেওয়া উচিত না মরফিন্ দেওয়া উচিত ভাবছি—এমন-সময় জগৎবাবু এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন—"নবীনবাবু দয়া করুন আমাকে—আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি—আপনি যাবেন না, থাকুন, দয়া করুন আমাকে।"

"না, জোচ্চরের বাড়ি আমি থাকি না।"

"ওরে খোকা, বাবা আমার।"

"আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন জগৎবাবু।"

খোকা আবার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল।

"শিগ্‌গির ফিস দিয়ে দাও এঁদের।"

"দিচ্ছি দিচ্ছি।"

আলু থালু বেশে উঠে পড়লেন জগৎবাবু। তাড়াতাড়ি 'সেফ' খুলে টাকা বার ক'রে আমাকে আর নার্সকে দিলেন।

খোকা যেন তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল।

সে চোখ আর খুলল না।

মালাবদল

গভীর রাত্রি। আকাশে জ্যোৎস্নার পাথার। একরাশি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে একধারে। একরাশি শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা যেন।

দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একা। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। ঠিক প্রথম নয়, তবু প্রথম। বাসর ঘরের ভীড়, ফুলশয্যার অস্বাভাবিকতা, সমাজের কলরব সমস্ত চুকে গেছে। আজই প্রথম প্রকৃত মিলন-রাত্রি।

...নিরালা জ্যোৎস্না-যামিনী নিবিড় হয়ে আসছে।

চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল।

ধাপে ধাপে সুর চড়িয়ে ডেকে উঠল পাখীটা। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে বেলফুল পড়ে গেল একটা। ফুলটা হাসছে...।

আকাশের ছোট ছোট মেঘগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকার রাশি নেই, এক জোড়া রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পাশাপাশি। স্বপ্নলোক যেন।

স্বপ্নলোকই তো। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে অমন রূপবান গুণবান স্বামী তাকেই পছন্দ করেছেন। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব ছিল না। কত রূপসী কত বিদুষী, কত ধনীর দুলালী এসেছিল ভীড় ক'রে। কিন্তু তার সুরের কাছে পরাভব মানতে হয়েছিল সবাইকে।

…একটা সূক্ষ্ম গর্ব গোলাপী নেশার মতো সঞ্চারিত হ'তে লাগল তার মনে। হবে না? মনে পড়ল কি কৃচ্ছ্রসাধনই না সে করেছে। সেতার, এস্রাজ, বীণ্। দিবারাত্র গলা সাধা। তানপুরার সংগে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আলাপ। জীবনে তো আর কিছুই সে করেনি। গত ষোল বৎসর সুরের সাধনাই করেছে কেবল একাগ্র চিত্তে। সুরের ঝরনাতলায় দেখা হ'লো স্বামীর সংগে। স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ফুটে উঠতে লাগল মানস পটে ধীরে ধীরে। আজ রাত্রে বাগেশ্রী আলাপ ক'রে শোনাবে সে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে।

—ঝন্ করে শব্দ হ'ল একটা। সেতারের তারটা ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল বন্দনা। পাশের ঘরের দরজায় একটি তন্বী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ রূপসী।

"আমি চললুম।"

"কে আপনি?"

"তোমার গানের সুর। এতদিন আমাকে নিয়ে তন্ময় হয়েছিলে তাই তোমার কাছে ছিলাম। এখন তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি চললুম।"

বন্দনাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল যেন। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বন্দনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।''

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। হংসমিথুন নেই। স্বচ্ছ-বসনা একটি পরী উড়ে চলেছে যেন অজানার উদ্দেশ্যে। ওড়নাটা উড়ছে আকাশ জুড়ে…।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনের দিক থেকে চোখ দুটো টিপে ধরেছে কে। নিঃশব্দ-চরণে স্বামী কখন এসে প্রবেশ করেছেন সে টের পায়নি।

দুই ভিক্ষুক

॥ এক ॥

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি বসে থাকে। পোড়া পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হ'ল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমন কি, অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার একধারে ছেঁড়া কাপড়টি পেতে বসে থাকে শুধু। ভিক্ষাও চায় না। হাত পেতে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভীড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যেই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব

ভিখারীটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানাজনের নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবলপয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি এমন কি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানারকম। ভিখারি কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তাঘাট নির্জন হ'লে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি ক'রে বেঁধে লাঠি ঠুক ঠুক ক'রে গঙ্গার ঘাটে যায়—তারপর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায়নি। কাপড়টি বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে!

॥ দুই ॥

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর একটি ভিখারীর আবির্ভাব হ'ল সেই পথে। ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট প'ড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারীটি এসে প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় ক'রে ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না, চলে যাচ্ছিল, সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হ'য়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রং টক্‌টকে ফরসা হ'য়ে গেল...মাথার চুল সোনালি। চেহারাই বদলে গেছে একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠল—"আমায় ক্ষমা ক'রে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি। হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি।"

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল—"ক্ষমা কর আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় বসে আছি! অভিশপ্ত-জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী-জীবন যাপন কর গিয়ে, যদি কোনদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে তা হ'লেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ···।"

ন্যুব্জদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তা হ'লে।

"মিস্টার হেস্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধ'রে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি তা তোমাকে না জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই!"

"ক্ষমা করেছ?"

"নিশ্চয়!"

দেখতে দেখতে ন্যুব্জদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হল।

ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

প্রমাণ

ভদ্রলোক কোথা থেকে এসেছিলেন কেউ জানত না। বাইরের কোন ভড়ং ছিল না। জটা, গেরুয়া, প্রাণায়াম, বক্তৃতা কিছু না। তিনি যে আধ্যাত্মিক মার্গের পথিক তা কেউ

সন্দেহও হয়ত করত না যদি না তিনি শহর ছেড়ে গঙ্গার ধারের পোড়ো বাড়ীটাতে আশ্রয় নিতেন। প্রথম প্রথম লোকে অন্য রকমও ভেবেছিল। কেউ ভেবেছিল ফেরারি আসামী, কেউ ভেবেছিল গোয়েন্দা। উর্বর মস্তিষ্কের অভাব নেই। নানাবিধ কল্পনা করেছিল লোকে। কিন্তু অনেকদিন কেটে যাবার পরও চমকপ্রদ কিছু ঘটল না, তখন সবাই মানতে বাধ্য হল লোকটা ভালই সম্ভবত—সাধু-সন্ন্যাসী গোছ কিছু একটা হবে। কিন্তু লোকেদের এ ধারণাকেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। কেউ হাত দেখাতে এলে বলতেন—আমি কিছু জানি না। দৈব ঔষধ চাইতে এলে বলতেন—জানি না। ভগবান সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলতেন—জানি না। উদ্ধতভাবে বলতেন না। অত্যন্ত সসঙ্কোচে মৃদুকণ্ঠে বলতেন। কৌতূহলী জনতা বারবার তাঁর কাছে গিয়ে হতাশ হয়ে নিরস্ত হয়েছিল শেষটা।

নিরস্ত হননি কেবল হারাধনবাবু। তিনি ফাঁক পেলেই যেতেন। এই অনাড়ম্বর নির্জনতাপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট লোকটিকে বড় ভাল লাগত তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকতেন। তাঁর কেবলই মনে হ'ত লোকটির মধ্যে ঐশ্বর্য আছে কোন। কি ঐশ্বর্য আছে জানবার চেষ্টা করেন নি কোনদিন। কাছে গিয়ে বসলেই সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। কথাবার্তা অল্পই হ'ত। যা হ'ত তাও অতি সাধারণ। যুদ্ধের কথা, দুর্ভিক্ষের কথা—এই সব। ভগবদ্ প্রসঙ্গ একদিন উত্থাপন করেছিলেন হারাধনবাবু।

"আচ্ছা, ভগবানের সম্বন্ধে কি ধারণা আপনার ?"

"কি বলব—"

একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

"আপনি কখনও কিছু দেখেন নি ?"

"আমি ? আপনি যা দেখেছেন আমিও তাই দেখেছি। আকাশ-সমুদ্র-নদী-প্রান্তর-ফল-ফুল-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রময় বিরাট বিচিত্র চেতনা এর বেশী আর তো কিছু দেখি না।"

"এই তাহ'লে ভগবান ?"

"কি জানি !"

সসঙ্কোচে চুপ ক'রে রইলেন।

কিছুক্ষণ ব'সে থেকে হারাধনবাবু উঠে এলেন।

ফিরবার পথে নরেনবাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল। নরেনবাবু বিদ্বান লোক।

"কোথা গেছলেন হারাধনবাবু ?"

"গঙ্গার ধারে সেই সাধুটির কাছে।"

"কে সাধু ? সেই পোড়ো বাড়ীতে থাকে যে লোকটা ?"

"হ্যাঁ।"

"সে সাধু কে বললে আপনাকে ! আস্ত ইডিয়ট একটা। পাছে বিদ্যে ফাঁস হয়ে যায় ব'লে পারতপক্ষে কথা বলে না। বোগাস্ !"

হারাধনবাবু মৃদু হাসলেন একটু। নরেনবাবুর সঙ্গে তর্ক করবার সামর্থ্য নেই তাঁর।

নরেনবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তাঁর সাধুত্বের প্রমাণ পেয়েছেন কোন ?"

"না।"

"তবে ?"

হারাধনবাবু চুপ করেই রইলেন।

এই ভাবেই কাটছিল। হারাধনবাবু তবু সময় পেলেই যেতেন তাঁর কাছে। আর সকলের কৌতূহল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, হারাধনবাবুরই হয়নি।

কিন্তু কিছুদিন পরে হারাধনবাবুও যাওয়া বন্ধ করলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁর একমাত্র ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল ব'লে। তারই চিকিৎসা ব্যাপারে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসর পাননি তিনি। ছেলের অসুখ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেন নি তিনি। সাধ্যের অতীত হলেও শহরের সমস্ত নামজাদা চিকিৎসকদের একত্রিত ক'রে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলছিলেন। অসুখ কিন্তু বেড়েই চলল। দিন কাটে ত রাত কাটে না। একদিন বিকেলে ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেলেন। আশা নেই, রাত কাটবে কিনা সন্দেহ। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হারাধন পুত্রের মৃত্যুশয্যার শিয়রে ব'সে চতুর্দিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। হঠাৎ সেই সাধুটির কথা মনে পড়ল। আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

···রাত তখন অনেক হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ মেঘের স্তর ভেদ ক'রে সবে উঠেছে। গঙ্গার জল কূলে কূলে ভরা। হাওয়া উঠেছে একটা। কল-কল ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখরিত। হন্তদন্ত হারাধন পোড়ো বাড়ীটাতে এসে হাজির হলেন। দেখলেন সাধুটি জেগেই আছেন। গঙ্গার ধারটিতে চুপ ক'রে বসে আছেন তন্ময় হয়ে।

‘আমার ছেলেকে বাঁচান আপনি।”

তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন হারাধনবাবু।

“কে, হারাধনবাবু! ও কি—উঠুন—উঠুন—কি হয়েছে কি—?”

সব শুনলেন। শুনে বললেন—“আমি কি করব বলুন—আমার কি ক্ষমতা আছে—”

হারাধনবাবু অবুঝের মতো কাঁদতে লাগলেন।

“দয়া করুন, দয়া করুন, আমার একমাত্র ছেলে।”

সাধু চুপ ক'রে রইলেন।

“বাঁচাবার কোন উপায় নেই? কোন আশাই নেই?”

“তার আয়ু যদি নিঃশেষ হয়ে থাকে—” এই পর্যন্ত ব'লে আবার নীরব হলেন তিনি।

হারাধনবাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

“আমার একমাত্র ছেলে। কিছু একটা করুন আপনি। ইচ্ছে করলেই আপনি পারেন। সত্যি কোন উপায় নেই—নিশ্চয় আছে কিছু—দয়া করুন আপনি।”

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সাধু বললেন—“শুনেছি অপর কেউ যদি নিজের আয়ু দান করে তাহ'লে নাকি আয়ুহীন লোক বাঁচতে পারে কিছুদিন। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব?”

“আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন—দয়া করুন।”

সাধুর পায়ে ধরে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন হারাধনবাবু।

বিব্রত সাধু নিজের পা সরিয়ে নিয়ে অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, “ভগবানকে ডাকুন, তিনি যদি দয়া করেন সব হ'তে পারে। তিনিই একমাত্র ভরসা, তাঁকেই ডাকুন। আমরা কে—”

অনেক ক'রে বুঝিয়ে হারাধনবাবুকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

হারাধনবাবু বাড়ী ফিরে দেখলেন ছেলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দেখে বিস্মিত হলেন—নাড়ির অবস্থা ফিরেছে, আর ভয় নেই। ক্রমশঃ ভালর দিকে যেতে লাগল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মেঘ যখন কাটতে সুরু করে তখন যেমন দেখতে দেখতে সব পরিষ্কার হয়ে যায় হারাধনবাবুর ছেলের অবস্থা তেমনি দেখতে দেখতে ভাল হয়ে উঠল। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তারেরা বললেন—"আর ভয় নেই, টালটা সামলে গেছে। এ যাত্রা বেঁচে যাবে বলেই মনে হচ্ছে --।"

উল্লসিত হারাধনবাবু সাধুটিকে খবর দিতে ছুটলেন। সেখানে পৌঁছে কাউকে দেখতে পেলেন না। ডাকলেন—সাড়া পেলেন না। ভিতরে ঢুকে দেখলেন আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আবার ডাকলেন, উত্তর পেলেন না। ঠেললেন—তবু সাড়া নেই। গায়ের চাদরটা সরিয়ে চমকে উঠলেন। প্রাণহীন মৃত-দেহটা পড়ে আছে শুধু—মুখে অদ্ভুত একটা প্রশান্ত হাসি।

অধরা

অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল। তার অঙ্গ-সৌরভ, বলয়-নিক্কণ, নিশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। মুখে কথা ছিল না। আমারও না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দু'জনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল আমার কল্পনায়। তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—"আমাকে তুমি তো কখনও দেখনি, তবু চাইছ কেন এত ক'রে ?"

তখন আমি অসংকোচে উত্তর দিলাম—"তোমাকে আমি জানি।"

" কি ক'রে জানলে ?"

"কি ক'রে তা জানি না, কিন্তু জানি।"

নিবিড়তর হয়ে উঠল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ…কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।…সহসা তার আর একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হল আমার মনে।

"এত ক'রে চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন ?"

"ধরা দিলে কই ?"

মদিরতর হয়ে উঠল তার অঙ্গ সৌরভ।

মনে হল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চলে গেল অন্ধকারকে। চতুর্দিক বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

"সর্বদা ধরে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিইনি !"

"আমি যেখানে চাই সেখানে দাওনি।"

"কোথায় চাও ?"

"ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে।"

দ্রুততর হয়ে উঠল তার নিশ্বাস। স্পন্দিত হয়ে উঠল অন্ধকার…মনে হল খুব কাছে স'রে এসেছে…তার চোখের জল গালে পড়ল আমার…এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল… বরফের মতো ঠাণ্ডা…

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি…সে-ও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে। সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন…তার ভিজে শাড়ীর স্পর্শ পেলাম মনে হল।…পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জন পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হলাম নীরবে।—তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলাম। সে-ও উঠল। ঘরে ঢুকলাম, সে-ও ঢুকল। সুইচ্ টিপলাম তাড়াতাড়ি—তীব্র আলোয় ভরে উঠল চতুর্দিক। দেখি, কেউ নেই।

প্রজাপতি

নীল শেড দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে বসে লেখা-পড়া করি ও শেড্টির উপরে চুপ ক'রে বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ও-ই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী হয়েছে।

বন্ধু সোমেশ্বর এসে প্রবেশ করলেন। ইদানীং প্রায় আসছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওর বোন বেলার সম্বন্ধে আজকাল যে একটু দুর্বলতা পোষণ করছি সেটা ও টের পেয়ে গেছে। বেকায়দায় পড়ে গেছি। সোমেশ্বর এসেই কাজের কথা পাড়লে একেবারে।

“বেলার সম্বন্ধে কি ঠিক করলে ?”

চুপ ক'রে রইলাম।

“যা হোক একটা ঠিক ক'রে ফেল ভাই”—তারপর একটু থেমে বললে—“শেষ পর্যন্ত বিয়ে তো করবেই, সবাই করে, বেলাকে যদি কর ; আমি নিশ্চিন্ত হই। বেলা তোমাকে ভালও বাসে।”

সবই ঠিক—তবু চুপ ক'রে রইলাম। আশা যখন বেঁচেছিল তখন তাকে বলেছিলাম যে আর কখনও বিয়ে করব না—এখন বুঝতে পারছি বিয়ে করতে হবে—বেলাকেই করতে হবে—কিন্তু দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

“চুপ করে আছ কেন ? তোমার সত্যি যদি মত না থাকে আমি জোর করতে চাই না। খুলে বলো সেটা। তাহলে দ্বিজেনের সঙ্গে চেষ্টা করি। তুমি রাজী হলে অবশ্য আর কোথাও যাব না আমি। দ্বিজেনের ভাব ভঙ্গী থেকে মনে হয় সে আপত্তি করবে না, তবে…”

ওই খোঁচা-গোঁফ-ওলা দ্বিজেন বেলাকে বিয়ে করবে!

ওর সে মতলব আছে না কি ?

বললাম—“দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমিই বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই।”

"তুমি কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।"

চুপ ক'রে রইলাম।

"কথা দিচ্ছ তো?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ। বেলাকে সুখবরটা দিয়ে আসি তাহ'লে।"

সোমেশ্বর চলে গেল।

এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ আমার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল—"তাহ'লে আমার দায়িত্বও ফুরোল—আমিও চললাম।"

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

একই ব্যক্তি

বাক্স খুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।

শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী
প্রাণাধিকাসু,

দেখ তো, মিছিমিছি আমায় এত ভাবিয়েছিলে। কত রকম 'হয়তো' যে এসে আমায় চিন্তিত করে তুলেছিল তার আর ঠিক নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না? কত বড়? ক'হাত লম্বা ক'হাত চওড়া চিঠি চাও? শেলী, রবীন্দ্রনাথই তো তোমার প্রিয় কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটনি' ফরমাস ক'রে বসছ কেন, বুঝতে পারছি না। যাক্—চেষ্টা করব তবু।

রাগ করেছি কি না? তুমি এ অবস্থায় কি করতে! রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশী হয়েছিল কিন্তু। আমার গা ঘেঁষে আশঙ্কাও থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই তোমার চিঠি আশা করছি। দু'একদিন পোস্টাফিস পর্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাসি এখনও সারছে না কেন বলত? কাসি একেবারে না সারা পর্যন্ত গান গেয়ো না। সেরে গেলেই গাইতে হবে কিন্তু। তুমি লিখেছ. "ভগবান বোধহয় দয়া ক'রে বিয়ের সময়টুকু পর্যন্ত গানের গলাটা একেবারে নষ্ট ক'রে দেননি। ভগবানের অসীম দয়া। আজকাল ভাবছেন এখন আর গান দিয়ে কি দরকার……।"

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে বলো—প্রভু যা যা করবার তা'তো করেইছ, এখন দয়া ক'রে তোমার দয়াটুকু ফেরত নাও, আমি একটু গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কিছু 'সিন্নি' দেব! তোমার এই করুণাময় ভগবানটির সংগে আমার যে আলাপ নেই—থাকলে আমিই আমার সিমুর জন্যে অনুরোধ করতাম একটু। সেতার বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি? টাকার জন্যে ভাবছ কেন? তোমার টিউটারের মাইনে আমি যেমন ক'রে হোক পাঠাব। লিখেছ—পরে শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি যেটা পরে শিখব ব'লে ফেলে রেখেছি তা আর শেখা হয়নি। টাকার জন্যে ভেবো না তুমি, অত সংকোচেরও দরকার নেই, অবিলম্বে আরম্ভ কর সেতার।

…এখন রাত্রি অনেক। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে গেছে বোধহয়। বোধহয় বলছি তার কারণ আমার প্রৌঢ় ‘টাইম পীস’টি কেন জানি না হঠাৎ সাতটা এগারো মিনিটে থেমে গেছেন। কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। পথ-চল্‌তি পথিক যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, কিম্বা হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের গতি-রোধ করে দিয়েছে ওর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, এই ঘড়ি যখন দোকানদারের গ্লাস কেসে বন্ধ ছিল তখন হয়তো কোন একটি সুন্দর সোনার হাত ঘড়ি এর পাশে থাকত। দুজনের ভাবও হয়েছিল হয়তো। হয়তো ভেবেছিল কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে না। সুন্দর স্বচ্ছ কাচের ঘরটিতে পাশাপাশি দিনের পর দিন কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন খরিদ্দার এসে হাজির। গরীব খরিদ্দার আমি কিনে নিলাম ‘টাইম পীস্‌’টিকে। সোনার হাত-ঘড়ি গিয়ে অলঙ্কৃত করল কোন ধনীর মণি-বন্ধ। আজ চাঁদনি রাত, আমার ‘টাইম পীস্‌’ হয়তো তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে ৭টা ১১ মিনিটের ঘরে থেমে আছে—খেয়ালই নেই যে সময় বয়ে চলছে। থাক, একে আজ দম দিয়ে চালাব না। সোনার হাতঘড়িটিও কি এর কথা ভাবছে আজ?…অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার কিন্তু জ্যোৎস্নার চেয়ে ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল লাগে। “আজু মধু চাঁদনী প্রাণ উন্মাদিনী”—সত্যি কথা, কিন্তু এর চেয়েও—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া

এই অবস্থাটা আরও বেশি ভাল লাগে আমার। অনেক কবি চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার মুখের তুলনা করেছেন। আমার এতকাল প্রিয়া ছিল না, জিনিসটা পড়েই এসেছি, মন্দও লাগেনি। এখন কিন্তু সিমুর মুখের সঙ্গে চাঁদের কোন রকম সাদৃশ্য আছে ভাবলেও রাগ হয়। একটুও নেই, থাকতেই পারে না। প্রথমতঃ, চাঁদের আলো ধার-করা; সিমুর আলো সিমুরই। দ্বিতীয়তঃ, চাঁদ তার এই ধার-করা রূপ নিয়ে আকাশে সমস্ত রাত ‘ধরণা’ দিয়ে পড়ে আছে, খেয়ালী-হাওয়ায় ভেসে-আসা যে কোন চল্‌তি মেঘ তাকে জড়িয়ে ধ’রে যতক্ষণ খুশি থাকছে রূপালী নেশায় বিভোর হয়ে। চাঁদের এতটুকু লজ্জা-সরম নেই। এ যেন কোন পথচারিণী অভিসারিকা পাউডার পমেড মেখে রূপের বেসাতি করতে বেরিয়েছে। এর সঙ্গে কি আমার সিমুর লজ্জামাখা সুন্দর মুখখানির তুলনা সম্ভব? আমি চোখের সামনে মুখখানি দেখতে পাচ্ছি যে। লজ্জা হ’লে আবার চোখে হাত দেওয়া হয়। আমার চোখে-চোখে চেয়ে কতদিন কথা বলনি মনে আছে? এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছিল তোমার। শুভদৃষ্টি পর্যন্ত করনি—কম দুষ্টু নাকি তুমি। তোমার সঙ্গে চাঁদের তুলনা চলতেই পারে না। হ্যাঁ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটি কবি চাঁদের সম্বন্ধে বড় খাঁটি কথা বলেছেন। ভারতচন্দ্র। লোকটা সত্যিই প্রিয়াকে ভালবাসত।

“কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
পদ-নখে পড়ে’ তার আছে কতগুলা॥”

…আজ অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে।…কত কথা। এই গভীর রাত,

চারিদিকে জ্যোৎস্না, একা ঘর, বেচারি ঘড়িটি পর্যন্ত চুপ ক'রে চেয়ে আছে, তার মৌন ব্যথিত দৃষ্টিতে যেন আমার মনের কথাটি ফুটে রয়েছে।

ঠিক এই মুহূর্তে তুমি আমার মনের কত নিকটে আছ···অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে···অথচ দুজনের দেহের মধ্যে প্রায় ৪০০ মাইল ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বেও কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে পেয়েছি, এসেছ তুমি আমার কাছে। দেখতে পাচ্ছি তুমি শুয়ে ঘুমচ্ছ ···এলোমেলো কয়েকটা চুল কাঁপছে কপালের উপর·· কান দু'টি চুল দিয়ে ঢাকা··· চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছ···

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

এ'কি শুধু কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পূর্বে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, বিয়ে করে দেখলাম ঠিক সে-রকমটি নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ গোছের। সর্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশঃ কতদিন কাটল। ক্রমশঃ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন মনে হচ্ছে ওঁকে চিনতে পারিনি। অথচ একসঙ্গে কুড়ি বছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস করেছি। এক বিছানায় শুয়েছি। এঁরই সাতটি সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম। কিন্তু একথা আজ স্বীকার করছি, আমাদের মনের মিল হয়নি। উনি যে-জগতের লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। চিঠিতে ওঁর যে কান্ত-কোমল রূপ ফুটে উঠেছে, আসলে কিন্তু সেরকম লোক ছিলেন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন এবং নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও বিরক্ত হতেন। বকতেন, এমনকি মারধোরও করতেন। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি খেয়েছে, ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে। অসুস্থ হলে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে আশ্রয় নেয়, কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ওঁরও অবস্থা অনেকটা তেমনি ছিল। এক-আধ দিন নয়, সারাজীবনই উনি এমনিভাবে কাটিয়েছেন। অথচ শরীর ওঁর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে এমন করতেন জানি না। মোট কথা, আমি বুঝতে পারিনি ওঁকে। একটা জিনিস কিন্তু বলব খুব কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে কখনও কোন অকর্তব্য করেন নি। আমাদের আধিভৌতিক কোন অসুবিধা ঘটতে দেননি। যত দিন বেঁচে ছিলেন, আমাদের কোন কষ্ট ছিল না। মৃত্যুর পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের মানুষ ক'রে গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন, শহরে পাকা বাড়ি ক'রে গেছেন, লাইফ ইনসিওরেন্স ক'রে গেছেন। সেদিক দিয়ে আমার কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে একটা অভাব বোধ করছি বই কি। আর একটা কথা। তিনি মুখে যদিও বলেন নি কিছু কখনও (চিঠিতে অত কথা লিখতেন, মুখে কিন্তু বলতেন না কিছু) তবু এটা আমি অনুভব করতাম যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন। মৃত্যুদিনের সে ঘটনাটা ভুলব না কখনও।

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। চল্লুম—

"কোথায়?"

“কোথায় আবার। হুকুম এসেছে।”

“ওসব কথা বলছেন কেন। কোন কষ্ট হচ্ছে ?”

“হ্যাঁ, বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু নয়, সিমু তুমি একটা গান গাও।”

“কোন্‌টা গাইব ?”

“যেটা খুশি।”

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন—“হ্যাঁ, গান না।”

ধরলাম—“জীবন-মরণের সীমানা ছড়ায়ে...”

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাত্মা ভর করে। যে-কোন লোকের প্রেতাত্মা সে নাকি আনতে পারে। সেদিন বকুল মাসীকে আনিয়েছিল নাকি। বকুল মাসীর গলার স্বর নাকি অবিকল শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

নীলিমার চোখমুখ হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে।

“আমাকে ডেকেছ কেন ?”

অবিকল তাঁরই গলার স্বর।

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, “আমাকে চিনতে পারছ না ?”

“না।”

“একেবারেই চিনতে পারছ না ?”

“না।”

“আমাদের মনে পড়ে না তোমার ?”

“না।”

“একটুও না ?”

“না।”

তাজমহল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছয় নি। একজন সহযাত্রী ব'লে উঠলেন—ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দ'মে গেলাম। চুনকাম-করা সাধারণ একটা মসজিদের মতো! ওই তাজমহল। তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম। হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল।......অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে ব'সে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের

তাজমহল।...আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি... ...মহাসমারোহে মিছিল চলেছে...সম্রাট শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া-সান্নিধানে?···আর বিচ্ছেদ সইল না···শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে...ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল...হয়তো এখনও আছে ...ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর...

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মতো তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাষ দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউ-বীথি থেকে নয়—মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে, মর্মর-ধ্বনি নয়, যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মতো স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশঃ। শুভ্র আভাষও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ ক'রে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনা-পটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজ-রাজেশ্বরী শাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেক দিন কেটেছে।

কোন্ কনট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেল-ওলা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওলাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মতো সিগারেট পাইপ বিক্রি ক'রে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কি ভীষণ ভীষণ ভাড়া নেয়—এ সব খবরও পুরানো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, ঊষায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে আর চোখে লাগে না। চোখে পড়েই না। পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু—গোড়া থেকেই শুনুন তাহ'লে।

সেদিন 'আউট ডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকলো। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে বেচারীর। ভাবলাম কোনও মেওয়া-ওলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম, ঝুড়ির ভেতর মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা ব'সে আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মতো, আলখাল্লা পরা, ধপধপে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম ক'রে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে ক'রে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে ব'লে। নিতান্ত গরীব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি ক'রে—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই

(আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল। ক্যাংক্রাম্‌ অরিস ! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎস-ভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে ক'রে ব'য়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার ইনডোরেও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাঁসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ। অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসর, এমন কি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা ক'রে চলেছে। সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হ'ল বারান্দা থেকে। হাঁসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাঁসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইনজেক্‌শান দিয়ে আসতাম। এভাবেই চলছিল।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি 'কল' থেকে ফিরছি হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। চাদরের তলায় রয়েছে বেগম সাহেব। নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা ! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠক্‌ ঠক্‌ করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম—হাঁসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে—এর বাঁচবার কি কোনও আশা আছে হুজুর ?

সত্যি কথাই বলতে হল—না।

বুড়ো চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে—সেদিনও কল থেকে ফিরছি—একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে ব'সে ব'সে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে ? মাঠের মাঝখানে মুমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি ? এগিয়ে গেলাম। কতকগুলো ভাঙ্গা ইট আর কাদা নিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।

"কি হচ্ছে এখানে মিয়া সাহেব—"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

"বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।"

"কবর ?"

"হাঁ হুজুর।"

চুপ ক'রে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি থাক কোথায় ?"

"আগ্রার আশে পাশে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই গরীব-পরবর।"

"দেখিনি তো কখনও তোমাকে। কি নাম তোমার ?"

"ফকির শা-জাহান।"

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হিসাব

দুই আর দুই যোগ ক’রে যতক্ষণ চার হয় ততক্ষণ কোন গোল থাকে না। কিন্তু যদি কোন কারণে তা না হয় তাহলেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। পদির ব্যাপারে তেমনি বিভ্রান্ত হয়ে আছি।

ভাল নাম পদ্মাবতী, ডাক নাম পদি।

অত্যন্ত গরীবের মেয়ে। উপযুক্ত সহৃদয় আত্মীয়-স্বজন এমন কেউ নেই যে ‘ভার’ নেয়। গরীবের মেয়ে হলেই বাধ্য হয়ে গৃহকর্মনিপুণা হতে হয়। তা না হলে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, উঠোন ঝাড় দেওয়া, ঘর নিকানো, গোয়াল পরিষ্কার করা কে করবে। পদি নিজের ঘরের কাজ তো সব করতোই, পাড়াপড়শীর ফরমাসও শুনত। কারো বড়ি দিয়ে দিচ্ছে, কারো সেলাই ক’রে দিচ্ছে, কারো ছেলে আগলাচ্ছে। মামাদের অবস্থা একটু ভাল। কিন্তু তাঁরাও এমন লক্ষ্মী মেয়ের ‘ভার’ নিতে চান না। পাত্র কোথায়? তাছাড়া চারদিকেই লকলক করছে আগুন— ঘৃত-কুম্ভের ভার নেবে কে?

দুই আর দুই যোগ ক’রে ঠিক চার হয়ে যাচ্ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পদির নামে একটা কলঙ্ক রটল, পাড়ায় দু’ একটা ছোঁড়া তাকে ইসারাও করল।—চলছিল। হিসেবে ভুল হয়নি।

আমরা জানতাম পদির বিয়ে হবে না এবং শেষ পর্যন্ত ও—সম্ভাব্য পরিণতিগুলোকে স্পষ্টরূপে আর ভাববার চেষ্টা করতাম না। তবুও সেগুলো বিভ্রান্ত করেনি আমাদের, কারণ সেগুলো সব দুই আর দুইয়ে চারের পর্যায়ে। হিসেবের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

গ্রামেরই ছেলে রামচরণ ছুটিতে এক-দিন গ্রামে ফিরে এল। রামচরণ নামটা যেমন ঘষা-পয়সার মতো, লোকটা তেমন নয়। বেশ জাঁদরেল লোক। রাজ-সরকারে হাজারখানেক না হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চড়ে না। প্রত্যেক ছেলের জন্য একজন ক’রে আয়া আছে। চার ছেলে, চার মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর এই রামচরণ একদিন দেশে ফিরে এল এবং শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—ওই পদিকে বিয়ে ক’রে বসল।

আমরা চমকে গেলাম বটে কিন্তু অঙ্ক কষে দেখলাম হিসেব ঠিক মিলেছে। পদ্মাবতী রূপসী ছিল। অবিশ্বাসী মন অবশ্য বাজে তর্ক তুলেছিল দু’ একটা। পদ্মার চেয়ে বেশী রূপসী আর একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল তার, নিখুঁত সুন্দরী সে, বংশও ঢের ভাল, ধরেও ছিল তারা খুব—তবু রামচরণ পদ্মাকেই পছন্দ করলে কেন। পছন্দ-অপছন্দের নিগূঢ় হেতুটা কি? মনের এসব বাজে কৌতূহলকে অবশ্য প্রশ্রয় দিই নি। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করেছে—দুই আর দুইয়ে চার-এর আবার কেন’ কি।

পদিকে বিয়ে করাতে রামচরণ দেব পদ-বাচ্য হয়ে উঠল প্রায়। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পদি খুব খুশি। একগা গয়না, দাসী, কাপড়, জামা, মাথায় চওড়া সিঁদুর, একমুখ হাসি, তার আলাদা রূপই খুলে গেল একটা।

যাবার দিনে স্টেশনে গেলাম সবাই। রিজার্ভ ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি—ফ‌ুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে। রামচরণ উঠে বসল। ছেলেমেয়েরা পাশের কামরায় ছিল। পদি উঠেই এক কাণ্ড ক'রে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে 'আঃ' বলে চীৎকার ক'রে উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। ম‌ুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল—ফ‌ুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোড় ক'রে বলতে লাগল,—আমার কোন দোষ নেই, আমাকে জোর ক'রে বিয়ে করেছে, আমি কিছ‌ু বলি নি—কিছ‌ু কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি…।

সম্প‌ূর্ণ পাগল হয়ে গেল সে।

ভূত?

আজকাল ভূত বিশ্বাস করে না কি কেউ!

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পদির অবচেতন মন বিশ্লেষণ ক'রে যখন দ‌ুই আর দ‌ুইয়ে চার করবার চেষ্টায় ছিলেন তখন আর এক কাণ্ড ঘটল।

ছোট্ট একটা মাদ‌ুলি পরে পদি সেরে গেল হঠাৎ।

নিম গাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগ‌ুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগ‌ুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই…

কিম্বা ভেজে বেগ‌ুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারী উপকার।

কচি ডালগ‌ুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক…দাঁত ভাল থাকে।

কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চম‌ুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খ‌ুসী হন।

বলেন—"নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না।"

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা ন‌ূতন ধরনের লোক এল।

ম‌ুগ্ধ দ‌ৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না। ম‌ুগ্ধ দ‌ৃষ্টিতে চেয়ে রইল শ‌ুধ‌ু।

বলে উঠল, "বাঃ, কি সুন্দর পাতাগ‌ুলি…কি র‌ুপ। থোকা থোকা ফ‌ুলেরই বা কি বাহার…এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সব‌ুজ সায়রে। বাঃ—"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

এপার ওপার

মেয়েটি কালো। যৌবনসীমা পার হয়েছে। তবু সুন্দরী। চোখে মুখে শ্রী আছে। দৃষ্টিতে ভাষা আছে। আমরা যখন গেলাম তখন সে ডিম ভাজবার আয়োজন করছিল আমাদেরই সম্বর্ধনার জন্য। কাছেই হার্মোনিয়মটা রয়েছে। তার পাশেই রয়েছে ফুটফুটে ছোট্ট একটি ছেলে। তার ছেলে নয়, পাশের বাড়ির ছেলে। আমরা গিয়ে বসলাম। মেয়েটি আমাদের দিকে একনজর চেয়ে ছেলেটির সঙ্গেই কথাবার্তা কইতে লাগল।

"ডিম খাবি একটু ?"

"না।"

"খা না, খেলে জাত যাবে না।"

"খাব না।"

"আচ্ছা, তা হলে গান শুনিয়ে দে এঁদের।"

রাজি হ'ল না। অনেক সাধ্যসাধনা করলে সে—কিছুতেই হ'ল না।

"কাল যে তোকে অত ক'রে শেখালাম গানটা, ভুলে গেলি এর মধ্যে ?"

ছেলেটি উসখুস করতে লাগল। দ্বারের দিকে চাইলে একবার।

মেয়েটি আমাদের দিকে চেয়ে বললে—"আপনারা এসেছেন ব'লে লজ্জা পাচ্ছে। তা না হলে আমার কথা ও খুব শোনে।"

ঝি-জাতীয় কে একজন উঁকি দিলে দ্বার প্রান্তে।

"আমাদের বাড়ির খোকন এখানে এসেছে ? ও মা, এই যে ! আমরা চারিদিকে খুঁজে অস্থির। এখানে আসা কেন এমন সময়ে—চল।"

"আমিই ডেকে এনেছিলাম। যাও, বাড়ি যাও।"

উঠে চলে গেল। মেয়েটির মুখখানা কেমন যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। আমাদের দিকে ফিরে বললে—"ও আমাকে খুব ভালবাসে, জানেন।"

ডিম ভাজতে লাগল।

নীরবে কাটল কিছুক্ষণ।

কাপ্তেন একটি ছোট বোতল, কিছু মাংস এবং পাউরুটি নিয়ে প্রবেশ করলেন। এসেই বললে—"ঘুগনি ক'রে রেখেছ তো ?"

"হ্যাঁ।"

খাওয়া সুরু হ'ল। ঘুগনি খুব চমৎকার হ'য়েছিল। প্রশংসা করলাম।

একজন বললেন—"ও খুব ভাল রাঁধতে পারে। সেবার—"

রান্নার গল্প সুরু হয়ে গেল। বিরিয়ানী কাবাব কোপ্তার নয়, মধ্যবিত্ত রান্নার। চচ্চড়ি, সুকতো, মোচার ডালনা, মাছের ঝাল, বেগুনের টক, খিচুড়ির গল্প আর শেষ হয় না। অথচ আমরা শুনতে গেছি গজল।

—গজল অবশ্য হ'ল দু'একখানা।

তারপর কথায় কথায় উঠে পড়ল তার বাড়ির কথা। উঠে পড়তেই সে হার্মোনিয়ম ছেড়ে বাড়ির গল্প সুরু ক'রে দিলে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি তার। বাড়িতে বিধবা মা আছে, বৌদি আছে, খোকন আছে, বুধি গাই আছে। কত গল্প। একটা পল্লীকে মূর্ত ক'রে তুললে যেন চোখের সামনে।

"পাড়ার লোক আমায় খুব ভালবাসে, জানেন। একবার আমার অসুখ করেছিল, পাড়ার সকলের নাওয়া খাওয়া বন্ধ। নায়েবমশাই কাছারি থেকে উঠে এসে খোঁজ নিয়ে যেতেন, পুরুতমশাই রোজ শিবের মাথায় বেলপাতা দিতেন, ডাক্তারের তো কথাই নেই—রোজ তিনবার চারবার আসতেন। কত রকম ওষুধ, ইনজেক্‌সন। আমার মায়ের একটু শুচিবাই আছে, জানেন। বিলিতি ওষুধ ছুঁতেন না কিছুতে। বৌদি পাটের কাপড় প'রে ওষুধ খাওয়াতেন আমাকে— "

"ও সব বাজে কথা ছেড়ে তুমি সেই গজলটা ধর দিকি।" আদেশ করলেন কাপ্তেন।

মুখের হাসি যেন নিবে গেল তার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। নামজাদা বাইজি অলকা। অলকা দুলিয়ে মুচকি হেসে আবার সুরু ক'রে দিলে—"তোরি নজরিয়া—"

বিয়ে বাড়ি।

বাড়ির বড়বউ সুষমার একমুহূর্ত অবসর নেই। রান্নার সমস্ত ভার তার উপর। আধময়লা কাপড়ে হলুদের ছোপ লেগেছে, চুলগুলোও বাঁধা হয়নি ভাল করে। উনুন কামাই যাচ্ছে—দ্রুতবেগে তরকারী কুটছে সে, কোলের ছেলেটা কোল পায়নি সমস্ত দিন, কাছে ব'সে ঘ্যান ঘ্যান করছে। মাছও কোটা হয়নি এখনও।

"ও ঝি, মাছগুলো কুটে দে না মা—কখন যে কি হবে—"

সুষমার দশ বছরের মেয়ে পুঁটি ছুটে এল ঊর্ধ্বশ্বাসে, উদ্ভাসিত মুখ তার।

"ও মা—মোটর এসে গেছে। আমাদের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। দেখবে ? এস না !"

সুষমা তরকারি ফেলে রেখে ছুটল।

তার শোবার ঘরে অনেকেই এসে জুটেছে। যমুনা, মিনু, পদি, রুবি—আরও অনেকে। জানালা দিয়ে আসরটা বেশ দেখা যায়। আসরে লোকে লোকারণ্য। ওই যে নামছে মোটর থেকে। বাঃ কি সুন্দর ! রং কালো, কিন্তু কি অপূর্ব মুখশ্রী। শাড়িটা কি চমৎকার, কি মানিয়েছে ! ওমা, শ্বশুর নিজে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করছেন। ভট্‌চায্যিমশায় নমস্কার করলেন হাত তুলে সসম্ভ্রমে ! করবে না ? কত গুণ ওর। আসরের অনেকেই উঠে দাঁড়াল। কেউ ত্রস্ত, কেউ বিস্মিত, কেউ মুগ্ধ। মহিমার দ্যুতি বিকিরণ করে অলকা দেবী আসরে প্রবেশ করলেন।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুষমা।

যমুনা বললে—"আমরাও ওরই মতো মেয়েমানুষ, কিন্তু কত তফাৎ দেখ দিকি । দাসীবৃত্তি করতে করতেই জীবন কাটল আমাদের ।"

"পোড়া কপাল আর কি !"—রুবি বললে ।

সুষমার মনে পড়ছিল নিজের কৈশোর জীবনের কথা । তার বাবাও ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছিলেন তাকে । খুব ভাল গান শিখেছিল সে । কত প্রশংসা করত সবাই তার গানের ।...সভায় সমিতিতে সর্বত্র গান গেয়ে বেড়িয়েছে সে বিয়ের আগে । বাজনাও শিখেছিল কত রকমের । সেতার, এস্রাজ, বেহালা, ব্যাঞ্জো—জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বাজনা শুনে মেডেল দিয়েছিলেন একবার । ফুলের মতো ফুটে ফুলেরই মতন ঝরে গেল জীবনের সে দিনগুলো ।···কোথায় গেল ?

হঠাৎ সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ জাগল যেন তার । অলকা দেবী গান ধরেছে । ঠাকুরপোর বিয়েতে একে এনে খুব ভাল হয়েছে । কি চমৎকার গলা । স্বপ্নলোকে উড়ে গেল সে যেন সহসা !—

"ও বৌমা, উনুনের আঁচ যে বয়ে গেল । কি করছ তুমি এখানে ?"

শাশুড়ী প্রবেশ করলেন ।

"এই যে যাই ।"

সুগৃহিণী সুষমা মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল ।

কেন

ছেলে হয় আর মরে ।

ডাক্তার কবিরাজ সবাই হার মানলেন ।

চতুর্থ শিশুর মৃত্যুর পর বাপ মা লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেকের চেহারা প্রায় একরকম । একটি শিশুই যেন বার বার আসছে আর চলে যাচ্ছে ।

কেন ? কি চায় ও ? যত্ন হচ্ছে না ?

পঞ্চম শিশু যখন হ'ল তখন আঁতুড় ঘরেই সৌখিন জামা, নূতন বিছানা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হল তাকে ।

বাঁচল না ।

অনেকে বললেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করালে ফল হবে ।

ষষ্ঠ শিশুর জন্মদিনে ধুমধাম করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হল । এমন কি রোশনচৌকি পর্যন্ত বাজল ।

বাঁচল না ।

অজ্ঞাত কোন পাপ আছে না কি সঞ্চিত ?

সপ্তম শিশুর জন্মের পর প্রায়শ্চিত্ত করানো হল যথাবিধি ।

তবু বাঁচল না ।

ঠিক একই রকম চেহারার শিশু কখনও ছেলে হয়ে কখনও মেয়ে হয়ে আসছে আর চলে যাচ্ছে ।

মায়ের চোখের জল শুকোয় না ।

বাপ যাকে পায় প্রশ্ন করে—কেন ?

অষ্টম সন্তান হয়ে গেল, বাপ বললে—ওকে এবার শাস্তি দিয়ে দেব, আর যেন না আসে। আর পারি না আমরা—

মরা শিশুর হাতের এবং পায়ের সব আঙুলগুলো মুড়িয়ে কেটে দিলেন। নবম শিশু গর্ভে এল তবু। যথা সময়ে ভূমিষ্ঠও হল। একটি কন্যা। মুখ অবয়ব সেই একরকম, কিন্তু হাতে পায়ে একটিও আঙুল নেই। এ ম'ল না।

এখনও বেঁচে আছে।

কেন ?

সহধর্মিণী

বীরেন্দ্রবাবু বিখ্যাত শিকারী।

তাঁহার বন্দুকের গুলিতে কত প্রাণী যে নিহত হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তিনি যে সত্যই শিকারে সিদ্ধহস্ত তাহা বহু পাখী, শুয়োর, সাপ, বাঘ, ভালুক, শিয়াল, সজারু, খরগোস, হরিণ, কুমীর, হনুমান প্রাণ দিয়া প্রমাণ করিয়াছে। সকলেই তারিফ করিত। শুধু ঝোঁক নয়—বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে সুযোগও পাইয়াছিলেন তিনি প্রচুর। শিকার-দক্ষতা লাভ করিতে হইলে শুধু ঝোঁক থাকিলেই হয় না—অর্থ এবং অবসর চাই। ধনীর দুলাল বীরেন্দ্রনাথের তাহা ছিল। এসব ছাড়া তাঁহার যোগ্যতাও ছিল। বীরেন্দ্র শুধু যে সাহসী ছিলেন তাহা নয়—সমর্থও ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুগঠিত দেহে অসুরের মতো শক্তি ছিল।

বীরেন্দ্রবাবু কিছুকাল পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন। পিতামাতা বহু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করাতে বীরেন্দ্রবাবুকে নিজেই সব করিতে হইয়াছিল। শতাধিক পাত্রী দেখার পর বীরেন্দ্রবাবু মিনতিকেই পছন্দ করিলেন। কেন করিলেন তাহা বলা শক্ত। প্রথমত মিনতি গরীবের মেয়ে—দ্বিতীয়ত অতিশয় রোগা এবং তৃতীয়ত অত্যন্ত ভীরু। ভয়চকিত চঞ্চল চক্ষু দুইটি সম্ভবত তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

বিবাহের পর তিন মাস কাটিয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার এক পাহাড়ি জঙ্গলে বীরেন্দ্রবাবুর জমিদারী। প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড জঙ্গলের প্রান্ত দেশে সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়িটি নির্মাণ করাইয়াছেন—শিকারের সুবিধার জন্যই। শিকারের জন্য প্রায়ই তাঁহাকে এখানে আসিতে হয়। নানারকম শিকার পাওয়া যায় এই জঙ্গলে। বিবাহের কিছুদিন পূর্বে তিনি এই জঙ্গলে প্রকাণ্ড একটা ময়াল সাপ মারিয়াছিলেন।

গভীর রাত্রি নয়—সন্ধ্যার একটু পরেই।

ইতিমধ্যেই কিন্তু চতুর্দিক ঝিল্লী-ধ্বনিতে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে। বাড়ীর ঠিক পিছনেই বড় একটা তেঁতুল গাছ। তাহাতে অসংখ্য বকের বাসা। তাহাদের কলরব ও পক্ষবিধূনন বন্য অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। চতুর্দিকে কেমন যেন থমথমে ভাব।

দূরে একটা ফেউ ডাকিয়া উঠিল।

মিনতির কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

শিকারীর বেশে সজ্জিত বীরেন্দ্রকে সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল—ওগো তুমি যেও না—আমার বড় ভয় ভয় করছে।

কোমরের বেল্ট্টা ভাল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সহাস্যমুখে বীরেন্দ্র বলিলেন—পাগল না কি! মাচান বাঁধা হয়ে গেছে, 'কিল' হয়ে গেছে—না গেলে কি চলে?

—'কিল' কি?

—'কিল' মানে একটা মোষের বাচ্চাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল—কাল রাত্রে বাঘে সেটাকে মেরেছে। তারই কাছাকাছি একটা উঁচু মাচা তৈরী করিয়েছি—বাঘটা আজও ঠিক আসবে সেখানে।

বেল্ট্টাকে ভাল করিয়া কসিয়া লইয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া আবার বলিলেন—যদি আসে ফিরে যেতে হবে না বাছাধনকে আজ!

আমার বড্ড ভয় করছে।

—ভয় কি? ফাগুয়া ত রইলো!

—লক্ষ্মীটি, তুমি যেও না!

—পাগল নাকি!

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

মিনতি বলিল—আচ্ছা, আজ বিকেলে গরুর গাড়ী করে কি একটা পার্শেল এল। আমাকে দেখতে দিলে না কেন? লুকিয়ে রেখেছ কেন বল না?

হাসি চাপিয়া বীরেন্দ্র বলিলেন—রাত্রে নয়—কাল সকালে দেখো।

বীরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন।

মিনতি একা বিছানায় শুইয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। তাহার চোখে ঘুম নাই। একটু তন্দ্রার মতো আসিয়াছিল—একটা নিদারুণ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি ভীষণ স্বপ্ন!—একটা বাঘ দুই থাবা দিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্তপান করিতেছে যেন!···অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মিনতি শেষে উঠিয়া বসিল। উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ কি যেন শুনিল! ও কি বকের শব্দ? কক্খনো নয়! ভারি মোটা গলায় কে যেন গাছের উপর বসিয়া কথা বলিতেছে। উঃ, এই দারুণ রাত্রি কতক্ষণে প্রভাত হইবে। সহসা তাহার মনে হইল আজ বিকালে কি পার্শেলটা আসিয়াছে দেখা যাক্। তবু খানিকটা সময় কাটিবে। পার্শেলটা উপরের ঘরে আছে। লণ্ঠনটা লইয়া ধীর পদসঞ্চারে মিনতি বাহির হইয়া গেল।

বীরেন্দ্র যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন সবে ভোর হইয়াছে।

দেখিলেন চাকরদের ঘরে ফাগুয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। গোলমালে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিল।

—মাইজি রাত্রে ভয়-টয় পায়নি ত রে?

ফাগুয়া বলিল যে বাবু চলিয়া যাইবার পরই মাইজি সেই যে ঘরে খিল দিয়াছিলেন আর খোলেন নাই।

বীরেন্দ্র আগাইয়া গিয়া বন্ধ দ্বারে করাঘাত করিলেন।

কোন শব্দ নাই।

আরও কয়েকবার করিলেন।

এবারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অধীর হইয়া শেষে তিনি দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন।

তথাপি দ্বার খুলিল না।

শেষে কপাট ভাঙিতে হইল।

ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই বীরেন্দ্রের চোখে পড়িল খানিকটা রক্ত গড়াইয়া আসিয়া দ্বারের কাছে জমিয়া রহিয়াছে।

কিসের রক্ত? মিনতি কোথায়?

বেশী খুঁজিতে হইল না—সিঁড়ির নিচেই তাহার মৃতদেহটা পড়িয়াছিল। একটু ঝুঁকিয়া বীরেন্দ্র দেখিল—মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। নাক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া সমস্ত মেঝেটা ভিজিয়া গিয়াছে। চাপ চাপ রক্ত; সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া বীরেন্দ্র দেখিলেন কলিকাতা হইতে আগত stuffed ময়াল সাপটা কোণে কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে। মিনতিকে সকালে ভয় খাওয়াইয়া মজা দেখিবে বলিয়া কথাটা তাহার কাছে বীরেন্দ্র গোপন রাখিয়াছিলেন।

কে বলিবে সাপটা জীবন্ত নয়! উহার ভিতরে খড় আর তুলো-ভরা আছে তাহা বলিয়া না দিলে বোঝা অসম্ভব। কাল রাত্রে এই সাপটাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে গিয়া মিনতি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই! বীরেন্দ্র ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সাপটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নকল চক্ষু দুইটি হইতে একটা হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে যেন। কিছুদিন পূর্বে এই সাপটাকেই তিনি জঙ্গলে মারিয়াছিলেন।

বীরেন্দ্রের শিকার অভিযান ব্যর্থ হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই বীরেন্দ্রের অনুচরবর্গ হিংস্র শ্বাপদটার মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া লইয়া আসিল।

প্রকাণ্ড একটা বাঘিনী।

বীরেন্দ্রের অব্যর্থ লক্ষ্য তাহার মস্তক বিচূর্ণিত করিয়াছে। বীরেন্দ্রের সহসা মনে হইল, বাঘটা কোথায়!

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সমস্যা দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত পৃষ্ঠা হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি

জ্বলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সেসব কিছু না করিয়া তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা।"

ঘরের কোণে কুঁজায় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাশ আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

"আর এক গ্লাশ।"

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

"আর এক গ্লাশ চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও--"

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বপ্ন।

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙ্গিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্কুলে যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

রূপকথা

শিল্পীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে !

জীবনের প্রতি মুহূর্তের সাধনা—এই মর্মর মূর্তি ! কত দিবসের, কত নিশীথের আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত স্বপ্ন—সহসা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। হতবাক্ শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে—যে মর্মর-প্রতিমাটি এত যত্নে সে গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা সহসা পাষাণস্তূপে পরিণত হইয়াছে ! প্রতিমা অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহা পড়িয়া আছে—তাহা পাষাণ ! হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল !

কেন এমন হইল ? কে বলিবে ? শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর স্বপ্ন কখন কোন্ মন্ত্রবলে নিঃশেষ হইয়া যায় কে তাহার সন্ধান দিবে ?

দিবারাত্রির অক্লান্ত পরিশ্রমের পর যেই তাহার স্বপ্ন মূর্তি-পরিগ্রহ করিল, কঠিন পাষাণ যে মুহূর্তে তাহার মানসীতে রূপান্তরিত হইল—যে মুহূর্তে সে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"যাক্, এতদিনে পরিশ্রম সার্থক হইল"—সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ ! মানসীর মৃত্যু ! ইহাকে কি সে আর ফিরিয়া পাইবে ?

প্রতিমা ফাটিয়া গেল—যাহা রহিল তাহা বিদীর্ণ শিলাখণ্ড! মুহ্যমান শিল্পী নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

অনুজা ও অভিজিৎ আসিয়া দেখে শিল্পী তেমনি-ভাবেই বসিয়া আছে। অনুজা শিল্পীর বিধবা দিদি। এই পাগল ভাইটিকে সে জননী-স্নেহে লালন করিয়াছে। সে খাইতে দিলে শিল্পীর খাওয়া হয়—তাহারই অনুরোধে যেন সে বাঁচিয়া আছে।

অভিজিৎ শিল্পীর প্রতিবেশী ও অনুজার প্রণয়ী। তাহাদের দেখিয়া অসহায়ের মত শিল্পী বলিয়া উঠিল—

"দেখ দিদি—দেখ অভিজিৎ—এ কি হয়েছে।"

অনুজা কিছু বলিল না।

অভিজিৎ বলিল—"তোমার মুক্তি হয়েছে। রাজশিল্পী তুমি, রাজসভায় যাও।"

·· শিল্পী ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

তাহার মানসীর স্মৃতি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল—রাজসভায় নয়, শ্মশানে!

মহাশ্মশান···

কাছে, দূরে চিতা জ্বলিতেছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়—চিতা—কেবল চিতা! নর, নারীর, দেশের, জাতির, হৃদয়ের। কাহারও অনলশিখা গগনস্পর্শী—কেহ নির্বাপিতপ্রায়—কেহ নিবিয়া গিয়াছে। চিতাভস্ম লইয়া বাতাস উন্মাদ!

···অন্ধকারে মৃদু কলকলধ্বনি!···বৈতরণীর। সেই প্রায়ান্ধকার শ্মশানে শিল্পী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই মহাশ্মশানে তাহার মানসীর সন্ধান মিলিবে কি? মানসী কি মরিয়াছে ··তাহাই বা কে বলিয়া দিবে! মানসী কি মরে? মরিলেও কি তাহার সন্ধান পাওয়া যায়? অন্ধকার উত্তর দেয় না। শ্মশানের চিতা জ্বলে ও নেবে! সহসা শ্মশানভূমি অট্টহাস্যে শিহরিয়া উঠিল। সচকিত শিল্পী চিতার আলোকে দেখিল, হাসিতে হাসিতে একটি মূর্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার মুখাবয়ব জটা-শ্মশ্রু-মণ্ডিত—চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়—মুখে বিকট হাস্য! কণ্ঠে পুষ্পমাল্য—পুষ্পমাল্যকে বেষ্টন করিয়া এক বিষধর সর্প পিচ্ছিল সঞ্চরণে সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত করিতেছে। তাহার এক হস্তে খর্পর—অন্য হস্তে বাঁশির!—সম্পূর্ণ উলঙ্গ। শিল্পীর নিকটে আসিবামাত্র সে অট্টহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত করিয়া উন্মাদ-নৃত্য জুড়িয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত গান—

দুটো গরুর চারটে পা রে
তিনটে পা তার খোঁড়া,
টিয়ে পাখীর ডিমের মাঝে
ছিল টাট্টু ঘোড়া
আকাশ থেকে চাঁদকে পেড়ে
ভাতে দিলাম সেদিন,
নামিয়ে দেখি শুয়ারমুখো
গিরগিটি দু জোড়া!

শ‌ুঁয়ো পোকার সঙ্গে যেদিন
বিয়ে হল রাণীর,
তাই না দেখে মাকড়শাটার
প‌ৃষ্ঠে হল ফোড়া—
হা-হা-হা-হা—

শিল্পী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে ?"

"আমি ? দেখ দিকি ভাল করে ?—চিনতে পারছ না ?"

"না।"

"হা হা হা হা"—উন্মাদের হাসি।

চক্ষ‌ু বিস্ফারিত করিয়া শিল্পী শ‌ুনিল—সে বলিতেছে—

"আমি যে তুমি। তোমারই আর একটা র‌ূপ আমি !"

"ব‌ুঝতে পারলাম না।"

"হা—হা—হা—হা"—আবার সেই অট্টহাস্য !

হাসি থামাইয়া হঠাৎ সে আবার বলিল—"তিনের পিঠে একটু কিছ‌ু দিলে একটা সংখ্যা হয় আর ঘোড়ার পিঠে একটা কিছ‌ু দিলে জিন্‌ হয়। কেমন মজা ! তোমার নাম কি বন্ধ‌ু ?—যদিও আমি জানি,—তব‌ু তোমার ম‌ুখে একবার শ‌ুনতে ইচ্ছে করছে—"

"আমার নাম চিত্রকার‌ু ! আমি শিল্পী—"

"আর বলতে হবে না। তুমি শিল্পী ? আমি যদি বলি, তুমি স্বল্প !—মিছে কথা হয় তাহলে ?—হা হা হা হা"—শিল্পী অভিভ‌ূত হইয়া দেখিতে লাগিল, আবার সে ন‌ৃত্য জ‌ুড়িয়াছে। বাঁশরীর আঘাতে হাতের খর্পরটা যেন হাসিতেছে। তাহার কণ্ঠের বিষধর সর্পের চক্ষে কুসুমের কোমলতা ফ‌ুটিয়া উঠিল—প‌ুষ্পমাল্যের এক একটি ফ‌ুল যেন স্ফ‌ুলিঙ্গ !

হঠাৎ সে আবার ন‌ৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দিল।

শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিল—"ফ‌ুটবল খেলেছিস্‌ কখনও ? আকাশে গিয়ে ? স‌ূর্য চন্দ্রকে ফ‌ুটবল করে ? আচ্ছা আর একট‌ু বড় হ—তারপর খেলবি।"

অপরিসীম কর‌ুণায় সে শিল্পীর গায়ে-মাথায় হাত ব‌ুলাইতে লাগিল। জ‌্বলন্ত অঙ্গারের মত চক্ষ‌ু-দ‌ুইটি হইতে স্নেহ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে ? আপনার নাম কি ?"

"আমার নাম 'যা-ইচ্ছে'—"

"যা-ইচ্ছে ?"

"হ্যাঁ—সকলের সঙ্গেই ত আমার আলাপ ! তোর কাছেও ত জন্মাবধি আছি। তোর মানসীর চোখের মাঝখানে এতদিন বসেছিলাম, তুই ত বাটালির ঘায়ে আমাকেই অস্থির ক'রে দিয়েছিস্‌ রোজ—এই দেখ—হা-হা-হা।"

শিল্পীর ভাষা হারাইয়া গিয়াছে। শিল্পী দেখিল, সত্যই ত ইহার সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন ! কে এ ?"

"আমার মানসীর চোখের ভিতর আপনি ছিলেন ?"

আবার পাগল নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে গান—

ভাবের যখন হয় রে অভাব
ভাষা তখন আসর জমায়
নফর যখন হয় রে নবাব
উজিরের সে মাইনে কমায়।

কান এবং নাকে মিলে
কান্নাকে যে জন্ম দিলে
চমকে গেল হায়রে পিলে
চোখের জ্যোতি বাড়ল অমায়!
উজীরের সে মাইনে কমায়—

সে থামিলে শিল্পী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কথা শুনুন। আপনি কি আমার মানসীকে চেনেন?"

পাগল হাসিয়া বলিল—"আমি তোমাকে চিনি। তুমি এখানে এসেছ কেন বল ত! যদিও আমি জানি, তবু তোমার মুখে শুনতে বেশ ভাল লাগে—হা-হা-হা—"

"আমার মানসীর স্মৃতি আমাকে এখানে টেনে এনেছে।"

"হা-হা-হা—মানসীর স্মৃতি! শ্যামা-নাপতিনির নাতনি মারা গেছে—রামময়ের ভাই মরে গেল—চিতা নেবেনি এখনও। তাদের স্মৃতি বুঝি তোমায় আকুল করছে না? কেবল মানসীর স্মৃতি নিয়ে তুমি ব্যস্ত! কেন বাছাধন?"

"তাকে যে আমি ভালবাসতাম—"

"আর এদের বাসতে না কেন? আম, আঙুর, আচার, মাংস এবং আরো অনেক কিছু ত তুমি ভালবাস একসঙ্গে। মানসীকে ভালবাসবে আর রামময়ের ভাইকে বাসবে না কেন?"

বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে আবার গান ধরিয়া দিল—

জলের মাঝে পড়লে চিনি
গলেই জেনো যাবে দাদা,
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হবে কাদা।
ডাগর চোখে সাগর আছে,
চাউনিতে তার ডাইনি নাচে,
ভুত থাকে রে সেওড়া গাছে
পরনে তার কাপড় সাদা—
গরম দুধে পাঁউরুটি সে
নিমেষ মাঝে হয় যে কাদা।

হঠাৎ সে থামিয়া গেল। বলিল—"এইবার আমাকে সরে পড়তে হবে। আমার গানের মানে ক্রমশঃ বোঝা যাচ্ছে!"

শিল্পী কহিল—"না, না, আপনি বলে যান—আমার মানসী কোথায়? আপনি ত চেনেন তাকে। সে কোথায়?"

পাগল বলিল—"তাকে তুমিই ত মেরে ফেল্লে। দিন রাত উঠে পড়ে লেগে শেষ করে দিলে। অমনি সে মরে গেল।"

"আর পাব না তাকে ?"

"আবার পাবে বৈকি ! আনন্দের দেশে যাও ।"

"কোথায় সে দেশ ?'

"খুঁজে বার কর ।" তাহার পর কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা এই মালাটা গলায় পর। আনন্দের দেশের আভাস একটা পাবে। এ মালা কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না—একটু পরে পাখী হয়ে যাবে। তার পরে হাওয়া—"

মালাটি শিল্পীর গলায় পরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে সেই অদ্ভুত মূর্তি শ্মশানের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল !

শ্মশান-দেবতার বরমাল্য গলায় পরিয়া শিল্পী আনন্দের দেশের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। তন্ময় হইয়া গেল। কি অদ্ভুত দেশ !

"ওই দেশে যেতে হলে জ্ঞানরাজ্যে যাও আগে।"

চমকিয়া শিল্পী দেখিল গলার মালা পাখী হইয়া গিয়াছে। উড়িয়া উড়িয়া বলিতেছে —"এস আমার সঙ্গে।"

অনুজা চলিয়াছে।

চলিয়াছে তাহার ভায়ের সন্ধানে। পাগলের মত কোথায় চলিয়া গেল সে ? তাহার সেই অসহায় ভাই ! না খাইতে দিলে সময়মত খায় না, বিছানা করিয়া না দিলে যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে ! পরিষ্কার পরিচ্ছদ জোর করিয়া হাতে তুলিয়া না দিলে সে বেশ-বাস বদলায় না ! এখনও শিশু। সন্তানহারা জননীর আকুলতায় অনুজা পথের শ্রান্তি ভুলিয়াছে।

…সহযাত্রী অভিজিৎ। অভিজিৎ খুঁজিতেছে শিল্পীকে নয়, অনুজাকে। অনুজা তাহার পথ-চলার সঙ্গিনী। পাশাপাশি চলিয়াছে—অথচ আজও সে অনুজার সন্ধান পাই নাই।

দিন যায়—রাত্রি আসে। কত ফুল ফুটিল, ঝরিল। কত চন্দ্র-সূর্য উঠিল, ডুবিল। পথের শেষ নাই—দুই জনে পাশাপাশি চলিয়াছে।

জ্ঞান-রাজ্য বহুদূর।

শিল্পী জ্ঞান-রাজ্যে আসিয়াছে।

অসীম এই দেশ। যতদূর দেখা যায় সীমা-রেখা চোখে পড়ে না। এই দেশে কোথাও অভ্রভেদী পর্বতমালা—আকাশের সঙ্গে মিতালি করিতেছে। কোথাও মরীচিকাময় মরুভূমি—কোথাও ঊর্মিসমাকীর্ণ মহাসমুদ্র—কোথাও আবার মনোহর পুষ্করিণী, পদ্মফুলে ভরা। এই দেশের কোথাও কণ্টকময়, কোথাও পুষ্পাকীর্ণ; কোথাও ঊষর, কোথাও শ্যামল। চতুর্দিক নিস্তব্ধ, ভিড় নাই। একটি বৃক্ষতলে শিল্পী একরাশি জটিল সূতার বাণ্ডিল লইয়া তাহার জট ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না—তাহার হস্তপদ সেই সূতার জালে যেন জড়ীভূত হইয়া যাইতেছে—বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু শিল্পীর চেষ্টার বিরাম নাই। চতুর্দিক প্রখর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু এই সূর্যালোক শিল্পীকে মুগ্ধ করিতেছে না। শিল্পী সূত্র-সমস্যায় মগ্ন। …দূরে সিদ্ধান্তশেখর প্রবেশ করিলেন। ইনি একজন মহাজ্ঞানী।

আপনার মনে সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে আসিতেছেন—তাঁহার গাত্রে, হস্তে, মস্তকে নানা বর্ণের সূতার জাল। তিনি সূতার জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে শিল্পীর সমীপবর্তী হইলেন। শিল্পী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিদ্ধান্তশেখর স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনি কে? কতদিন এ দেশে এসেছেন? ইতিপূর্বে আপনাকে দেখেছি বলে ত মনে পড়ছে না!"

শিল্পী বলিলেন—"আমি আনন্দের দেশের সন্ধানে যাত্রা করেছিলাম। শুনেছি আনন্দের দেশের সন্ধান জ্ঞানরাজ্যে পাওয়া যায়। এখানে এসে আমি আচার্য উদ্দীপনের উপদেশ প্রার্থনা করি। তিনি আমায় বললেন, এই যে রাশি রাশি জটিল সূত্র—এদের সমস্যা—এদের জটিলতা যে সমাধান করতে পারবে সে-ই আনন্দের দেশে যেতে পারবে। আমি তাই তাঁর উপদেশ অনুসারে এই জট্ ছাড়াবার চেষ্টা করছি। কত দিন লাগবে বলতে পারেন?"

সিদ্ধান্তশেখরের সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"তার কি ঠিক আছে? সে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। আমার ত বহু-বৎসর অতীত হয়ে গেছে—এখনও ত সব বাকী, অধীর হয়ো না। ওই সাদা সুতার জট্ খুলতেই তুমি অধীর হয়ে পড়েছ - এর পর লাল, কালো, নীল, সবুজ, হলুদ—বহুবর্ণের জটিল সমস্যা আছে। একে একে সব রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে, তবে না আনন্দের দেশের সন্ধান পাবে!"

এই বলিয়া সিদ্ধান্তশেখর ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

নিকটে দূরে সিদ্ধান্তশেখরের মত আরও দুই-একজনকে দেখা গেল। সকলেই সূত্র-সমস্যায় আকুল!

আর ভাল লাগছে না।

শিল্পীর ধৈর্য সীমা ছাড়াইয়াছে—হস্ত-পদ ক্লান্ত, অবসন্ন। চোখে ঘুম ঘিরিয়া আসিতেছে। সাদা সূতার জট্ এখনও জটিল হইয়াই আছে। আপন মনেই শিল্পী বলিয়া উঠিল, "আর ত পারি না। এর-যে কোন আদি-অন্তই খুঁজে পাচ্ছি না। অনেক কষ্টে যদি খুঁজে পেলাম, একটু পরেই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। যার জট্ ছাড়িয়ে রেখেছিলাম, খানিকক্ষণ পরে দেখি আবার তাতে নূতন করে জট্ পড়েছে। কি করা যায়? আনন্দের দেশের কোন খবরই ত পাচ্ছি না! সন্দেহের পর সন্দেহ মনে জাগছে! এই জটিলতার মধ্যে কি—" সহসা শিল্পীর চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। হঠাৎ একটি গান কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল, অপূর্ব কণ্ঠস্বর!

উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়।...

একটি সুশ্রী কিশোরী, পিছনে লীলায়িত সবুজ ওড়না, মাথায় বেণী দুলিতেছে, সর্বাঙ্গে চাঞ্চল্য। হাততালি দিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেই দিকে আসিল।

শিল্পী তাড়াতাড়ি সূতার বাণ্ডিল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কে?"

কিশোরী তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল মাত্র। কথার উত্তর দিল না, হাততালি দিতে দিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গাহিয়া চলিল—

হঠাৎ এই সোনার আলো
নয়নে লাগ্‌লো ভালো
ভরেছে পরাণ আমার
ভরেছে রে কানায় কানায়।
উড়ে গেল মন যে আমার
ভ্রমরের ডানায় ডানায়—!

গান শেষ করিয়া কিশোরী শিল্পীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"যখন কেউ গান করে তখন তাকে কথা কওয়াতে নেই। এ বুঝি আপনি জানেন না! আচার্য উদ্দীপন তা বুঝি আপনাকে শেখান নি!"

শিল্পী বিস্মিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একটা ঘুরপাক খাইয়া কিশোরী বলিল—"আমার নাম খেয়াল।"

শিল্পী আবার প্রশ্ন করিল—"ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনি যে এই গান গাইলেন, এর অর্থ কি?"

"এর অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। তা-ছাড়া কোন জিনিসের অর্থ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না কখনো! গানের অর্থ যাই হোক্—আপনার এখানে বসে থাকার অর্থ কি?"

"আমি আনন্দের দেশের পথ খুঁজছি—এই জটিলতার সমাধান করতে পারলেই—"

কিশোরী হঠাৎ হাসিয়া কবিতায় উত্তর দিয়া উঠিলেন—

জটিলকে আরো জটিল করিছ
সরল তাহারে করিতে গিয়া,
প্রেম-সমস্যা সমাধান লাগি
নিত্য যেমন করিছ বিয়া।

শিল্পীর মুখে কথা যোগাইল না।

কিশোরী আবার বলিল—"এই সব বাজে সুতোর বাণ্ডিলে আপনি আনন্দের দেশের সন্ধান পাবেন—কে বলল আপনাকে?"

"আচার্য উদ্দীপন।"

"আচার্য উদ্দীপন যে একটি বাতুল, তা আপনি শোনেন নি বুঝি? এই দেশটাই ত পাগলের দেশ। পাগল দেখতে বেশ লাগে, তাই মাঝে মাঝে এখানে আসি। আপনি দেখছি এখনও একটু প্রকৃতিস্থ আছেন—এই বেলা পালান।"

"কোথা যাব?"

"যে দিকে দু'চক্ষু যায়—"

বলিয়া কিশোরী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে শিল্পী বলিল—"একটু দাঁড়ান। আপনি থাকেন কোথায়?"

হাস্যকলরবে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া কিশোরী কহিল—"চিনতে পাচ্ছেন না আমাকে? আপনার মনের ভেতরই ত আমার বাসা।"

"কৈ, এর আগে কখনও ত দেখিনি আপনাকে।"

"বাঃ—সেদিন যে শ্মশানে দেখা হল রাত্রে ! বা-রে বেশ !"

কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

শিল্পী নির্বাক।

শিল্পী অবশেষে বলিলেন—"আপনি আজ বলছেন এখান থেকে পালাতে। সেদিন ত আপনারই দেওয়া গলার মালা পাখী হয়ে আমাকে এ দেশে নিয়ে এল।"

"আমি আর আমার মালা—কি এক জিনিস ?"

এই বলিয়া কিশোরী সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

শিল্পীও চলিয়াছে। সূত্রের বোঝা পিছনে ফেলিয়া তাহার মন উধাও হইয়াছে—কোথায় কে জানে !

কিন্তু এ রাজ্যে আর সে থাকিবে না।

কিন্তু বড় পিপাসার্ত সে !

জল কোথায় ?

জল !...ওই যে !

মরু-প্রান্তরের মরীচিকার পিছনে সে ছুটিল।

অনুজা ও অভিজিৎ।

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ পথ অতিবাহন করিয়াছে। এই ত জ্ঞানরাজ্য। কই ? এখানেও ত কেহ নাই ! অনুজা আজিও তাহার ভাইকে পাইল না—অভিজিৎ অনুজার সন্ধান আজও করিতেছে। পথ চলার শেষ নাই...কতদূর— !

সহসা অভিজিৎ কৃতার্থ হইয়া গেল।

অনুজা বলিতেছে—সে তৃষিতা, একটু জল চাই।

জল ?

ওই ত নিকটেই একটা কূপ রহিয়াছে। চতুর্দিক ফুল-গাছ দিয়া ঘেরা। জল তুলিবার কোন উপকরণ কিন্তু নাই। অভিজিৎ সেই সন্ধানে অনুজাকে সেই কূপের পার্শ্বে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। বলিয়া গেল—"বালতি কিম্বা ঘড়া যাহোক্ একটা যোগাড় করে আনছি আমি। তুমি বোস।"

অনুজা বসিল—অভিজিৎ চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আর আসে না। কোথায় গেল সে ?

অনুজার তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে।

সহসা অনুজা বলিয়া উঠিল—"উঃ বড় পিপাসা—আর ত পারি না। আমাকে একটু জল দেয় এমন কেউ নেই এখানে ?"

অনুজার কথা শেষ হইতে না হইতে সেই কূপের ভিতর হইতে চন্দন-চর্চিত পুষ্প-মাল্য-বিভূষিত একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। অনুজাকে বলিল—"সুন্দর নির্মল জল যদি চান আসুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায় যেতে হবে ?"

"এই কূপের ভিতর। কোন ভয় নেই—আসুন।"

"আমার সঙ্গী যে এখনও ফেরেন নি।"

"তাহলে অপেক্ষা করুন। আমি যাই।"

"একটু জল এনে দিতে পারেন না দয়া ক'রে।"

"না, সে জল আনা যায় না।"

"চলুন যাই তবে—"

অনুজা চলিয়া গেল।

অভিজিৎ আসিয়া দেখে অনুজা নাই। একটু দূরে সিদ্ধান্তশেখর সুতার জট্ ছাড়াইতেছেন। অভিজিৎ তাঁহাকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"একজন রমণী এখানে ছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি ? দেখেছেন আপনি ?"

সিদ্ধান্তশের বলিলেন—"দেখেছি। তাঁকে সহজে এখন পাবেন না। তিনি ধর্মকূপে প্রবেশ করেছেন।"

"ধর্মকূপ ? সে আবার কি ?"

"ওই যে আপনার সম্মুখেই রয়েছে। ওখানে কোন সরল অসহায় বিশ্বাস-প্রবণ প্রাণ যদি গিয়ে তৃষ্ণার জল চায় তাহলে ধর্মকূপের অভ্যন্তরবাসী কেউ এসে নির্মল জলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ওর ভিতরে নিয়ে যায়। একটি স্ত্রীলোককে এক্ষুনি নিয়ে গেছে আমি দেখেছি।"

অভি। আপনি দেখ্‌লেন অথচ বারণ করলেন না ?

সিদ্ধান্তশেখর। বারণ করে কোন ফল হয় না বরং উল্টো ফল হয়। আমি আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ওই ধর্মকূপে পতিত হতে দেখেছি। এই জ্ঞানরাজ্যের মধ্যে কয়েকটি ওই রকম ধর্মকূপ আছে। একবার যদি ওর প্রতি কোন মোহ জন্মায় তাহলে আর নিস্তার নাই। জ্ঞান-রাজ্যে সে আর ফিরে আসতে পারবে না।

অভি। আপনি এতে পড়েন না কেন ?

সি। আমি যে নাস্তিক।

অভি। আমি কি প্রবেশ করতে পারব ?

সি। তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করুন। আপনাকে যদি যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন—ও'রা নিজেরাই এসে সমাদরে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

অভি। আমি যদি লাফিয়ে পড়ি ?

সি। (হাসিয়া) তা হয় না। ওর কিছুদূর গিয়েই একটা রুদ্ধদ্বার আছে। অবিশ্বাসী নাস্তিকের পক্ষে তা চির-রুদ্ধ।

এই বলিয়া সিদ্ধান্তশেখর চলিয়া গেলেন।

অভিজিৎ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না।

তারস্বরে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলেন—কেহ আসিল না।

ভিতরে লাফাইয়া পড়িলেন—কিন্তু উঠিয়া আসিতে হইল।

সর্বপ্রকার চেষ্টা তিনি করিলেন—কিন্তু ধর্মকূপ তাঁহার নিকট রুদ্ধই রহিয়া গেল।

অনুজা আর ফিরিবে না—?

সে কি!

শিল্পী,—উদ্‌ভ্রান্ত শিল্পী—চলিয়াছে।

চতুর্দিকে হতাশার মরুভূমি—মৃগতৃষ্ণিকার মায়াসরোবর রচনা করিতেছে। তৃষ্ণার্ত শিল্পী তাহাদেরই উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃষ্ণা ত মিটিল না—কিন্তু শক্তির যে শেষ হইয়া আসিল!

তপ্ত বালুকণার জলন্ত অনুভূতি—ঘূর্ণিবাতাসের উন্মত্ত নর্তন—মরীচিকার ছলনা!

শিল্পীর বিস্রস্ত কেশ, বিক্ষত চরণ। নয়নে তীব্র জ্বালা, বক্ষে নিদারুণ পিপাসা। বিশুষ্ক রসনায় অব্যক্ত হাহাকার—কোথায়—কোথায়—কোথায়!

ওই যে আর একটু দূরে—ওই ত শ্যাম অরণ্যানীর স্নিগ্ধকান্তি।—জলধারার আভাস পাওয়া যাইতেছে যেন!

মরীচিকার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে সহসা শিল্পী আর পারিল না। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ তপ্ত বালুকায় লুটাইয়া পড়িল।

কাছে—দূরে মরীচিকার স্বপ্ন রচনা করিতেছে। এখনও!

ধীরে ধীরে একটি মরীচিকা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

…একটি মানবী মূর্তি।

সুন্দরী—যুবতী—তন্বী!

ধীরে ধীরে সে শিল্পীর নিকট আসিল।

ধীরে ধীরে কহিল—"ওঠ, আমি এসেছি।"

ধর্মকূপের অভ্যন্তর।…চতুর্দিক বন্ধ। আলোক-প্রবেশের পথ নাই। ধূপ-ধূনার ধূমে সমাচ্ছন্ন। হোমাগ্নি জ্বলিতেছে। রাশি রাশি মৃত কিম্বা মৃতপ্রায় পুষ্পের শবদেহ। এখানে মহাধার্মিক সকলেই অন্ধ। এক একজন হাত ধরিয়া তাহাদের লইয়া বেড়াইতেছে। বিবিধ মূর্তি। কাহারও শিখা—কাহারও জটা—কেহ মুণ্ডিত-মস্তক—কেহ পট্টবস্ত্র পরিহিত—কেহ উলঙ্গ—কেহ রক্তাম্বরধারী।

…সিংহবাহিনী-মূর্তির পদতলে অনুজা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। সরলতার প্রতিমূর্তি একটি নারী বসিয়া গান গাহিতেছে। তাঁহার নাম বিশ্বাস। এই গানের সুরই ধর্মরাজার প্রাণ-মন্ত্র!

ডাকো শুধু ডাকো—
তাঁহারি চরণে মরম-খানিরে
উজার করিয়া রাখো।
তাঁহারি বোঝা চরণের তলে
ভিজাইয়া রাখ নয়নের জলে
সকল বেদনা ঘুচিবে মুছিবে
যেও না, দাঁড়ায়ে থাকো!
বেদনার কথা লুকায়ে রেখো না
সরমের কথা বৃথাই ঢেকো না
কেবল তাঁহার মোহন মূরতি
ব্যথিত মরমে আঁকো!

এই একই মন্ত্রের বিবিধ ভাষা! অন্ধকারে অন্ধের প্রার্থনা। অনুজা অন্ধ হইয়াছে।

প্রার্থনা করিতেছে, 'ভাইকে ফিরাইয়া দাও'—পিপাসা কিন্তু মেটে নাই। অভিজিৎ কখন জল আনিবে—মনে মনে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

অভিজিৎ মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অনুজার মত বিশ্বাস তাহার নাই···ধর্মজগতে সে স্থান পাইল না। শিল্পীর মত স্বপ্ন নাই. কোন মরীচিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিল না। সংসারের সাধারণ মানুষ সে। শিল্পী তাহার বন্ধু ছিল—তাহার পাগলামির জন্যই তাহাকে ভালবাসিত। অনুজাকে সে জীবন-সঙ্গিনী করিতে চাহিয়াছিল। পাইল না। কাহাকেও পাইল না।

হতাশার মরুভূমি ধু ধু করিতেছে। অভিজিৎ যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়—জীবনের সমস্তটা যখন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে তখন তাহার সহিত এক ফেরিওয়ালার দেখা হইল। নাম তার ব্যসন। অভিজিৎ তাহাকে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

"তুমি কে ভাই ?"

"আমি একজন ফেরিওয়ালা !"

অভি। ফেরিওয়ালা ? এই মরুভূমির মাঝখানে ফেরিওয়ালা !

ব্যসন। আজ্ঞে হ্যাঁ। এইখানেই আমার সমঝদার বেশী।

অভি। কি আছে—তোমার কাছে ?

ব্যসন। নানারকম জিনিস আছে। কি চান বলুন ?

অভি। দু' একটা নাম কর দেখি।

ব্যসন। তাস, পাশা, গান, সাহিত্য, সঙ্গীত, মদ।

অভি। মদ আছে ?

ব্যসন। আছে।

অভি। দাম ত আমার কাছে এখন নেই।

ব্যসন। আমার কাছে আসতে হলে অগ্রিম দাম দিয়ে তবে আসতে হয়। তা আমি পেয়ে গেছি। জিনিসটার দাম যথা-সময়ে ও যথাস্থানে আপনার কাছে আদায় করে নেওয়া হবে।

অভি। (সাগ্রহে) দিন তবে।

বহুকাল পরে অনুজা ও অভিজিতের দেখা হয়।

অনুজা অন্ধ—অভিজিৎ মত্ত।

কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই।

আনন্দের দেশ। চতুর্দিক উজ্জ্বল। অজস্র ফুল, অজস্র হাসি—অনবদ্য সঙ্গীত, অফুরন্ত আনন্দ। তরুণ-তরুণীর হাট। বিশ্বের যৌবন এখানে অক্ষয় হইয়া আছে।

একটি নির্জন চাঁপা-গাছের তলায় বসিয়া শিল্পী মরীচিকা-সুন্দরীর কর্ণমূলে স্তুতিগান করিতেছে—"তুমি কত সুন্দর !"

শিল্পীর সেই মর্মর প্রতিমা ?

তাহা এখনও ভগ্ন-বিদীর্ণ !

শ্যাম শৈবালদল আসিয়া তাহার বিদীর্ণ-স্থানটুকু ঢাকিয়া দিতেছে।

স্বপ্ন

নিদারুণ দারিদ্র্য। দুই বেলা অন্ন জোটে না, পরিধানে ছিন্ন মলিন বসন। অপরিচ্ছন্ন পল্লীতে খোলার ঘরে তবু দিন কাটিতেছিল। কিন্তু নূতন একটি সমস্যার উদয় হইয়াছে, পুঁটি আসন্নপ্রসবা। যদিও প্রথম সন্তান, তবু আনন্দ নাই। দীন-দরিদ্রের অভাব অনশনের মধ্যে কোন্ হতভাগ্য আসিতেছে কে জানে। পুঁটি বিপিন উভয়েরই চিন্তার অন্ত নাই। যেদিন ব্যথা ধরিল, সেদিন সেই সরু গলিতে একটি দামী মোটর প্রবেশ করিল এবং মোটর হইতে কাঁচাপাকা-গোঁফ ঝাঁকড়া-ভুরুওয়ালা এক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। লোকটি খর্বাকৃতি। গায়ে দামী শাল, পায়ে দামী জুতা, অনামিকায় দামী আংটি। ভদ্রলোক নামিয়া প্রশ্ন করিলেন, এগারো নম্বর বাড়ি কোন্‌টা ?

পাড়ার এক ব্যক্তি খোলার ঘরগুলি দেখাইয়া দিল।

ওই খোলার ঘরগুলো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ির মালিক সামনের ঘরটায় থাকেন, পেছনের ঘরগুলো ভাড়া দেন। সবগুলোরই এক নম্বর।

কি দুর্দৈব !

অস্ফুট কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া ভদ্রলোক আগাইয়া গেলেন। বাড়ির মালিক সম্মুখের দাওয়ায় বসিয়া ছিলেন।

আপনিই কি এই বাড়ির মালিক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার বাড়িতে বিপিন ব'লে কি কোন ভাড়াটে থাকে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তার স্ত্রীর নাম কি পুঁটি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তিনি কি আসন্নপ্রসবা ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কবে নাগাদ ছেলে হবে বলতে পারেন আপনি ?

আজই হতে পারে, শুনছি ব্যথা ধরেছে।

ও, তাই নাকি ? তা হ'লে তো দেরি করা ঠিক হবে না। এই রঘুবীর সিং, তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে এস তাহ'লে, জল্‌দি।

মোটর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ভদ্রলোক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া রোয়াকটা ঝাড়িয়া বসিতে যাইতেছিলেন, বাড়িওয়ালা বাধা দিল।

ওখানে বসবেন না, আমি মোড়া বার ক'রে দিচ্ছি।

মোড়ায় উপবেশন করিয়া ভদ্রলোক একটি সিগার ধরাইলেন এবং বলিলেন ; এখানে নহবৎ বসাতে চাই, তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?

নহবৎ ? কেন ?

কেন পরে বলছি। ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবেন ?

এখানে কি ক'রে ব্যবস্থা হয় এখন।

হুঁ, মুশকিল বটে। আচ্ছা, ফুটপাতে ব'সেই বাজাবে। এপাড়ায় যতগুলো শাঁখ আছে যোগাড় করুন। পুঁটিমায়ের ছেলে হবামাত্র বাজাতে হবে। প্রত্যেক শাঁখের জন্যে আমি নগদ দশ টাকা ক'রে দেব। যোগাড় করতে পারবেন ?

এক্ষুনি। তা হবে না কেন ?

বিস্মিত বাড়িওয়ালা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

যান তাহ'লে, দেরি করবেন না।

পকেট হইতে এক শত টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া বাড়িওয়ালার হস্তে দিলেন, বাড়িওয়ালা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। বিস্ময়কর খবর রটিতে বিলম্ব হইল না, দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। রঘুবীর সিং আসাসোঁটাধারী জরির পাগড়ি পরা একদল বরকন্দাজ আনিয়া সারি সারি দাঁড় করাইয়া দিল। নহবৎও লইয়া আসিল। তাহারা ফুটপাতে বসিয়াই আশাবরী রাগিণী বাজাইতে লাগিল। একজন ডাক্তার ও নার্স আসিয়া পুঁটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন।

কৌতুহলী জনতার আগ্রহাতিশয্যে খর্বাকৃতি ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটি অবশেষে খুলিয়া বলিলেন।

রাজা নেহাল সিং আমার মনিব ছিলেন। লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি রেখে অপুত্রক অবস্থায় তিনি মারা যান। আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, সমস্ত সম্পত্তি আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। কাল রাত্রে হঠাৎ এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলাম। আমার মনিব যেন আমাকে বলছেন, ঐশ্বর্যের সুখ তো অনেক ভোগ করেছি, দারিদ্র্যের সুখ কি তাও একবার ভোগ করবার ইচ্ছে আছে। কাল আমি এক দরিদ্রের ঘরে জন্মাব, আমার মায়ের নাম পুঁটি, বাবার নাম বিপিন, ঠিকানা এই। ঠিকানাটা দিয়েই তিনি অন্তর্ধান করলেন, আমারও তখন ঘুম ভেঙে গেল। সকালে উঠে ভাবলাম, একবার খোঁজ নিয়ে আসি। সত্যিই যদি তিনি আবার আসেন, তাহ'লে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। খোঁজ নিয়ে দেখছি, স্বপ্ন মিথ্যে নয়। তাই সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি। আপনারা পাড়াসুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুন, খরচ যা লাগে আমি দেব। বিপিনবাবু এখনও ফেরেন নি ? তাঁর ছেলের সম্পত্তিও তাঁর হাতে আমি ফিরিয়ে দিতে চাই, বুঝলেন।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বহু শঙ্খ একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। রাজা নেহাল সিং জন্মগ্রহণ করিলেন। নহবতে আশাবরী তখন জমিয়া উঠিয়াছে।

নন্দী ক্ষ্যাপা

ট্রেন থেকে নেবেই একটি দুঃসংবাদ পেলাম—'কনেক্‌সন্‌' মিস্‌ করেছি। পরবর্তী ট্রেনের জন্য সাত ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোন আয়োজন বা উপকরণ সঙ্গে নেই। বন্ধু নেই, পরিবার নেই, এমন কি একখানা বই পর্যন্ত নেই। সম্বলের মধ্যে ছোট একটি সুটকেশ—তাতে খান দুই কাপড়, গামছা, কামাবার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই। স্টেশনের দিকে চেয়েও সান্ত্বনা পাবার মতো চোখে পড়ল না কিছু।

ছোট স্টেশন। হুইলার নেই। গোটা দুই ফেরিওলা, কয়েকটি কুলি এবং জন দুই স্টেশনের বাবু (তাঁরাও কাজে ব্যস্ত)—এদের কেউ আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। সাত ঘণ্টা চুপ ক'রে বসে থাকাও তো মুশকিল।

সুটকেসটি হাতে ঝুলিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়লাম। একটু দূরে গিয়েই একটি খাবারের দোকান চোখে পড়ল। ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এখানে দেখবার মতো কিছু আছে কাছে-পিঠে ? সমস্ত দিনটা কাটাই কি করে ?"

"এখানে দেখবার মতো আর কি আছে ! তবে নন্দী ক্ষ্যাপাকে যদি দেখতে চান চেষ্টা করতে পারেন।"

"সে আবার কে ?"

"সাধক একজন, শ্মশানে থাকে। তবে গেলেই যে দেখা পাওয়া যাবে তার কোন মানে নেই। নদীর চড়ায় কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না—মন মরজি।"

"শ্মশান কত দূর এখান থেকে ?"

"আধ ক্রোশটাক হবে—এই রাস্তা ধ'রে চলে গেলেই দেখতে পাবেন। মা-কালীর মন্দির আছে।"

কি আর করি, শ্মশানের দিকেই অগ্রসর হলাম।

বেশ ভাল লাগল। চমৎকার নির্জন জায়গা। পাশ দিয়ে একটি নদী বইছে। নদীর ধারেই কালীমন্দির। মন্দিরের চার দিকে পাকা প্রশস্ত বারান্দা। মন্দিরে কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই! মন্দিরের কপাট খোলা রয়েছে। সামনে দাঁড়াতেই কালীপ্রতিমা চোখে পড়ল। লোলিহ-রসনা ভয়ংকরী মূর্তি। প্রণাম করলাম। একটা বলিষ্ঠ কালো কুকুর মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, ক্ষণকাল আমার দিকে চেয়ে রইল, তার পর চলে গেল। আমি নদীর ধারের বারান্দাটায় গিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। বারান্দাটার নীচেই খানিকটা জমি, তারপরই কণ্টকাকীর্ণ নদী তীর, ঝোপ ঝাড়ে পরিপূর্ণ, গোটাকয়েক গ্রন্থিল আশশেওড়া গাছ নদীর উপর ঝুঁকে আছে। চতুর্দিক কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে, একটি পাখী পর্যন্ত ডাকছে না। দিনের বেলাও গা ছম ছম করতে লাগল। তবু কিন্তু উঠে পালিয়ে আসতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা আকর্ষণী শক্তি আমাকে যেন টেনে বসিয়ে রেখে দিলে। বসে রইলাম—সমস্ত মনটা উদাস হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা কান্নার শব্দে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। মন্দিরের সামনের দিক থেকে কান্না আসছে মনে হ'ল। উঠে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা মড়া এসেছে। মড়া বয়ে এনেছে জন ছয়েক লোক, তাছাড়া সঙ্গে দুটি স্ত্রীলোক রয়েছে। একটি কম বয়সী—বছর ষোল হবে—আর একটি প্রৌঢ়া। একজন স্ত্রী, একজন মা, দুজনেই খুব কাঁদছে। শুনলাম সর্পাঘাতে মারা গেছে লোকটি। কে যেন ওদের বলেছে যে নন্দী ক্ষ্যাপা যদি কৃপা করে তাহলে ও বেঁচে যাবে। সেই আশায় এসেছে ওরা।

একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে--"কতক্ষণ এসেছেন আপনি ?"

"প্রায় ঘন্টাখানেক হবে।"

"নন্দী বাবার দর্শন পেয়েছেন ?"

"না, আমি তো কাউকেই দেখিনি।"

শ্মশানের ডোমটাও এসে জুটেছিল। সে বললে—"এখন ব'স খানিক—উ কখন যে কুথায় থাকে—কেউ বলতে লারে।"

সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় ক'রে শব্দ হ'ল একটা। ফিরে দেখি নদীর ধারের ঝোপ ঝাড় কাঁটা বন ভেঙে আবির্ভূত হচ্ছেন নন্দী ক্ষ্যাপা। বিরাট পুরুষ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জবা ফুলের মতো লাল চোখ। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। সর্বাঙ্গে কাদা মাখা। বিরাট একটা মস্ত মহিষ যেন। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে। আমিও করলাম।

কি চাস এখানে ?

ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে ব্যাপারটা নিবেদন করলে। শোনামাত্র লোকটা যেন ক্ষেপে গেল।

"বেরো শালা—বেরো—বেরো—বেরো বলছি এখান থেকে—"

একটা পোড়া কাঠ পড়ে ছিল তাই নিয়ে তাড়া করলে। পুরুষগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। মেয়ে দুটি বসে রইল।

"তোরা আবার বসে রইলি কেন, যা না—"

তারা নড়ে না।

"ওঠ, ওঠ বলছি—"

তারা মাথা নীচু ক'রে কাঁদতে লাগল ব'সে ব'সে। তখন নন্দী ক্ষ্যাপা যা মুখে এল তাই বলে গাল দিতে লাগল। সে ভাষা এত অশ্লীল যে লেখা যায় না। কতকগুলো ইট পড়েছিল কাছে তাই তুলে মারতে লাগল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। আমি আর এদৃশ্য দেখতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ও করছিল। আমি তাড়াতাড়ি মন্দিরের পিছনের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম সবাই চলে গেলে আস্তে আস্তে সরে পড়া যাবে। সমস্ত মনটা ঘৃণায় বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল। ইনিই সাধক ! এরই এত নাম ডাক ! ছি—ছি—ছি ! এই করেই দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।

হঠাৎ গালাগালির শব্দ থেমে গেল। মন্দিরের ভিতর পদশব্দ পেলাম। তার পরই—

"মা, সত্যিই বড় দুঃখী ওরা—যদি পারিস বাঁচিয়ে দে ; বাঁচিয়ে দে মা—তুই দয়াময়ী, ইচ্ছে করলে সব পারিস—" নন্দী ক্ষ্যাপার কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে এলাম। এসে দেখি নন্দী ক্ষ্যাপা মন্দির থেকে নেমে যাচ্ছে। কারও দিকে ফিরে চাইলে না। ঝোপঝাড় ভেঙে সোজা নেমে গেল নদীর খাতের মধ্যে।...

ফেরবার সময় দেখলাম মড়া আগলে মেয়ে দুটি তখনও বসে কাঁদছে। কষ্ট হ'ল। একটা বদ্ধ পাগলের উপর বিশ্বাস ক'রে কি দুর্ভোগ এদের।

স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। হঠাৎ স্টেশনের বাইরে একটা সোরগোল উঠল। বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি ভীড়ের মধ্যে সেই মেয়ে দুটি—তাদের মুখে হাসি ফুটেছে—আর তাদের সঙ্গে একটি যুবক। সবাই বলাবলি করছে—আশ্চর্য ক্ষমতা লোকটার। মড়াকে বাঁচিয়ে দিলে ? আশ্চর্য !

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বনফুল ঃ গল্প সমগ্র

প্রথম খণ্ড

তথ্যপঞ্জী

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

সম্পাদিত

বনফুলের গল্প প্রসঙ্গে

বনফুলীয় গল্প বাঙলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। তাঁর জীবৎকালে নানা পত্র পত্রিকা হতে তাঁর লেখার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার তিনি একজন নিয়মিত মুখ্য লেখক ছিলেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক বন্ধুবর সজনীকান্ত দাসের অনুরোধে তিনি 'সচিত্র ভারত' ও অন্যান্য পত্রিকাতে লিখতেও সম্মত হন। সজনীকান্ত দাস ও শ্রীপরিমল গোস্বামীও নানাপ্রকারে উক্ত পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বনফুল বলেন, লেখক হবার মূলে তিনি যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ তাঁদের মধ্যে উপরোক্ত দুই ব্যক্তিই সর্বাগ্রগণ্য। সত্যি বলতে, এঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বে তাঁর লেখা ছিল সীমিত, কিছু কবিতা ও কিছু গল্পের মধ্যে। ১৩২৯ সালের ভাদ্র (১৯২২ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) সংখ্যার প্রবাসীতে 'পাখী' গল্পটিই তাঁর সর্বপ্রথম প্রকাশিত গল্প। অনেকের মতে 'চোখ গেল' গল্পটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। কিন্তু এই গল্পটি প্রকাশিত হয় উক্ত পত্রিকায় ঐ বছরের আশ্বিন সংখ্যায়।

বনফুল বলেন, তাঁর বিবাহ হয় ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সালে (৭ই জুন, ১৯২৭)। সংসারের দায়িত্বে এবং ডাক্তারি পেশার প্রসারে এই সময়ে তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে, বড় কোনও সাহিত্যকর্মে এই সময়ে তিনি হাত দিতে পারেননি। তাঁর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়,—

> "জীবনের একমাত্র নারী—সহধর্মিণী লীলা দেবীকে কেন্দ্র করিয়া এই অবসরে কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠে, বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হয়; পাড়াপ্রতিবেশী এবং রোগীরা আসিয়া প্রতিমার চারিদিকে চালচিত্র রচনা করে; বলাইচাঁদের সাহিত্যিক দুর্গোৎসব রূপে রসে ভরিয়া উঠে। কিন্তু প্রধানত ওই প্রতিমার স্তবপাঠের মধ্যেই তাঁহার এই কালের সাহিত্যকীর্তি নিবদ্ধ ছিল; লক্ষ্মী-সরস্বতী কার্তিক-গণেশ সিংহ-সর্প মহিষাসুর নন্দী-ভৃঙ্গী কলাবউ আসিয়া জুটে নাই।"
> পরবর্তীকালে বনফুলের কবিতাগ্রন্থ 'বনফুলের কবিতা' (১৯২৯) ও 'অঙ্গারপর্ণী'-তে (১৯৪০) ঐ কবিতাবলী স্থান পায়। তারপরে বনফুলের প্রথম গল্পসংকলন 'বনফুলের গল্প' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৯-৩০ সনে। তারপরে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সনে।

সজনীকান্ত 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেই পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন বনফুল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় ১৯৩৫ সনে যখন সজনীকান্ত অসুস্থ হয়ে বিশ্রামের জন্য ভাগলপুরে যান। ইতিপূর্বে ১৯৩৩ সনের শেষের দিকে শ্রীপরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'-র সঙ্গে যুক্ত হন এবং পৌষ, ১৩৩৯ সংখ্যা থেকে সজনীকান্তের স্থানে তিনি সম্পাদক হন। সেই সময় থেকে পরিমলবাবু লেখক হিসেবে বনফুলকে উৎসাহিত করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> '…দ্বিজেনবাবু (শ্রীদ্বিজেন্দ্র সিংহ) ও বলাইচাঁদ দুজনেই ডাক্তার এবং ভাগলপুরবাসী। আমি সেখানে তখন আগন্তুক মাত্র। কিন্তু বনফুলকে উস্কে দিলে তার উৎসাহের অন্ত থাকে না। যেমন তাকে সাহিত্যবৃত্তিতে উস্কানি দেওয়াতে লেখা দিয়ে সে ক্রমে বাংলাদেশ ছেয়ে ফেলেছে, তাকে এখন ঠেকানো দুঃসাধ্য…।'

সত্যি, ১৯৩৫ সনের পর থেকে বনফুলের বৈচিত্র্যময় রচনাবলী বর্ষাধারার মতো প্রকাশিত হতে থাকে।

বনফুলের ব্যঙ্গ রচনার প্রধান প্রকাশ মাধ্যম নিঃসন্দেহে 'শনিবারের চিঠি'। ঐ পত্রিকায় যে তিনি শুধু ব্যঙ্গ কবিতা, গল্প ও বিশিষ্ট উপন্যাস ধারাবাহিক লিখেছেন তাই নয়, সমসাময়িক আধুনিক সাহিত্যের উপরে বেনামীতে 'স্যাটায়ার'ও লিখেছেন। একথা বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক মাত্রেরই জ্ঞাত যে, তৎকালে অতি-আধুনিক যৌন-সাহিত্য বিষয়ে নির্মম সমালোচনা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। বনফুলকে 'উস্কে' দিলেন পরিমলবাবু। অতএব কোন বিষয়েই তাঁর আর লিখতে বাধা নেই। কল্লোল-প্রগতি-কালিকলম ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত যৌন সাহিত্যের উপরে রূপকধর্মী একটি ব্যঙ্গ রচনা তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন পরিমলবাবু এবং সেই লেখা প্রকাশিত হলো উক্ত পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৪০ সংখ্যায়। বনফুলের ব্যঙ্গরচনায় যে অপূর্ব সিদ্ধহস্তের রূপকরস পাওয়া যায়, উক্তপ্রকার রচনাগুলি নিঃসন্দেহে তারই পূর্বাভাষ। নিম্নে কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বোধ হয় বাহুল্য হবে না—

> "…আমার এক বন্ধুপত্নী তাঁহার প্রথম সন্তান জন্মাইবার পর বছরখানেক পরে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।—সিমটম মিলাইয়া ওষুধ দিলাম। কিছুই হইল না। —আসিলেন কবিরাজ—বলিলেন বায়ু কুপিত হইয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।—
>
> হঠাৎ একদিন রাত্রে ধরিল পেটে ব্যথা। ক্ষীরোদবাবু আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, 'এ তো লেবার পেন।' —শেষরাত্রি নাগাদ ক্ষীরোদবাবু বলিলেন, এ আপনি হবে না, ফরসেপস্ ডেলিভারি করতে হবে—যাই হোক ক্ষীরোদবাবু ফরসেপস্ লাগাইলেন। প্রসবও করাইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! কি সন্তান হইল জানেন? ছেলে নয়, মেয়ে নয়, মনস্টার নয়—যাহা ডাক্তারি কেতাবে লেখা তাহার কিছুই নয়। বাহির হইল—
>
> ১। একতাড়া প্রেমপত্র।
>
> ২। কতকগুলি গল্প ও প্রবন্ধ।
>
> ৩। কয়েকখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি।
>
> স্বচক্ষে দেখিয়াছি মশায়। সবগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িয়াছিও। তাহার পর বন্ধুবর এখান হইতে চলিয়া যান। সহসা দেখিতেছি সমস্ত মাসিক পত্রিকায়

সেই সব পত্র, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসাদি বাহির হইতেছে। আঁতুড় ঘরের গন্ধ এখনও যেন উহাদের গায়ে আছে। এগুলিও ঠিক তদ্রূপ।…”

অবশ্য উক্ত রচনাটি ‘বৃহন্নলা বসাক এম-ডি (হোমিও)’ ছদ্মনামে “সত্য ঘটনা” শীর্ষনামায় প্রকাশিত।

বাঙলা সাহিত্যে বনফুলী-গল্পের যে একটি বিশিষ্ট স্বকীয় স্থান রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। ব্যঙ্গ গল্প, প্যারডি, রহস্য, রূপক, হাস্যরস ও কৌতুক মিশ্রিত গল্প অনেকেই লিখেছেন—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় হতে পরশুরাম পর্যন্ত বহু বিচিত্র রসের সন্ধান মিলে। কিন্তু বনফুলের গল্প ঠিক তাঁদের সমগোত্রীয় বলা যায় না। কারণ, তাঁর অধিকাংশ গল্পের ব্যঙ্গরস বহিরাবরণ মাত্র, অন্তরের করুণ রসটিকে গোপন করবার জন্য।

বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যাদুকর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> “ছোট গল্প বলিয়া কোন জিনিস রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। যাহা ছিল. তাহা ছোটগল্প নহে, কাহিনী। অথবা অসার্থক উপন্যাসের কয়েকটি অধ্যায়। কাহিনী এবং ছোট গল্পে প্রভেদ বিস্তর। ছোট গল্প একটি বিশেষ ভঙ্গি “কথা-”ব। আমাদের দেশেব প্রাচীন সাহিত্যে “কথা” ছিল। যেমন, কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্র।…। ছোট গল্প এই শ্রেণীর “কথা” নয়। ইহাতে একটি বিশেষ ধরনের আর্ট প্রকাশিত।… উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী সাহিত্যে Comtc বলিয়া এক শ্রেণীর “কথা” বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মোপাসাঁ, ব্যালজাক, আলফাঁস দোদে প্রভৃতি ক্ষমতাশীল কথা-লেখকের হাতে Comte অপূর্ব সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে…। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এদিকে পতিত হইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইহা একটি অদ্ভুত সৃষ্টি।…এই মাধ্যমের মূল কৌশলটি সকলেই যথাযথভাবে অভ্যাস করিলেন। এই মূল কৌশলটি হইল ছোট গল্পের ‘মুহূত” বা moment। …প্রথম অংশটি ‘ভূমিকা’, দ্বিতীয় অংশ ‘সম্প্রসারণ’, তৃতীয় অংশ ‘পুনরাবৃত্তি’, চতুর্থ অংশ ‘বিরতি’ ও সর্বশেষ অংশ Koda বা ‘ক্লাইম্যাক্স’।…”

বস্তুতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশগল্পই মোটামুটি এই ‘ফরম্’এ রচিত। পরবর্তী-কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের বেলাতেও এই ‘ফর্ম’-এর আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু, বনফুলের গল্পকে এই পর্যায়ে বোধ হয় ফেলা যায় না। তিনি সংক্ষিপ্ত ‘ভূমিকা’ (যেটুকু না দিলে নয়) ও সংক্ষিপ্ত ‘সম্প্রসারণ’-এর পরেই একেবারে সেই ‘মুহূর্তে” চলে এসেছেন, যেখানে ‘ক্লাইম্যাক্স’। সেইজন্যই তাঁর গল্পের পরিধি বাড়তে পারেনি, প্রকৃতই ‘ছোটগল্প’ না হয়ে ‘ছোট গল্প’ হয়েছে। বরং তাঁর ছোট গল্পকে গল্পিকা বলাই উচিৎ। অবশ্য, তা বলে যে বনফুল ‘Comte’-ধর্মী বা ‘ফর্ম’-এ গল্প লেখেননি তা নয়, যেমন ‘টাইফয়েড্’। তবে, অগণিত তাঁর গল্পের মধ্যে ঐরকম গল্পের সংখ্যা অল্প।

এই ‘ফরম’ বাঙলা সাহিত্যে একেবারে নূতন। প্রথমে রবীন্দ্রনাথেরও বোধ হয় বনফুলী-গল্পিক ‘ফর্ম’-এর সাফল্যের উপরে কিছু সন্দেহ ছিলো। ১৯৩৭ হতে ১৯৪০

সনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—যার অপূর্ব বিবরণ পাওয়া যায় বনফুলের 'রবীন্দ্র স্মৃতি' গ্রন্থে। 'বনফুলের আরও গল্প' বইটি প্রকাশিত হবার পরে (১৯৩৮। বনফুল রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য) ওটির এক খণ্ড তিনি গুরুদেবকে পাঠিয়ে দেন। উক্ত বইখানি প্রাপ্তির কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে এক পত্রে লেখেন—

> "তোমার এবারকার গল্পগুলো পড়ে' কী মনে হল বলি। যেন তুমি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, হাটে যাবার মেঠো-রাস্তায় যেতে যেতে এদিকে-ওদিকে আগাছা এবং ঘেসো গাছ-গাছড়া যা তোমার চোখে পড়েছে, তোমার নমুনার বইয়ে সেগুলোকে গেঁথে রেখেছ। এগুলো পথিকদের চোখ এড়ায়—কেননা এরা না দেয় পুজোর ফুল, না চড়ে চীনে ফুলদানিতে। এরা আদরণীয় নয়, পর্যবেক্ষণীয়। তুলে ধরে' দেখিয়ে দিলে মনে হয় কিছু খবর পাওয়া গেল, কিছু কৌতুক লাগে মনে। মেঠো পথটা চৌরঙ্গী রোড নয়, কিন্তু জীবলোকের নানা আমেজ ওর এখানে-ওখানে লুকিয়ে থাকে, ওর ফড়িং-টিকটিকিগুলো ময়ূর-হরিণের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু ঝুঁকে পড়ে যদি দেখা যায় তাহলে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে—আর ঘেসো জগতের সঙ্গে ওদের মিল দেখে কিছু মজাও লাগে।"

স্বভাবতই উক্ত চিঠি পেয়ে ক্ষুণ্ন হয়ে বনফুল রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন—

> '...আমি আপনাকে পাঠালাম কাব্য আর আপনি আমাকে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ঠাওরালেন। এটা ঠাট্টা, না প্রশংসা, বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

অবশ্য, এবার ঐ চিঠির জবাব আসতে দেরি হলো না। ৭ ১০. ৩৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> 'তুমি জানো বর্তমান যুগ সাহিত্যের উপরে বিজ্ঞানের মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তার কাজ হচ্ছে মনোযোগ করানো। আগাছা পরগাছা ওষধি বনস্পতি সব কিছুতেই যে দৃষ্টি সে টানে সে কৌতুহলের দৃষ্টি। পদে পদে সে বলিয়ে নিচ্ছে, তাই তো, এতো আমি দেখিনি, কিংবা ঠিকটি দেখলুম। আগেকার সাহিত্য চোখ ভোলানো সামগ্রী নিয়ে, এখনকার সাহিত্য চোখ-এড়ানো সামগ্রী নিয়ে। আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে উপেক্ষিত অনতিগোচরের দিকে। তাতেও রস আছে, সে হচ্ছে কৌতুহলের রস। সাজ-পরানো কনে-দেখানোর মতো করে প্রকৃতিকে দেখাতে গেলে ঐ রসটি থেকে বঞ্চিত করা হয়, ঠিকটি দেখা গেলো বলে' হাততালি দিয়ে ওঠার উৎসাহ চলে যায়। জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলিধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতায় মূল্যেই তাদের মূল্যবান ক'রে দেখাবার কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক। তোমাদের সন্ধান জগতের অভাজন মহলে—তোমাদের ভয় পাছে ছোটকে বাড়িয়ে বলো, পাছে তার অকিঞ্চিৎকরত্বের বিশিষ্টতাকে ভদ্র চাদর পরিয়ে অস্পষ্ট করে' ফেলো। অতএব গল্প-সাহিত্যের

আসরে তোমাকে যদি বিজ্ঞানীর আসন দিয়ে থাকি তাহলে মান হানির আশঙ্কা করে নালিশের ভয় দেখাচ্ছ কেন ?”

সুতরাং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও বনফুলের গল্পের বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিলেন। অবশ্য, তিনিও যে এ-ধরনের গল্প কিছু লেখেননি এমন নয়। ‘লিপিকা’-র কিছু কিছু গল্পকে এই গোত্রভুক্ত করা যায়।

বনফুলের গল্প বিষয়ে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেন—

> ‘বাংলা সাহিত্যে বনফুলের ছোট গল্পগুলি এক অপরূপ বিস্ময়,—সে কেবল ঐ আশ্চর্য বাক্‌সংক্ষিপ্তির কল্যাণেই নয়,—শৈলী এবং ভাবানুষঙ্গে এমন এক অনির্বচনীয় রহস্যকরতা, যার অদৃশ্য প্রভাবে স্বল্পকথার সর্বাঙ্গ ঘিরে বচনাতীতের এক মৌন স্পর্শ যেন নিরন্তর গুঞ্জন করে ফেরে। …কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বনফুল মৌন-মুখরতার এক আশ্চর্য বৈপরীত্য-রহস্য রচনা করেছেন।’

‘রবীন্দ্র স্মৃতি’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছোটগল্প বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বনফুল লেখেন—

> ‘…তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি ও হেনরি কিংবা শেখভের গল্প পড়েছ ?’ সত্যিই আমি পাড়িনি শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘তোমার গল্প পড়লে ওদের গল্পের কথা মনে পড়ে। ওদের বই পেলে তুমি পড়ে দেখো।’ বলা বাহুল্য এ আদেশ অমান্য করিনি। দুজনের লেখা পড়েই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, যদিও ও হেনরির সব লেখা পুরো বুঝতে পারিনি, আমেরিকান চলতি ভাষার গোলকধাঁধায় অনেক সময় পথ হারিয়ে রসের উৎসে পৌঁছাতে পারা যায় নি।’

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বনফুলের গল্পের যে মৌন-মুখর বিশিষ্ট রূপ লক্ষ্য করেছেন ও হেনরীর গল্পে সে প্রসাদগুণ আছে বলে সন্দেহ। বরং পরশুরামের ব্যঙ্গ-প্যারডি গল্পের সঙ্গে হেনরী তুলনীয়। কিন্তু চরিত্র ও সাহিত্যে শেখভের সঙ্গে বনফুল অবশ্যই তুলনীয়। ‘Great Short Stories of the World’ (Edited by Clark & Lieber) গ্রন্থে শেখভ সম্বন্ধে ছোট্ট অবতরণিকায় লেখা হয়—

> “Chekhov stands out as one of the greatest short story writers of the world. Although he received an M. D. degree, he never practised medicine, but devoted himself to writing. His scientific studies were, however, of service to him. There seems to be no limit to the range of his knowledge of the human family. His situations are handled adroitly and with a strict economy of words.” (P. 676).

অবশ্য, যদিও চিকিৎসা জগতে শেখভের তেমন বিচরণ ছিল না, তথাপি তিনি বলতেন —“Medicine is my lawful wife and literature is my mistress. When I get tired of one, I spend the night with the other.” শেখভের ছোটগল্প যদিও কিছুটা পরিধি সম্পন্ন (অবশ্য বনফুলেরও ‘সম্প্রসারিত’ ছোটগল্প নেই এমন

নয়, তবে সংখ্যায় কম), তবুও মূলত আঙ্গিকের দিক দিয়ে একই গোত্রের বলা যেতে পারে। যেমন তার 'The Bet' গল্পটি। সামান্য রহস্যচ্ছলে এক ব্যাঙ্কার ও তার আইনজ্ঞ বন্ধুর সঙ্গে তর্ক হয় যে, মৃত্যুদণ্ড সহজ না যাবজ্জীবন কারাবাস করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া সহজ। এই নিয়ে দুজনের ভিতরে দুই মিলিয়ন রুবলের বাজী হয়। আইনজ্ঞ বন্ধুটি ঐ অর্থের জন্য তার স্বাধীনতাকে পনের বছরের জন্য একটি সম্পূর্ণ নির্জন কক্ষে বন্দী রাখতে রাজি হয়। উক্ত সময় পূর্ণ হবার ঠিক পাঁচ মিনিট পূর্বে সে তার নির্জন কক্ষ থেকে স্ব-ইচ্ছায় মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। সেই বেরিয়ে আসার মুহূর্তটিই এই গল্পের 'ক্লাইম্যাক্স'—যেটিকে শুধু ভাষা দিয়ে বোঝান সম্ভব নয়। তেমনি তাঁর আর একটি গল্প 'The Lady with a Toy Dog'। এণ্টন শেখভ-এর এই গল্পটি পড়ে ম্যাকসিম্ গোর্কি উল্লসিত হয়ে তাঁকে যে পত্র লেখেন তাতে রয়েছে—

> '…After you no one will be able to go along this path, for no one will be able to write of such simple things in the simple way you can. After the briefest short story from your pen everything else seems coarse and wretchedly clumsy and, what is far worse, lacks simplicity, i. e., does not ring true. There's no doubt about that · …So I say that you will make away with realism. I'm terribly pleased, for it's time it went…"

সত্যি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই গল্পগুলি বাস্তবধর্মী নয়, রূপকমাত্র। কিন্তু, সমীক্ষমান দৃষ্টি নিয়ে দেখলে দেখা যাবে, তাদের অন্তর বাস্তব মৌন-মুখরতায় পরিপূর্ণ। রূপকটি মুখোশ মাত্র। ধরা যাক 'কবচ' গল্পটি (পৃঃ ২৯৪)। প্রতিটি মানুষের অবচেতন ও বাস্তব মনের দ্বন্দ্ব চিরায়ত। আপাতদৃষ্টিতে গল্পটিকে মনে হয়—আরে, এ কী! পরমুহূর্তেই গল্পটির অন্তরে 'উঁকি' দিয়ে দেখা যায় যে, জীবনের একটি গভীর সত্য রূপকধর্মী একটি অতিসাধারণ অবাস্তব গল্পিকার ভিতরে আত্মগোপন করে রয়েছে। লেখক তাঁর সামান্য বক্তব্যটুকু বলেই যেন অন্তরালে দাঁড়িয়ে পাঠকের অবস্থা দেখে মৃদু হাসছেন আর মনে মনে বলছেন, তোমাকে নিয়ে কেমন মজা করলেম, দেখলে! শেখভের উক্ত গল্পটি পড়ে গোর্কি আরও লিখেছিলেন—

> 'Through your short stories you are doing work of the utmost importance, evoking in people, as you do, disgust in a drab and humdrum life that is semi-death, may the devil take it ! Your *Lady* affected me in such a way that I immediately felt like committing some infidelity against my wife, suffer, swear, and all that sort of thing. However, I've remained faithful to my wife because no suitable lady was in the offing, but still I had a terrific row with her and her

> sister's husband, a close friend of mine. I imagine you never expected such results from your story…Your stories are like excellent cut-glass bottles full of all the perfumes of life and, you may believe me, the discerning nose always discover among these the delicate, piquant and wholesome smell of the "real stuff.."

রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী বলেন,—

> 'রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ সংকলন করলে বনফুলের গল্পে অভিনবতার তিনটি মুখ্য উপকরণ চোখে পড়ে—(১) তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর সঞ্চয় ভাণ্ডার 'চোখ এড়ানো সামগ্রী নিয়ে' গড়া—দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে ধূলি মালিন্যের তুচ্ছতায় তারা আবৃত। (২) শিল্পীর গঠন-শৈলীতে আত্মসংবরণের বিজ্ঞান-জনোচিত সন্তর্পণ প্রয়াস,—পাশে বস্তুর 'অকিঞ্চিৎকরত্বের' বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টার ব্যক্তিগত মানসিকতার ভদ্র চাদরে আবৃত হয়ে পড়ে। (৩) রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় বক্তব্য,—বনফুলের বিজ্ঞানী মেজাজে গড়া গল্প চোখ ভোলায় না,—কৌতূহলের কৌতুক রসে 'হাততালির উৎসাহ'কে উৎসারিত করে তোলে।'

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুইটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে অধ্যাপক চৌধুরী একমত, কিন্তু তৃতীয়টি সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারেন নি। কারণ,—

> 'কবি-কথিত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে বনফুলের পরিহাসরসের গল্প প্রসঙ্গে ;—'বনফুলের আরো গল্প' যে-রসে মুখ্যত রসান্বিত ;—কৌতুক, কৌতূহল, হাততালির উৎসাহে উদ্দাম নয়—পূর্ণগর্ভ, কিংবা ভার-স্তিমিত। অর্থাৎ, এসব গল্প পড়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ম বক্রতায় অথবা humour-এর আবেশে উল্লসিত, অট্টহাস হয়ে পড়া সম্ভব নয়। হাসির উৎসমূলেও বিজ্ঞানিজনোচিত জীবনবোধের গাঢ়তা, কৌতূহলান্বিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং বিচিত্র জটিলতামুক্ত সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে যেন নিত্য অন্বীক্ষু।… বনফুলের গল্পে জীবন-ব্যাখ্যায় প্রগাঢ় বলছি এই অর্থে,—রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, বনফুলের এই ধরণের গল্পেও রসের রহস্যালোকে প্রবেশ করা সম্ভব,—"ঝুঁকে যদি দেখা যায়,"—তবেই।'

বনফুল তাঁর 'কাব্যপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধে বলেন—'একজন পাশ্চাত্য মনীষী কাব্যকে Interpretation of life বলিয়াছেন! কথাটা সম্পূর্ণ হইত 'Poet's interpretation of life' বলিলে।' এই জীবন-ব্যাখ্যান যে সর্বদাই দৃশ্যত বাস্তব-ভিত্তিক হবে এমন নয়, রূপকধর্মীও হতে পারে। আর সেই কলাকৌশলটি বনফুলের গল্পিকায় প্রোজ্জ্বল। এই বিষয়ে অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন বলেন—

> 'বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু-বিচিত্র বহু-বিসর্পিত। নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব

কল্পনার তাঁতে আত্মভাবনার জাল বুনে বুনে তাঁর গল্প গড়া নয়। এঁর গল্প প্রচণ্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর। বনফুলের গল্পে যে-সব নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়তো তাদের কেউই কখনো দেখা দেয় নি, অথচ মনে হয় তারা যেন অপরিচিত নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব।···বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে—ফোটোগ্রাফ ওঠে নি।'

বনফুলের ছোট গল্প নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। এ-বিষয়ে গবেষণাও চলছে। তাঁর গল্প সম্ভার বাঙলাসাহিত্যে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে। বলা বাহুল্য বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেও এই ধরনের গল্পের বিশেষ দেখা পাওয়া যায় না।

প্রকাশক 'গ্রন্থালয় প্রা. লি.' বনফুলের সমগ্র রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করছেন। তাঁদের কাছে অগণিত সাহিত্য রসিকের অনুরোধ প্রতিনিয়তই আসছে বনফুলের 'গল্প সমগ্র' আলাদাভাবে প্রকাশ করবার জন্য। অবশ্য এই 'গল্প সমগ্র'র প্রয়োজন অনস্বীকার্য। 'গল্প-সমগ্র'র প্রথম খণ্ডে ১৭০টি গল্প সংকলিত হয়েছে। আশা করা যায় দুটি খণ্ডে বনফুলের সমগ্র গল্প প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এই দুটি খণ্ড হতে বনফুলের গল্পের বৈশিষ্ট্য ও সামগ্রীক রূপটি বিদগ্ধ পাঠক এবং গবেষকদের নিকট প্রতিভাসিত হবে। বনফুলের 'গল্প সমগ্র' প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশ করবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

বর্ণানুক্রমিক সূচী……

অ

অমলা ৪ অজান্তে ৯ অদ্বিতীয়া ১৫ অনির্বচনীয় ২৫ অধিবাসীবৃন্দ ৪৩ অলকনন্দা ১২৩ অক্ষমের আত্মকথা ১৬২ অন্তর্যামীর কাণ্ড ১৬৭ অবচেতনা ২৮৭ অতি-আধুনিকতা ২৯০ অতি-আধুনিক ৩১৫ অণুবীক্ষণ ৪৪১ অন্ধ ৪৫৮ অভিজ্ঞতা ৪৬৬ অশ্রুর উৎস ৪৭৫ অর্জুন মণ্ডল ৪৮৫ অদৃশ্যালোকে ৫০০ অবর্তমান ৫০১ অধরা ৫১৪ আত্মপর ৭

আ

আমাদের শক্তি-সম্পদ ২১৬ আধুনিক গল্প সাহিত্য ২১৭ আত্মদর্শন ২৭৪ আকাশ-পাতাল ৩৬০ আইন ৪১৯

ই

ইতিহাস ৩২৬

উ

উৎসবের ইতিহাস ১২০

এ

এক ফোঁটা জল ৮ একই ব্যক্তি ৫১৬ এপার ওপার ৫২৪

ঐ

ঐরাবত ১১৪

ক

কার্তিকেয়-কাহিনী ১৭ ক্যানভাসার ১৬৪ কালো ১৯৪ কবচ ২৯৪ কাকের কাণ্ড ৩০৪ কোনটা গল্প ৩০৯ ক খ গ ৩১৯ করুণা-ভাজন ৩২২ কাত্যায়নী ৪৩০ কশাই ৪৭৩ কেস ৫২৬

খ

খেঁদি ৫ খোঁকি ২২ খড়মের দৌরাত্ম্য ১৪৪ খুড়ো ১৬০ খোশামোদ ২২৯ খেলা ৩০৭

গ

গদ্য-কবিতা ৩০১ গণেশ ৩২৭ গণেশ-জননী ৪৫৫ গোবর্ধন-চরিত ৪৮২

ঘ

ঘটনাচক্র ১৮৯ ঘোষাল মহাশয় ৪১৭

চ

চোখ গেল ৩ চৌধুরী ২০৬ চিন্তার কথা ২৩৮ চিরন্তনী ২৮০ চান্দ্রায়ণ ৩৪৪ চিত্র চতুষ্টয় ৩৪৯ চিঠি পাওয়ার পর ৩৬৪

ছ

ছোটলোক ৩২৫ ছেলেমেয়ে ৪১৩ ছাত্র ৫২৯

জ

জগমোহন ২০২ জৈবিক নিয়ম ৩৫৪ জ্যোৎস্না ৩৫৭ জাগ্রত দেবতা ৩৯৮

ঝ

ঝুলন পূর্ণিমা ৪৪৩

ট

ট্রেনে ৪১ টাইফয়েড ৮০

ত

তর্ক ও স্বপ্ন ৩০ তপন ৩২১ তিলোত্তমা ৩৩৯ ত্রিবেণী ৪০০ তাজমহল ৫১৯

থ

'থিওরি অব্ রিলেটিভিটি' ১৭১

দ

দত্ত মহাশয় ১৫৩ দামোদর ২৪৮ দুই বন্ধু ২৭০ দোলের দিনে ৩৩৩ দিবা দ্বিপ্রহরে ৩৬৮ দর্জি ৪১১ দুই ভিক্ষুক

ন

নরোত্তম ২১৩ নিবিড় পরিচয় ২৮৪ নাথুনির মা ৩০০ নাম ৩৩৬ নির্ভর ৪০৯ নিপুণিকা ৪২৪ নমুনা ৪৫০ নিস্তারিণী ৪৬৪ নিমগাছ ৫২৩ নন্দী ক্ষ্যাপা ৫৪২

প

পারুল প্রসঙ্গ ৬ পুজোর গল্প ৩৬ পাশাপাশি ১৪৬ পাঠকের মৃত্যু ১৫১ পরচর্চা ২২২ প্রাণকান্ত ২৪১ পাকারুই ২৯৮ পরিবর্তন ৩৭০ প্রভু-ভৃত্য ৩৮৫ প্রস্তর-সমস্যা ৩৮৭ প্রমাণ ৫১১ প্রজাপতি ৫১৫

বাড়তি মাশুল ৩ বেচারাম বাবু ১০ বিধাতা ২৯ বর্ষা-ব্যাকুল ৩৫ বলহরি, হরিবোল ৩৮ বুধনী ৬২ বাস্তব ও স্বপ্ন ১৩৮ বিদ্যাসাগর ১৪৯ বৈষ্ণব-শাক্ত ১৬৬ বংশ গৌরব ১৯৭ বাজে খরচ ২২৫ বঙ্কিম শতবার্ষিকী ২৫৭ বিবেক ২৬৩ বিবর্তন ২৬৭ বাঘা ৩৫১ ব্যতিক্রম ৩৭৭ বুর্জোয়া প্রোলিটারিয়েট ৩৯১ বর্ণে বর্ণে ৪২৮

ভ

ভৈরবী ও পূরবী ১২ ভ্রষ্ট-লগ্ন ১৮৫ ভূত ১৯৯ ভোম্বলদা ২০৮ ভক্তি ভাজন ৪৬৯

ম

মাত্র দশটি টাকা ৪৮ ভিতর ও বাহির ৫৬ মানুষের মন ৬৪ মিস্টার মুখার্জি ১৫৮ মুহূর্তের মহিমা ১৭৬ মানুষ ২১১ মাধব মুকুজ্যে ৪০৭ মকরধ্বজ মহিমা ৪৩৭ মালাবদল ৫০৯

শ

শেষ রক্ষা ৫২ শ্রীপতি সামন্ত ১৭৯ শরশয্যা ১৮২ শিশু ২৪৫ শরীর, মন ও মানুষ ২৫৪ শ্রীধরের উত্তরাধিকারী ৩৯৩ শেষ কিস্তি ৫০৭

স

সার্থকতা ৮ সমাধান ১১ স্থূলের স্মৃতি ২৬ সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ ৪৩ সুলেখার ক্রন্দন ৫৯ স্ত্রী-চরিত্র ১৬৯ স্থূল-সূক্ষ্ম ২৩৫ সংক্ষেপে উপন্যাস ৩১৩ সামান্য ঘটনা ৪২২ স্মৃতি ৪৩৩ সহধর্মিনী ৫২৭ স্বপ্ন ৫৪৯

হ

হাসির গল্প ৩৭৫ হার ৪৭৯ হিসাব ৫২২

র

রামায়ণের এক অধ্যায় ২৬ রূপকথা ৬৭ রূপকথা ১১৩ রূপকথা ৫০০ রাত-দুপুরে ৫০১

ল

লাল বনাত ৩২৪

য

যুগল স্বপ্ন ৫৪ যুগান্তর ১৩০ যূথিকা ৩৮৯